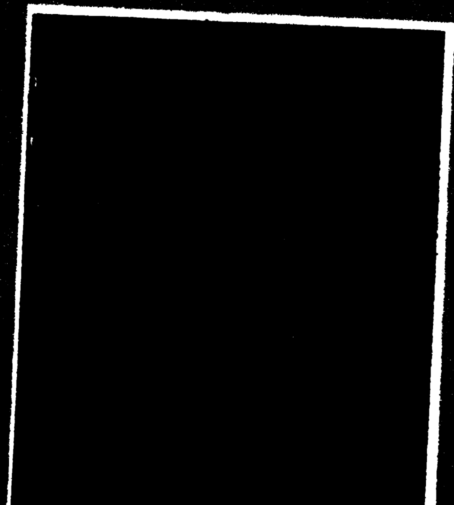
কুমুদনাথ মল্লিক

নদীয়া কাহিনী



মোহিত রায় সম্পাদিত



কুমুদনাথ মল্লিক

নদীয়া-কাহিনী

মোহিত রায় সম্পাদিত

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে স্থানীয় ইতিহাসের চর্চা শতাব্দী-প্রাচীন। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্রে স্থানীয় তথ্যসংবলিত রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সেগুলি মূলত গেজেটিয়ার-জাতীয় লেখা, স্থানীয় ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত নয়। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কোচবেহারের বিবরণ' (বলাইচাঁদ সিংহ লিখিত, বৈশাখ ১৭৮০ শক, পৃ. ৪—১০) রচনাটিকেও এই জাতীয় বলা চলে। ১৮৬২-১৮৬৩ খৃস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিজলীর বৃত্তান্ত' (আশ্বিন—অগ্রহায়ণ ১৭৮৪ শক, বৈশাখ ১৭৮৫ শক) রচনাটি সম্ভবত বাংলায় লেখা প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত হয় শ্যামধন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মুরশিদাবাদের ইতিহাস'। এই বইটি বাংলাভাষায় প্রথম স্থানীয় ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ।

স্থানীয় ইতিহাস রচনার এই ধারা প্রবাহিত থাকে বর্তমান শতকেও। গত শতকের শেষপাদ থেকে বাংলার জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চাও ব্যাপকতর হতে থাকে। প্রকাশিত হয় অম্বিকাচরণ ঘোষের 'বিক্রমপুরের বিবরণ' (পল্লীবিজ্ঞান, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৬৭), একই লেখকের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' (১৮৬৮), ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোচবিহারের ইতিহাসের উপক্রমণিকা' (১৮৮২), কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর 'নবদ্বীপ মহিমা' (২য় সংস্করণ, ১৮৮৪) ত্রৈলোক্যনাথ পালের 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' (২ খণ্ড, ১৮৯৬-৭) নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' (১৮৯৭), খোসালচন্দ্র রায়ের 'বাকরগঞ্জের ইতিহাস' (২য় সংস্করণ, ১৮৯৮), কালীনাথ চৌধুরীর 'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (১৯০১) নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' (১ম খণ্ড ১৯০২), মুনীন্দ্রদেব রায়ের 'হুগলী-কাহিনী' (১৯০৩), কেদারনাথ মজুমদারের 'ময়মনসিংহের বিবরণ' (১৯০৪), যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' (১ম খণ্ড, ১৯০৯) প্রভৃতি অজস্র গ্রন্থ।

কুমুদনাথের 'নদীয়া-কাহিনী' এই ধারারই অনুসরণ। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে কুমুদনাথ মল্লিক (১৮৮০—১৯৩৮) অবিভক্ত নদীয়া জেলার নানা স্থান পরিভ্রমণ করে সরজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তথ্য-বিবরণ সংগ্রহ করে অশেষ ক্লেশ, শ্রম ও সময়সাধ্য

গ্রন্থ 'নদীয়া-কাহিনী' রচনা সমাপ্ত করেন ১৪ ভাদ্র ১৩১৭ (৩০ আগস্ট ১৯১০) তারিখে। 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে সাতটি কিস্তিতে এই রচনার প্রথমাংশ মুদ্রিত হয় (বর্তমান সংস্করণের ৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)। তারপর অতিরিক্ত একটি লাইন ছিল : 'এইরূপে বণিক ইংরাজ ঘটনা চক্রে দেশের রাজা হইয়া পড়িলেন।'—যা গ্রন্থনকালে বর্জিত হয়েছে।

সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালের অষ্টম বর্ষে অর্থাৎ ১৯০৮ খৃস্টাব্দে লেখক নদীয়া-কাহিনী লিখতে শুরু করেন। সম্ভবত ১৯০৮-এর মার্চের মধ্যেই প্রথমাংশ লেখা হয়ে যায়। কারণ 'পূর্ণিমা'র বৈশাখ ১৩১৫ সংখ্যায় প্রথম কিস্তি ছাপা হয় (এপ্রিল-মে ১৯০৮)। অনুমান করা চলে, লেখক ১৯০৭ খৃস্টাব্দ থেকেই 'নদীয়া-কাহিনী' রচনার জন্য পরিকল্পিতভাবে তথ্য-বিবরণ সংগ্রহ শুরু করেন। আশী বছর পূর্বে নদীয়া জেলার পথঘাট দুর্গম ছিল, যানবাহনাদিও সহজপ্রাপ্য ছিল না। কাজেই তথ্যসংগ্রহে কি পরিমাণ শারীরিক শ্রম প্রয়োজন হয়েছিল, ভাবতেও বিস্ময় জাগে। কুমুদনাথের গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য।

'নদীয়া-কাহিনী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থকার নিজেই এর প্রকাশক ছিলেন। কলিকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এই সংস্করণ ২০০০ ছাপা হয়েছিল। ২০+৪০০ পৃষ্ঠার সচিত্র বইটির দাম ছিল ২ টাকা ১২ আনা। বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ অনুসারে এর প্রকাশকাল ২১ জানুয়ারি ১৯১১।

'নদীয়া-কাহিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। রাণাঘাট থেকে লেখকের অনুজ নৃপেন্দ্রনাথ এই সংস্করণ প্রকাশ করেন। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত এই সংস্করণের মুদ্রণসংখ্যা ১০০০। ২০+৫১৬ পৃষ্ঠার সচিত্র বইটির দাম ছিল ২ টাকা ৮ আনা। বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ অনুসারে এর প্রকাশকাল ২৫ অক্টোবর ১৯১২।

লেখক দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদনে লিখেছেন যে 'নদীয়া কাহিনী' সেকালের পত্রপত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল (পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মতামত বর্তমান সংস্করণে সংযুক্ত করা হল)। অনেক জ্ঞানী-গুণী লেখককে পত্র দিয়ে উৎসাহিত করেন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী লেখককে 'পণ্ডিতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন (১৯১১)।

কুমুদনাথের সাহিত্যগুরু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মুখবন্ধে 'নদীয়া কাহিনী' সমৃদ্ধ। বস্তুত তাঁর তত্ত্বাবধানেই কুমুদনাথ 'নদীয়া কাহিনী' রচনা করেন এবং তিনিই সংশোধনাদি করে দেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬—১৯১৭) ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১৮৭২) অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম রচনা 'উদ্দীপনা' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে চুঁচুড়া থেকে প্রকাশ করেন 'সাধারণী' সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং ১৭ বছর এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র

ভূমিকা

'নবজীবন' (১৮৮৪—১৮৮৯) পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর দৌহিত্র হলেন জননেতা অতুল্য ঘোষ।

'নদীয়া-কাহিনী' আঞ্চলিক ইতিহাসের অসামান্য গ্রন্থ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক জনইতিহাসের আকর উপাদান। লেখক যথার্থই লিখেছেন যে 'নদীয়া-কাহিনী'-তে প্রাচীন ও আধুনিক সমগ্র নদীয়া জেলার জ্ঞাতব্য যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। 'নদীয়া-কাহিনী'র নামপত্রে লেখা হয়েছিল: 'নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন ইতিকথা, বিদ্যাচর্চা, ধর্মালোচনা, বংশপরম্পরাগত কাহিনী, বিশিষ্ট জীবনী এবং সাহিত্য, শিল্প, লোকাচার সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র।' তবু লেখক নিজেই লিখেছেন, 'নদীয়া-কাহিনীকে নদীয়ার ইতিহাস বলা যায় না।' গ্রন্থনামও একারণেই 'নদীয়া-কাহিনী'। লেখক লিখেছেন: '···সেইজন্যই ইহার নাম নদীয়ার ইতিহাস না দিয়া নদীয়া-কাহিনী দিয়াছি।'

লেখক যে নামই দিন, 'নদীয়া-কাহিনী' বাংলাভাষায় অবিভক্ত নদীয়া জেলার সর্বপ্রথম ইতিহাস। J. H. E. Garrett সম্পাদিত 'Bengal District Gazetteers : NADIA' কলিকাতা থেকে ১৯১০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'নদীয়া-কাহিনী' তার আগেই রচিত ও 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

'নদীয়া-কাহিনী' দ্বিতীয় সংস্করণ অনুসারে বর্তমান সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। প্রকাশ থেকে ৭০ বছর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে নদীয়া জেলার নানা পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণে বর্তমান সংস্করণের ৩৪৫—৪২৮ পৃষ্ঠায় পৃথকভাবে বর্তমান নদীয়া ও কুষ্টিয়া জেলা বিষয়ে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক তথ্য অংশে (৩২৫—৩৪৪ পৃষ্ঠা) কুমুদনাথ প্রদত্ত কোন কোন তথ্য খণ্ডন ও মণ্ডন করা হয়েছে।

'নদীয়া-কাহিনী'র অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে লেখক সচেতন ছিলেন। 'নদীয়া-কাহিনী'তে নদীয়া জেলা বিষয়ক সমস্ত তথ্য সঙ্কলিত হয়নি একথা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন: 'অনেক কথাই লেখা হয় নাই।...সে সকল কথাই পুনরায় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।' জীবনের শেষভাগে কুমুদনাথ 'নদীয়ার বাণী' পত্রিকায় নদীয়াবিষয়ক রচনাদি প্রকাশ করেন।

লেখক লিখেছেন: '···মুদ্রাঙ্কণে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে সে ত্রুটি সংশোধনে যথোচিত যত্ন করিব।' অনুমান লেখক অসুস্থ ও শয্যাশায়ী না থাকলে এমন মুদ্রণ প্রমাদ হত না।

লেখক লিখেছেন: 'গ্রন্থ সংকলন ও তথ্য সংগ্রহে সাধারণের নিকট আশানুরূপ

সহানুভূতি না পাওয়ায় ইহাতে বহু ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে।' লেখক শিক্ষিতজনের ঔদাসীন্যের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেছেন। প্রায় একশো বছর আগে স্থানীয় জনইতিহাসের তথ্যসংগ্রহের জন্য সরজমিন ক্ষেত্র অনুসন্ধানে যে সমস্যা ছিল, আজ সে সমস্যা আরও জটিল ও প্রকট হয়েছে। আজকের ভাঙচুর মূল্যবোধের দিনে সরজমিন ক্ষেত্র অনুসন্ধানকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখে, অবিশ্বাস করে। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষও সহযোগিতার হাত আশানুরূপ প্রসারিত করেন না। ফলে, সরজমিন ক্ষেত্র অনুসন্ধান আজও এক দুরূহ কর্ম। সেকালের নদীয়াবাসী 'নদীয়া-কাহিনী' সঙ্কলনে লেখককে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করলে বইটি আরও সমৃদ্ধ হত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

লেখক গ্রন্থে নদীয়ার বহু মন্দির-মসজিদ সহ পুরাকীর্তির উল্লেখ করলেও গঠনরীতি-নির্মাণশৈলীর বর্ণনা দেন নি। ইতোমধ্যে, সেসব পুরাকীর্তির অধিকাংশই হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত, নয় নিশ্চিহ্ন। ফলে, আজ আমরা সেগুলির গঠনরীতির পরিচয় তুলে ধরতে পারি না। লেখক কিছু মন্দির-প্রতিষ্ঠালিপির বিবরণ লিখেছেন। তখন প্রতিষ্ঠালিপিগুলি বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়নি, পাঠোদ্ধারও তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। 'নদীয়া-কাহিনী'তে নদীয়ার সমস্ত মন্দির-মসজিদের প্রতিষ্ঠালিপির বিবরণ থাকলে সেগুলির প্রতিষ্ঠাকাল নিশ্চিতভাবে জানা যেত।

বাংলার বহুল প্রচলিত লোকশ্রুতিনির্ভর বিদূষক গোপালভাঁড়ের কথা লেখক লিখেছেন। যদিও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপালভাঁড় ছিলেন কিনা তা প্রমাণিত হয়নি। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে গোপালভাঁড় নামে কেউ ছিলেন না, কৃষ্ণনগর রাজসভায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেও নয়, তার পরেও নয়। ভারতচন্দ্র বর্ণিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বিবরণেও গোপালভাঁড় অনুপস্থিত।

নদীয়ার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জনইতিহাসের বিবর্তনের ধারা লেখক বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। এব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট ধারণাও ছিল না বলে মনে হয়। নদীয়ার নববৈষ্ণবধর্ম ও তার লৌকিক উপশাখা কর্তাভজা, সাহেবধনী ও বলরামী প্রভৃতি গৌণ লোকধর্ম সম্পর্কে লেখক সেকালের পটভূমিতে যে ধারণা পোষণ করতেন তাই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচনায়। লেখকের চোখে নদীয়ার লোকধর্ম সুবিচার পায়নি। লেখক বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন (পৃ. ১৭৭-১৭৮) এবং নিন্দাবাদ জানিয়েছেন যারা নামে বৈষ্ণব হয়েও আচারব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথাবলম্বী। লেখক লিখেছেন: '...ভেকধারী বৈষ্ণবগণের মধ্যেই ব্যভিচার কদাচার প্রভৃতি এত ঘনিষ্ঠভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছে যে ইহাদের অনেককে বৈষ্ণব বলিতেই কুণ্ঠা জন্মে।' (পৃ. ১৮১)

নেড়ানেড়ী-বাউলদের লেখক 'কদাচারী বৈষ্ণব' বলে উল্লেখ করে লিখেছেন : '…ব্যভিচার পদে পদে দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়চর্চার স্রোত অতি প্রবল এবং সেই কুহকে মজিয়া বহু ইতর জাতিয় লোক এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়ে।…বৈষ্ণব বলিলে যে আচারবান ধীর প্রেমিক ভক্তের উজ্জল ছবি মানস নয়নে উদ্ভাসিত হইত এক্ষণে ঠিক তদ্বিপরীত।…লম্পট, ব্যভিচারী, মর্কট বৈরাগ্যধারী নরনারী এখন অনায়াসে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেছে।… ধর্মধ্বজী এক একজন ব্যভিচারিণী দুই দশটি রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছে।' (পৃ. ১৮১)।

ঘোষপাড়াকে লেখক বলেছেন 'কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা' (পৃ. ১৯৪)। তাঁর মতে কর্তাভজাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য হেতুই নাকি 'ব্যভিচারের স্রোত এত প্রবল' এবং 'এ ধর্মের সর্বনাশের মূল'। সাহেবধনী ও আউল সম্প্রদায় কর্তাভজার শাখা বিশেষ এবং তাদের গুহ্যসাধনা 'নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ' বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। বাউল-সাধনা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : '…কামরিপুর চরিতার্থতা সাধনপূর্বক চরমে পরম পবিত্র প্রেমমাত্র অবলম্বন করা এই সাধনার উদ্দেশ্য।' লেখকের মতে বলরামী সম্প্রদায়ের 'সকলেই অশিক্ষিত ও হীন জাতিয়।'

নদীয়া জেলার নববৈষ্ণবধর্মের লৌকিক উপশাখাগুলির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আমাদের অভিমত আমরা এই গ্রন্থের ৩৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি। আমরা মনে করি যে নদীয়ার লোকধর্ম সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ ছিল না।

ভেক শব্দটি বিবর্তিত হয়েছে ভৈক্ষ্য শব্দ থেকে। ভৈক্ষ্য শব্দের মূল অর্থ ভিক্ষালব্ধ। ভেক শব্দের প্রচলিত অর্থ হল সন্ন্যাসীর সাজ বা বৃত্তি। নদীয়ায় বর্তমানে ভেকধারী বৈষ্ণবেরা যেমন আছেন, তেমনি আখড়া ও মঠে (গৌড়ীয় মঠাদিতে) বসবাসকারী বৈষ্ণব এবং গৃহী বৈষ্ণবেরাও আছেন। অজিত দাস লিখিত 'জাতবৈষ্ণবের কথা' প্রবন্ধ ('বারোমাস' এপ্রিল, ১৯৮৬) প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য।

নদীয়ায় উদ্ভূত ও বিকশিত প্রত্যেকটি গুরুবাদী লোকধর্মের সাধনাঙ্গের গুহ্যতত্ত্ব তাদের সম্প্রদায়গত গানের মধ্যেই প্রকাশিত। এই গান শুধুমাত্র নিছক লোকধর্ম সঙ্গীত নয়, নদীয়ার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জনজীবন-ইতিহাসের অসামান্য উপাদান নিহিত আছে এই গানের অন্দরমহলে নিগূঢ় সাঙ্কেতিকতায়। নরনারীর মৈথুনাত্মক অতি পরিচিত শব্দে গুহ্যসাধন ও গুরুতত্ত্ব তাদের গানে প্রতীকে প্রকাশিত। শব্দ-সঙ্কেত ও প্রতীক যথার্থভাবে বুঝতে পারলে, তবেই খুলে যায় এ গানের রহস্যের দরজা। ব্রাহ্মণ্যশাসিত-লালিত সমাজে যাদের স্থান হয়নি সেই সব আর্য-সমাজ-পীড়িত নিম্নবর্ণের নিম্নবর্গের প্রতিবাদী মানুষেরা সবার অলক্ষ্যে গুরুবাদী লোকধর্মে আশ্রিত হয়েছিল এবং এ কারণেই তাদের গুপ্তসাধনা। যথাধর্মপ্লাবিত আধুনিক নগরমুখী যন্ত্রনির্ভর জটিল-গ্রন্থিল জনজীবনের নিষ্পেষণে বিলুপ্তপ্রায় নদীয়ার লোকধর্মাবলম্বীদের আজ আর সহজে

চিহ্নিত করা যায় না। সরকারী দশকীয় জনগণনাবিন্যাসে লোকধর্মের স্থান নেই, উল্লেখ নেই—নাম-উপাধিতে তারা হয় হিন্দু (বর্ণ ও তপশিলী), না হয় মুসলমান। নানা লোকধর্মের কেন্দ্রে-আখড়ায়-আস্তানায় ও সম্প্রদায়গত মেলা-উৎসবে গেলে তাদের চেনা যায়, সনাক্ত করা যায়। কিন্তু তাদের গুহ্যসাধনা ও ধর্মতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বা রহস্য উন্মোচন সহজসাধ্য নয়। প্রত্যেক লোকধর্মাবলম্বী একজন 'গুরুর কাছে শিক্ষা নেন, তিনি হন তাঁর শিক্ষাগুরু; আর একজন 'গুরুর কাছে দীক্ষা নেন, তিনি হন তাঁর দীক্ষাগুরু। প্রত্যেক শিষ্যকে প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে গুরুপাটে গিয়ে দিতে হয় সাধ্যমত বা নির্দিষ্ট অর্থ যার লোকায়ত নাম 'খাজনা' ও 'জরিমানা'। গুরু-শিষ্যও নানা লৌকিক নামে পরিচিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্র পৃথক। এসব জানতে হলে বুঝতে হলে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে নিবিড় গভীরভাবে সহানুভূতিপূর্ণ দরদী অথচ মুক্ত মন নিয়ে। তবেই নির্ণয় করা যাবে লোকধর্ম বিশ্বাসের ও মার্গের স্বরূপ। সাহেবধনী ও আউল সম্প্রদায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের শাখা—'নদীয়া কাহিনী'-লেখকের এই ধারণা হয়েছে সম্ভবত এই সব লোকধর্মগুলির পরস্পরের মরমীসাধনার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দেখে। কিন্তু প্রত্যেকটি লোকধর্মই পৃথক এবং স্বতন্ত্র সত্তায় বর্তমান। নদীয়ার কোনো লোকধর্মেরই প্রবর্তক উচ্চবর্ণের লোক নন, প্রবর্তক হলেন নিম্নবর্গের, নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মারফত ফকির। ডক্টর সুধীর চক্রবর্তী লিখিত 'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান' গ্রন্থ প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থে কর্তাভজা ও সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গুরুবংশধারার বর্তমানকাল পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ তালিকাও আছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সাহেবধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে মনে করেন: 'আমি নিঃসংশয় যে শব্দটি আসলে সাহেবজানী। সাহেবজান নামে কোনো মারফত তত্ত্ববাদী ফকির এ সম্প্রদায়ের মূলে।...গ্রামসমাজে বিকৃত উচ্চারণের জন্য সাহেবজানী হয়ে সাহেবধনী।' ('দেশ', ১৫ মার্চ ১৯৮৬)।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে ২৯ মাঘ—২ ফাল্গুন ১৩৪৪ (১২—১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই অধিবেশনের ইতিহাসশাখার সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন: 'শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের নদীয়া কাহিনী·· ··উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।' কুমুদনাথ হেজেসের ডায়েরিতে লিখিত SINADGHUR শব্দটি পরিবর্তন করে Sreenagar রূপে উল্লেখ করেছেন 'নদীয়া-কাহিনী'তে (দ্র. বর্তমান সংস্করণ পৃ. ৬০)। ভট্টশালী পূর্বোক্ত ভাষণে এর সমালোচনা করে বলেছেন: 'শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার নদীয়া কাহিনীতে SINADGHUR-কে Sreenagar-এ পরিবর্তিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিবার কালে এ রকম ইচ্ছামত পরিবর্তন করা নিতান্ত অসঙ্গত। মল্লিক মহাশয় এই শ্রীনগর কোথায় তাহার নির্ণয়ে কোন যত্ন করেন নাই। কৃষ্ণনগর রাজগণের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরের নাম স্মরণে

এই পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই রাজধানী শ্রীনগর রাণাঘাটের বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাকদহ থানার এক প্রান্তে অবস্থিত।' ভট্টশালীর মতে SINADGHUR হল শিঙ্গাডাঙা। 'Diary of William Hedges' (Hakluyt Society কর্তৃক তিনখণ্ডে প্রকাশিত) গ্রন্থে SINADGHUR শব্দটিই আছে। আমরাও মনে করি SINADGHUR চাকদহ থানার শ্রীনগর নয়, এবং কুমুদনাথের এই পরিবর্তন অসঙ্গতই হয়েছে। মৃত্যুর প্রায় দুমাস পূর্বে অনুষ্ঠিত এই সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কুমুদনাথ শারীরিক অসুস্থতাহেতু অনুপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত থাকলে তাঁর বক্তব্য জানা যেত।

ইংরেজরাজত্বে লেখক 'নদীয়া-কাহিনী' রচনা ও প্রকাশ করেন। ১৯১০ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনও তথ্য এতে নেই। শাসক শ্রেণীর প্রতি দুর্বলতাহেতু লেখকের রচনায় (পৃ. ৩১৪) সপ্তম এডোয়ার্ড হয়েছেন 'পুণ্যশ্লোক শান্তিপ্রিয় রাজরাজেশ্বর' ও পঞ্চম জর্জ হয়েছেন 'উপযুক্ত পিতার প্রতিচ্ছায়া, মহাশক্তিধর, দয়াময়, রাজরাজেশ্বর মহামহিমান্বিত।' তাঁদের আলোকচিত্রও মুদ্রিত হয়েছিল গ্রন্থে। লেখক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন পঞ্চম জর্জের কর্মময় শান্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবন ও তাঁর 'শান্তিমাখা কোমল আশ্রয়ে কমনীয় বঙ্গভাষার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ।' লেখকের এই আনুগত্যই তার 'রায়বাহাদুর' খেতাব প্রাপ্তির অন্যতম কারণ।

নদীয়া জেলার দারিয়ারপুর গ্রাম (পরে কৃষ্ণনগর) থেকে প্রকাশিত 'সাধক পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় 'নদীয়া কাহিনী'র উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। 'সাধক' ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, পৃ. ৬২]-এ লেখা হয়: 'রাণাঘাট নিবাসী একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক নদীয়া কাহিনী নামক বহু তথ্যপূর্ণ একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩১৭ সালে ইহার প্রথম সংস্করণ ও ১৩১৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কুমুদনাথ বয়সে নবীন, কিন্তু জ্ঞান গবেষণায় প্রবীণ, বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে। প্রত্যেক শিক্ষিত নদীয়াবাসীর এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করা উচিত। নদীয়া জেলা সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য যথা নদীয়ার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামের ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিবরণ ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য কুমুদবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি তাহা সাদরে ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করিবেন। সাধকের সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে তাহা সাধকেও প্রকাশিত হইতে পারে।' কুমুদনাথের কাছে নদীয়ার গ্রামের তথ্যপূর্ণ বিবরণ লিখে কেউ পাঠিয়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। কিন্তু 'সাধক' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে 'নদীয়া কাহিনী'তে অপ্রকাশিত নদীয়ার বিভিন্ন প্রাচীন জনপদের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। কিভাবে গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে ও লিখে পাঠাতে হবে—তার একটি ছকও 'সাধক' প্রকাশ করেছিল। 'নদীয়া কাহিনী'র প্রচারেও 'সাধক'-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। 'সাধক'-এর ১ বর্ষ ৪ সংখ্যায়

(শ্রাবণ ১৩২০, পৃ. ১০২) লেখা হয় : 'নবা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক কৃত নদীয়া কাহিনী পাঠ করুন' এবং ১ বর্ষ ৬-৭ সংখ্যায় (আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০, পৃ. ২১৪) লেখা হয় : 'সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য নবীন সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গ ও নদীয়া কাহিনী—একখানি ভগবদ্ভক্তির ও অপরখানি দেশভক্তির পূর্ণপাত্র'।

কুমুদনাথ নদীয়ার অন্যতম প্রাচীন মল্লিক পরিবারের সন্তান। এই পরিবারের কালীকুমার মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমুদনাথ রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১৬ ভাদ্র তারিখে (৩১ আগস্ট ১৮৮০)। তাঁর পারিবারিক পরিচয় নদীয়া-কাহিনীর ২৬০—২৬৩ পৃষ্ঠায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত বংশ-পরিচয় অষ্টমখণ্ডে (১৯২৮) পাওয়া যাবে। বহু অনুসন্ধানেও কুমুদনাথের শিক্ষাজীবনের কথা বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কুমুদনাথের প্রাথমিক শিক্ষাজীবন সম্ভবত রাণাঘাটেই অতিবাহিত হয়। রাণাঘাটের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পালচৌধুরী বিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৩ খৃস্টাব্দ) ১৬ বছর বয়সে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে কুমুদনাথ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কুমুদনাথের ঘনিষ্ঠ নাতিকার দেবনারায়ণ গুপ্ত সূত্রে একথা জানা গেছে। বংশ-পরিচয় থেকে জানা যাচ্ছে, 'কলিকাতার জেনারাল এসেম্ব্লির অধ্যক্ষ মরিসন সাহেবের নিকট ইংরাজি সাহিত্য ও সুবিখ্যাত দার্শনিক ষ্টিফেন্সের [হেনরি ষ্টিফেন] নিকট দর্শনশাস্ত্র এবং মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট নবন্যায় অধ্যয়ন করেন।'

বাল্যকাল থেকেই কুমুদনাথের সাহিত্যচর্চায় বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তখন থেকেই তিনি গল্প কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। নানা সাময়িকপত্রে তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য হয় এবং তাঁর উপদেশে পরিচালিত 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় 'নদীয়া-কাহিনী' অংশত মুদ্রিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র নদীয়া-কাহিনী প্রায় সমগ্র পুস্তক সংশোধন করে দেন।

কুমুদনাথ ত্রিশ বৎসর বয়সে 'নদীয়া-কাহিনী' রচনা সমাপ্ত করেন। তিনি অবশ্য রচনা-সমাপ্তির কালে (১৪ ভাদ্র ১৩১৭) তাঁর বয়স একত্রিশ বৎসর বলে উল্লেখ করেছেন (বর্তমান সংস্করণ, পৃ. ৩১৪)। এটা তাঁর ভ্রম, বস্তুত এই তারিখে তাঁর বয়স ত্রিশ পূর্ণ হতে দু'দিন বাকি ছিল।

'নদীয়া-কাহিনী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে (২১ জানুয়ারী ১৯১১)। কয়েক মাসের মধ্যে ১ম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। ২য় সংস্করণের প্রেস-কপি তৈরির কাজ শেষ হয় ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৮ তারিখে। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১২ অক্টোবর ১৯১২)। ১ম সংস্করণ প্রকাশের অব্যবহিত পরে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী

'নদীয়া-কাহিনী'র গুণে মুগ্ধ তাঁকে 'পণ্ডিতরত্ন' উপাধি দেন ১৮৩২ শকের ২৮ চৈত্র তারিখে (১৯১১)। সম্ভবত কাছাকাছি সময়ে নদীয়ার মুসলমান সমাজের শীর্ষস্থানীয় মৌলবীরা তাঁকে উপাধি দেন 'আওহারে মুরারে রাখিন' অর্থাৎ ইতিহাস শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

নদীয়া কাহিনী ছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল :

চাঁদমুখ (ছোটদের ছড়া সঙ্কলন)
হজরত মহম্মদ (জীবনী)
শ্রীগৌরাঙ্গ (জীবনী, ১৩১৮)
সতীদাহ (১৩২০)
শ্রীচৈতন্য
মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র

বংশ-পরিচয় সূত্রে জানা যাচ্ছে : 'সম্প্রতি তিনি Annals of Nadia এবং Sati Rite নামক দুইখানি ইংরাজি পুস্তক সঙ্কলন করিতেছেন।'

বাংলাদেশে কৃষির অবনতি দেখে তিনি উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকর্মের জন্য 'মল্লিকস্ এগ্রিকালচারাল ফার্ম' নামে এক কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করেন। রাণাঘাটের উপকণ্ঠে বর্তমান কুমুদনগর এলাকায় এই কৃষিক্ষেত্র ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে অনেকে এখানে এসে হাতে-কলমে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রথাসম্মত কৃষির শিক্ষালাভ করতেন। এখানে তিনি চিনির কারখানাও করেছিলেন এবং আখের চাষ ও গুড় তৈরি করতেন। এখানে বহু ছাত্রকে গুড় ও চিনি তৈরির এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের কৃষিশিক্ষা দেওয়া হত বিনাব্যয়ে।

তৎকালীন ভারত সরকার ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মতিথি উপলক্ষে ১৯২২ খৃস্টাব্দের ৩ জুন তারিখে তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। কলকাতার লাটভবনের দরবারকক্ষে আয়োজিত সভায় কুমুদনাথকে খিলাত দেওয়ার সময় লর্ড লিটন যে ভাষায় তাঁকে অভিনন্দন জানান, তা হল এই :

'Your loyalty and your anxiety to improve the agricultural condition of your tenants have show you to be a model of what a Zemindar should be. Your attitude is deserving all commendations.'

কুমুদনাথ ব্যক্তিজীবনে অমায়িক ও নিরহঙ্কারী ছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজসেবা মূলক জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী সরোজিনী দেবী (মৃত্যু ২২শে আগস্ট ১৯৬৩)। একমাত্র সন্তান শচীন্দ্রনাথ (জন্ম ৭ জুলাই ১৯০৪, মৃত্যু ৫ অক্টোবর ১৯৬৭) ছিলেন রাণাঘাটের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী। তিনি রাণাঘাট পৌরসভায় একাদিক্রমে বহুবৎসর কমিশনার ছিলেন এবং

বহু সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি এলাহাবাদ এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউটে, ঢাকা গভর্নমেন্ট ফার্মে ও ভূপাল স্টেটের মন্ত্রী কৃষি-বিশারদ মাননীয় হাদীর কাছে কৃষিশিক্ষা করেন এবং পিতার প্রতিষ্ঠিত ফার্মে কৃষি বিভাগের ভার গ্রহণ করেন।

রাণাঘাটে ৯ই বৈশাখ ১৩৪৫ (২২শে এপ্রিল ১৯৩৮) তারিখে কুমুদনাথ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কয়েক বৎসর বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে রাণাঘাটের সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর পরলোকগমনে শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শোকসংবাদ এখানে পুনর্মুদ্রিত হল :

পরলোকে রায় বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

রাণাঘাট, ২৩শে এপ্রিল—সাহিত্যিক ও জমিদার রায় বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক গত ২২শে এপ্রিল ৫৭ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নদীয়া-কাহিনী প্রমুখ বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি জমিদার হইয়াও স্বয়ং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি কার্য্য করিবার জন্য মল্লিক কৃষিক্ষেত্র নামে এক কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করেন। তথায় গুড় ও চিনি তৈয়ার হইত। তথায় বহু ছাত্রকে গুড় ও চিনি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী ও নিরহঙ্কারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে রাণাঘাটের সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখা হয়। তিনি স্ত্রী, একপুত্র, ভ্রাতা ও বহু আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৭ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ২৬ এপ্রিল ১৯৩৮, মঙ্গলবার, ১৩ বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ. ১৫, স্তম্ভ ৩।

সাময়িকী

রায় বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক

'নদীয়াকাহিনী' প্রণেতা খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায়বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক গত ২২শে এপ্রিল ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। নদীয়া জেলার রাণাঘাটে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি জমীদার হইয়াও স্বয়ং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য বিরাট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথায় তিনি চিনির কারখানা করিয়াছিলেন এবং ইক্ষুচাষ ও গুড় তৈয়ারী করিতেন। তিনি নিজ কৃষিক্ষেত্রে বহু ছাত্রকে রাখিয়া তাহাদিগকে উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন

এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার মত অমায়িক মিষ্টভাষী লোক অতি অল্পই দেখা যায়।

—ভারতবর্ষ। ২৫ বর্ষ ২ খণ্ড ৬ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ. ৯৭১—৯৭২।

অশ্রু-অর্ঘ্য

কুমুদনাথ মল্লিক

গত ৯ই বৈশাখ শুক্রবার 'নদীয়া-কাহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক রাণাঘাটের ঐতিহাসিক কুমুদনাথ মল্লিকের পরলোকগমন সংবাদে আমরা মর্ম্মপীড়িত হইয়াছি। 'নদীয়া-কাহিনী' রচনা করিয়া তিনি সাহিত্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কুমুদনাথ শুধু ঐতিহাসিক ছিলেন না। সাহিত্যসেবা ব্যতীত তিনি কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। সরকারী সাহায্য না লইয়া রাণাঘাটে তিনিই সর্ব্বপ্রথম আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ধান্যের ফলন কি উপায়ে অধিক হইতে পারে, সে জন্য তিনি শুধু গবেষণা করিয়াই নিরস্ত হন নাই—স্বয়ং চাষ করিয়া তাহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টার পরিচয় পাইয়া সরকার তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ইক্ষুর চাষেও তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। স্বীয় পুত্রকে বিদেশ হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি শিখাইয়া আনিয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কমুদনাথের অকালবিয়োগে আমরা বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছি। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন। তাঁর শোকার্ত পরিবারবর্গের নিকট আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মাসিক বসুমতী। ১৭ বর্ষ ১ খণ্ড ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ. ১৭১—১৭২, সচিত্র।

'নদীয়া-কাহিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১২ খৃস্টাব্দে। দীর্ঘকাল বইটি ছাপা ছিল না। নদীয়ার ইতিহাসচর্চায় এর অপরিহার্যতা বিবেচনা করে আমরা কিছুকাল পূর্বে বইটি পুনর্মুদ্রণের পরিকল্পনা নিই। আমরা ব্যাপক অনুসন্ধানেও 'নদীয়া-কাহিনী'র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে পারিনি। কাজেই দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সংস্করণ ভুলভ্রান্তি সহ দ্বিতীয় সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। পরিশেষে মূল গ্রন্থে প্রদত্ত কিছু কিছু তথ্যপ্রমাদ সংশোধন ও অনুল্লেখিত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে, যাতে বইটি একালের নদীয়া-অনুরাগী পাঠকজনের কাছে সমাদৃত হয়।

'নদীয়া কাহিনী'-র বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে কুমুদনাথের পৌত্র দেবীপ্রসাদ মল্লিক

ও বিজয়প্রসাদ মল্লিক এবং পৌত্রী বাণী পালচৌধুরী ও গীতা দে-র সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

সম্পাদনাকর্মে দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি দিয়ে, 'নির্দেশিকা' তৈরি করে ও নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন 'দুষ্প্রাপ্য তথ্যের ভাণ্ডারী' অশোক উপাধ্যায়। অধ্যাপক ডক্টর সুধীর চক্রবর্তী আমার সম্পাদনায় 'নদীয়া কাহিনী' প্রকাশে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হন। সম্পাদনাকর্মে সাক্ষাৎভাবে ও চিঠিপত্রাদি দিয়ে উৎসাহ, প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়েছেন এবং নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন নদীয়ার মহারাজকুমার সৌরীশচন্দ্র রায়, নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ), অধ্যাপক আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, অজিত দাস, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, ভবেশ দত্ত, অধ্যাপক নিজন দে চৌধুরী, পাঁচুগোপাল কুণ্ড, অসীমানন্দ রায় ও আশিস ভট্টাচার্য প্রমুখ এবং কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী, নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার ও কৃষ্ণনগর কলেজ লাইব্রেরীর কর্মিবৃন্দ। 'বংশপরিচয়' ৮ম খণ্ডে মুদ্রিত 'নদীয়ার মল্লিকবংশ' রচনাটির সন্ধান দিয়েছেন ডাক্তার দেবাশিস বসু। সকলকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

'নদীয়া-কাহিনী'র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতে না পারলেও, কুমুদনাথের স্বহস্তে লিখিত একটি পত্র প্রকাশ করতে পেরেছি। পত্রটি শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রভাসচন্দ্র রায়কে লেখা। এ থেকে আমরা কুমুদনাথের হস্তাক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছি এবং তিনি যে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের প্রথম বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, সে খবরও পাচ্ছি। প্রয়াত প্রভাস রায়ের পুত্র মৃণাল রায়ের কাছ থেকে এই পত্র এবং 'নদিয়াবাসী' পত্রিকার প্রতিলিপি পেয়েছি। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

মূল গ্রন্থে মুদ্রিত ছবিগুলি পুনর্মুদ্রণযোগ্য অবস্থায় নেই, সেজন্য আমরা সমস্ত নতুন ছবি দিয়েছি। নদীয়া জেলা-বিষয়ক ফটোগুলির অধিকাংশই সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল সূত্রে পেয়েছি। বল্লালঢিপির ফটোগুলি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-পূর্বাঞ্চল চক্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত। দিগনগরের বিষ্ণুমূর্তি, শিবনিবাসের মন্দির ও প্রতিষ্ঠাফলকের ফটো পেয়েছি অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এবং সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিয়েছেন অলঙ্কৃত মন্দিরদ্বারের কাঠের দরজা এবং পোড়ামাতলার ফটো। রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সূত্রে পাওয়া গেছে ভবতারিণী মূর্তি ও যোগপীঠ মন্দিরের ফটো। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

'নদীয়া কাহিনী'র অনেকাংশে আছে অধুনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রভুক্ত বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার কথা। 'নদীয়া কাহিনী'র কুষ্টিয়া অংশ সম্পাদনা ও সংযোজনের জন্য কুষ্টিয়াবাসীর আন্তরিক আমন্ত্রণে আমি সম্প্রতি কুষ্টিয়া সফর করি। বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরে কুষ্টিয়া গেলেও এই উদ্দেশ্যে যাইনি। এবারে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় পরিভ্রমণ, সরজমিন অনুসন্ধান ও তথ্য-বিবরণ সংগ্রহ করি। কুষ্টিয়াবাসীর আন্তরিক আতিথেয়তায়, সৌজন্যে ও সহযোগিতায় আমি অভিভূত। 'নদীয়া কাহিনী' পুনঃপ্রকাশে কুষ্টিয়াবাসী অধীর আগ্রহী। আমার অনুজপ্রতিম স্নেহভাজন, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের অধ্যাপক ও কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক আবুল আহসান চৌধুরী আমার এবারের কুষ্টিয়া সফর, অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পিত কর্মসূচীই শুধু তৈরি করেননি, যাবতীয় ব্যয়ভার পর্যন্ত বহন করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর সংগ্রহ থেকে পেয়েছি 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা', 'হিতকরী' পত্রিকার ও নকশীকাঁথার প্রতিলিপি এবং প্রচুর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিশিষ্ট রবীন্দ্রভক্ত, গ্রন্থকার ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার কুষ্টিয়াস্থ উপমহাব্যবস্থাপক কাওছার আলি শেখের সৌজন্যে মেহেরপুর, বাগোয়ান ও বল্লভপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করি। কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক এ. এফ. এম. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মহ. ইদ্রিস মিয়া, 'ইস্পাত' পত্রিকা সম্পাদক ওয়ালিউল বারি চৌধুরী সাংবাদিক আবদুর রশীদ চৌধুরী, শ. ম. শওকত আলী, মিলন সরকার, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র কুষ্টিয়াবাসী এম. আশরাফুল হক, বাংলাদেশ শিশু একাদেমীর কুষ্টিয়া জেলা সংগঠক ম. মনিরুজ্জামান, মোহম্মদ এনায়েত কবীর, আমিরুজ্জামান, এস. এ. এম. সাজেদুর রহমান (জগতি), গাজী হাবিবুর রহমান (শিলাইদহ), সৈয়দ আলি ইকবাল (গ্রন্থাগারিক, কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ), নজরুল ইসলাম হিলাল (... ডাঙা) প্রমুখের সহযোগিতায় আমি ধন্য।

কুষ্টিয়া অংশের ফটোগুলি পেয়েছি লালন একাদেমীর পরিচালক অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ারুল করীম, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সাংবাদিক এম. এ. রেজা ও মোহাম্মদ আবদুর রজ্জাক সূত্রে। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কুষ্টিয়ায় আমি ছিলাম রেনউইক-যজ্ঞেশ্বর কোম্পানী লিমিটেডের গড়াইনদীতীরবর্তী সুরম্য সুখপ্রদ অতিথিশালায়। এই প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক কামারুল হককে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক সহ কর্মিবৃন্দ ও কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক বন্ধুদের সহযোগিতা ভোলবার নয়।

রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, বাংলা একাদেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ারসের প্রাক্তন মহাসম্পাদক, কবি-অধ্যাপক ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী। দুদিন তাঁর সান্নিধ্যে

থেকে 'নদীয়া কাহিনী' সম্পাদনা সম্পর্কে আলোচনা করি, তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান নির্দেশও পাই। তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি।

বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার নানা স্থান পরিভ্রমণের সময় আমার সঙ্গী কুষ্টিয়ার ছাত্র-যুবকদের উৎসাহ-উদ্যমে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

আমার কুষ্টিয়া সফরে কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষ, 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক-অধ্যাপক ডক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও বন্ধুবর সুবোধ মিত্রের কাছ থেকেও পেয়েছি অকুণ্ঠ সহযোগিতা, তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শিল্পী অমিয় ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের শোভন প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র-বিন্যাস করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

'নদীয়া কাহিনী'-র মত সুবিশাল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সম্পাদিত-সংযোজিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য প্রকাশন প্রতিষ্ঠান 'পুস্তক বিপণি'র কর্ণধার অরুণকুমার মাহিন্দারকে নদীয়া (ও কুষ্টিয়া)-বাসীর পক্ষ থেকে জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

'খেয়া', গেট রোড,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

মোহিত রায়

নদীয়া-কাহিনী।

নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন-ইতিকথা, বিদ্যাচর্চ্চা,
ধর্ম্মালোচনা, বংশ-পরম্পরাগত-কাহিনী, বিশিষ্ট-জীবনী,
এবং সাহিত্য, শিল্প, লোকাচার সম্বন্ধীয় বিবিধ
স্বতন্ত্র তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত
মুখবন্ধ সংবলিত।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

রাণাঘাট

সন ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

উৎসর্গ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীভগবানের পাদপদ্মে

ভক্তিপূর্ব্বক

অর্পণ করিয়া

ক্ষুদ্র

গ্রন্থকার

ধন্য

এবং

কৃতার্থ হইল

মঙ্গলাচরণ

কেচিদ্বিষ্ণুং যমাহু স্ত্রিভুবনশরণং পূর্ণতাং সম্মতঃ
কেচিচ্চাংশাবতারং বিবিধগুণনিধিং নিত্যমাহুঃ প্রগল্‌ভাঃ।
কেচিৎ ভক্তং বদন্তি প্রতিহতমতয়োভাব গাম্ভীর্য্য পূর্ণং
সশ্রীকং তং নদীয়াজনচিততমসাং জ্ঞানদীপ স্বরূপং॥

নদীয়াভূষণং বন্দে বিষ্ণুং গৌরাঙ্গ রূপিণং।
পিত্রোশ্চচরণদ্বন্দ্বং সর্ব্বকামপ্রদং দ্বিজান্॥

নিবেদন

দুই বৎসর পূর্ব্বে বংশবাটির কৃতবিদ্য বিদ্যোৎসাহী কুমারগণের যত্নে পরিচালিত "পূর্ণিমা" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-মহারথী প্রথিতনামা পল্লীলেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে "নদীয়া-কাহিনী" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার লিখিত সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে নদীয়া সম্বন্ধে আরও অধিক কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি নদীয়ার সমাজ, বিদ্যা, ধর্ম্ম, ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় ইতিহাস সংগ্রহে যত্নবান হই ও বহু পরিশ্রমে এতদিনে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সম্প্রতি পুস্তকাকারে "নদীয়া-কাহিনী" নামে প্রকাশ করিলাম।

নদীয়া কাহিনীকে নদীয়ার ইতিহাস বলা যায় না। তবে যে সকল উপাদানে ইতিহাস বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদের দেশে অন্যান্য বিষয়ের যতই কেন উন্নতি হউক না ইতিহাসের চর্চ্চা যে কখনও বহুল পরিমাণে হইয়াছে, বলিয়া অনুমিত হয় না। যাহা কিছু ইতিহাস বলিয়া সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহা এতই অদ্ভুত ও অলৌকিক কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন যে, তাহার মধ্য হইতে খাঁটি সত্যটুকু বাছিয়া লওয়া সুকঠিন; আর তাহা বাছিয়া লইতে গেলেও ইতিহাসের অঙ্গে অনেক ক্ষত হইয়া পড়ে; তাই এই পুস্তক রচনায় বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছে, আর সেই জন্যই ইহার নাম নদীয়ার ইতিহাস না দিয়া "নদীয়া-কাহিনী" দিয়াছি। নদীয়া-কাহিনী কেবলমাত্র নবদ্বীপের কাহিনীতে পূর্ণ নহে, ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সমগ্র নদীয়া জেলার জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে।

সাধারণতঃ ইতিহাস বলিলে মনে যে একটা স্থান বিশেষের রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির চিত্র মনে আসে, নদীয়ার ঠিক সেরূপ বিবিধ ঘটনা-রাগ-রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিবার উপায় নাই। কারণ, শেষ বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের পর মহাপ্রভুর আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসরের ব্যবধান। এই সুদীর্ঘকাল নদীয়া হইতে রাজধানী অপসারিত হওয়ায়, নদীয়ার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এইরূপ আরও অনেক সময়ের তথ্য সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। সুতরাং নদীয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিতে যাইয়া আমাকে অনেক সময় বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস বর্ণন করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গেতিহাসে নদীয়ার সংস্রব কতটুকু এবং বাঙ্গালার সমাজ, ধর্ম্ম

ও রাষ্ট্র-বিপ্লবে নদীয়ার প্রভাব কতখানি, এইগুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রথম কয়েক অধ্যায়ে বঙ্গেতিহাসের সহিত নদীয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিয়াছি। পরে, পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে খাঁটি নদীয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এমন কি পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত গ্রাম মাত্রেরই স্থানীয় ইতিহাস পৃথক্‌ভাবে বিস্তীর্ণরূপে লিখিত প্রায়াস পাইয়াছি। একদিকে যেমন নদীয়া-রাজবংশের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি, তেমনি আবার বহুত প্রাচীন বংশের ইতিহাস স্থানীয় বিবরণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

খ্যাতঃ বিদ্যাচর্চ্চা লইয়াই নদীয়ার যশঃ পৃথিবীব্যাপ্ত। তাই, ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র, বঙ্গভাষা ও পারস্য ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার চর্চ্চা, নদীয়ার কোন্ সময় হইতে আরম্ভ ও উহাদের ক্রম-বিকাশ কিরূপে হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিয়াছি। এ সকল বিষয়ে লিখিবার এত সামগ্রী আছে যে, উহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিলে তবে উহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু প্রত্যেকের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ লিখিত হইলেও, উহাদের কেবল স্থূল ঘটনাগুলি মাত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর কয়েকজনের জীবনীমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

ধর্ম্মচর্চ্চাই নদীয়ার যশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়াছে; আর নবদ্বীপচন্দ্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবই নদীয়ার প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের প্রাণ-স্বরূপ; তাই তাঁহার পূতচরিত নদীয়ার ধর্ম্মচর্চ্চা অধ্যায়ে পৃথকরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি এবং মহাজন-বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ, শ্রীচৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের লিখিত বিবরণ হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির বিবরণ যতদূর প্রকাশ করিলে সাম্প্রদায়িক আপত্তির কারণ না হইতে পারে, ততদূরই প্রকাশ করিয়াছি। মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞান অতি সামান্য সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আমি লিখিয়াছি তাহাতে ভুল প্রমাদ থাকা সম্ভব। যদি কোনও সহৃদয় পাঠক কৃপা করিয়া ঐ সকল ভ্রম, বা অন্য কোন ভ্রম বা ত্রুটি প্রদর্শন করাইয়া দেন তাহা হইলে আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঐ সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইব। সাম্প্রদায়িক মেলাগুলির বিবরণ স্বচক্ষে দেখিয়া বা স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

সমগ্র বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস যাহা, নদীয়ার সামাজিক ইতিহাসও তাহাই। তবে, বিশেষভাবে নদীয়ার সামাজিক পরিবর্ত্তন কিরূপ সাধিত হইয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য নদীয়ার গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতেই তত্তৎ সময়ের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

নদীয়ার যে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান সমূহের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ স্থানীয় জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ও প্রাচীন দলীলাদি দৃষ্টে লিখিত। তবে এ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট হইতে যতদূর সহানুভূতির আশা করিয়াছিলাম, তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায় নদীয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সমস্ত স্থানগুলির ইতিহাস দিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে সাধারণের সাহায্য পাইলে, সমস্ত স্থানের সম্পূর্ণ ইতিহাস

দিবার ইচ্ছা থাকিল। নদীয়া সম্বন্ধে "বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়" বলিয়া যে অধ্যায়টি লিখিয়াছি, তাহাতে বর্ত্তমান নদীয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ের Statistical Account যথাযথভাবে দেখান হইয়াছে, যথা—জেলার ক্রমবিস্তৃতি ও তাহার হ্রাস, নদীয়ার নদী, রাজবর্ত্ম, আদমস্থমারী, নদীয়ার কৃষী ও বাণিজ্য ইত্যাদি।

পুস্তকের মূলভাগে যে সকল বিষয় স্থান পায় নাই, তাহাই পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নদীয়া-কাহিনী মুদ্রাঙ্কণ করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে, নদীয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথাই একরূপ সংগৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত হইলে দেখিলাম যে অনেক কথাই লেখা হয় নাই। ভগবান দিন দিলে, সে সকল কথাই পুনরায় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এ পুস্তকে যে সমস্ত ছবি দিয়াছি, তাহার অধিকাংশই আমি নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে Photographer পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছি, আর কতকগুলি আমি আমার গণ্যমান্য বন্ধুবান্ধব গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরঋণী রহিলাম।

এই পুস্তক রচনায় আমি আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকের নিকটেই নানারূপে উৎসাহ লাভ করিয়াছি, সেজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তবে যাঁহাদের সহানুভূতি ও উৎসাহ না পাইলে আমি এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না, তাঁহাদের মধ্যে প্রবীন সাহিত্যগুরু, পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়, যিনি আমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করেন এবং কৃপা করিয়া আমার প্রায় সমগ্র পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিয়া নিরাভরণ নদীয়া-কাহিনীকে সালঙ্কারা করিয়া সাধারণের সম্মুখে প্রকাশযোগ্য করিয়া দিয়াছেন এবং পণ্ডিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য রায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম. এ ; এবং দেশমান্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচয়িতা পণ্ডিত শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীরামরত্ন বেদান্তরত্ন, উড়িষ্যার চিত্রপ্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গগত মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, আমার প্রিয় সুহৃৎ অশেষ গুণালঙ্কৃত শোভাবাজারের সাহিত্যানুরাগী রাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সুলেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী ও শ্রীপ্রভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আমার সোদর-কল্প বংশবাটীর স্বনামখ্যাত উদার চরিত সাহিত্যসেবী সুধী রাজকুমারগণ প্রমুখ অনেকের নিকট আমি তাঁহাদের কৃত উপকারের জন্য চিরঋণী রহিলাম

আমার অক্ষমতা বশতঃ এই গ্রন্থে নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও, ইহাতে আমার যত্নের ত্রুটি হয় নাই, তবে বিষয়টী যেরূপ দুরূহ এবং দেশের লোকের এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকেরও এবিষয়ে যেরূপ ঔদাসীন্য, তাহাতে গ্রন্থ সঙ্কলনে ও তথ্যসংগ্রহে সাধারণের নিকট আশানুরূপ সাহানুভূতি না পাওয়ায় ইহাতে বহু ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া অবধি আমি দারুণ

বাতরোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় এবং বহুদিন রোগভোগ করায়, সেই পীড়িত অবস্থায় প্রুফ সংশোধনে যথোচিত মনোযোগী হইতে না পারায়, মুদ্রাঙ্কণে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে সে ত্রুটি সংশোধনে যথোচিত যত্ন করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক রচনায় আমি কোনও বিষয়ের মৌলিকত্বের দাবী করিতেছি না বা সে স্পর্দ্ধাও রাখিনা। আমি নদীয়ার সম্বন্ধে যেখানে যেটুক বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি মাত্র। পরন্তু কোনও বিষয়ে মতান্তর প্রাপ্ত হইলেও সে সম্বন্ধে নিজের কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া তাহার সকলগুলিই পুস্তকে স্থান দিয়াছি। ফলতঃ বিশাল সাহিত্যক্ষেত্রে নদীয়ার ন্যায় কমনীয় ফলফুলে সুসজ্জিত কাননের যেখানে যে ভাল ফুলটী পাইয়াছি, তাহাই চয়ন করিয়া নদীয়া-কাহিনী রূপ মালা গাঁথিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই মালা যদি কাহারও মনোরঞ্জনে অপারক হয়, তবে সে দোষ পুষ্পের নয়—সে দোষ মালাকরের। এই ক্ষীণ-শক্তি মালাকরের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং যোগ্যতা কিছুই নাই, তবে সুরভি কুসুমের প্রাণোন্মাদ গন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাহা নিজে উপভোগ করিয়া দশজন বন্ধু-বান্ধবকে আনন্দ দিতে তাহার এই বিফল প্রয়াস। যদি কোন দক্ষতর শিল্পী এমন সুরভিকুসুমের অযোগ্য হস্তে এরূপ লাঞ্ছনা দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং এই সকল পুষ্পে সুন্দরমালা গ্রন্থন করেন, তবেই এই পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। সেদিন কি আসিবেনা?

রাণাঘাট, নদীয়া
১৪ই ভাদ্র, সন
১৩১৭

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক।

দ্বিতীয় সংস্করণ

বাঙ্গালীর মধ্যে ইতিহাসের চর্চ্চা ও আদর নাই বলিয়া সমগ্র জাতির একটা অখ্যাতি চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু যাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী তাঁহারা জানেন সম্প্রতি বাঙ্গালায় ঐ বিষয়ের আলোচনা ও আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার বহু জেলার ও বহু স্থানের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে ও প্রতিদিন বাঙ্গলা ভাষাবিৎ বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক উহার আলোচনা ও মহাকালের চিরতমসাময় উদর হইতে উহার উদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে, আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলার এক অতি বিস্তৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে। এক দিকে শিক্ষিত সমাজে যেমন দেশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে একটা তীব্র বাসনা প্রকটিত হইয়াছে তেমনি অপর দিকে ইতিহাস পাঠেচ্ছু বাঙ্গালী পাঠকের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েক মাসের মধ্যে নদীয়া-কাহিনীর মত একখানি সুবৃহৎ পুস্তকের [illegible]টী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, সুতরাং বাঙ্গালী জাতিকে আর এখন ইতিহাস বিমুখ বলিয়া বিদ্রূপ করা চলে না।

নদীয়া-কাহিনী প্রকাশিত হইবার কয়েক মাসের মধ্যেই উহার প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হইয়া যায়, ঐ সময়ে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কন করার একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়, কিন্তু এই কালে শৈশবে মাতৃহীন হইলে যিনি আদর যত্নে আমাদের ভাইভগ্নী কয়টীকে লালন পালন করিয়াছিলেন, আমাদের সেই মাতৃপমো স্নেহময়ী মাতামহী দেবী ও আমার ইহজীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতৃদেব যাঁহার যত্ন ও উৎসাহে উৎসাহিত হওয়ায় সাহিত্য চর্চ্চাকে আমি জীবনের অন্যতম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, উভয়েই স্বর্গ গমন করেন সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও সদ্য শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। এক্ষণে নদীয়া-কাহিনী পাঠেচ্ছু সুধীজনগণের ঐকান্তিক আগ্রহে আমাকে এ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছে।

ব্রতী হইয়াছি বটে কিন্তু পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে ও প্রকাশকের তাড়নায় ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তনাদি করিতে সময় পাই নাই। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব প্রতি পরিচ্ছেদে সেইরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিয়া দিয়াছি। কোনও কোনও পরিচ্ছেদ নূতন করিয়া লিখিয়া দিয়াছি ও বহুতর নূতন ছবি সন্নিবেশিত করিয়াছি কিন্তু তথাপি দ্বিতীয় সংস্করণ যতদূর সুন্দর করিব মনে ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই, সুতরাং প্রথম সংস্করণের ন্যায় এবারও বলি শ্রীভগবান দিন দিলে ইহাকে ভবিষ্যতে সংস্করণে আশানুরূপ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিব।

আমার অক্ষম লেখনী-প্রসূত নদীয়া-কাহিনী যে সাধারণের এত কৃপালাভে সমর্থ হইবে তাহা পুস্তক প্রণয়ন কালে মনেও করি নাই। বিদ্যোৎসাহী সুধী পাঠকবর্গ যাঁহাদের কৃপায় এত শীঘ্র ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ও বঙ্গের সুবিখ্যাত ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ ও সাময়িক পত্রের কৃতী সম্পাদক মহাশয়গণ যাঁহারা সম্পাদকীয় স্তম্ভে সুবৃহৎ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এক বাক্যে ইহার যশোগান করিয়াছেন, বঙ্গের অসংখ্য সুকৃতী সন্তান যাঁহারা এই পুস্তক পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়া পত্র দ্বারা আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং নবদ্বীপস্থ বরেণ্য পণ্ডিত মণ্ডলী যাঁহারা নদীয়া-কাহিনীর গুণমুগ্ধ হইয়া আমাকে "পণ্ডিত রত্ন" উপাধি ও অভিনন্দন পত্র দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণেও বহু ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটি পরিদৃষ্ট হইবে, আশা করি বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশে সময়ে অল্পতা ও আমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

রাণাঘাট, নদীয়া
১৬ অগ্রহায়ণ
১৩১৮

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক

মুখবন্ধ

আপনাদের কথা, আপনাদের ঘরের কথা, আর একটু অধিকতররূপে ভাবিতে যদি আমরা অভ্যাস করি তাহা হইলে, আমাদের অধিকতর মঙ্গল হয়। এমনই একটা ধারণা হইয়াছে যে, যে যত আপনার ঘরের কথা না জানে, তাহার তত 'কূপমণ্ডূক' অপবাদ ঘুচিয়া গেল। এই ধারণার বশে যুবকগণ আপনার দেশের, আপনার জাতির কিছুই না জানিয়া, না বুঝিয়া বিলাতে, বা অন্য কোন বিদেশে আপনার জ্ঞান বিস্তার করিতে যান, সেখানকার সমাজ-শৈবালের শোভা মাথায় পুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন —একটি কিম্ভুত-কিমাকার জীব। দেশে আসিয়া হন—সমাজ সংস্কারক। এই বিষম বিড়ম্বনা হইতে শীঘ্র বঙ্গীয় যুবকগণকে রক্ষা করিতে না পারিলে, আমরা তথা কথিত কূপমণ্ডূকমণ্ডলীর পরিবর্তে পাইব—কেবল কতকগুলি উড়ন্ত ঘুঘু—সেই ঘুঘুগুলি আমাদের কোটা-ভিটায় প্রবেশ লাভ করিয়া, আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

বাঙ্গালী যুবককে বাঙ্গালার কথা ঔষধ-গিলান মত করিয়া শিখাইতে হইবে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধিগণ বাঙ্গালিকে বাঙ্গালার কথা শিখাইতে অগ্রসর হইয়া আপনারা ধন্য হইয়াছেন ও আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। খ্যাতনামা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় কৃষ্ণনগরের রাজবংশের এবং রাজাদিগের কৃতিত্বের বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করিয়া, যে পথ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই পথে আমাদের নবীন যুবক গ্রন্থকার রাণাঘাটের শ্রীমান কুমুদনাথ মল্লিক অগ্রসর হইয়া, এই যে নদীয়া-কাহিনী প্রচারিত করিলেন, ইহাতে সাধারণতঃ বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ নদীয়া জেলায় অধিবাসীদের বিশেষ উপকার হইবে।

প্রাচীন যুনানী মণ্ডলে যেমন আথিনী নগরী, ভারতে যেমন বারাণসী সঙ্গে তেমনই নবদ্বীপ, ভারতীর রাজধানী—ক্ষিতির প্রদীপ। নবদ্বীপ সরস্বতীর সিংহাসন—এইখানে দীপ জ্বলে, চারিদিকে আলো হয়। স্মৃতি, তন্ত্র ন্যায়, জ্যোতিষ—এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কলি-পাবন পতিত-তারণ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এইখানেই অবতীর্ণ হইয়া, অপূর্ব্ব হরিনাম প্রচারে কলিকলুষিত জীবের সদ্গতিসাধন করিয়াছেন। এই নদীয়ার এবং সমগ্র নদীয়া জেলার বিবরণ, ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আমাদের লিখিবার সামগ্রী। আবার নদীয়া জেলার পলাশী-ক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্যপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সুতরাং নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসও আমাদের অনুশীলনের উপযোগী।

নদীয়া-কাহিনীতে এসকল বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ আছে, আরও অনেক

প্রয়োজনীয় কথাও বিস্তর আছে। ফলকথা, নদীয়া-কাহিনীতে ভবিষ্যৎ বঙ্গেতিহাসের একটি প্রধান অংশ সঙ্কলিত হইল।

আমার ধাত্রীমাতা বৃদ্ধা এবং এক চক্ষুহীনা ছিলেন—সেই বিড়ম্বনায় আমার মাথার উপরিভাগ দগ্ধ হয়, এখনও কেশহীন। আমি নদীয়া-কাহিনীর সূতিকা হইতে পরিচর্য্যা করিয়াছি, আমিও এখন বয়োবৈগুণ্যে শক্তিহীন, দৃষ্টিক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছি সুতরাং নদীয়া-কাহিনীর যে অঙ্গ বৈলক্ষণ্য থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই—তবে ধাইগিরীতে যে নবগর্ভিণী সুপ্রসবা হইলেন, নবীন যুবক যে এরূপ সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইলেন, তাহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

নবপ্রসূতকে সূতিকার সকলেই সোণারচাঁদ দেখে—আমাদের এই সোণার চাঁদকে তোমাদের কোলে দিলাম, তোমরা বুকে করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ধরে তোলো—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। ছেলে ভাল মন্দ—তোমরা যেমন লালনপালন করিবে, তেমনই হইবে। আমরা তার কি জানি?

কদমতলা, চুঁচুড়া
১ই আষাঢ়, ১৩১৭

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার

সূচীপত্র

চিত্রাবলী

২৯। ঘোষপাড়ার সতীমা
৩০। প্রবেশ-তোরণ, লালনমাজার : ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া
৩১। পোড়ামাতলা : নবদ্বীপ
৩২। ভবতারিণী : নবদ্বীপ
৩৩। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়
৩৪। সাধক : সতীশচন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত
৩৫। হিতকরী : মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত
৩৬। গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা : কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত
৩৭। নদিয়াবাসী : সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
৩৮। কুমুদনাথ মল্লিকের হস্তাক্ষর
৩৯। নদীয়ারাজের সীলমোহর
৪০। ক্লাইভকে লেখা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চিঠি
৪১। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বাক্ষরিত দানপত্র
৪২। নদীয়ার প্রথম দৈনিক পত্রিকা
৪৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত দুট পত্রিকা
৪৪। পুরস্কৃত মৃৎশিল্পের নিদর্শন : কৃষ্ণনগর
৪৫। নবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু : শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পূজিত
৪৬। যোগপীঠ মন্দির : শ্রীচৈতন্যমঠ মায়াপুর, নদীয়া
৪৭। ইস্কন : মায়াপুর, নদীয়া

নদীয়া-কাহিনী

'নদীয়া' নামোৎপত্তি

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আজ যে জনসঙ্কুল বিপুলা নগরী অগণিত পণ্য বিথীকা, অসংখ্য সুরম্য হর্ম্ম্যরজিত, শত শত অশ্ব গজাদিতে পরিপূর্ণ, কালে তাহাই বিজন অরণ্যে পরিণত। আজ যে স্থানে সমুন্নত গিরিশ্রেণী সগৌরবে নিদারুণ ঝঞ্চাবাত অবহেলা করিতেছে, সময়ে হয়ত সেই স্থানেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল নীলাম্বুরাশির লহরীলীলা পরিদৃষ্ট হইবে। যে উত্তর কোশল একদিন প্রাতঃস্মরণীয়, বরেণ্য, সূর্য্যবংশীয় রাজগণের সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ছিল, যে স্থানে অন্য কথা কি, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং রঘুপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত শাসন ও স্বীয় মহতী সুপবিত্র লীলার দ্বারা মানবকে তাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, জগতের সেই শ্রেষ্ঠ পুরীর আজ কি দশা! যে ইন্দ্রপ্রস্থ একদিন মহারাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার মহা প্রতাপান্বিত আদর্শচরিত্র ভ্রাতৃগণের প্রিয় রাজধানী ছিল, যে স্থানে শত সহস্র নরপতি পাণ্ডবের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া তাঁহাদের সেবায় নিরবধি রত রহিতেন, সুবর্ণধাম সৌন্দর্য্যভূষিত সেই বিশালপুরী আজ কোথায়! যে মহতী দ্বারকানগরী শ্রীশ্রীনারায়ণের মর্ত্তলীলার ঐশ্বর্য্যবিকাশ, সেই ভূস্বর্গ দ্বারাবতী আজ কোথায়! আবার সেদিন যে সুপ্রশস্ত দিল্লীনগরী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মোগল বাদশাহগণের রাজধানীরূপে শোভা ও সমৃদ্ধির আধার ছিল, এবং যে বাদশাহগণ 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া খ্যাত হইতেন, আজ সেই দিল্লী এবং দিল্লীশ্বরগণের কি দশা! কালে সকলই লয় হয়, আবার পুরাতনের স্থানে নূতনের উদ্ভব হয়।?

যে নবদ্বীপ একদিন স্বাধীন বাঙ্গালী সম্রাটের রাজধানী ছিল, যে স্থানের জ্ঞানগরিমা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত, যে পবিত্রধামে শ্রীমদ্ কৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং নবদ্বীপচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল মহিমা আত্মচরিত্রে প্রদর্শন করিয়া লোক শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী সমগ্র দেশের বরেণ্য, সেই মহিমান্বিত নবদ্বীপ আজ গৌরবের স্মৃতি ও সমাধি মাত্রে পর্য্যবসিত। কালের গতি অতি কটীল ও দুর্ব্বোধ্য। যে স্থান একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, আজ সে স্থান ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আশার ক্ষীণ রশ্মিমাত্রেরও বিকাশ নাই।

নদীয়ার সমগ্র ইতিহাস ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, স্বতই মনে হইবে যে নদীয়া যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত অথবা রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের জন্য উদ্ভুত হয় নাই, উহার প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যা ও জ্ঞান, এবং ধর্ম্ম। জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনাই নদীয়ার বিশেষত্ব। জ্ঞান নদীয়ার রক্ত, মাংস, অস্থি ও মজ্জা এবং ধর্ম্মই নদীয়ার প্রাণ।

নদীয়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে বহু স্থলেই অনুমান ও যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পুরাকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণের লিখিত বিবরণে কুলপী নদীয়ার নাম দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীক বা রোমীয়গণের বৃত্তান্তেও ইহার কোন উল্লেখ নাই কিম্বা সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান বর্ণিত তৎকালীন বঙ্গের ইতিহাসে নবদ্বীপের উল্লেখ নাই। আবার যখন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অন্যতম চীন পরিব্রাজক হুয়েন্তসাং বঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিয়াছিলেন, তখনও তিনি নবদ্বীপের নামোল্লেখ করেন নাই। অতএব এ সময়ে হয় নবদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল না, অথবা উহা সামান্য নগণ্য অবস্থায় থাকায় কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তবে বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের সংগৃহীত গ্রন্থ সমুদায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে পৌরাণিক যুগেও নদীয়ার নাম পরিচিত ছিল। শ্রীমৎ পূর্ণব্রহ্ম, শ্রীধাম নবদ্বীপে, শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন, এই মতের পোষকে যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করা হয়, সেই পৌরাণিক শ্লোকাবলীই এ বিষয়ের উত্তম প্রমাণ।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণায় স্থির করিয়াছেন : সমগ্র নদীয়া এবং বর্তমান যশোহরের উত্তরাংশ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বহু পুরাতন সুবিস্তীর্ণ ও সমুন্নত চরভূমি এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে অধ্যুষিত। কলকল নাদিনী স্বচ্ছ সলিলা ভাগীরথী, প্রাতঃস্মরণীয় ভগীরথের ঐকান্তিক ভক্তি ও কাতর প্রার্থনায় যখন সগরবংশের উদ্ধার কল্পে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াও সগর সন্তানগণের উদ্দেশ পান নাই, তখন কৃপাময়ী জননী ভক্তের কারণে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং এক শরীর হইতে শতমুখী হইয়া সগর সন্তানোদ্দেশে দক্ষিণমুখে প্রবাহিতা হন, সেই শত মুখ মধ্যবর্ত্তি জাহ্নবী বিধৌত পূত বায়ু সম্পৃক্ত ভূখণ্ডই বঙ্গনামে অভিহিত। বাঙ্গালা যেন মায়ের কমনীয় কণ্ঠে মনোহর কণ্ঠভূষণ আর নবদ্বীপ—পুণ্যধাম নবদ্বীপ—যে স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বন্যায় সমগ্র ভারত প্লাবিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীধাম যেন সেই মনোরম ভূষণের দ্যুতীমান মধ্যমণি। চৈতন্য ভাগবতকার প্রণম্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় প্রকৃতই লিখিয়াছেন—

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যথা অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোসাঞি।"

নবদ্বীপের অপর নাম নদীয়া। প্রথমে কোন্ নামটীর দ্বারা ইহার নামকরণ সমাধা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। এই দুইটী নামের আবার বহু লোকে বহুবিধ অর্থ করিয়া থাকেন। যাঁহারা নবদ্বীপকে "নয়টি দ্বীপের সমষ্টি" বলিয়া উল্লেখ করেন তাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি একজন। ইঁহার প্রণীত "নবদ্বীপ-পরিক্রমাপদ্ধতি" নামক গ্রন্থে নবদ্বীপকে নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বলিয়া এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

"নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥"

"নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
যৈছে রাজধানী কোন স্থান।
যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম॥"

তিনি উক্ত গ্রন্থে যে নয়টি দ্বীপের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চারিটি গঙ্গার পূর্ব্ব পারে ও পাঁচটি পশ্চিম পারে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে যথাঃ—

গঙ্গার পূর্ব্ব পারের ৪টী দ্বীপ :—

(১) অন্তর্দ্বীপ—মায়াপুর বা মেয়াপুর, ভারুইডাঙ্গা ইহার অন্তর্গত। এই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়।

(২) সীমন্তদ্বীপ—সরডাঙ্গা, সিমলাদি ইহার অন্তর্গত।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা, স্বর্ণবিহার আদি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৪) মধ্যদ্বীপ—মাজীদা, ভালুকা ইহার অন্তর্গত।

গঙ্গার পশ্চিম পারে ৫টী দ্বীপ :—

(১) কোল দ্বীপ—কলিয়া তেঘরির দক্ষিণ ও সমুদ্রগড় ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) ঋতু দ্বীপ—রাতপুর, রাহুতপুর ও বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত।

(৩) মোদদ্রুম দ্বীপ—মাউগাছি, মামগাছি ও মহতপুর ইহার অন্তর্গত।

(৪) জহ্নু দ্বীপ—জাননগর বা জাহ্নুনগর।

(৫) রুদ্রদ্বীপ—রাতুপুর বা রুদ্রডাঙ্গা, শঙ্কাপুর ও পূর্ব্বস্থলী আদি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

যাহারা নবদ্বীপের নূতন দ্বীপ অর্থ করেন, তাঁহারা বলেন যে পূর্ব্বকালে এই স্থান গঙ্গামধ্যবর্ত্তী চর ভূমি ছিল এবং উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া গঙ্গা ও জলাঙ্গী প্রবাহিত ছিলেন; কালে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ চরভূমি ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং মনুষ্যের বাসোপোযোগী হইয়া উঠে। ক্রমশঃ জনসমাগমে ক্ষুদ্র পল্লী হইতে উহা একদিন সমগ্র বঙ্গের রাজধানীতে পরিগণিত হয়। দ্বীপের উপর নূতন গ্রাম সংস্থাপিত হয় বলিয়া উহা নব-দ্বীপ নামে খ্যাত হয়।

নদীয়া নামের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে পূর্ব্বকালে প্রদীপকে "দীয়া" বলিত এবং ন অর্থাৎ নয়টি দীয়া হইতে নবদ্বীপ বা নদীয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতের পোষকে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, যখন গঙ্গামধ্যস্থিত সুবিস্তীর্ণ চরে প্রথম মনুষ্য সমাগম হইতে থাকে, তখন উক্ত চরে একজন সন্ন্যাসী প্রতি নিশায় নয়টী দীপ জ্বালিয়া কোনও তান্ত্রিক সাধনায় রত রহিতেন। লোকে দূর হইতে ঐ নয়টী দীপ দেখিয়া উক্ত চরকে নদীয়ার চর বলিয়া অভিহিত করিত। ক্রমে যখন উক্ত চরে গ্রাম বসিল, তখন উহা নদীয়া নামে খ্যাত হয়; পরে কালের ক্রিয়ায় যখন এই ক্ষুদ্র চর বিশাল বঙ্গভূমির ঐশ্বর্য্যশালিনী রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইল, তখন তদধীন সুপ্রশস্ত রাজ্য সাধারণত নদীয়া নামে অভিহিত হয়।

নদীয়া রাজ্য বলিতে বল্লাল সেনের সময় সমগ্র বাঙ্গালা রাজ্য বুঝাইত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় উত্তরে পলাশী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে ধুলিয়াপুর ও পশ্চিমে ভাগীরথী এই চতুঃসীমান্তর্গত সুবৃহৎ চৌরাশী পরগণা বুঝাইত এবং ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগকে বুঝাইত। বর্ত্তমান কালে উত্তরে রাজসাহী, পূর্ব্বে পাবনা ও যশোহর, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা ও পশ্চিমে বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর-পশ্চিমে মুরসিদাবাদ এই চতুঃসীমান্তর্গত ভূখণ্ডই নদীয়া নামে খ্যাত।[২]

---

১ এক বৎসর পূর্ব্বে প্রথম সংস্করণ নদীয়া কাহিনীতে যখন দিল্লীর বিগত ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম ও "পুরাতনের স্থলে নূতনের উদ্ভব হয়" বলিয়া কালের পরিবর্ত্তন শীলভাব উল্লেখ করিয়াছিলাম তখন কে ভাবিয়াছিল এই কয়েকদিনের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল কালের হস্তে সমাদর লাভ করিয়া সুপ্রাচীন পরিত্যক্ত দিল্লী মহানগরী আজ আবার মহামহিম রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের অঙ্গুলী সংকেতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ইংরাজ রাজের ভারতের রাজধানীতে' পরিণত হইবে? কেই বা কল্পনা করিয়াছিল যে ইংরাজের ঐশ্বর্য্যময়ী, গরবিনী মহানগরী কলিকাতা হইতে কখন বিস্মৃত পরিত্যক্ত দিল্লী নগরীতে তাঁহাদের রাজধানী অপসারিত হইবে। কিন্তু মহাকালের কার্য্যই এই, এক ভাঙ্গিতেছে আর গড়িতেছে।

২ "Padma separating Nadia from Pabna and Rajshahi; Jalangi from Murshidabad; Bhagirathi forming the Western boundary, but for the change of its current Navadip now lies on the further bank of the river."—W. W. Hunter's Imp. Gazetteer of India Vol. X.

"On the remaining sides of the district there are no natural boundaries, but it is bounded on the South by the 24 Pargannahs district, on the south-east by Jessore, and on the east by Faridpur, on the Western boundary there were two strips of land included in the district, though they lie, at present, on the west bank of the Bhagirathi, on the southern-most of these which has an area of 11 Sq. miles, lies the town of Nadia or Navadip."—Vide Bengal Dist. Gazetteers Vol. XXIV.

নদীয়ার রাজনৈতিক বিবরণ

নদীয়ায় হিন্দুরাজত্ব

বর্ত্তমান যুগে নদীয়া বলিয়া যে নদী বহুল প্রশস্ত ভূখণ্ড আখ্যাত, তাহা পুরাকালে গৌড়েশ্বরগণের রাজ্যান্তর্গত ছিল। এই গৌড় রাজ্য খৃষ্ট জন্মের ৭৩০ বৎসর পূর্ব্বে ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিল এবং গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল। এই খণ্ড পঞ্চ, পাঁচজন পৃথক নরপতির শাসনাধীন ছিল; এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি পঞ্চ গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। গৌড়ের অপর নাম লক্ষ্মণাবতী; সম্ভবতঃ টলেমি তাঁহার বর্ণনায় "গ্যানজিয়া রিজিয়া" বলিয়া যে ভূভাগের উল্লেখ করিয়াছেন উহাই এই গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী[১]। হিন্দু কুলচূড়ামণি মহারাজ আদিশূর ৯৯৯ শকে বা ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধাধিকার হইতে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করণান্তর স্বয়ং গৌড় রাজ্য অধিকার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্ত পুনরুড্ডীয়মান করেন[২]। কথিত আছে একদিন রাজা আদিশূর শ্রান্তি বিনোদনার্থ যখন প্রাসাদোপরি পাদচারণা করিতে ছিলেন, সেই সময় একটী শকুনী অস্বাভাবিক শব্দ সহকারে তাঁহার প্রাসাদের শিখরদেশে সবেগে অবতরণ করে। শাস্ত্রজ্ঞানী রাজা, স্থান, কাল বিবেচনা করিয়া এই শকুনী অবতরণকে বিশেষ অশুভ জ্ঞাপক অবধারণ করেন এবং এ সম্বন্ধে স্বীয় সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মত জিজ্ঞাসু হইলে, তাঁহার সভাস্থ একজন ব্রাহ্মণ বলেন যে সম্প্রতি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি কান্যকুব্জাধিপতির প্রাসাদে অবিকল এবম্বিধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এক মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা এতদ্বিষয়ে দোষশান্তি করিয়াছেন। ধর্ম্মগত-প্রাণ, নরপতি ব্রাহ্মণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কান্যকুব্জাধিপতির ন্যায় নিজেও যজ্ঞ দ্বারা এই অশুভ ঘটনার স্বস্ত্যয়ন করিতে বাসনা করেন। কিন্তু সে সময়ে বৌদ্ধ প্রভাবে তাঁহার রাজ্যমধ্যে তদ্রূপ ক্রিয়াশীল বেদজ্ঞ সুব্রাহ্মণের অভাব থাকায়, কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামধেয় আচারবান পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং ভক্তি ও যত্নসহকারে ধন রত্ন ও গ্রামাদি দান করিয়া তাঁহাদের এতদ্দেশে স্থাপনা করেন[৩]। ইঁহারাই বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। মহারাজ আদিশূর এইরূপে বঙ্গদেশের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার বংশ কিছুদিন গৌড়সিংহাসনে রাজত্ব করিবার পর তদ্বংশীয়গণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয়েরা গৌড় অধিকার করেন। পরে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে সেন নরপতিগণ এদেশে রাজা হন এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে

অনুমান করেন বর্ত্তমান নবদ্বীপের ৪ মাইল পূর্ব্বে স্বর্ণবিহার নামে যে ক্ষুদ্র পল্লী বর্ত্তমান, উহাই পাল রাজাগণের অন্যতম বাসস্থান, এবং উক্ত পল্লীতে অদ্যাপি যে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহাই তাঁহারা পালরাজন্যবর্গের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পরন্তু বৌদ্ধগণের মঠের অপর নাম "বিহার", এই গ্রামটীর নামের সহিত বিহার শব্দ যোগ থাকায় ইঁহাদের মতের পোষকতা করিতেছে। ইঁহাদের মতে নবদ্বীপ উক্ত রাজাগণের রাজত্বকালে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

মতান্তরে সেনবংশীয় হিন্দু নরপতিগণের রাজত্বকালে সামন্ত সেন নামে ঐ বংশীয় এক বৃদ্ধ নরপতি শেষ দশায় গঙ্গাতীরে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া গঙ্গা জালাঙ্গী সঙ্গমে এক উপনিবেশ স্থাপনা করেন। এই উপনিবেশের অনতিদূরে বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত। এই সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন আপনার বাহুবলে বহু দেশ জয় করিয়া প্রবল প্রতাপশালী হয়েন। সুবিখ্যাত বল্লাল সেন এই বিজয় সেনের পুত্র। ইনি পিতার ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর এবং শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। সুবিখ্যাত গ্রন্থ দানসাগর তৎকর্ত্তৃক রচিত হয়। তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রধান প্রধান নদীর গতি অনুসারে পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত করেন। যথা—বঙ্গ রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও মিথিলা[৪] এবং উক্ত প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণকে তত্তৎ নামে অভিহিত করেন, যথা—রাঢ়ীয় বারেন্দ্র, মৈথিলী ইত্যাদি। এই সময়ে বল্লাল সেন সমাজে কৌলিন্যমর্য্যাদার সৃষ্টি দ্বারা জ্ঞানী ও সৎচরিত্র ব্যক্তির সম্মান বাড়াইয়া যান। তিনি গৌড় ব্যতিরেকে নবদ্বীপ ও সুবর্ণগ্রামে আর দুইটী রাজধানী স্থাপনা করেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তীরস্থ নবদ্বীপে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতেন, এক্ষণে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছেন[৫]। বল্লালের সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ও বল্লাল দীঘি ইত্যাদি এখনও নবদ্বীপে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রাসাদের এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে কতিপয় কাষ্ঠের বারকোশ ও একটী বল্মীকদষ্ট ভগ্নসিন্ধুক আবিষ্কৃত হয়। এই কাষ্ঠসিন্ধুকের মধ্য হইতে কয়েকখানি কীটদষ্ট জীর্ণ শাল ও পশমী পোষাকের জীর্ণাতিজীর্ণ ছিন্নাংশ ও কতিপয় সোণা মুদ্রা বহির্গত হয়[৬]।

বল্লালের শেষ জীবনে তাঁহার পুত্র লক্ষণ সেন[৭] পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া নবদ্বীপের বিল্বপুষ্করিণীর দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। সর্ব্বধ্বংসী কালের হস্তে ইহাও এখন সুবিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এই অন্ধ বিশ্বাসই তাঁহার এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বনাশের মূল। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের সমস্ত ভার ব্রাহ্মণগণের উপর ন্যস্ত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হলায়ুধ ও তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, বটুদাস নামে একব্যক্তি সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু তিনি যে কখনও সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এমত বোধ হয়

না। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বেই ত্রিপুরা, কামরূপ, পঞ্চকোট প্রভৃতি রাজ্যগুলি গৌড় রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। গৌড় রাজ্য যখন এইরূপে ক্রমে ক্রমে হীনবল হইতেছিল সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া সুচতুর মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ ই-বকতিয়ার খিলজি বেহার জয় করিয়া ধীরে ধীরে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়েন[৮]। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন এই সময়ে অশীতিপর বৃদ্ধ, মুসলমাণগণ রাজধানী আক্রমন করিতে আসিতেছে শুনিয়া তিনি কর্ত্তব্যাবধারণের নিমিত্ত সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত জিজ্ঞাসা করেন। শুভাশুভ অবধারণের নিমিত্ত দৈবজ্ঞগণের মত গ্রহণ করা হইল। দৈবজ্ঞগণ গণনাদ্বারা স্থির করিলেন যে রাজা লক্ষ্মণ সেন বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যচ্যুত হইবেন ও তাঁহার রাজ্য ম্লেচ্ছ জাতির হস্তগত হইবে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবে তাহার আকার খর্ব্ব, বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও মুখ মর্কটাকৃতি হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন দৈবজ্ঞগণ ও রাজ্যের কোনও কোনও কৃতঘ্ন কর্ম্মচারি মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার কর্ত্তৃক সবিশেষ প্রলুব্ধ হইয়া স্বীয় প্রভুকে প্রতারণা পূর্ব্বক নিজ মাতৃভূমি বিজাতীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের কোনও উপায় নাই, তবে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া প্রতীতি হয়। বক্তিয়ার নবদ্বীপের উপকণ্ঠস্থ বন্যাভ্যান্তরে তাঁহার বিপুলবাহিনী লুক্কাইত রাখিয়া, মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে অশ্ববিক্রয়চ্ছলে দিবা দ্বিপ্রহরে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করেন[৯]। সে সময়ে প্রাসাদস্থ রক্ষীবৃন্দ মাধ্যাহ্নিক পাককার্য্যাদিতে রত ছিল। বকৃতিয়ার পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক রক্ষীবৃন্দ ও কর্ম্মচারীগণকে হত্যা করিতে লাগিলেন। এই সময় দলে দলে মুসলমান সেনা বনপ্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়া নগর আক্রমণ করিল[১০]। রাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ব হইতেই অবশ্যম্ভাবী পরাজয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সহসা এইরূপে আক্রান্ত হওয়ায় নবদ্বীপ ত্যাগ করত সপরিবারে বিক্রমপুরে প্রস্থান করেন এবং বঙ্গেতিহাসের অকলঙ্কিত পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য কলঙ্ককালিমা লেপন করেন।

রাজপুরী হস্তগত করিয়া বক্তিয়ার আপন সৈন্যদিগকে নদীয়া লুণ্ঠন করিতে আদেশ দেন এইরূপে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয়[১১] করিলেও সমগ্র বঙ্গভূমি অধিকার করিতে মুসলমানগণের শতাধিক বৎসর লাগিয়াছিল। বকৃতিয়ার এইরূপে বঙ্গের তদনীন্তন রাজধানী নবদ্বীপ ধ্বংস করিয়া বঙ্গের পুরাতন রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে পুনরায় রাজধানী স্থাপন করেন। এই দিন নবদ্বীপের এবং সমগ্র বাঙ্গালার পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন।

নদীয়ায় মুশলমানাধিকার

বক্তিয়ার খিলজি, অধিকৃত প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন, এবং গৌড়েব ন্যায় দিনাজপুরের সন্নিহিত দেবকোটে আর একটী রাজধানী স্থাপন করেন। এই দেবকোটেই বক্তিয়াব কালগ্রাসে পতিত হন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দিল্লীশ্বরেব অধীন হয়, বাদশাহ গায়সুদ্দিন বলবন্ শাসন সৌকার্য্যার্থ বঙ্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গৌড়নগরীকে উত্তর ভাগের সুবর্ণগ্রামকে পূর্ব্ব ভাগের এবং নবদ্বীপের পরিবর্ত্তে সরস্বতী তীরস্থ সপ্তগ্রামকে পশ্চিম ভাগের রাজধানী মনোনীত করেন[১২]। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যাদির কেন্দ্রস্থলরূপে গণ্য হয় এবং বহুসংখ্যক ধনবান্ বণিক এখানে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কালে এই সমৃদ্ধশালী সপ্তগ্রাম বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ধনীর অভ্রভেদী প্রাসাদ ও দরিদ্রের পর্ণকুটীর একই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে দিন বিশালকায়া বেগবতী পূণ্যসলিলা সরস্বতীর স্রোত মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল সেই দিন হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়।

১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়স্ সমগ্র বঙ্গদেশের একচ্ছত্র রাজা হন এবং দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন। সামসুদ্দিন গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুবিখ্যাত সেকেন্দার সাহ সিংহাসনে অধিরোহন করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কৃতঘ্ন পুত্র গীয়াসুদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত হইলে, ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ বাইজিদ্‌সাহ নামে একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, পরে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং সিংহাসনে আবোহণ করিয়া দশ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করেন। গণেশের পুত্র জাঠমল বা যত্ন জালালুদ্দিন নাম ধারণ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ১৪১৪ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনন্তর জালালুদ্দিনের পুত্র আহমদ্‌সাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তিনি অচিরে তাঁহার ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক নিহত হইলে নসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার পুত্র বারবাক্ সাহ নিজ সেনাদলে আট হাজার হাব্‌সী কৃতদাসকে স্থান দান করেন। তাহারা ক্রমশঃ প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং অন্তঃপুর রক্ষী খোজা ও পাইক সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ফতেসাহকে হত্যাপূর্ব্বক বারীক নামক খোজাকে সুলতান সাজাদা নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার সিংহাসনে এইরূপে এক নপুংসক সমারূঢ় হইল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে হয় নাই। হাবসী সেনাপতি মালিকিদ্দিন ইহাকে নিহত করিয়া ফিরোজ সাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর নসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ রাজা হন। তিনিও আবার সিদ্দিবদর দেওয়ানে নামক এক ব্যক্তির দ্বারা নিহত

হন। এই সিদ্দিবদর মজাফর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার ন্যায় নৃশংস ও যথেচ্ছাচারী রাজা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। তিনি নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে প্রথমে তুর্কী জাতীয় ওমরাহগণের নিধন সাধন করেন, পশ্চাৎ হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদারগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করেন। এই নির্ম্মম নরপতির অত্যাচার হইতে কাহারও নিস্তার ছিল না। তিনি ভয়ঙ্কর হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এই সময়ে কতকগুলি মুসলমান তাহার নিকট নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের নামে নানারূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার হয়। তাহাদের অত্যাচার নবদ্বীপের সন্নিহিত পিরল্যা গ্রামেই অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করে। তাহারা পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণগণকে বলপূর্ব্বক তাহাদের উচ্ছিষ্ট অভক্ষ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করাইয়া জাতি ধর্ম্ম নাশ করিয়াছিল। এইরূপে নষ্টধর্ম্ম পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ উত্তরকালে পিরালী নামে অভিহিত হন[১৩]। অনিচ্ছায় বল প্রয়োগ জাতিচ্যুত হইলে অনেকে যবনাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার অনেকে করেন নাই[১৪]।

পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে[১৫] খাঁ জাহান আলি বা খাঞ্জেআলি নামে কোন এক ধনশালী মুসলমান দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সুন্দরবন আবাদের সনন্দ লইয়া যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সুজলা সুফলা উর্ব্বরা ভূমিতে বিস্তীর্ণভাবে আবাদ করিয়া খাঞ্জেআলি অল্পকালের মধ্যে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া উঠেন এবং নবাব খাঞ্জেআলি নামে খ্যাত হন। নবাব খাঞ্জেআলির সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার যশোহরের বেঙ্গুটিয়া পরগণার জমিদার কামদেব ও জয়দেব রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর অর্পিত ছিল। এই দুই ভ্রাতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে এবং নবাব খাঞ্জে আলির অর্থে খুলনা বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত ও পুষ্করিণী খনন করা হয়।[১৬]

এই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদতাহের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নবাব খাঞ্জেআলির সহিত মিলিত হন। মহম্মদতাহের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একজন গোঁড়া মুসলমান হইয়া উঠেন এবং নবাব খাঞ্জেআলির সাহায্যে তৎপ্রদেশস্থ হিন্দুগণকে মুসলমান করিতে প্রবৃত্ত হন ও তিন শত ষাটটী মস্‌জিদ্ স্থাপন করেন, এ কারণে তৎপ্রদেশস্থ মুসলমানগণ তাঁহাকে "পির আলি" নামে অভিহিত করিয়া সম্মানিত করেন। পিরআলি আপনার বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ক্রমে নবাব খাঞ্জেআলির অতিশয় প্রিয়পাত্র হন এবং পরিশেষে তাঁহার উজিরী পদ লাভ করেন। দরিদ্র তাহের উজিরী পদ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না. তিনি দেখিলেন তদঞ্চলে কামদেব ও জয়দেব রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তি অসাধারণ; একে তাঁহারা স্বয়ং বহু অর্থের অধীশ্বর তাহাতে আবার নবাব খাঞ্জেআলির সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার হস্তে থাকায়, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে, সে অঞ্চলের রাজা; সুতরাং উজিরী পাইলেও তাঁহাকে এই দুই ভ্রাতাকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে; বিশেষতঃ তাঁহারা নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ, আর

তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বধর্ম্মত্যাগী মুসলমান বলিয়া অনেকের চক্ষে অতি হীন। এই সকল কারণে পিরআলি, চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং কিসে তাঁহাদের অনিষ্ট করিবেন তাহার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কোন একটী ঘটনা উপলক্ষে পিরআলি তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। নবাব খাঞে আলি সকল সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন না। এক্ষণে উজির হওয়ায় পিরআলিই অধিকাংশ সময় দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। কামদেব ও জয়দেব রায়চৌধুরীও কার্য্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে দরবারে আসিতেন। একদিন রোজার উপবাসকালের মধ্যে দরবার হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক কর্ম্মচারী একটী ঘৃতকলম্বা লেবু আনিয়া উজিরকে উপহার দিলেন। পিরআলি লেবুটীর আঘ্রাণ লইয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সেই দরবার গৃহে নিষ্ঠাবান হিন্দু চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় উপস্থিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ কামদেব রায়চৌধুরী উপবাসকাল মধ্যে উজির সাহেবকে লেবুর আঘ্রাণ লইতে দেখিয়া বলিলেন—"হুজুর করিলেন কি! রোজার দিন লেবুর আঘ্রাণ লইলেন?" উজির জিজ্ঞাসা করিলেন—"দোষ কি?" তাহাতে কামদেব উত্তর করিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে উপবাসের দিন কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ পর্য্যন্ত লইতে নাই, কারণ ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন হয়।" পিরআলি একথা শুনিয়া মনে করিলেন তিনি যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাই লক্ষ্য করিয়া কামদেব তাঁহাকে এবম্বিধ বিদ্রূপ করিতে সাহসী হইয়াছেন। তিনি মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

প্রতিহিংসা-পরায়ণ উজির এক দিন প্রজাসাধারণ ও কর্ম্মচারীবৃন্দের এক দরবার আহ্বান করিলেন এবং চৌধুরীবংশের সকলকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুসারে ঐ দরবার প্রাঙ্গণের সন্নিকটে এক সুপ্রশস্ত গৃহে মুসলমান বাবুর্চ্চিগণ নানাবিধ সুগন্ধি মসলা, পলাণ্ডু ও লশুনাদি সংযোগে গোমাংস রন্ধন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সভাগৃহ গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল। সভাস্থ হিন্দুগণ নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বসিলেন; পিরআলি মনে মনে সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়া মৌখিক সৌজন্য সহকারে বলিলেন, "চৌধুরী মহাশয়গণ ওরূপ নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন কেন? ব্যাপার কি?" কামদেব উত্তর করিলেন "মাংসের গন্ধ"। তখন নষ্টবুদ্ধি পিরআলি বলিলেন "অগ্রে গোমাংসের গন্ধ পাইয়া পরে নাসিকা আচ্ছাদন করিয়াছেন, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্র মতে আপনাদের সকলেরই ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনাদের সকলেরই জাতিচ্যুতি ঘটিয়াছে, এক্ষণে আর নাসিকাচ্ছাদনে ফল কি?" পিরআলির এবম্বিধ বাক্যে কামদেব প্রমাদ গণিলেন। ও দিকে উজিরের আদেশে কয়েকজন সিপাহী আসিয়া বলপূর্ব্বক কামদেব ও জয়দেবের মুখে গোমাংস প্রদান করিল। গ্রামস্থ হিন্দুগণ সকলে মিলিয়া রায়চৌধুরী বংশীয়গণকে ও অন্যান্য দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পতিত সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার রহিত করিলেন। এ দিকে কামদেব ও জয়দেবের মুখে প্রত্যক্ষভাবে গোমাংস পতিত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ ও নিকট কুটুম্বগণও

তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন সেই দুই দুর্ভাগা ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই দেখিয়া নবাব খাঞ্জেআলি খাঁর শরণাপন্ন হইলেন ও যথাক্রমে কামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী ও জামালুদ্দীন খাঁ চৌধুরী নাম লইয়া যশোহরের পাঁচ ক্রোশ দূরে সিংহিয়া গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিলেন ; ইঁহাদের বংশাবলী বৃদ্ধি পাইয়া এখন সাতক্ষীরা, হুসেনপুর, মাগুরা, বস্তুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

পীরঅলির দৌরাত্ম্যে এই সকল ব্যক্তির জাতিচ্যুতি ঘটায় তাঁহাদের পতিত বংশবলী সাধারণতঃ পিরালী নামে খ্যাত হন। রায় চৌধুরী বংশীয়গণ এইরূপে গুড়গ্রামী সাধ্য শ্রোত্রীয় হইতে পিরালী অখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে বিশেষ দায়ে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধনের অপ্রতুল ছিল না, সুতরাং ধনবলে কুলীন ও শ্রোত্রীয় পাত্র সংগ্রহ করিয়া বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই সকল কুটম্বগণও পতিত হইতে লাগিলেন। এই রূপে পিরালীগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এতদ্ব্যতীত পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে এ সকল কিম্বদন্তির মধ্যে কতটুক ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন, সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল যাহা ইতিহাসবহুল প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সাহিত্যে আদৃত তথা কথিত বিবরণটি, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

নবদ্বীপবাসীগণের উপর অত্যাচার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পিশাচ প্রকৃতি মজাফরের প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন সাহ মুসলমান ও হিন্দু জমিদারগণের সহিত মিলিত হইয়া ১৪৯৭ অব্দে মজাফরের কলুষময় জীবনের অবসান করত বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। হুসেন সাহ নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির ও ভগ্ন দেউল প্রভৃতির পুনঃসংস্কারের অনুমতি প্রদান করেন। এই হুসেন সাহ পূর্ব্বে সুবুদ্ধি খাঁ নামক একজন ধনাঢ্য কায়স্থের বাটীতে ভৃত্যের কার্য্য করিতেন। কোন সময়ে সুবুদ্ধি খাঁ তাঁহাকে পুষ্করিণী খনন কার্য্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন, কিন্তু হুসেন তাঁহার প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে সবিশেষ মনোযোগী না হওয়ায়, সুবুদ্ধি বেত্রা ঘাতে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করেন। হুসেন নীরবে বেত্রাঘাতে সহ্য করেন এবং পূর্ব্ববৎ প্রভুর কার্য্য করিতে থাকেন, এ কারণ সুবুদ্ধির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সুবুদ্ধির চেষ্টায় হুসেন রাজসরকারের প্রথমে একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন, উত্তর কালে স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত লাভ করেন।

হুসেন সাহের সময়ে কামরূপ বিজিত হয় এবং চট্টগ্রামে মগগণ পরাজিত হয়। ইনিই মেদিনীপুর অঞ্চলে হাব্‌সীদিগকে নিষ্করভূমি দান করিয়া উড়িষ্যার রাজাদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থা অতি সচ্ছল ছিল। ধনীগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন। নিমন্ত্রণ সভায় যিনি যত সুবর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতে৷ তিনি তত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি একদিকে যেমন সুশাসক বলিয়া পরিচিত, তেমনি বঙ্গ সাহিত্যের

উৎসাহদাতা বলিয়াও সুবিখ্যাত। ইহারই আদেশে সুপ্রসিদ্ধ কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন, ইহা পারগলী ভারত বলিয়াও খ্যাত। বঙ্গকবি গুণরাজ খাঁ, ছুটী খাঁ, গোপীনাথ বসু প্রভৃতি ইহার সভার উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

হুসেনের সময় অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় দবীর খাস ও সাকর মল্লিক পদে তাঁহার সভায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সপ্তগ্রামের রাজপ্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি দান করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ ও বহু সমসাময়িক সাহিত্যে দেখা যায় যে সে সময়ে কয়েকজন কাজী বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নদীয়া শাসন করিতেন। চাঁদ খাঁ নামক একজন কাজী নবদ্বীপের একাংশ বেলপুখুরিয়ায় বাস করিতেন। আর একজন শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে থাকিতেন; তাঁহার নাম ছিল মুলুক; ইহার গোরাই নামে একজন হিন্দুবিদ্বেষী পরম অত্যাচারী অমাত্য ছিল। কাজীগণ বিদ্বেষ বশতঃ সর্ব্বদাই হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ভক্ত শিরোমণি যবন হরিদাস[১৭] ইসলাম ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করায় শান্তিপুর নিবাসী কাজীর প্ররোচনায় ও বাদসাহের বিচারে বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে হরিদাস ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর অপার কৃপায় পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপস্থ চাঁদ কাজী মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়াও পরিশেষে তাঁহার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন।

হুসেন সাহের পরবর্ত্তীকালে সের সাহ্ নামে একজন দুর্দ্ধর্ষ আফগান প্রথমে বঙ্গদেশ পরে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সের সাহ্ রাজকার্য্যে সুদক্ষ হইলেও অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এমন কি তাহাদের জাতি ধর্ম্ম হানিকর আইনাদি প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সকল আইনের মধ্যে "হিন্দু প্রজা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে অশক্ত হইলে মুসলমান শাসনকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে তাহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, এবং ইসলাম ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত হিন্দু প্রজা ঘৃণা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য,"[১৮] ইত্যাদি আইন প্রচলন দ্বারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র হিন্দুর ধর্ম্মনাশ করিয়া মুসলমান করিয়া যান। ইহাই এতদঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।[১৯]

সের সাহের মৃত্যুর পর তদ্বংশীয় কয়েকজন গৌড়ে শাসনকর্ত্তা হন। রাজনীতিবেত্তা মোগল-কুল-রবি সুচতুর আক্‌বর সাহ সমগ্র হিন্দুস্থান করতলগত করিয়া সেনাপতি মুনিম খাঁকে এবং তোডরমল্লকে বাঙ্গালায়, পাঠান শাসনের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রেরণ করেন। এই সময়ে গৌড়ে অত্যন্ত মারিভয় হয়; লক্ষ লক্ষ লোক এই লোকক্ষয়কর ব্যাধির দারুণ কবলে কবলিত হওয়ায় প্রাচীন গৌড় একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। আক্‌বরের সেনাপতি মুনিম খাঁও এখানে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং আক্‌বরসাহ তাঁহার স্থানে হুসেন কুলী খাঁ নামক একজন দক্ষ সেনাপতিকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তোডরমল্লের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। সুচতুর তোডরমল্ল দিল্লী হইতে সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইলে

তাঁহার সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ জমিদারবর্গের সহিত সখ্যতা করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে তদানীন্তন নদীয়ার অন্তর্গত চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ স্বামী কায়স্থকুলভূষণ রাজা কাশীনাথ রায় তোডরমল্লের সহিত মিলিত হন এবং মোগলের পক্ষ হইয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ এক্ষণে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং সাধারণতঃ চৌবেড়িয়া নামে খ্যাত। ইহা বর্ত্তমান বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের গোপাল নগর ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।[২০] চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ যখন প্রাসাদ, পরিখা ও অগণিত জনপূর্ণ ছিল, তখন সন্নিহিত বনগ্রামও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। পূর্ব্বে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া পুণ্যসলিলা যমুনা প্রবল বেগে প্রবাহিতা ছিলেন; সেই দুর্গপাদচারিণী বিশালকায় যমুনাও এক্ষণে ক্ষীণ রজত রেখার ন্যায় অতি মৃদু গতিতে প্রবাহিতা। কোথাও আবার সেই সূক্ষ্ম প্রবাহেরও অভাব দাঁড়াইয়াছে। গুনগ্রাহী বাদসাহ আক্‌বর সেনাপতি তোডরমল্লের নিকট বঙ্গবীর রাজা কাশীনাথের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং পাটনা অবরোধের সময় স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া পাটনা অধিকারের পর প্রকাশ্য দরবারে রাজা কাশীনাথকে সমরসিংহ এই গৌরব জনক উপাধি ও বাদসাহী ঝ; :, নাগরা, পাল্কী ও অশ্ব গজাদি প্রদান পূর্ব্বক নানারূপে সম্মানিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই যখন কুলী খাঁ ও তোডরমল্লের সম্মিলিত বিপুল মোগল বাহিনী পলায়ন পর শেস পাঠান নরপতি দাযুদ খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল তখনও রাজা সমরসিংহ সানন্দচিত্তে সর্ব্ব প্রথমে তোডরমল্লের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং নিজের স্বাভাবিক বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালা হইতে পাঠান রাজত্ব উচ্ছেদের ও মোগল রাজত্ব সংস্থাপনের বিশেষ সহায়তা করেন। মহাবীর্য্যশালী রাজা সমরসিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবহ। বঙ্গদেশে সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইলে কুলী খাঁর উপর কিয়ৎদিবসের নিমিত্ত বঙ্গের শাসন ভার অর্পণ করিয়া রাজা তোডরমল্ল সম্রাট আক্‌বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী গমন করেন। এই সুযোগে সমরসিংহের কতিপয় কৃতঘ্ন কর্ম্মচারী সমরসিংহের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করে। রাজবিদ্রোহ-অপবাদে তদানীন্তন বঙ্গের সুবেদারের অদ্ভুত বিচারে সমরসিংহের শিরচ্ছেদন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তোডরমল্ল বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলে সমরসিংহের মহিষী তাঁহার নিকট বিচারপ্রার্থিনী হন। রাজা তোডরমল্ল, চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে বঙ্গবিজয়ের ঘোষণাস্বরূপ এক বিরাট দরবার আহ্বান করেন এবং সমরসিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই দরবারে সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। এত দিনে বাঙ্গালায় স্বাধীন পাঠান রাজত্ব শেষ হইয়া বাঙ্গালা প্রত্যক্ষভাবে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। রাজা তোডরমল্লই বাঙ্গালার মোগল সম্রাটের প্রথম প্রতিনিধি। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ জমাবন্দী করিয়া রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করেন ও আশ্‌লী জমাতুমারে বঙ্গদেশকে ১৯টী সরকারে ও ৬৮৯টী মহলে বিভক্ত করেন। তোডরমল্লের আশ্‌লী জমায় ১০,৬৯৩,০৬৭ আক্‌বরসাহী টাকা আদায়

হইত।। পূর্ব্বোক্ত ১৯টী সরকারের মধ্যে ১১টী গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব্বে, ৮টী গঙ্গার পশ্চিম এবং ভাগীরথীর সঙ্গমস্থানের নিকট অবস্থিত, তন্মধ্যে সরকার সপ্তগ্রাম ১টী। জেলা নদীয়া তখন সরকার সপ্তগ্রামের অধীন ছিল। এই সপ্তগ্রাম সরকার তখন বহুদূর বিস্তৃত ছিল; ইহার উত্তর সীমা পলাশী, দক্ষিণ সীমা হাতিয়াগড় এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম কপাতক (কপোতাক্ষ নদী ?) হইতে ভাগীরথীর উত্তর তীর লই বিস্তৃত ছিল। ইহার অধিকাংশ মহল বর্ত্তমান নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে, এই সুবিস্তীর্ণ সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৪১৮, ১১৮ আক্‌বরী টাকা, বন্দর, হাটের আয় ছিল ৩০, ৩০০ টাকা, ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে আয় ২৯৭, ৭৪১ টাকা বলিয়া উল্লিখিত আছে।[২১]

পাঠানগণ বিজিত হইলেও তাহাদিগকে মোগলগণের করতলগত রাখা দুঃসাধ্য হইল। সুযোগ পাইলেই বাঙ্গালার ভূস্বামীগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা নামে দিল্লীশ্বরের অধীন হইলেও কার্য্যত তাঁহারাই দেশের প্রকৃত রাজা ছিলেন। এইরূপে স্বাধীন ভূস্বামীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ জন প্রধান ছিলেন, তাঁহারা সাধারণতঃ দ্বাদশ ভৌমিক নামে খ্যাত। এই সকল স্বাধীন ভূস্বামীগণের মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যই সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। মোগলগণ কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইলে পাঠান রাজের একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বহু পাঠান সর্দ্দারের ও স্বীয় ধন রত্নাদি সহ সুন্দরবনের মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন; তাঁহার নাম বিক্রমাদিত্য।[২২] তিনি এই জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশে ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া তদানীন্তন ভূস্বামীগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা বসন্ত রায় ইঁহার খুল্লতাতপুত্র এবং বঙ্গের শেষ বীর—বীরচূড়ামণি প্রতাপাদিত্য ইঁহার পুত্র। এই প্রতাপাদিত্য আকবরের শেষ জীবনে তাঁহার অতি দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়া উঠেন। তিনি চট্টগ্রামের ও আরাকানের রডা-প্রমুখ পর্ত্তুগীজদিগকে আপনার গোলন্দাজ সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিয়া পুরী হইতে নোয়াখালি পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ অধিকার করেন। নদীয়ার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চনগর বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়া এবং জগদ্দল প্রভৃতি স্থানও তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এখনও জগদ্দলে তাঁহার গড় ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে ও রাজার পুকুর নামে পুষ্করিণী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তাৎকালিক নদীয়ার অপরাপর স্থানেও তাঁহার অধিকারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে প্রতাপের রাজ্যলাভের পূর্ব্ব হইতেই কুশদহের অন্তর্গত জলেশ্বর ও ইছাপুরে কাশীনাথ রায় নামে একজন ধনশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। নদীয়া প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণা ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ ও খড়দহ মেলের সিদ্ধান্তী থাকের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিদারীর অধিকাংশ ভোগ করিতেছিলেন। প্রতাপ তাঁহাদের নিকট কর প্রার্থনা করিলে সিদ্ধান্তবাগীশ উহা দিতে অস্বীকার করায় প্রতাপ তাঁহাকে শাসন করিবার মানসে সসৈন্যে গোবরডাঙ্গার নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। এক্ষণে সিদ্ধান্তবাগীশ সবিশেষ ভীত হইয়া প্রতাপের শরণাপন্ন হন। দয়ালু প্রতাপ ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিতে তাঁহার জমিদারী গ্রহণ করিলেন

না তবে যে স্থানে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল সেই স্থান টুকু গ্রহণ করিয়া আপনার নামে উহার প্রতাপপুর নাম রাখিলেন। এই স্থানটুকু গ্রহণের কারণ এই শুনা যায় যে প্রতাপ নিজ অধিকার ব্যতিত অন্যত্র আহার করিতেন না। এই গ্রামখানি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এখান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি হালিসহর, কুমারহট্ট, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। প্রতাপকে দমন করিবার জন্য দিল্লীশ্বর আকবর সাহ পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ, করেন কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই সময় সম্রাট আকবর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরও দিল্লীর সম্রাট হন। জাহাঙ্গীরও প্রতাপের বিরুদ্ধে তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। মানসিংহ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে বাঙ্গালায় আগমন করতঃ নদীয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় এবং প্রতাপের কতিপয় কৃতঘ্ন আত্মীয় ও কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় বহু কষ্টে প্রতাপকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান। দিল্লীর পথে পবিত্র কাশীধামে বীর প্রতাপের জীবন-লীলার অবসান হয়।

এই ... অন্যান্য যে সমস্ত বঙ্গীয় ভূস্বামী অত্যাচারী মুসলমান শাসনকর্ত্তার বিপক্ষে মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন, নদীয়ার অন্যতম বিখ্যাত ভূস্বামী দেবগ্রামস্থ কুম্ভকার বংশীয় রাজা দেবপাল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কালের কঠোর নিষ্পেষণে এই কুবের সদৃশ ধনশালী, শক্তিমান ভূস্বামীর বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, বিপুলা পুরী ও সুগভীর পরিখাদি ধ্বংস হইয়া সাধারণতঃ "দে গাঁর ঢীবি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা এক্ষণে বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের মাঝেরগ্রাম নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। দেবগ্রামস্থিত এই পর্ব্বতাকৃতি ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহৃদয় দর্শকমাত্রেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এনামেলের ইট কারুকার্য্যময় প্রস্তরাদি ও প্রাসাদের পরিখা প্রান্তে অবস্থিত চারিটী উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ (যাহার গঠন প্রণালী দেখিলে পূর্ব্বে শত্রু সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যালোচনার নিমিত্ত স্থাপিত বলিয়া অনুমিত হয়) এবং অসংখ্য পুষ্করিণী, বিশেষতঃ, শোকাবহ স্মৃতি বিজড়িত রাজান্তঃপুর সংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ সরোবর স্বতই প্রাণের অন্তস্তলে একটা বিষাদের চিত্র অঙ্কিত করে।[২৩]

রাজা দেবপাল সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। বহু অনুসন্ধানেও আমরা এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই।[২৪] সুকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মানসিংহের আখ্যায়িকার মধ্যে স্বর্গগমনোদ্যত ভবানন্দ মজুমদারের সহিত দেবী অন্নদার কথোপকথনচ্ছলে নবদ্বীপ রাজবংশের যে ভবিষ্যচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন অর্থাৎ বাজপেয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে রাজসভায় বসিয়া ভারতচন্দ্র নদীয়া রাজবংশের যে অতীত কাহিনী দেবীর মুখ হইতে ভবিষ্যৎবাণীরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেব-গ্রামের রাজবংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি পরিদৃষ্ট হয়। ঐ ছত্র কয়েকটী হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে দেবপালবংশ ধ্বংস

হইলে তাঁহাদের বিশাল সম্পত্তি, কি সূত্রে জানি না, ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘবের অধিকারভুক্ত হয়। যথা—

"গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর
রাঘব হইবে নাম রাঘব ে..নর॥
দেগাঁয় আছিল রাজা দেপাল কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন॥"

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্ব মুখে যাইলে কামালপুর নামে একখানি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রাম প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। বহুভট্টাচার্য্য পণ্ডিত এখানে বাস করিতেন; সেজন্য অনেকে এখনও ইহাকে ভট্টাচার্য্য কামালপুরও বলিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ বনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে স্বচ্ছসলিল থলসিয়ার বিল দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এই বিলের নিকট নবাবপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের মধ্যস্থিত ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের অভ্যন্তরে যে মৃত্তিকা প্রোথিত হস্তপরিমিত লিঙ্গমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় উহাই সাধারণতঃ পোড়া মহেশ্বর নামে খ্যাত। ভগ্নাবশেষ মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকাস্তুপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা যে পূর্ব্বে ইষ্টকনির্ম্মিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চত্বর বেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী দেবালয় ছিল তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সেই স্তুপ সকল এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদ সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে।

কথিত আছে এ স্থানের অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে একদা এক লোভী সন্ন্যাসী এই পাষাণময় লিঙ্গমূর্ত্তির মস্তকদেশে একখানি স্পর্শমণি লুকায়িত আছে জানিতে পারিয়া এই শিবমন্দিরে আসিয়া বাস করিতে থাকে। এক দিন ঐ কপটাচারী ভাবিল যদি চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি উত্তপ্ত করা যায়, তবে ঐ মণি মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; কিন্তু পাছে দগ্ধ করিলে লিঙ্গমূর্ত্তি গ্রামবাসীগণকে মন্দির রক্ষার্থে আহ্বান করেন সেই আশঙ্কায় সে এক চাতুরী অবলম্বন করিল। সে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ঐ মন্দিরে সঞ্চয় করিল এবং উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং ঐ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক "কে কোথায় আছ গ্রামবাসি! দেখ পামর সন্ন্যাসী আমায় দগ্ধ করিতেছে" ইত্যাদি আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। গ্রামবাসীগণ প্রথম প্রথম কয়েক রাত্রি ঐ ভয়ঙ্কর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া মন্দিরে আগমন করিয়াছিল; কিন্তু প্রত্যহ সন্ন্যাসীকে এরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করিয়া আর কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ করিত না। এক দিন ঐ সন্ন্যাসী লিঙ্গমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিল তখন লিঙ্গমূর্ত্তি হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রামবাসীগণ

উহা উন্মাদগ্রস্ত সন্ন্যাসীরই কার্য্য বিবেচনায় সে কথা কেহ শুনিয়াও শুনিল না, সন্ন্যাসীর এই পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দিতে কেহই অগ্রসর হইল না। দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বলমণি পাষাণ মূর্ত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে নিপতিত হইল। এতদিনে সন্ন্যাসীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সেই অমূল্য নিধি ঝুলির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দেবগ্রামে উপস্থিত হইল। তখন দেবগ্রামে বহু কুম্ভকারের বাস ছিল। সন্ন্যাসী ঐখানে উপস্থিত হইয়া দেবপাল নামক একজন কুম্ভকারের গৃহে অতিথি হইল এবং ঝুলিটী ঐ কুম্ভকারের কুটীর প্রান্তে ঝুলাইয়া রাখিয়া স্নানার্থে গমন করিল। তখন বর্ষাকাল—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় কুম্ভকারের জীর্ণ চাল হইতে জল পড়িয়া ঐ ঝুলিটী সিক্ত হইতে লাগিল এবং স্পর্শমণি সংস্পর্শে ঐ জলধারা অপূর্ব্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থিত যে কোন ধাতবপদার্থের সংস্পর্শে আসিতে লাগিল তাহাই স্বুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল। এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কুম্ভকার যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং সাগ্রহে সন্ন্যাসীর অসাক্ষাতেই তাহার ঝুলিটী অনুসন্ধান করায় সেই অমূল্যনিধি প্রাপ্ত হইল এবং এক নিভৃত স্থানে উহা লুক্কায়িত রাখিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। সন্ন্যাসী স্নানান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে তাহার এত কষ্টের এত সাধনার ধন অপহৃত হইয়াছে। তখন সে আকুলপ্রাণে দেবপালের শরণাপন্ন হইয়া মণি প্রত্যর্পণের নিমিত্ত সকাতরে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া এক বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া এই বলিয়া পূর্ণাহুতি দিল, "যেন ঐ মহামণিই দেবপালের সর্ব্বনাশের মূল হয়—আর যেন অচিরাৎ সে নির্ব্বংশ হয়—ও সেই গ্রামে যেন কখন কোন কুম্ভকার আসিয়া বাস না করে—করিলে সেও যেন সবংশে নির্ব্বংশ হয়।" দেবপাল সেই স্পর্শমণির গুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশালী হইয়া উঠিলেন এবং নিজ বাসগ্রাম অধিকার করিয়া ইন্দ্রপুরী সদৃশ প্রাসাদ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ এবং সুবৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়া স্বীয় নামে ঐ গ্রামের "দেবগ্রাম" নাম করণ করিলেন। ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র গ্রাম নগরের আকার ধারণ করিল এবং দেবপাল একজন ক্ষমতাশালী ভূম্যাধিকারী হইয়া উঠিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মুসলমানগণকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়—বঙ্গদেশ তখন মুসলমান অধিকৃত, মুসলমানগণের প্রতাপ তখন অপ্রতিহত। বহুদিন শান্তির ক্রোড়ে বিলাস স্রোতে ভাসমান থাকিয়া তাহারা অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি স্ত্রীলোকগণের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। রাজা দেবপাল এই সকল উচ্ছৃঙ্খলতা অমার্জ্জনীয় মনে করিতেন, তাই তিনি কঠোর হস্তে তাঁহার নিজ অধিকারভুক্ত মুসলমানগণের এই সকল অত্যাচার দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তদানীন্তন বঙ্গেশ্বরের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং কয়েকবার কয়েকটী ক্ষুদ্র সংঘর্ষে তিনি মুসলমান সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ নবাব এই রূপে একজন ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার নিকট পরাস্ত হওয়ায় দারুণ হিংসানলে প্রজ্বলিত হইয়া দেবগ্রামের চতুষ্পার্শ্বে বহু সৈন্য সমাবেশ করিলেন। দিল্লীশ্বরের বিনানুমতিতে একজন ভুঁইয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহার

রাজ্য বিধ্বস্ত করিলে পাছে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয় সেই ভয়ে বঙ্গেশ্বর দেবগ্রাম অবরোধ পূর্ব্বক রাজা দেবপালের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া দিল্লী দরবারের দূত প্রেরণ করিলেন এবং দিল্লীশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা দেবপাল ও বঙ্গেশ্বর এই অযথা অত্যাচারের প্রতিবিধান মানসে দিল্লীর খাস দরবারে আরজ করিতে গমন করিলেন। গমন কালে তিনি জয় ও বিজয় নামে দুইটী বর্ত্তবাহ কপোতকে সঙ্গে লইয়া বলিয়া যান যে "যদি এই শ্বেতকায় জয় আমার আসিবার পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করে—তবে সকলে জানিও যে আমি দরবারে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্তু জয়ের পরিবর্ত্তে যদি কৃষ্ণকায় বিজয় প্রত্যাবর্ত্তন করে তবে জানিও আমার নিধন হইয়াছে। তখন সকলে দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্ত হইতে আত্মরক্ষার উপায় করিও" নবাব প্রেরিত দূত ও দেবপাল উভয়ে একই সময়ে দিল্লীশ্বরের সমীপে উপস্থিত হন। দিল্লীশ্বর দেবপালের তেজগর্ব্বব্যঞ্জক বপু, অসীম সাহস, নির্ভীক ভাব ও উদার চরিত্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন ও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বঙ্গেশ্বরকেই মুসলমানগণ কৃত অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে পরামর্শ দিয়া দেবপালকে এক ফরমান দ্বারা মহারাজ উপাধি ভূষিত করিয়া কয়েকখানি পরগণার স্বামীত্ব প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দেন। মহারাজা দেবপাল এইরূপে দিল্লীর দরবারে অপ্রত্যাশিতরূপে সাফল্য ও সম্মান লাভ করিয়া বঙ্গাভিমুখে রওনা হন এবং কপোতবাহী দাসকে শ্বেতকায় জয়কে মুক্ত করিয়া দেবগ্রাম অভিমুখে প্রেরণ করিতে আদেশ করেন। ঐ কপোতবাহী দাস বঙ্গেশ্বরের দূতের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ লইয়া জয়ের স্থলে বিজয়কে মুক্তি প্রদান করে। দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত কপোত শনৈঃ শনৈঃ দেবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা দেবপালের পৌর জনবর্গ সেই অশুভ দর্শন কৃষ্ণকায় কপোতকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং রাজা দেবপালের নিধন নিশ্চয় বুঝিয়া মহিলাগণ দুর্দ্দান্ত মুসলমান হস্ত হইতে আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সকলে অপূর্ব্ব বেশভূষা ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রাসাদ প্রাঙ্গণস্থিত স্বচ্ছসলিলা খিড়কী পুষ্করিণীতে ও সাগর দিঘিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তখন পুরুষগণ কৃপাণ হস্তে গড়ের দ্বার মোচন করিয়া প্রচণ্ড বেগে সেই মুসলমান সৈন্য ব্যূহের মধ্যে পতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্টিমেয় হিন্দু সেনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন মুসলমানগণ বিনা ক্লেশে সেই অরক্ষিত পুরী প্রবেশ করিয়া যেখানে যাহা পাইল অপহরণ ও ধ্বংস করিল। এ দিকে মহারাজা দেবপাল মহোল্লাসে শূন্যে কত অট্টালিকা রচনা করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে মুসলমানগণের বিজয় নিনাদ শুনিয়া ও স্বীয় পুরী তাহাদের অধিকৃত দেখিয়া বজ্রাহতবৎ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মূর্চ্ছান্তে দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন এবং আপনার শরীর রক্ষক সেনা কয়জন ও স্বয়ং কিয়ৎকাল অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শত শত মুসলমান সেনা ধ্বংস পূর্ব্বক আপনিও নিহত হইলেন এইরূপে বঙ্গের আর একটী রত্ন আপনার পূর্ণজ্যোতি বিকীরণ না করিতেই অকালে কালের করাল

গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন এবং এইরূপে সেই দুর্ম্মুখ সন্ন্যাসির দারুন অভিসম্পাত কার্য্যে পরিণত হইল।

এইরূপে বাঙ্গালার ভুঁইয়া রাজাগণ একে একে মোগল শাসনাধীনে আসিলেন বটে কিন্তু রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মুসলমানগণের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক রহিল না। তদানীন্তন ভূস্বামীগণ রাজ্যের সর্ব্ব প্রকার শাসন কার্য্য স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ কেবল নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন ও সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতেন।

এইরূপে নদীয়া সে সময়ে অদৌ মুসলমান শাসনাধীন থাকিলেও উহা প্রত্যক্ষত কৃষ্ণনগরাধিপতিগণের শাসনধীন হইল। মানসিংহকে বাঙ্গালা বিজয়ে সহায়তার পুরষ্কারস্বরূপ ভাবনন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বহু সম্মান ও এক ফরমান দ্বারা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া, মহৎপুর, মারূপদহ, লেপা, মুলতানপুর, কাশীমপুর, বয়েশা, মসুণ্ডা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার স্বামীত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় হইতে নদীয়া, তদ্বংশীয়গণের দ্বারা স্বাধীনভাবে শাসি, হইতে থাকে। ভাবনন্দ বাগোয়ান হইতে মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপনা করেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে মধ্যম পুত্র গোপালকে তাঁহার বিষয়ের অধিকারী করিয়া যান। গোপাল, সাদসাহের নিকট হইতে শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকা প্রভৃতি পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে স্বতন্ত্রভাবে কুশদহ ও উখড়া পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করায় তাঁহাব সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা গোপাল অধিকার করেন। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাঘব মাটিয়ারি হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে এই রেউই ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ খড়িয়া নদীর উপরে শ্যামল বৃক্ষাদি শোভিত মনোরম স্থান ছিল এবং সেই সময়ে এখানে দলে মৃগ ও ময়ূব বিচরণ করিত। অদ্যাপি এই সকল মৃগের দু চারিটী বংশধর কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী আড়বন্দি প্রভৃতি গ্রামের প্রান্তরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন এই স্থানে বহুসংখ্যক গোপ বাস করিত এবং তাহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিল। রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্ররায় এই রেউইয়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণনগর নাম করণ করেন। তাঁহার সময়ে নদীয়া রাজ্য অতি বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করে। তিনি এই সুবিস্তীর্ণ ভূমির রাজস্ব হিসাবে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা মোগল সরকারে কর প্রেরণ করিতেন। কথিত আছে এই সময়ে তদানীন্তন বাদসাহ রেউইতে মৃগাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় শুনিয়া এখানে মৃগয়ায় আসিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজা সসৈন্য বাদসাহের আগমনে দরিদ্র প্রজাগণের উপর অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া বহুমুদ্রা অঙ্গীকার পূর্ব্বক বাদসাহকে নিরস্ত করেন।[২৫]

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত টাবরনিয়ার সাহেব ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আগমন করিয়া উক্ত বৎসর ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নদীয়ায় উপস্থিত হন। তিনি তদানীন্তন নদীয়াকে জনসঙ্কুল বৃহৎ নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায়

গঙ্গার জোয়ার এ সময়ে নদীয়া পর্যান্ত আসিত। কিন্তু এখন উহা কালনা পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে।[২৬]

এই সময়ে সুবিখ্যাত সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নবাব পদে অধিষ্ঠিত। ইহার রাজত্ব-কালে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে জবচর্ণক নামক সাহেব সুতানুটি নামক স্থানে ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুরের একটী কুঠী স্থাপন করেন; সুতানুটী কলিকাতার একটি অংশ, সুতরাং এই সময় হইতে কলিকাতার প্রথম সুত্রপাত বলিতে হইবে কথিত আছে এই সায়েস্তা খাঁর শাসনকালেই টাকায় আট মন চাউল বিক্রয় হইত।

সায়েস্তা খাঁর পরে বঙ্গ মসনদে ইব্রাইম্ খাঁ উপবিষ্ট হয়েন। ইহার সময়ে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভা সিংহ নামে বর্দ্ধমানের একজন জমিদার, বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং রোহিম খাঁ নামক আফগান সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া রাজা কৃষ্ণরামের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তদীয় প্রাসাদ অধিকার করে। বর্দ্ধমান[২৭] রাজকুমার জগৎ রায় পলায়ন পূর্ব্বক নদীয়া রাজ রামকৃষ্ণের শরণ লয়েন। শোভা সিংহ ও রোহিম আর সম্মিলিতশক্তি এই সময়ে হুগলি অধিকার করে, কিন্তু তাহারা ওলন্দাজগণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া সপ্তগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই স্থান হইতে শোভা সিংহ তাহার সৈন্যের অধিকাংশ রোহিম খাঁর অধীনে নদীয়া ও মুরশিদাবাদ অধিকার নিমিত্ত প্রেরণ করেন[২৮] এবং স্বয়ং বর্দ্ধমানাধিপতির কুমারী কন্যার রূপে আকৃষ্ট হইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করে এবং সুরাপানে মত্ত হইয়া রাজকুমারীর ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইলে তেজস্বিনী বর্দ্ধমান রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে কামোন্মত্ত পশুর প্রাণ হনন করেন। তাহার নিধনের পর তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিং তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অধিকার পূর্ব্বক দেশে অরাজকতা আনয়ন করে। এই সময়ে ইংরেজগণ কলিকাতায় মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে "ফোর্ট-উইলিয়ম্" নামকরণ করিয়া তাঁহাদের দুর্গ দৃঢ়তর রূপে স্থাপনা করেন এবং ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় ও ফরাসীরা চন্দননগরে আত্মরক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদানীন্তন বাদসাহ ঔরঙ্গজেব বাঙ্গালায় শান্তিস্থাপনার্থ তাঁহার প্রিয় পৌত্র সাজাদা আজিম ওসানকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এদেশে প্রেরণ করেন। ইনি আসিয়া দেখিলেন যে শোভাসিংহ নিহত হইয়াছে এবং নব নিযুক্ত বঙ্গেশ্বর জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহ অনেক দমন করিয়াছেন সুতরাং নিজে বর্দ্ধমানে থাকিয়া দেশস্থ সমস্ত মভ্যাধিকারীগণের সহিত প্রীতি বিনিময় ও আনন্দোৎসব করিতে থাকেন। এই সময় তদানীন্তন নদীয়াধিপতি রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। বাদসাহজাদা যখন বর্দ্ধমানে থাকিয়া এইরূপে উৎসবাদিতে মগ্ন, সেই সময়ে বিদ্রোহীরা আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া নদীয়া লুণ্ঠন করে।[২৯]

এই সময়ে নদীয়া রাজবংশ কি মুসলমান শাসনকর্ত্তা[৩০] কি য়ুরোপীয় শাসনকর্ত্তা সকলের নিকটে বিশিষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাৎকালিক কলিকাতার ইংরেজ প্রতিনিধি সাহেবের সহিত নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণের বিশেষ প্রণয় স্থাপিত হয়, এমন কি তিনি নদীয়ারাজের শাসন সৌকার্য্যার্থ স্বার্দ্ধ দ্বিসহস্র অস্ত্রনিপুন সৈন্য কৃষ্ণনগরে থাকিতে

অনুজ্ঞা করেন। কথিত আছে কৃষ্ণনগর গোয়াড়ির "পুরাতন কালেক্টরী" বাটীতে ঐ সকল সৈনিকের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং ঐ বাটী উক্ত কারণেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বাদসাহজাদা আজিম ওসান নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, দেওয়ান জাফর খাঁর তাহা ভাল লাগিত না। রামকৃষ্ণের উপর তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ভাব ছিল কিন্তু তখন তিনি দেওয়ান মাত্র, কাজেই রামকৃষ্ণের কোনও অনিষ্ট করিতে সাহসী হন নাই। জাফর খাঁ, মুরসিদ কুলী খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঙ্গালার শাসন কার্য্য গ্রহণ করিলেন তখন রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব বিদ্বেষ জাগরিত হইয়া উঠিল এবং রাজস্ব অনাদায় বাপদেশে কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজধানীস্থ 'বৈকুণ্ঠে' (কারাগারে) প্রেরণ করিলেন। বাঁসবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় একথা শুনিতে পাইয়া আপনি তাঁহার সমুদায় দেনা শোধ করিয়া তাঁহাকে নরক মুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্যতায় মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে "শূদ্রমনি" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তাহাতেও রামকৃষ্ণের পাপগ্রহ কাটিল না। অল্প দিন পরে পুনরায় রাজস্ব বাকী পড়ায় নবাব তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া রাজস্ব পরিশোধের নিমিত্ত। একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনের ভিতর টাকা না আসিলে তাঁহার জাতি নাসের ভয় প্রদর্শন করেন। একদিন দুইদিন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল কিন্তু এবারে রামকৃষ্ণের টাকা আসিয়া পৌঁছিল না। ওদিকে অন্যতম কারারুদ্ধ সমুদ্রগড়ের রাজার টাকা আসিল। সমুদ্রগড়ের উদার হৃদয় রাজা, রঘুদেবের মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার সমস্ত অর্থ রাজা রামকৃষ্ণের নামে জমা দিলেন। রঘুদেব যে কার্য্যের জন্য "শূদ্রমনি" উপাধিতে ভূষিত হইলেন সেই কার্য্যের জন্যই সমুদ্রগড়ের রাজার ভাগ্যে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইল। তিনি স্বীয় রাজস্ব দিতে না পারায় নবাবের আদেশে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।[৩১] যদিও সদাশয় সমুদ্রগড়াধিপতির মহত্ত্বে সে যাত্রায়ও রাজা রামকৃষ্ণের নিষ্কৃতিলাভ হইয়াছিল কিন্তু 'বৈকুণ্ঠের' দারুণ কষ্টে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন।

মুরসিদকুলির রাজত্বকালে আর একটী ঘটনার সহিত নদীয়ার সম্পর্ক দেখা যায়। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে মহাপ্রভু প্রদর্শিত বৈষ্ণবধর্ম্মই দেশ বিদেশ চর্চ্চিত ও বহুলরূপে আচরিত হইতেছিল। জয়পুর রাজের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য নামীয় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আপনার অসাধারণ বিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্তগণের আচরিত পরকীয়া মতে দোষরোপ করিয়া স্বকীয়াভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকল্পে জয়পুর ও বৃন্দাবনবাসী বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের সহিত বিচারার্থী হয়েন। বিচারে পরাস্ত হইয়া পণ্ডিতগণ স্বকীয়ামতের আনুকুল্যে দিগ্বিজয়ীর জয়পত্র স্বাক্ষরিত করেন কিন্তু তৎকালীন জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দিগ্বিজয়ীকে বঙ্গের পরকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণব কুলের সহিত বিচার করিয়া স্বকীয়া বা পরকীয়া-ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবকুলও স্বকীয়ায় দস্তখত করিতে বাধ্য হন এবং বঙ্গের বহুস্থানেও দিগ্বিজয়ীর জয় হয়;

কিন্তু পরিশেষে শ্রীধাম নবদ্বীপে এবং শ্রীখণ্ড ও জাজিগ্রাম প্রভৃতি বৈষ্ণবপ্রধান স্থানে আসিয়া ঐরূপ দাবী করিলে উক্ত স্থানসমূহের, বিশেষতঃ নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া দিগ্বিজয়ীর প্রাধান্য স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায়, তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর নবাব জাফর খাঁর আনুকূল্যে এক বিরাট সভা আহূত হইয়া এ সম্বন্ধে বিচার হয়। এই সভায় নদীয়ান্তর্গত চাকড়ী (চাখন্দী) গ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের বংশধর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুরের সহিত বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইয়া স্বকীয়া ভাবাপেক্ষা পরকীয়ার প্রাধান্য স্বীকার ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে দলিলের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষরকারী গোস্বামীগণের মধ্যে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্দ্ধমান, কাটোয়া, কানাইডাঙ্গা প্রভৃতির গোস্বামীগণের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী; অতএব বিচারে যে ধর্ম্ম স্থায়ী হয় তাহাই লইব। এই মত কড়ার হইল, বিচার মানিলাম—তাহাতে পাতসাহী সুভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল—তিঁহো কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিণা তজ বিজ হয় না—অতএব বিচার কবুল করিলেন। সেই মত সভাসদ্ হইল—শ্রীপাটনবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য তৈলঙ্গ দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যালঙ্কার, সেনারগ্রামের শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য—সাঃ মতুলা।[৩২]"

এই সময়ে অর্থাৎ মুরশিদ কুলিখাঁর নবাবী প্রাপ্তির ১৫ বৎসর পরে নদীয়ার উত্তর সীমা "বাঙ্গালীবাহাদুর" সীতারাম রায় ও নবাবী ফৌজের সঙ্ঘর্ষে শান্তিহীন হইয়াছিল। সীতারাম নদীয়া সন্নিহিত পরগণা মামুদাবাদে রহিয়া নবাবী ফৌজকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে ধৃত হইয়া মুরশিদ কর্ত্তৃক নৃশংস ভাবে সপরিবারে নিহত হয়েন ও তদীয় জমীদারী মুরশিদের আদেশে নদীয়ারাজ রামজীবনকে প্রদত্ত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা রামকৃষ্ণ মুসলমানের অকথ্য পীড়নে কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পুত্রাদি না থাকায় নদীয়া সিংহাসন কাহাকে বর্ত্তিবে এই লইয়া সে সময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং রাজা রামকৃষ্ণের পরম সুহৃত সাজাদা আজিম ওসান তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে আন্তরিক ব্যথিত হইয়া জাফর খাঁর প্রতি এক পরোয়ানা জারি করেন এবং রামকৃষ্ণের যাবতীয় সম্পত্তি ও নদীয়ার রাজ্য তাঁহার পুত্র বা পৌত্র অভাবে দত্তক পুত্র বা তদ্বৎ সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে দান করিতে অনুজ্ঞা করেন। জাফর রামকৃষ্ণের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিলেও এক্ষণে সাজদা আজিম ওসানের আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে সাহসী না হইয়া লিখিলেন যে রামকৃষ্ণের পুত্রাদি বা উত্তরাধিকারী কেহই বিদ্যমান নাই, তাহাতে সাজদা নদীয়া রাজ্য, রামকৃষ্ণের স্ত্রী ও আত্মীয়গণের সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম এরূপ কোন বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারীকে দান করিতে বলেন। এতদুত্তরে জাফর খাঁ পুনরায় লিখিলেন যে রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন যিনি বহুদিন যাবৎ ঢাকায় বন্দী অবস্থায় আছেন অনুমতি হইলে তাঁহাকে নদীয়া রাজ্য প্রদান করা যায়। সাজাদা আজিম ওসান জাফরের এই প্রস্তাবে সম্মত হন। এইরূপে রামজীবন তাঁহার

মুক্তির নিমিত্ত জাফর খাঁকে বহু অর্থ অঙ্গীকার করিয়া নদীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু যথাসময়ে তাঁহার মুক্তির মূল্য পরিশোধ করিতে না পারায় পুনরায় জাফর খাঁ কর্ত্তৃক নবরাজধানী মুরসিদাবাদে কারাবদ্ধ হয়। এই সময়ে আলি মহম্মদ ও কালু জমাদার নামক দুইজন মুসলমান সেনানীর সহায়তায় রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ, বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গেশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং বীরকাটি[৩৩] নারায়ণগড়, দেবীনগর প্রভৃতি স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। মুরসিদকুলী খাঁ তাঁহার দমনের নিমিত্ত লহুরীমল্ল প্রমুখ সেনাপতিগণকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি রামজীবনের পুত্র অসীম বলশালী যুবরাজ রঘুরাম স্বইচ্ছায় লহুরীমল্লের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় স্বীয় বাহুবল প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন। কথিত আছে তাঁহারই অমোঘ সন্ধানে আলিমহম্মদ নিহত হইলে পরিণাম চিন্তা করিয়া বিদ্রোহী রাজা উদয়-নারায়ণ সপরিবারে দেবীনগরের নিকটবর্ত্তী হ্রদে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন। এইরূপে বিদ্রোহ দমিত হইলে নবাব মুরসিদকুলী বিস্তীর্ণ রাজসাহী জমীদারী তাঁহার প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে প্রদান করেন। রঘুনন্দন তদানীন্তন বঙ্গের সদর কাননগু দর্পনারায়ণের কর্ম্মচারী ছিলেন।[৩৪] এই রঘুনন্দন নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুরসিদ নদীয়া রাজকুমার রঘুরামের কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার পিতা রামজীবনের কারামোচন করেন। পরে পিতার মৃত্যু হইলে রঘুরাম ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১৬৫০ শকে বা ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী-তীরে প্রাণত্যাগ করেন এবং তৎপুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই রাজার অধিকারকালে নদীয়া সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে নদীয়া রাজ্যের বিস্তৃতি উত্তরে মুরসিদাবাদ হইতে দক্ষিণে সুদূর বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ব্বে ধুলিয়াপুর হইতে পশ্চিমে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।[৩৫] এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিতে ন্যূনাধিক দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত হইত এবং ইহার আয় পঞ্চবিংশতি লক্ষ মুদ্রারও উপর ছিল।[৩৬] সমগ্র অধিকার মোট ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল; এই সকল পরগণা বিভিন্ন জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল এবং দেশের সর্ব্ববিধ বিচার কার্য্যই এই সকল জমিদারগণ কর্ত্তৃক সমাহিত হইত। মহারাজা স্বয়ং হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান কাজীর সাহায্যে ন্যায়ানুমোদিত বিচার সাধন করিতেন। মহারাজের অধীনে বদীরুদ্দিন নামক জনৈক কাজী ছিলেন। কথিত আছে এই কাজীর মাতৃবিয়োগ হইলে মাতার প্রেতকার্য্য সমাধানার্থে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত অবকাস প্রার্থনা করিলে মহারাজা তাঁহাকে বিদায় দিয়া তাঁহার মাতৃকার্য্যে গোহত্যা করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহার স্থলে ছাগ ও মহিষ বধে অনুজ্ঞা দেন। কাজী স্বীকৃত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করত মহিষান্বেষণে বহু লোক নিযুক্ত করেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে মহিষ আসিয়া না পৌঁছানয় তাহার আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় গোহত্যা করিতে বাধ্য হন। মহারাজ, স্বীয় অধিকার মধ্যে আপনার ভৃত্য কর্ত্তৃক এরূপে গো-হত্যা কাহিনী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ কাজীর মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ও তাহার আবাস লুণ্ঠনে আদেশ দেন। রাজসভায় রাজার জমাদার জাফর খাঁ—কাজীর বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজার আদেশ

শ্রবণমাত্র গোপনে কাজীকে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগে পরামর্শ পাঠাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়ায়, রাজভৃত্যগণ যখন কাজীর আবাস লুণ্ঠন করিতে আসিল, তখন সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধানেও কাজীর সন্ধান না পাইয়া তাহার শূন্য আবাস দগ্ধ করিয়া তাহারা রাজ-সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাজী ইতিমধ্যে বসিরহাটে কুটুম্বগৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে থাকেন এবং গোপনে জমাদার জাফর খাঁকে[৩৭] রাজসন্নিধানে উপযুক্ত অবসরে তাহার পক্ষে ওকালতি করিয়া রাজার ক্রোধোপনোদনে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। মহারাজা সর্ব্বদা ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান কাজী বিহনে মুসলমানদের বিচারে সর্ব্বদাই মহারাজের সন্দেহ হইতে লাগিল। এক দিন এবম্বিধ সন্দেহাকুলিত চিত্তে যখন উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাঁহার প্রিয় জমাদার সুযোগ বুঝিয়া কাজীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তাহাতে মহারাজ সে যাত্রা কাজীকে ক্ষমা করেন বটে কিন্তু তাঁহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করায় কাজীর উপযুক্ত পুত্রকে ঐ কার্য্যে মনোনীত করিয়া তাহাদের সন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন। জমীদার পূর্ব্বে হইতেই তাহাদের সন্ধান অবগত ছিলেন এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অবিলম্বে তাহাদের এই শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন ও তাহাদের দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ পাঠাইলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক গগণ ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন হয়। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুরসিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী প্রাপ্ত হন। ইহার সময়ে চারি জন ব্যক্তি রাজামধ্যে প্রধানরূপে গণ্য হন ও তাঁহাদের পরামর্শানুসারে সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। প্রথম আলম চাঁদ—ইনি হিন্দু এবং নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া পরে "রাইরাঁইয়া" অর্থাৎ রাজাদের মধ্যে রাজা—এই পদবী ভূষিত হন। দ্বিতীয় ফতেচাঁদ—যিনি বাদসাহ কর্ত্তৃক জগৎ শেঠ উপাধী মণ্ডিত হন।[৩৮] তৃতীয় হাজি আহম্মদ—সুজার প্রধান মন্ত্রী ও চতুর্থ হাজি আহম্মদের সহোদর ভ্রাতা আলবর্দ্দী যিনি আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সুজা এই সকল উপযুক্ত সহকারীর সাহায্যে সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে (১৩ জেলহজ্জ ১১৫১ হিঃ) পরলোকে গমন করিলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হন। সরফরাজ বাল্যকাল হইতে উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠেন এবং পিতৃবন্ধু রাইরাঁয়ান আলমচাঁদ, মন্ত্রী হাজি আহম্মদ ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে সর্ব্বদা তাচ্ছিল্য করিতে থাকেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাদের অপমানিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। রাজ্যস্থ ক্ষমতাবান ব্যক্তি চতুষ্টয়ের সহিত সংঘর্ষ তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে এবং জগৎ শেঠের প্রতি নিদারুণ পাশব ব্যবহার তাঁহার উচ্ছেদের কাল অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেয়। কথিত আছে সরফরাজ এই সময় এতই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন যে জগৎ শেঠের ন্যায় একজন ক্ষমতাবান ধনীর অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।[৩৯] বৃদ্ধ জগৎ শেঠ তাঁহার পৌত্র মহাতাপ রায়ের সহিত একটী কিঞ্চিন্ন্যূন একাদশ বর্ষীয়া অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা প্রবাদের ন্যায় তৎকালে

প্রচারিত হয়। নরপশু সরফরাজ এই লাবণ্যময়ী, সকল সৌন্দর্য্যের ললামভূত কন্যার কথা লোক-মুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একবার দর্শনের নিমিত্ত আকুল হৃদয়ে বৃদ্ধ জগত শেঠের শরণাপন্ন হন। এই নিদারুণ বাক্যে বৃদ্ধের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাঁহার বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার পূর্ব্বেই পাপিষ্ঠ সরফরাজ জগৎ শেঠের বাটী অবরোধ পূর্ব্বক সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই কন্যাকে প্রাসাদে আনয়ন করেন এবং দর্শন-পিপাসা মিটাইয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রেরণ করেন।[৪০]

কেহ কেহ অনুমান করেন জগৎ শেঠের সহিত অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াই সরফরাজের মনান্তর হয়। যে কারণেই হউক রাজ্যপ্রাপ্তির ৫ বৎসরের মধ্যে সরফরাজ, আহম্মদ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের কোপনয়নে পতিত হন। হাজি আহম্মদ রাজমহলের ফৌজদার পরে পাটনার নবাব স্বীয় ভ্রাতা আলীবর্দ্দীকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজের প্রতি সরফরাজের তাচ্ছিল্য ভাবের প্রতিশোধ গ্রহণে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে জগৎ শেঠের সাহায্য পাইয়া কৌশলে দিল্লী হইতে আলিবর্দ্দীর নামে বাঙ্গালার সুবেদারির সনন্দ বাহির করিয়া লন, এবং গোপনে আলিবর্দ্দীকে সসৈন্য মুরসিদাবাদ আক্রমণে উপদেশ প্রেরণ করেন। পথে গিরিয়া নামক স্থানে নবাব সৈন্যের সহিত আলীবর্দ্দীর বল পরীক্ষা হয় এবং এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে অলিবর্দ্দী আপনাকে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজধানী অধিকৃত হইলেও সমগ্র দেশ তাঁহাকে প্রথমে সুবেদার বলিয়া স্বীকার করে নাই এ কারণে তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের পর দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে না হইতেই, নাগপুর হইতে মারহাট্টারা আসিয়া বার বার পশ্চিম বঙ্গ লুট পাট করিতে থাকে। এই ঘটনার নাম বর্গীর হাঙ্গামা।[৪১] এই হাঙ্গামা দেশে দশ বৎসর ছিল। এই সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা সপরিবারে পলায়ন করিয়া তদানীন্তন নদীয়া অন্তর্গত মূলাজোড়ের সন্নিহিত কাউগাছি গ্রাম গড়খাই করিয়া তন্মধ্যে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। কিন্তু নদীয়াও এ সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে নির্ব্বিঘ্ন হইবার মানসে শিবনিবাসকে কঙ্কনাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া সুদৃঢ় দুর্গ ও বাসস্থানাদি নির্ম্মাণ করেন, এবং সন্নিহিত কৃষ্ণপুরে অসংখ্য লাঠি সড়কী ক্রীড়া পারদর্শী গোপগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন।[৪২] বর্গীর বিভ্রাটে নদীয়ার ভাগীরথীকুল যেমন ধ্বংস হইয়াছিল তেমনি নবাবের রাজস্ব আদায়ের অযথা অত্যাচারে সমগ্র নদীয়ার প্রজাকুল উদ্বাস্ত হইতে বসিয়াছিল। বর্গীর বিভ্রাটে পশ্চিম বঙ্গের জমিদারকুল, বর্গীর আক্রমণে অত্যধিক পীড়িত হওয়ায় পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জমিদারগণের নিকট হইতে অসম্ভব রাজস্ব আদায় হইতেছিল এবং নদীয়া, রাজসাহী দিনাজপুর প্রভৃতির রাজাগণের নিকট যুদ্ধের ও রাজ্য রক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত সবিশেষ উৎপীড়ন চলিতেছিল। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র পৈত্রিক ঋণ দশলক্ষ মুদ্রা নিজ নজরানা না দিতে পারায় তৎকাল প্রচলিত নিয়মে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন।[৪৩] এখান হইতে তিনি সে

সময়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন কিন্তু শীঘ্রই স্বীয় দক্ষ দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের কর্ম্ম-কুশলতায় নজরানার টাকা পরিশোধ করিয়া মুক্ত হন। মারহাট্টা বিভ্রাট শেষ হইলে পুনরায় রাজস্ব বাকী দায়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। এবার নবাব আলিবর্দ্দী স্বচক্ষে তাঁহার জমীদারীর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন। কথিত আছে চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে জলবিহারী নবাবকে নদীয়ার জলমগ্ন ভূভাগ সকল বিশেষতঃ নবদ্বীপের বংশাচ্ছাদিত জলাভূমির ও কলিকাতা সন্নিহিত বাদার জলময় স্থান সকলের দুরবস্থা দেখাইয়া সে-যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত দেওয়ান রঘুনন্দন সম্বন্ধেও বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে কোন সময়ে মুরসিদাবাদ দরবার গৃহে প্রবেশ কালে সভাপ্রবেশের পথ অতি সঙ্কীর্ণ বিধায় নদীয়ারাজের দেওয়ানের পরিচ্ছদের প্রান্ত-দেশ বর্দ্ধমানাধিপতির দেওয়ান মানিকচাঁদের অঙ্গস্পর্শ করায় ক্রুদ্ধ হইয়া মানিকচাঁদ, রঘুনন্দনকে হিন্দি ভাষায় "দেখতে নেহি পাজী বলায় তেজস্বী রঘুনন্দন "হাঁ নওকর সবহি পাজী হৈ—কোই ছোট্টা কোই বড়া"—এই সমুচিত উত্তর প্রদান করেন। সেই অবধি মাণিকচাঁদ রঘুনন্দনের ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া দাঁড়ান এবং পরে বুদ্ধিবলে বর্দ্ধমান রাজসংসার হইতে মুরসিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া রঘুনন্দনের সর্ব্বনাশ করিবার পন্থা খুঁজিতে থাকেন। এই সময়ে হুগলী হইতে কয়েক লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব হিসাবে মুরসিদাবাদ সরকারে প্রেরিত হয়, কিন্তু পথে নদীয়ান্তর্গত পলাশীতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক উহা অপহৃত হইলে বহু অনুসন্ধানেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মচারীগণ উহার উদ্ধার সাধন করিতে না পারায় রঘুনন্দনের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া মাণিকচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে রঘুনন্দনকে প্রথমে গর্দ্দভ পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করাইয়া পরে তোপমুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসী দেওয়ানের এই বীভৎস পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়া রঘুনন্দনের বংশাবলীকে পলাসী পরগণায় চৌদ্দ শত বিঘা মহোত্রাণ জমি প্রদান করেন। অদ্যাপি তাঁহারা উহা ভোগ করিতেছেন।

বর্গীদিগের দ্বারা ক্রমাগত দশ বৎসর কাল যাবৎ দেশ এইরূপ পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইতে থাকে, এবং অমিততেজা বৃদ্ধ নবাব অলিবর্দ্দী বার বার তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেও প্রায়শঃ প্রতিবৎসর বর্ষাগমে সুযোগ পাইলে তাহারা দর্শন দিতে থাকে। ইদানীং তাহারা আর সমবেত হইয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিত না; সুতরাং তাহাদিগকে আশু দমন করার কোন আশা না দেখিয়া রাজনীতিজ্ঞ বৃদ্ধ নবাব ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনা করেন। এই সন্ধির ফলে বর্গীয়া উড়িষ্যার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও বাঙ্গলার চৌথ অর্থাৎ বার্ষিক রাজস্বের এক চতুর্থাংশ বাবদ দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে চিরদিনের জন্য বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই দীর্ঘকালব্যাপী বর্গীর হাঙ্গামার ফলে দেশে দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছিল—শস্যাদির অবস্থা শোচনীয় দাঁড়াইয়াছিল এবং বস্ত্র বয়নাদি সূক্ষ্ম শিল্পেরও সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, তন্তুবায়গণ যুদ্ধের অবকাশ কালে যে কিছু বস্ত্রাদি বয়ন করিত তাহাও আশঙ্কা ও ব্যগ্রতা প্রযুক্ত তত উৎকৃষ্ট হইত না।[৪৪] এইরূপে এই সময় হইতেই শান্তিপুর প্রভৃতির বস্ত্রাদির বয়ন ব্যবসায়ে দুরবস্থার সূত্রপাত হয়।

ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ নবাবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি তখন তাঁহার আদরের দুলাল, স্নেহের পুতুল দৌহিত্র সিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দুরদর্শী বৃদ্ধ নবাব ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, নবীন নবাব নানাকারণে তৎকালিন রাজ্যস্থ বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত ও তাঁহার কতিপয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সদ্ভাব রাখিতে সক্ষম হয়েন নাই; সুতরাং তাঁহাদের সকলেরই তাঁহার প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল, এবং কিসে তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় সকলেই তাহার পন্থা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইঁহাদের দুই চারিজন একত্র হইলেই এ বিষয়ের গোপন পরামর্শ চলিতেছিল, এক্ষণে দৈবক্রমে তাঁহাদের মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়ার এক সুযোগ উপস্থিত হইল। ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দেওয়া উপলক্ষে ও অন্যান্য নানাকারণে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত নবীন নবাবের বিবাদ বাধিয়া উঠিল।[৪৫] এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীগণ ইংরাজগণের সহায়তায় নবাবকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে সিংহাসন দেওয়াইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে জগৎ-শেঠের মুরশিদাবাদ ভবনে এই গোপন সভার অধিবেশন হয়। প্রবাদ এই সময়ে নদীয়া-ধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরিজন ও ভৃত্যবর্গ লইয়া শিবনিবাসে বাস করিতেছিলেন। নবাব সিরাজের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্র (দুর্লভ রাম), রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নদীয়াধিপতিকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া সৎপরামর্শ দিবার জন্য এক পত্রিকা প্রেরণ করিয়া মুরশিদাবাদে আহ্বান করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পত্রিকার্থে অবগত হইয়া এককালে হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পত্রে নবাবকে পদচ্যুত করিবার কথা লেখা ছিল। রাজা সেইদিন নিশীথ সময়ে এক নিভৃত স্থানে স্বীয় মন্ত্রী কালিপ্রসাদ সিংহ ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া পত্রপাঠ পূর্ব্বক তাঁহাদের পরামর্শ চাহিলেন। পত্রার্থ এইরূপ ;—"নবাবের অত্যাচারে মুরশিদাবাদের লোক সকল স্ব স্ব ঘরদ্বার ত্যাগ করিয়া পলাইতে উদ্যত। নবাব কাহারও কোন কথা শুনেন না। এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আপনি শীঘ্র আসিবেন।" সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের আহ্বানে, প্রথমে স্বয়ং না যাইয়া নিজ বিশ্বস্ত দেওয়ান কালীপ্রসাদকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইবার জন্য মুরশিদাবাদে প্রেরণ করেন। পরে, তাঁহার বাচনিক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং মুরশিদাবাদ যাত্রা করেন। পুনর্ব্বার জগৎশেঠের বাটীতে মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কেহ কেহ মুসলমানের পরিবর্ত্তে হিন্দু শাসকের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাতে দুরদর্শী বিচক্ষণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর করেন, "আমার মতে সেনাপতিকে সহায় করিয়া নববলদৃপ্ত ইংরাজগণের সহিত যোগ দিয়া বর্ত্তমান নবাবকে পদচ্যুত করা সহজসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ ইংরাজগণের সহিত আমার সদ্ভাব আছে, সুতরাং এ বিষয়ে আমি

বিশেষ চেষ্টা করিতে পারিব।" পরিশেষে কথঞ্চিৎ বাকবিতণ্ডার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কোন কাগজপত্রে প্রকাশ না থাকিলেও ইহা বাঙ্গলার জনসাধারণের বিশ্বাস যে স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীঘাটে মায়ের পূজা দিবার ছলে কলিকাতায় গমনপূর্ব্বক ইংরাজদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। এইরূপে নবাবের নৃশংস হস্ত হইতে অসহায় প্রজাবর্গের নিষ্কৃতি লাভ ও বাঙ্গালার কল্যানকর ইংরাজাধিকার বিস্তার এই উভয় ঘটনাই নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরিণামদর্শীতার ফল বলিতে হইবে।

এইরূপে উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ হইলে ইংরাজগণ সেনাপতি মীরজাফরের আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া কিঞ্চিন্ন্যূন তিন সহস্র মাত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পলাশীস্থ সিরাজের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই সৈন্যদলের অধিকাংশ নদীয়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল ইহাদের নাম ছিল লাল পল্টন। ২২শে জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সমগ্র বৃটিশবাহিনী পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইল, এবং গভীর নিশীথে ভাগীরথী তীরস্থ বিশাল আম্রকুঞ্জে আশ্রয় করিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিল।[৪৬] এই আম্রকানন তখন "লক্ষাবাগ" নামে অভিহিত হইত, কথিত আছে এই বাগানে লক্ষ্য আম্রবৃক্ষ থাকাতেই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল—কেহ কেহ বলেন ঐ স্থানে বহু শত পলাশ বৃক্ষ থাকায় ঐ স্থানের নাম পলাশী হইয়াছিল। নবাব চালিত নবাব সৈন্যগণ মুরশিদাবাদ হইতে মানকরা তৎপরে দাদপুর পরিশেষে পলাশী ক্ষেত্রে ইংরাজেরা আসিবার দ্বাদশ ঘণ্টা অগ্রে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। নবাব পক্ষে ৩৫ হাজার পদাতিক, পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী ও ৪০টী কামান ছিল। কিন্তু হইলে কি হয় এই বিপুলবাহিনীর অধিকাংশই ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফর ইয়ারলুৎফ ও দুর্লভরামের অধীনে চালিত হইতেছিল। ২৩শে জুন বৃহস্পতি-বার প্রাতঃকালে এই অগণিত নবাব বাহিনী ইংরাজের সৈন্যগণের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। বিপর্য্যয় চক্রব্যূহ, বিশাল কায় বিচিত্র গতি রণহস্তী, রণকুশল সুসজ্জিত বিপুল অশ্বসেনা, ভীমকায় সুদক্ষ পদাতিক ও তাহাদের হস্তস্থিত বালার্ক কিরণ প্রতিভাত করাল করবাল, কঠিন গিরিভেদী দুর্জ্জয় কামান ও প্রভাত সমীরে উড্ডীয়মান অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত যবনের জয়পতাকা ও রথধ্বজ সমূহ মুষ্টিমেয় ইংরাজ দলের হৃদকম্প উপস্থিত করিল। অমিততেজা অসমসাহসী দলপতির মনেও ত্রাসের সঞ্চার হইল। মনে হইল যদি মীরজাফর প্রমুখ নবাবের সেনাপতিবর্গ দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতই যুদ্ধে অগ্রসর হয়—যদি তাহাদের আশ্বাসবাক্য যবনের চক্রান্তমাত্রই হয়, তবেত একটী প্রাণীও সংবাদ দিতে ফিরিবে না। তাহাদের আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইংরাজ এতদুর অগ্রসর হইয়াছে; এখন হয় যুদ্ধ নয় কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন ব্যতীত উপায়ান্তর না দেখিয়া সাহসী সেনাপতি ক্লাইব সৈন্যসমাবেশে মন দিলেন এবং আক্রমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় ফরাসীগণই প্রথম কামান দাগিল। অতঃপর নবাবসৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বর্ষার বারি বরিষণের ন্যায় অজস্র গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী সেদিন ইংরাজ বাহাদুরের প্রতি অনুকুল, সুতরাং অধিকাংশ গোলাই হয় উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত

হইয়া ইংরাজের পশ্চাতে পড়িতে লাগিল বা আম্রবৃক্ষে লাগিয়া বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। ক্বচিৎ ২।৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল; কিন্তু এই স্বল্প মৃত্যু সংখ্যাই ইংরাজ বাহাদুরের সংখ্যা হিসাবে অতি ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদনের পদদ্বয় গোলা লাগিয়া উড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে নবাব শিবিরে আনয়ন করা হইল; তথায় প্রভুর সাক্ষাতে অন্যান্য সেনাপতির দুরভিসন্ধির কথা বলিতে না বলিতে তিনি স্বর্গগত হইলেন। এতদিনে নবাবও তাঁহার সেনাপতিগণের দুরভিসন্ধি বেশ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদের হস্তেই আত্মসমর্পণ করিলেন এবং মীরজাফরকে স্বীয় পট্টাবাসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর এতক্ষণ স্থিরভাবে সসৈন্যে যুদ্ধক্রীড়া পরিদর্শন করিতেছিলেন; এক্ষণে মীরমদনের মৃত্যুর পর বাঙ্গালী বীর মোহনলালকে অমিত বিক্রমে শত্রুসৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইংরাজের প্রমাদ গণিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। নবাবের আহ্বানে স্বীয় প্রাণের আশঙ্কায় মীরজাফর, পুত্র মীরণ ও হোসেন খাঁ প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরবর্গ সমভিব্যহারে সসস্ত্র নবাব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কথিত আছে সিরাজ তখন আপনার ও প্রিয় জনের প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্বর্গগত নবাব আলীবর্দ্দির পুণ্য নাম স্মরণ করতঃ মীরজাফরের সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া স্বীয় সম্মান ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মূঢ়ের মন তখন রাজ্যলালসায় মত্ত—সে বধির কর্ণে সিরাজের কাতরোক্তি নিবেদন আদৌ প্রবেশ লাভ করিল না। বরং এতাবৎ যে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল তাহা সুসাধনের উপায় দেখিয়া, মীরজাফর নবাবকে সে দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার এই কপট বিজ্ঞতায় সরল প্রকৃতি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নবাব প্রতারিত হইলেন এবং মোহনলালকে ও ফরাসী গোলন্দাজগণকে সে দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুমতি পাঠাইলেন। মোহনলাল প্রতিমুহূর্ত্তেই বিজয়ের আশা করিতেছিলেন সুতরাং সে সময়ের প্রত্যাগমনের সময় নহে বলিয়া নবাবের নিকট যুদ্ধ চালাইবার অনুমতি চাহিয়া পাঠান কিন্তু মীরজাফরের চক্রান্তে পুনরায় যুদ্ধ করিতে নিষেধাজ্ঞা পাইয়া অগত্যা অনিচ্ছা-স্বত্ত্বে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সেনাপতির প্রত্যাবর্ত্তনে সৈন্যগণ ভয়াকুল হইল। ওদিকে চক্রান্তকারীগণের সৈন্যদের পলায়নপর দেখিয়া তাহারা আরও নিরুৎসাহ হইয়া রণে ভঙ্গ দিল।

নবাব সৈন্যগণকে এইরূপ পলায়নপর দেখিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবার মানসে ইংরাজদলের মেজর কীলপ্যাটরিক আম্রকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিয়া সেনা-পতির আজ্ঞা চাহিয়া পাঠান। ক্লাইব এই সময়ে নবাবের মৃগয়াকুঞ্জে ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া সোৎসাহে সানন্দে তিনি বাহিরে আসিলেন। এদিকে নবাব-শিবির হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই মীরজাফর ক্লাইবকে তৎক্ষণাৎ নবাব-শিবির আক্রমণের পরামর্শ দিলেন, এবং অন্যতম বিশ্বাসঘাতক রাজা দুর্লভরাম সিরাজকে রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনের পরামর্শ প্রদান করিলেন এইরূপে সেই দিন পলাশী ক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগ্যরবি চির-তরে অস্তমিত হইল। এদিন নদীয়ায় আর একটি স্মরণীয় দিন।

বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকমাত্রেই হতভাগ্য সিরাজের পরিণাম অবগত আছেন—পালায়নপর সিরাজ কিরূপে মীরজাফর পুত্র মীরণ কর্তৃক ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই জাফরগঞ্জের প্রাসাদে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই নিদারুণ বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতিত হইলে, ক্লাইব মীরজাফরকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন।

এই সময়ের ইংরাজ কোম্পানীর দপ্তর অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—যে তদানীন্তন নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক মান্যবান ইংরাজগণ কর্তৃক অতীব সম্মানিত হইতেন কিন্তু সেই সময়ে যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারায় কোম্পানীর কোন কোন কর্মচারীর নিকট তিনি বিশেষ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।[৪৭]

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ২০ আগষ্ট তারিখের গবর্ণমেন্টের মন্তব্যে দেখা যায় যে তদানীন্তন নদীয়ার রাজস্ব ৯ লক্ষ মুদ্রা ধার্য্য ছিল। এই ৯ লক্ষ মুদ্রার মধ্যে ৬৪,৩৪৮ টাকা কোম্পানীর রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়াও ৮,৩৬,৯৫২ টাকা নদীয়া রাজাকে মুসলমান সরকারে রাজস্ব দিতে হইত। নদীয়া পূর্ব্ব হইতেই মীরজাফরের অঙ্গীকৃত তনখারনিমিত্ত ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুরের নিকট বন্ধক থাকায় শেষোক্ত খাজনাও ইংরাজ কোম্পানীকে দিতে হইত। সে সময়ে রাজ্যের অভ্যন্তরিক গোলযোগের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে যথাসময়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। সেকারণ তিনি ক্রমাগত নানা ওজর করিয়া মালগুজারি দিতে বিলম্ব করিতে থাকেন। সুতরাং কোম্পানীর প্রাপ্য আদায় করিবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রাহকগণ নদীয়া রাজ্য নদীয়াধিপতির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া শোভাবাজারের স্বনামখ্যাত রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ রাজা নবকিশন বাহাদুর প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির সহিত তিন বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দবস্ত করেন;[৪৮] কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং রিচার্ড বিচি সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী সদাশয় কোম্পানী বাহাদুর বাঙ্গালার এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশের মর্য্যাদা হানি না করিয়া পুনরায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত নদীয়ার মালগুজারি বন্দবস্ত করেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও বাকী রাজস্ব কিস্তীবন্দী অনুযায়ী বিনা ওজরে কোম্পানীর কুঠীতে চালান দিবেন অঙ্গীকারে এক চুক্তি পত্র লিখিয়া দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন।[৪৯]

এই কালে যখন লর্ড ক্লাইব বাহাদুর দিল্লীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন তখন মিঃ সামনার বৰ্দ্ধমানাধিপতির জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ও ঝালরদার পালকী শিরোপা প্রার্থনা করিলে কোম্পানীর দেওয়ান রাজা নবকিশন বাহাদুর আপনার নিজ তহবিল হইতে দশ সহস্র মুদ্রা নজরানা দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিমিত্তও ঐরূপ শিরোপা ও রাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি প্রার্থনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ রাজেন্দ্র-বাহাদুর এই উপকারের বিনিময়ে রাজা নবকিশনকে ১১৭৩ বঙ্গাব্দে শ্রীরামপুর বনাম মূলাযোড় গ্রামখানি মহোত্রাণ স্বরূপ প্রদান করেন। কিন্তু তদানীন্তন রেভিনিউ বোর্ডের নির্দ্দেশমতে নদীয়ার কালেক্টর মিঃ রেডফারনের আদেশে নদীয়াধিপতির এরূপ দানের

ক্ষমতা না থাকা অজুহাতে উক্ত মূলাযোড় গ্রাম গবর্ণমেন্টের খাস দখল ভুক্ত হয়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করায় ভান্সিটার্ট সাহেব বাঙ্গালার কোম্পানীর কুঠির গভর্ণর ও অধ্যক্ষ হয়েন। এই ভান্সিটার্ট বাহাদুর কিছুকাল নদীয়ার কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরাজদিগকে, অঙ্গীকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে না পারায় সকৌন্সিল ভান্সিটার্ট সাহেব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার সুচতুর জামাতা মীরকাশীমকে নবাব মনোনীত করেন। মীরকাশিম, সন্দিগ্ধমনা, কঠোর হৃদয় ও স্বাধীনচেতা শাসন কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত। কোম্পানীর সহিত তাঁহার সদ্ভাব যে স্থায়ী হইবে না তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। তিনি মসনদে উপবিষ্ট হইয়া কোম্পানীর দাবী পরিশোধের নিমিত্ত বাঙ্গালা বিহারের ভূস্বামীগণকে বন্দী করিয়া তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার একশেষ করিয়াছিলেন। সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রও বন্দীগণের মধ্যে ছিলেন। এবারও রাজস্ব বাকীর দায়ে তাঁহার এই দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়া ছিল। ইংরাজের অঙ্গীকৃত অর্থ পরিশোধ হওয়ায় নদীয়া রাজ্য পুনরায় নবাবের একাধীন আসিয়াছিল। এক্ষণে নব নবাব মীরকাশিম রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বহু অর্থ বাকী দেখিয়া রাবস্থার তাঁহাকে রাজধানী মরসিদাবাদে আহ্বান করেন, কিন্তু রাজা আজ দশহারা—কাল দেওয়ালী—তৎপর পীর অসুখ ইত্যাদি নানা অছিলায় রাজস্ব প্রদানে বিলম্ব করিলে, নবাব, ইংরাজ গভর্ণর ভান্সিটার্ট বাহাদুরকে রায় রায়ানের দ্বারা রাজাকে মরশিদাবাদে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এক লিপি প্রেরণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সদাশয় ইংরাজ পক্ষের শরণ লইয়া নজর ও রাজস্বের কিয়দংশ প্রদান করিয়া এবং নিজ মালগুজারি ১২৮,৭৫৫ টাকা বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া লইলে কিছুদিনের জন্য পরিত্রাণ লাভ করেন কিন্তু আবার অল্পদিনের মধ্যেই বন্দী হয়েন। নবাব, বাঙ্গালার প্রধান ভূস্বামী ও ধনবান ব্যক্তিদিগকে বিশেষতঃ যাহাদিগকে তিনি ইংরাজ বাহাদুরের পক্ষভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিলেন তাঁহাদিগকে মুঙ্গের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া পরিশেষে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। এইকালে নবাবের আদেশে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি অন্যান্য বন্দীর সহিত সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" মনে করিয়া নবাবের কর্ম্মচারীগণকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তৎকালোচিত এক যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং পূজান্তে তাঁহাদের প্রাণ গ্রহণের নিমিত্ত সকাতরে প্রার্থনা করেন। সেজন্য তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের বিলম্ব ঘটে। এদিকে ইংরাজের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং বিজয় লক্ষ্মী ইংরাজ বাহাদুরের সহায় হওয়ায় নবাব পরাজিত হইয়া মুঙ্গের ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন, সুতরাং সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সে যাত্রা রক্ষা পান। মীরকাশিম গুরগণ খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিবর্গের অকর্ম্মণত্যায় পলাশী, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বার বার পরাজিত হইয়া পরিশেষে অযোধ্যায় পলায়ন করেন, পরে অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীশ্বর সাহ আলমের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বকসারের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অল্পদিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এইরূপে দেশব্যাপী রাষ্ট্র বিপ্লবের উপসংহার হইলেও দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। এ সময়ে নদীয়া রাজ্যে একরূপ অরাজকতা বিরাজ করিতে ছিল। দেশ মধ্যে দস্যু ও তস্কর ভীতি অসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের দারুণ অত্যাচারে কত সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সামান্য ধনশালী বা গৃহস্থ লোকের কথা দূরে থাকুক, এই সকল অসমসাহসিক দস্যুনিচয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কোম্পানীর কুঠীও লুণ্ঠন করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। এই সকল লুণ্ঠন কাহিনীর দুইটী ঘটনা জ্বলন্ত অক্ষরে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। একটী তদানীন্তন কোম্পানীর শান্তিপুরের কাপড়ের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া কোম্পানীর গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্য্যকে লইয়া যাওয়া এবং অপরটী সায়েস্তা খাঁ নামক মুরশিদাবাদের জনৈক মুসলমান সওদাগরের কর্ম্মচারী মহম্মদ মোবারিক ও মুজা বদলু প্রভৃতির নিকট হইতে নদীয়ার সীমানায় ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা লুণ্ঠন করা; শেষোক্ত ব্যাপারটি লইয়া দেশ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। সায়েস্তা খাঁ বাদসাহ সরকারে যাইয়া এ বিষয়ে জানাইলে তথা হইতে তদানীন্তন কোম্পানীবাহাদুরের গভর্ণরের উপর এ বিষয়ের বিচার নিমিত্ত এক পরোয়ানা জারি হয় এবং গভর্ণর সাহেব তাৎকালিক নদীয়ার মুসলমান কালেক্টরকে এ বিষয়ে সম্যক তদন্ত করিয়া দোষীর শাস্তি বিধান ও নদীয়া রাজের গোমস্তা প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তির অমনোযোগিতায় এ কার্য সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের সকলের শাস্তি বিধান ও অপহৃত অর্থ আদায় পূর্ব্বক অভিযোগ কারী সায়েস্তা খাঁকে পুনঃপ্রদানের অনুমতি প্রদান করেন।

তাৎকালিক নদীয়ার দস্যু দলপতিদিগের মধ্যে একজনের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সে ব্যক্তি বিশ্বনাথ বাবু। বাড়ী গাড়রা, ভাতছালা, থানা চাপড়ার ৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে। বিশ্বনাথ জাতিতে বাগদী এবং ব্যবসায় ততোধিক হীন হইলেও তাহার উদার চরিত্র ও বীরোচিত সুন্দর গঠন, ভদ্রোচিত দানশৌণ্ডতা তাহাকে "বাবু" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। কথিত আছে তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—দরিদ্র অসহায় প্রজাকুলকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করা। বিশ্বনাথ কৃপণ ধনীর যম ছিল; ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণের ধনে দরিদ্র পোষণ তাহার বড় আনন্দের কার্য্য ছিল। বিশ্বনাথ কত কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রের বিবাহের ব্যয় কুলান করিয়াছে, কত অসহায় পরিবারের সংসার প্রতিপালন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশ্বনাথের পুত্রাদি না হওয়ায় বৈদ্যনাথ নামক এক গোপ বালককে সে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এই বৈদ্যনাথ হইতে শেষ জীবনে বিশ্বনাথকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বিশ্বনাথের যে সকল সহযোগী ছিল তাহাদের মধ্যে মেঘা, কৃষ্ণসর্দ্দার, নলদা এবং সন্ন্যাসী, প্রধান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক একটী বিশেষত্ব বিদ্যমান ছিল; নলদা ডুব দিয়া জলের ভিতর বহুক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া থাকিতে পারিত। বিশ্বনাথ স্বয়ং দস্যুচিত বহুগুণে শোভিত ছিল। রণপা নামক দীর্ঘ বংশ যষ্টী অবলম্বনে সে এক রাত্রে বিংশতি ক্রোশ পথ গমন করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম ছিল। বিশ্বনাথের সুবৃহৎ দলে সহস্রাধিক বলবান ব্যক্তি সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রস্তুত থাকিত।

এই সুবৃহৎ দলের প্রত্যেকের উপর তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বর্ত্তমান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের উপর বিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল যেন কেহ কদাচ স্ত্রীলোক, শিশু ও গোজাতির উপর কোন অত্যাচার না করে। বিশ্বনাথ বাবু এই সুবিপুল দস্যুদলের সহিত প্রকাশ্য ভাবে পালকী চড়িয়া দস্যুতা করিতে গমন করিত। বিশ্বনাথের আর একটী নিয়ম ছিল পূর্ব্বাহ্ণে গৃহস্থকে পত্র দ্বারা সতর্ক করা। উক্ত পত্র এই মর্ম্মে লিখিত হইত "সদাশয় মহাশয়! যদি পত্র বাহক মারফৎ প্রার্থিত অর্থ প্রদান করেন বিশেষ বাধিত হইব, অন্যথা প্রস্তুত থাকিবেন শীঘ্রই আপনার শ্রীচরণ দর্শনে গমন করিব।"

একবার বিশ্বনাথ কালী পূজার দিন অর্থ সঙ্কুলান করিতে না পারায় সমৃদ্ধি সহকারে মায়ের পূজা হয় না দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে উপবিষ্ট আছে এমন সময়ে তাহার গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে কালনার গদীতে বৈদ্যপুরের নন্দীরা এই মাত্র দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছে এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে সবিশেষ পুলকিত হইয়া বিশ্বনাথ তৎক্ষণাৎ মাত্র তিন জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে নৌকা যোগে কালনায় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ দারোগার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বাধ্য করিয়া এক একরার লিখাইয়া লইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই গদীতে উপস্থিত হইল; ঐ একরার এই মর্ম্মে লিখিত হইল যে দারোগার বিশেষ যোগ সাজগে এ কার্য্য সমহিত হইল। এইরূপে সেই কার্য্যের যথাযথ অনুসন্ধানের মূলোচ্ছেদ করিয়া বিশ্বনাথ স্বীয় বিক্রমে গদী লুণ্ঠন পূর্ব্বক সেই রাত্রেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

আর একবার বিশ্বনাথের দল নদীয়ার ইনডিগো কনসার্নের ফ্যাডি সাহেবের বাঙ্গালা আক্রমণ করে। মিঃ ফ্যাডি তাঁহার প্রধান পাইকের সাহায্যে বিশ্বনাথের দলের একজনকে ধরিয়া পুলিশে দেওয়ায় বিশ্বনাথ ঐ পাইককে ধরিতে সাহেবের কুঠীতে সে লুক্কায়িত আছে এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ২৭সে সেপ্টম্বর রাত্রিতে ফ্যাডির বাঙ্গালা আক্রমণ করে। মিসেস ফ্যাডি রাত্রির অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে কোনরূপে নিকটস্থ পুস্করিণীতে কাল হাঁড়ি মাথায় দিয়া দস্যুদলের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু ফ্যাডি সাহেব শীঘ্রই ধৃত হইয়া দলপতির সম্মুখে নীত হইলে দূরদর্শী বিশ্বনাথ একজন সাহেবের প্রাণনাশ করিলে সমগ্র সাহেব লোক তাহার কিরূপ ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে স্মরণ করিয়া সাহেবকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু দলস্থ সকলেই এক বাক্যে ফ্যাডি সাহেবকে বিনাশ করিতে মত প্রকাশ করে এমন কি দলস্থ এক জন সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া ফ্যাডিকে সংহার মানসে তরবারি উত্তোলন করিলে বিশ্বনাথ ক্ষিপ্র হস্তে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সাহেবের প্রাণ রক্ষা করে। পরিশেষে বহু বাকবিতণ্ডার পর সাহেবকে মুক্তি দেওয়াই স্থির হইলে বিশ্বনাথ সাহেবকে তাঁহার ভগবানের নামে শপথ করাইয়া অঙ্গীকার করাইয়া লন যেন মুক্ত হইয়া কিছুতেই তাহাদের বিপক্ষতাচরণ না করেন। ফ্যাডি সাহেব এইরূপে মুক্ত হইয়া দস্যুর নিকট প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নহে মনে করিয়া ...াবর তাৎকালিক নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেবের নিকট গমনপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করেন। ইলিয়ট

সাহেব কলিকাতা হইতে ব্ল্যাকুয়ার[৫০] সাহেবের অধীনে কতকগুলি বলিষ্ঠ ইউরোপীয় গোরা আনাইয়া ও শান্তিপুর হইতে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ গোড়া উপর গোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া বিশ্বনাথের পালিত পুত্র বৈদ্যনাথের সাহায্যে শীঘ্রই বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন। বিচারে বিশ্বনাথ ও তাহার দ্বাদশ জন সঙ্গীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং নদীয়া ঠগবগের খালের মাঠে বাঁশবেড়িয়া কুঠীর দক্ষিণে নদীতীরস্থ বটবৃক্ষে তাহাদের ফাঁসি হয়।[৫১] বিশ্বনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে মাত্র দুইজনের উপর বিশেষ কোপ প্রকাশ করে। প্রথম তাহার বিশ্বাসঘাতক পালিত পুত্র বৈদ্যনাথ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ক্যাডি সাহেব।

রাজ্যের যখন এরূপ অরাজক অবস্থা তখন ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে ক্লাইব ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে লর্ড উপাধি ভূষিত হইয়া মুসলমানের সহিত বিবাদ নিষ্পত্ত্য করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কর্ত্তৃক এদেশে পুনঃ প্রেরিত হন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে চতুর্দ্দিক হইতে নবাব ও জমিদারগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে নজর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রও পঞ্চ মোহর ও তৎকালোচিত সৌজন্যপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিয়া ভাগ্যবান ক্লাইবের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ক্লাইবের আগমনের পূর্ব্বেই মীরকাসিমের মৃত্যু হয় এবং মীর কাশীম দ্বিতীয় বার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারও মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র নাজিমদ্দৌল্লা ইংরাজগণ কর্ত্তৃক নবাবী পদে প্রতিষ্ঠীত হন। ক্লাইব মুরশিদাবাদে যাইয়া নূতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্দোবস্ত করিলেন যে সৈন্য সংক্রান্ত ও রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় অন্যান্য ভার ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের হস্তে থাকিবে; কর সংগ্রহ, শাসন ও বিচার প্রভৃতি কার্য্য নবাবের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং ঐ সকল কার্য্য ও সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন। অনন্তর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখের প্রদত্ত বাদসাহী সনন্দ বলে প্রজাপালক ইংরাজ বাহাদুর বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলেন।

নদীয়ায় ইংরাজাধিকার

মহামান্য ইংরাজ কোম্পানী সম্রাট সাহ-আলম দত্ত বঙ্গের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলে, তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড ক্লাইব বাহাদুর মুরসিদাবাদ সন্নিকটস্থ মতিঝীল প্রাসাদে ১৭৬৬ অব্দে পুণ্যাহ দিনে কার্য্যতঃ বঙ্গের শাসনভার হস্তে লইয়া এতদ্দেশের রাজস্বের উন্নতি বিধানে মনসংযোগ করিলেন, কিন্তু এ সকল বিষয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের সম্যক অভিজ্ঞতা না থাকায় সমস্ত বিষয়ে প্রথম প্রথম বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া কোম্পানী বাহাদুর কঠোর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং তৎকাল প্রচলিত প্রথানুযায়ী সিপাহী দ্বারা কর আদায় করাইতে লাগিলেন।[৫২] বিশেষত এই সময়ে লর্ড ক্লাইব পুনরায় বিলাতে যাওয়ায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের এবং রাজ কার্য্যে নানারূপ গোলযোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাৎকালিক জমিদারগণও কি জানি কিরূপ দাড়ায় মনে করিয়া নীরহ প্রজাকুলের নিকট স্বীয় স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। রাজপরিবর্ত্তনের অনিবার্য্য ফলে কিছুদিন দেশের এইরূপ অবস্থা হইল, ইহার উপর আবার ১৭৬৮—খ্রীষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের সমূহ অনিষ্ট হওয়ায় দেশে করালমূর্ত্তি দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী ভয়ঙ্কর বেশে দর্শন দিল। এই দুর্ভিক্ষে দেশের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[৫৩] শুনা যায় অট্টালিকায়, পর্ণকুটীরে, পথে, প্রান্তরে ঘাটে হাটে, মাঠে লোকালয়ে, যেখানে সেখানে দলে দলে মানুষ ও গৃহপালিত পশ্বাদি মরিয়া পড়িয়া থাকিত, কেহ কাহাকেও দেখিবার বা কেহ কাহাকে ফেলিবার ছিল না। এই নিদারুণ ঘটনা বাঙ্গালা ১১৭৭ সালে সংঘটিত হওয়ায় ইহা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে খ্যাত।

ইংরাজরাজ নবলব্ধরাজ্যের রাজস্ব ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে মনোযোগী হইয়া পড়িলেন ও বঙ্গদেশকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া জমিদারগণের সহিত নূতন মেয়াদী বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুযোগ পাইয়া নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সমগ্র বিষয় স্বীয় জেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে নূতন প্রথানুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লন এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এক "অভিলষিত ব্যবস্থাপত্র" দ্বারা শিবচন্দ্রকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ইংরাজের সুশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফল স্বরূপ আমরা এতদ্দেশে মৃত্যুর পূর্ব্বে বিষয়াদির বিধিবন্ধের জন্য এই প্রথম "উইল" পত্রের সৃষ্টি দেখিতে পাই। মহারাজা রাজেন্দ্র অগ্নিহোত্রীবাজপেয়ী কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ এই সময়ে অতি বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যাপী ধারাবাহিক কর্ম্ম নিচয় তাঁহার স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি করিয়াছিল। এক্ষণে কর্ম্ম-বীর মহারাজা নিজের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণনগর হইতে ক্রোশৈক পূর্ব্বে স্থিত অলকনন্দা তীরে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তনুত্যাগ করেন। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত অলকনন্দার ন্যায় তাঁহার

বংশের অবস্থারও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এইকাল হইতেই ভারতবর্ষের সহিত সদাশয় ইংরাজের স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা শিবচন্দ্র ১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নদীয়ার রাজত্ব করেন। রাজা শিবচন্দ্র পিতৃ-গদীতে অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার নিজাধিকারে তাঁহার ক্ষমতা কোম্পানী কর্তৃক হ্রাস করা হয়। এমন কি কোম্পানীর তদানীন্তন কর্ম্মচারী জন্ শোর সাহেব নদীয়া রাজের শিথিল হস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার পর্য্যন্ত অপসৃত করিয়াছিলেন।[৫৪] কিন্তু নদীয়া-রাজ এ বিষয়ে তদানীন্তন সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল হেষ্টিংশ সাহেব বরাবর এ বিষয়ে আবেদন করেন, তাহাতে প্রার্থনা থাকে যে, বর্ত্তমান সন তাঁহার সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত স্থির হইলে তিনি প্রথানুযায়ী কিস্তীবন্দী হিসাবে কোম্পানীর সরকারে বর্ত্তমান সনের রাজস্ব দাখিল করিবেন এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর বাকী বকেয়াও পরিশোধ করিবেন, যদি এ বিষয়ে সক্ষম না হয়েন, তাহা হইলে তখন যেন তাহাকে অধিকার-চ্যুত করা হয়।[৫৫] ইহার উপর কি আদেশ প্রদত্ত হয় তাহা পাওয়া যায় নাই কিন্তু ১৭৮২ খ্রীঃ ২৩ জুন তারিখের মিঃ ম্যাকডাইয়েল সাহেবের রিপোর্টানুযায়ী দেখা যায় যে সেই বৎসর নদীয়া-রাজের কর্ম্মচারীগণ কর্তৃকই রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছিল।[৫৬]

কোম্পানী বাহাদুর ১৭৮৭ অব্দে রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্ত কালেক্টর পদ সৃষ্টি করিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন এবং নদীয়াতেই সর্ব্ব প্রথমে জেলা স্থাপিত করিয়া ইংরাজ কালেক্টরের অধীন করিলেন। এতদনুসারে মিঃ রেডফার্ণ নদীয়ার সর্ব্ব প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হয়েন। চেরী সাহেব তাঁহার সহকারী হয়েন। বর্ত্তমান কালে প্রেসিডেন্সী বিভাগ বলিয়া যে ভূভাগ আখ্যাত, মুরসিদাবাদ বাদে তাহাই এই সময়ে নদীয়া বিভাগ বলিয়া খ্যাত হয়। হেষ্টীংস সাহেব কলিকাতা কাউন্সিলের চারিজন সদস্যকে জমিদারগণের সহিত পাঁচ বৎসরের জন্য খাজনার বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলেন, ও মুরসিদাবাদ হইতে খাজনা-দপ্তর নদীয়ান্তর্গত "সুখসাগরে"[৫৭] এবং অন্যান্য যাবতীয় সরকারী কার্য্যালয় মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন। বিচার কার্য্যের সুবিধার্থ প্রতি জেলায় এক একটী দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত গোবিন্দসড়কে (গোয়াড়ীতে) নদীয়ার এই সকল আদালত স্থাপিত হইল। কালেক্টররাই দেওয়ানী বিচরালয়ে বিচারপতি হইলেন, কিন্তু ফৌজদারী বিচার মুসলমান কাজী ও মুফ্তির হস্তেই রহিল। আপিল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামে দুইটী আদালত স্থাপিত হইল। পরিশেষে ইংরাজদিগের অপরাধের এবং রাজধানীর মকর্দ্দমা বিচারের নিমিত্ত কলিকাতায় মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বরের ব্যবস্থানুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট নামে এক নূতন আদালত সংস্থাপিত হইল এবং ভারতবন্ধু সংস্কৃতানুরাগী পণ্ডিত সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম্ জোন্স সাহেব উক্ত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হইয়া আসিলেন। সংস্কৃতানুরাগী জোন্স সংস্কৃত ভাষাধ্যয়নের নিমিত্ত ১৭৮৪ অব্দে গোয়াড়ীতে কয়েক মাস অবস্থান করেন এবং তৎকালিক নদীয়ারাজ শিবচন্দ্রের নিকট একজন উপযুক্ত অধ্যাপকের প্রার্থনা করেন। তখন দেশমধ্যে পাশ্চাত্য

সভ্যতা প্রবেশ করে নাই সুতরাং ম্লেচ্ছকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ঐ কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে মহারাজের ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায় বৈদ্য-কুলোদ্ভব রামলোচন কবিভূষণ সাহেবকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হয়ে। এই রামলোচন সংস্কৃতে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে একবার কোন ব্রাহ্মণ কুমারের ব্যাধি ও ঔষধ নির্ণয়ে তাঁহার ভ্রম হয় এবং ঐ ভ্রম হেতু ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত অধ্যাপনায় ব্রতী হয়েন।

রাজা শিবচন্দ্র পূর্ব্বের অঙ্গীকারানুযায়ী নদীয়ার রাজস্ব যথা সময়ে ইংরাজ সরকারে দাখিল করিতে না পারায় ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞাপন দ্বারা নদীয়া-রাজ কর্তৃক নদীয়ার রাজস্ব আদায় পুনর্ব্বার সর্ব্বতোভাবে রহিত করা হয়।[৫৮] কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মহামান্য সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল বাহাদুর পুনরায় নদীয়া রাজকে তাঁহার অধিকারে রাজস্ব আদায়ের ও অন্যান্য ক্ষমতা প্রদান করেন।[৫৯]

১৭৮৫ অব্দের প্রারম্ভে লর্ড হেষ্টিংস স্বদেশ যাত্রা করেন এবং পর বৎসর লর্ড কর্ণওয়ালিশ গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ১৭৮৮ অব্দে রাজা শিবচন্দ্র পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়া-রাজ্যের অধিকারী হয়েন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত বিলাসী এবং অমিতব্যয়ী ছিলেন। ইনি কৃষ্ণনগর হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে অঞ্জনা নামক অধুনা বদ্ধ-সলীলা নদী-তীরে শ্রীবন নামে এক প্রমোদ উদ্যান স্থাপন করিয়া নদীতটে একটী সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এই অট্টালিকার দক্ষিণ দিকে যে কানন অধুনা বন্য বনস্পতির গাঢ় ছায়ায় আবৃত থাকিয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু বা ততোধিক হিংস্র দস্যু তস্করের আশ্রয় স্থল হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বিবিধ সুগন্ধী পুষ্পের ও সুস্বাদু ফলের বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং ইহার আদরের নাম ছিল মধুপোল। এই অপূর্ব্ব আনন্দ কাননে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তাঁহার রাজকার্য্যে অমনোযোগ বশতঃ রাজকার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইতে থাকে।

এই সময়ে প্রজাহিতৈষী লর্ড কর্ণওয়ালিশ বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা বিধান, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন প্রভৃতি দেশের হিত কামনায় নির্দ্দিষ্ট রাজস্বে জমিদার-গণের সহিত "দশসালা" বন্দোবস্ত করেন। এই "দশসালা" বন্দবস্তের ৩০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র নদীয়া জেলা একমাত্র নদীয়ার মহারাজের সহিত বন্দবস্ত হইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু এই কালে (১৭৯০ খ্রীঃ) ইহা ২৬১ স্বতন্ত্র তালুকে বিভক্ত হইয়াছিল ও ২০৫ জন স্বতন্ত্র জমীদারের নিকট হইতে ইহার রাজস্ব আদায় হইতেছিল। নদীয়ার রাজারাই প্রথম এই সকল অধীন তালুকদারের সৃষ্টি করেন ও এই সকল তালুকদারের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানীর ঘরে নিজ নামে জমা দিতেন, কিন্তু পরে কোম্পানি কর্তৃক তালুকদারগণকে স্বতন্ত্র জমীদার স্বীকারে সরাসর কোম্পানী বরাবর রাজস্ব দিবার আদেশ প্রদত্ত হয় ইহার ফলে নদীয়ারাজের অর্থের সহিত নদীয়ায় তাঁহার প্রতিপত্তিও

কমিতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে (১৯১৯ খ্রীঃ) সমগ্রনদীয়ার রাজস্বের ১/৫ অংশ মাত্র নদীয়া রাজকর্তৃক প্রদত্ত হয়।

মহামান্য লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কর্তৃক পরে ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে পূর্ব্বোক্ত "দশসালা" বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয় এবং এতদ্দ্বারা অবধারিত হয় যে জমিদারেরা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া অধিকৃত ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবেন। কিন্তু বৎসরের মধ্যে কতিপয় নিরূপিত দিনে রাজস্ব দিতে না পারিলে তাঁহাদের জমিদারী নিলাম হইবে।

যথাকালে কর দিতে না পারিলে জমিদারী নিলাম হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বহু অক্ষম জমিদারের জমিদারী হস্তান্তর হইতে আরম্ভ হইল বটে কিন্তু মুসলমান অধিকারে ভূম্যাধিকারীগণ বাকী খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ হইয়া যেরূপ বর্ব্বরোচিত অকথ্য শাস্তি প্রাপ্ত হইতেন, তাহা এই সুসভ্য বিধানে এই সময়ে রহিত হইয়া গেল। নদীয়া রাজ ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয়কার্য্যে অমনোযোগিতা নিবন্ধন রাজকার্য্যে স্বতই বিশৃঙ্খলা ঘটিতে ছিল; এক্ষণে আবার ১৭৯৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভাগিরথী ও অন্যান্য নদীর জল অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে, নদীয়ায় এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়।[৬০] এই প্লাবনে লোকের কষ্টের অবধি ছিল না, দেশে ডাঙ্গা ছিল না, ডাঙ্গায় ঘর ছিল না, ঘরে লোক ছিল না; কাজেই রাজস্ব আদায় কষ্টকর হইয়া পড়িল। নদীয়া রাজ গবর্ণমেন্টকে দেশের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া রাজস্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন।[৬১] কিন্তু তখন পূর্ব্বোক্ত নিলামী আইন সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় এ আবেদনে কোনই সুফল হয় নাই এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত যে নদীয়া রাজ্যের ক্রমিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এই সময় হইতেই নিলামে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করিল। বিধির নিয়ম এক ভাঙ্গে, আর গড়ে। এদিকে নদীয়া রাজের যেমন অবস্থা হানি হইতে লাগিল, ওদিকে তাৎকালিক উদীয়মান সুবিখ্যাত ধনপতি রাণাঘাটের কৃষ্ণপান্তি নদীয়া রাজের নিলামী জমিদারি সকল ক্রয় করিয়া ধনে ও মানে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন।

নদীয়াধিপতির এইরূপে দিন দিন আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িলেও তাঁহার অধিকারস্থ নবদ্বীপে তখনও জ্ঞান চর্চ্চা একেবারে লোপ পায় নাই! দুই একটী ক্ষীণ জ্যোতি, তখনও পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছিল। রাজ কার্য্যে তখনও দেশীয় তারিখের সমধিক প্রচলন ছিল অথচ বিশুদ্ধ পঞ্জিকা সাধারণভাবে দেশ মধ্যে প্রচলিত না থাকায় জন সাধারণের বিশেষতঃ রাজকার্য্যের অনেক সময়ে অসুবিধা ও গোলযোগ সংঘটিত হইত। এই অভাব দূরীকরণ মানসে গবর্ণমেন্টের যত্নে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ায় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক দেশীয় প্রচলিত জ্যোতিষের মতে সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুমোদিত এক বিশুদ্ধ পঞ্জিকা প্রণীত হয়।[৬২] ইহাই বর্ত্তমান প্রচলিত "নবপঞ্জিকার" মূল ভিত্তি।

এই ১৭৯৯ অব্দে নদীয়ার নদী সকল অসম্ভব স্ফীত হইয়া আবার দেশে বন্যা আনয়ন করে। তদানীন্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রজার দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া সে বৎসর রাজস্ব আদায়ে শিথিলতা প্রকাশের জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন।[৭]

এই দারুণ দুরবস্থা হইতে দেশ উদ্ধার হইতে না হইতে ১৮০২ অব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র

প্রাণ ত্যাগ করেন এবং গিরিশচন্দ্র নদীয়ার রাজগী প্রাপ্ত হন। এই সময় মার্কুইস্ অব ওয়েলেসলী গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত। পূর্ব্বে লর্ড কর্ণওয়ালীশ রাজস্ব বিভাগের ন্যায় শাসন ও বিচার বিভাগেও বহু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। প্রতি জেলায় একজন জজ ও তাঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে একজন রেজিষ্ট্রার ও কয়েক জন মুন্সেফ ও তাঁহাদের সকলের বিচারিত মকর্দ্দমার আপিল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুরসিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় চারিটী প্রভিনসিয়াল কোর্ট স্থাপন করেন এবং দেশের শান্তি রক্ষার জন্য কয়েক ক্রোশ অন্তর এক একটী থানা স্থাপন করিয়া প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া দারোগা নিযুক্ত করিয়া যান। যদিও নদীয়া বিভাগেই সর্ব্ব প্রথমে এই সকল বৃটীশ নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এতাবৎ এ সকল রাজ-ব্যবস্থা জন সাধারণের বিশেষ অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং কি ফৌজদারী কি দেওয়ানী, কি সামাজিক সকল বিষয়ের মীমাংসাই নবদ্বীপাধিপতি অথবা জমিদারবর্গ কিম্বা গ্রামস্থ প্রধানগণ কর্ত্তৃক সমাহিত হইতেছিল।[৬৪] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১২২০—২৫ সাল) নদীয়ায় "দশ ঠাকুরী" প্রথা প্রচলিত ছিল, ১৮৩৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। গ্রামস্থ দশজন নিরপেক্ষ প্রধান ব্যক্তি এক যোগে সর্ব্ববিধ মকর্দ্দমাই নিষ্পত্তি করিতেন। সুতরাং এখনকার ন্যায় বিচার কার্য্য তখন এত ব্যয়সাপেক্ষ ছিল না। কিন্তু ইংরাজী ভাব দেশে তখন শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ করিতেছিল এবং যাহা কিছু প্রতীচ্য তাহাই আদরের সহিত গৃহীত ও যাহা প্রাচ্য তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং এ সকল সনাতন প্রথা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই সময়ে নদীয়া-সিংহাসনে রাজা গিরীশচন্দ্র অধিষ্ঠিত। ইঁহার জীবদ্দশায় নদীয়া রাজ্য, যাহা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে সুবিস্তীর্ণ চৌরাশী পরগণায় বিস্তৃত ছিল, তাহা মাত্র ৫।৭ খানি পরগণা ও কয়েক খানি নিষ্কর গ্রামে দাঁড়াইয়াছিল। ইঁহারই সময়ে নদীয়া-রাজের সর্ব্ব প্রধান সুবিস্তীর্ণ ও সুবিখ্যাত "উখ্ড়া" পরগণা নিলাম হইয়া যায় এবং পরে ১৮০৬ অব্দে ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার সমস্ত জমিদারী বাকী খাজনার দায়ে নিলামে উঠে।[৬৫]

এই সময়ে কোম্পানীর সুবিখ্যাত শান্তিপুরের কাপড়ের আড়ংএর শ্রী পূর্ব্বের ন্যায় না থাকিলেও বহু পরিমাণে বজায় ছিল।[৬৬] তখনও বিলাতি কাপড়ের আমদানী আরম্ভ হয় নাই; তবে এ বিষয় তখন ইংলণ্ডীয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং কিসে ভারতের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল। তখন শান্তিপুরে কোম্পানীর একজন কমারসিয়াল রেসিডেন্ট বাস করিতেন। ১৮০৬ অব্দে কমারসিয়াল এজেন্ট শান্তিপুরে দেশী মদ প্রস্তুত করিয়া রপ্তানীর জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এক সুবৃহৎ মদের ভাঁটি স্থাপন করেন।[৬৭]

১৮০৭ অব্দে লর্ড মিন্টো বাহাদুর গবর্ণর জেনারেল হইয়া এদেশে আগমন করেন। তিনি নদীয়ায় সংস্কৃত-চর্চ্চার দুরবস্থাদির কারণ নির্ণয় করিয়া পরিশেষ বাণীর প্রিয়-নিকেতন নবদ্বীপে ও ত্রিহুটের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে দুইটী সংস্কৃত কলেজ ও

তৎসংলগ্ন পাঠাগারাদি স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন এবং তদনুসারে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময় কোর্ট অব ডিরেক্টরের সভাগণ ভারত-গবর্ণমেন্টের প্রতি ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিতগণের উৎসাহদান-কল্পে অন্যূন এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক ব্যয় করিতে আদেশ দেন।[৩৮] এই টাকায় নদীয়ায় কোন সংস্কৃত কলেজাদি স্থাপিত হয় নাই বটে, কিন্তু ১৮২৩ অব্দের ১৭ই জুলাই "কমিটী-অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন" নামে একটী সভা গঠিত হয়। ঐ সভা উক্ত অর্থ প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ও পণ্ডিতদিগের বৃত্তি আদিতে ব্যয় করিতে থাকেন।

মুসলমানদিগের হস্ত হইতে দেশ সর্ব্বতোভাবে ইংরাজদিগের হস্তে আসিয়া নিরুপদ্রব হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু নদীয়ার ভাগ্যে বহু দিন ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখ বিধাতা লেখেন নাই। এই সময়ে, এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নদীয়ার রাজনৈতিক গগনে একটী অশুভকর জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়; সেটী তিতুমীর নামে খ্যাত জনৈক ধর্ম্মোন্মত্ত বলদৃপ্ত মুসলমান। কিছু দিন তিতুর দৌরাত্ম্যে নদীয়ার শান্তি বিদূরিত হইয়াছিল। বলদৃপ্ত তিতু তাহার মূর্খ অনুচরগণের সাহায্যে কেবল যে নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণার জমিদারগণ ও নিঃসহায় প্রজাকুলের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা নহে; সে তাহার প্রায় নিরস্ত্র, নিরক্ষর সঙ্গীগণের সাহসের ও আপনার অদ্ভুত শক্তির উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরাক্রান্ত বৃটীশ রাজের বিপক্ষেও দণ্ডায়মান হইতে পশ্চাদ্পদ হয় নাই।[৩৯] তিতু ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ের গোবর-ডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে আট মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে হায়দারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান তখন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। এই হায়দারপুর গ্রাম খানি জেলা নদীয়া ও ২৪ পরগণার সন্ধি-স্থলে ইচ্ছামতী নদী, যাহা নদীয়া ও ২৪ পরগণার সীমা নির্দ্দেশ, করিতেছে তাহারই দক্ষিণ কূলে কিয়দ্দূরে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ইহা জেলা ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া নামক থানার অন্তর্গত। শিশুকাল হইতেই তিতুর মুসলমান ধর্ম্মের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হইত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই ধর্ম্মভাব ধর্ম্মোন্মাদে দাঁড়াইয়াছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিতু মক্কা যাত্রা করে। তথায় ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়। মতান্তরে ফরাজী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ফরিদপুরের অন্তর্গত দৌলতপুর নিবাসী হাজি সরিতুল্যার ধর্ম্ম-মত গ্রহণ পূর্ব্বক তিতু দেশে প্রত্যাগমন করে এবং স্বদেশীয় হীন জাতি মুসলমানগণের ভ্রষ্টাচার ও স্থানে স্থানে হিন্দুবৎ আচার করিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে নবমত প্রচার করিতে আরম্ভ করে। তিতুর নূতন মত সর্ব্বতোভাবে কোরাণের সহিত ঐক্য না হওয়ায়, কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান তাঁহার ধর্ম্ম মতাবলম্বী হয়েন নাই। কেবল কতকগুলি মুসলমান জোলা প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় লোক তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির বাস নদীয়া জেলায়। তিতু ইহাদের স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ লইতে, আনন্দোৎসবে বাদ্যোদ্দাম করিতে, ও কাছা দিয়া কাপড় পরিতে নিষেধ করিল এবং সকলকেই দাড়ী রাখিতে অনুমতি করিল। মক্কা হইতে আসিবার

কালীন একজন ফকীর তিতুর সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিল। সে এই সময়ে নানারূপ বুজ-রুগ দেখাইয়া তিতুর মূর্খ শিষ্যগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিতুর দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং এই জন্ত, ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ হিন্দুগণের প্রতি, এবং যে সকল মুসলমান তাহাদের মতাবলম্বন করে নাই, তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। বিশেষতঃ এই সময়ে তিতুর দল পুষ্ট হওয়ায় তাহার এখন দল বজায় রাখিতে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু আয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা না থাকায় সে দুই এক সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাটী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল।

তিতুর এই সকল অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া পুঁড়া গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার জমিদারীর মধ্যে তিতুর দলের প্রতাপ হ্রাস করিবার মানসে উক্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের দাড়ীর প্রতি ২।০ পাঁচ শিকা কর ধার্য্য করিলেন। জমিদারের এইরূপ অনধিকার চর্চ্চায় তিতু যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইল; তখন তাহার দলের সহস্রাধিক লোক যোগ দিয়াছিল, সুতরাং এই অপমান নীরবে সহ্য না করিয়া পুঁড়া আক্রমণপূর্ব্বক উক্ত রায় মহাশয়কে লাঞ্ছিত করিয়া মুসলমান করিবার মানসে তিতু সদলে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক দিন যাত্রা করিল। পথে খাসপুরে যে সম্ভ্রান্ত মুসলমান রায় মহাশয়কে তিতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বাটী লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাঁহার কুমারী কন্যার ধর্ম্ম নাশ করিয়া তিতু পর দিন প্রভাতে ইচ্ছামতী উত্তীর্ণ হইয়া পুঁড়া আক্রমণ করিল। সে দিন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উপলক্ষে সেখানে বারোইয়ারি পূজা হইতে-ছিল ও তদুপলক্ষে প্রাতেই যাত্রা বসিয়াছিল। সদলবলে তিতুমীর পুঁড়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া বারোইয়ারি-তলা জনশূন্য হইয়া পড়িল। পুরোহিত তখন পূজায় বসিয়াছিলেন, সুতরাং পূজা ছাড়িয়া উঠিতে না পারিয়া তিনিই কেবল বারোইয়ারি মণ্ডপে উপস্থিত রহিলেন। এদিকে তিতু আসিয়া প্রথমে বারোইয়ারি তলায় একটী গো-হত্যা করিল। পূজারত ধর্ম্মপ্রাণ পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় এই নিদারুণ ব্যাপার ও বীভৎস দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া মায়ের সম্মুখস্থিত দীর্ঘ কৃপাণ গ্রহণ করিয়া সেই নিষ্ঠুর ঘাতক-গণের মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তখনই অগণিত পাষণ্ড কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া নিজেও হত হইলেন। এদিকে জমিদারের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে লাঠী লইয়া বাহির হইলে তিতু গতিক মন্দ দেখিয়া, সে যাত্রা পলায়ন করিল।

বারাসাতে তৎকালে জেলা ছিল ও একজন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে থাকিতেন। বসিরহাটে তখন মহকুমা বা বাদুড়িয়াতে থানা হয় নাই। এক কদম্বগাছিতেই থানা ছিল। বারাসাতের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ব্যাপার অবগত হইয়া স্বল্পসংখ্যক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ও চৌকিদার লইয়া কদম্বগাছির ব্রাহ্মণ দারোগাকে তিতুকে গ্রেপ্তার করিতে পাঠান। কিন্তু তিনি কয়েক জন অনুচরসহ তিতুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তিতু এই দারোগা-জয়-ব্যাপারে সাতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়া আপনাকে অসীম বলশালী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল এবং বৃটিশ শাসন উপেক্ষা করিয়া আপনাকে ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিল এবং টাকীর ও গোবরডাঙ্গার জমিদারগণের নিকট কর চাহিয়া

পাঠাইল। গোবরডাঙ্গায় এ সময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় জমিদার ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে তখন বাঘে বখরিতে এক ঘাটে জল খাইত। অন্যূন দুই শত লাঠিয়াল, তিন চারি শত পাইক ও নগদী ও কয়েকটা হস্তী তাঁহার সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তখনও দেশে চোর ডাকাতের ভয় সম্পূর্ণ দূরীভূত না হওয়ায়, সকল জমিদার ও ধনবান ব্যক্তিরই কিছু কিছু লোকজনের ছলতানা রাখিতে হইত। এই সময়ে তিতুর দৌরাত্ম্যে কালীপ্রশন্ন বাবু দুই শত বেতন-ভোগী হাব্‌সী আনিয়া গোবরডাঙ্গায় রাখায় তাঁহার নিকট কর গ্রহণ করিতে আসিতে বা কর না দিলে তাঁহার মস্তক লইতে আসিতে তিতুর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। যাহা হউক এ সময় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল তাহার দৌরাত্ম্য একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

তিতু শহার বাসের নিমিত্ত ও সঙ্গীগণের আশ্রয়ের জন্য নারিকেল বেড়িয়া নামক স্থানে একটী সুবৃহৎ আম্র-কাননের চতুর্দ্দিকে গড কাটিয়া বাঁস পুঁতিয়া কেহ কেহ বলেন মৃত্তিকাভস্তারে তাহার কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এখনও কোন বিষয়ে ক্ষণভঙ্গুরতা প্রকাশ করিতে হইলে লোকে "তিতুমিরের কেল্লা" উল্লেখ করিয়া থাকে। এই বংশ ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষণভঙ্গুর কেল্লায় বসিয়া ভারতের স্বমনোনীত নব বাদসাহ কবে কোন গ্রাম ধ্বংস করিবেন, কাহার অর্থ লুণ্ঠন করিবেন এবং কখন্ কাহার কি সর্ব্বনাশ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যে ধর্ম্ম প্রাণতায় উত্তেজিত হইয়া তিতু প্রথমে ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছিল দুরাশায় ছলনায়, অর্থের অবিতৃপ্ত পিপাসায় এক্ষণে তাহা পৈশাচিক ভাব ধারণ করিয়াছিল; তাই নিত্য নূতন অত্যাচার করিয়াও তিতুর তৃপ্তি হইতেছিল না।

মোল্লাহাটির কুঠীর ম্যানেজার ডেভিস সাহেব দুই শত লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা লইয়া তিতুকে আক্রমণ করেন; কিন্তু তিতু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া কোনরূপে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সাহেবের সঙ্গীগণ কেহ কেহ ইচ্ছামতি তীরস্থ গোবরা গোবিন্দপুরে যাইয়া আশ্রয় লইলে, তাহাদের রক্ষা করিতে যাইয়া উক্ত স্থানের জমিদার রায় মহাশয়গণের সহিত তিতুর বিবাদ হয়।

বারাসাতের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দিন দিন তিতুর এই অপ্রতিহত প্রতাপ বৰ্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু গবর্ণ-মেণ্ট মুষ্টিমেয় জনকতক উন্মত্ত মুসলমানের শাসনের জন্য প্রথমে সৈন্য না পাঠাইয়া বারাসাতের নাজিরের অধীনে কয়েক শত চৌকিদার, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল এবং কয়েকজন অনিয়মিত সৈন্য ও চারিজন গোরা অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহারাও যখন এই বলদৃপ্ত মুসলমানদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইল ও একটা ইংরাজ অশ্বারোহী ও কয়েকজন সিপাহী নিহত হইল, তখন গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দমনের নিমিত্ত ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে লেফটান্যাণ্ট ষ্টুয়ার্টের অধীনে একদল ইংরাজ সৈন্য, একদল দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় কামান প্রেরণ করিলেন। লেফটান্যাণ্ট ষ্টুয়ার্ট তাঁহার দলবল লইয়া ১৯ নবেম্বর রাত্রি থাকিতে আসিয়া তিতুর কেল্লা ঘিরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিতু ও তাহার সঙ্গীগণ তখনও

পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ভীত না হইয়া এই সুশিক্ষিত সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। তিতু তাহার ধর্ম্মোন্মত্ত সৈন্যগণকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিল যে, ধর্ম্মবলে সে ইংরাজের গোলাগুলী গিলিয়া ফেলিবে। লেফ্‌টান্যান্ট ষ্টুয়ার্ট এই বংশ কেল্লাবাসী বীরগণকে ভয় দেখাইবার জন্য প্রথমে কতকগুলী ফাঁকা আওয়াজ করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু মূর্খ মুসলমানগণ ইহাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইল না দেখিয়া "হজরত গুলি খা ডালা" বলিয়া কেল্লা হইতে বাহির হইয়া সবেগে ইংরাজ-সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। তখন বাধ্য হইয়া সেনাপতি গোলাগুলি ছাড়িতে আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল। তিতুমীর ও তাহার বহু শিষ্য কেল্লার মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল এবং তাহার ভাগিনেয় নসিরদ্দি তিন শত মুসলমানের সহিত বন্দী হইল! অবশিষ্ট যে যেমন পারিল পলায়ন করিল। বারাসতে এই সকল বন্দীর বিচার হইয়া নসিরদ্দি ও অপর দেড় শত লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এইরূপে তিতুর দল বিধ্বস্ত হইলে দারুণ ভয়ে তাহার শিষ্য সেবকগণ দাড়ী ফেলিয়া হিন্দু সাজিতে আরম্ভ করিল। কথিত আছে তখন পরামাণিকগণ প্রতি দাড়ী ফেলিতে ১০ পাঁচ সিকা হিসাবে মজুরি লইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তখন অনেক ব্যঙ্গ কবিতা রচিত হইয়াছিল :—

"জোলানী উঠিয়া বলে উঠ্ রে জোলা ঝাট।
হাজাম বাড়ী গিয়া ঝাট মোচ দাড়ী কাট॥
কোথায় হাজাম, কোথায় মোকাম, কোথায় কার বাট।
দাড়ী কেচ্চে দিয়ে কাট, দাড়ী কেচ্চে দিয়ে কাট॥
তিতুমীরের গলা ধরি নসরদ্দি কয়।
তোমার বুদ্ধিতে মামু ঠেকলাম এবার দায়॥
এসেছে রাঙ্গা গোরা, উর্দ্দি পরা ব্যাতের টোপর মাথায়।
এরা ছাড়ছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরত গুলি মানলেনা।
সারলে ইংরাজে মামু! এবার আর জানে রাখলে না॥"

এইরূপে তিতুর বিদ্রোহ দমন হইলে নদীয়ায় আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল; ১৮৪১ অব্দে রাজা গিরীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইলে তাঁহার দত্তক পুত্র শ্রীশচন্দ্র জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট বিষয়ের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। ইনি উদ্যোগী হইয়া নদীয়া জেলাস্থ অনেক ভদ্রলোককে সমবেত করিয়া নিজ প্রাসাদে এক সাধারণ হিতকারী সভা স্থাপন করেন। এই সভার উদ্যোগে নদীয়াবাসীগণের একটি মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তির নিষ্কর ভূমি গবর্ণমেন্ট সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, এই সভা ভূম্যধিকারীদিগের দ্বারা আবেদন করাইয়া গবর্ণমেন্টকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

১৮৪৪ অব্দে সার হেনরি হার্ডিঞ্জ সাহেব গবর্ণর জেনারল মনোনীত হয়েন। ইনি সাতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং দেশে হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয় নামে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে এক

শত একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছিলেন। ইঁহারি রাজত্বকালে ১৮৪৬ অব্দের ১লা জানুয়ারি মহাসমারোহে কৃষ্ণনগর কলেজ খোলা হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েন। এই সময় হইতে নদীয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে দেশময় "বিধবা বিবাহের" এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ে অগ্রণীরূপে দণ্ডায়মান হন। বিধবা বিবাহের আন্দোলন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইলেও এই সময়ে ইহা দেশ মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয় বিশেষতঃ এবিষয় আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে রক্ষণশীল হিন্দুমাত্রেই মহা আপত্তি উত্থাপন করেন; এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে নদীয়া জেলার "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি বহু কবিতা প্রকাশিত হয়[১০] এবং শান্তিপুরের তাঁতিগণ কাপড়ের পাড়ে ঐ সকল গীত লিপি-বদ্ধ করে। হিন্দু মাত্রেই তখন এ বিষয়ে কর্ত্তব্যাবধানের নিমিত্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের মুখাপক্ষী হয়েন। কথিত আছে বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবার পুনঃ সংস্কার শাস্ত্র সম্মত কিনা এ বিষয়ে বিচারার্থী হইয়া নবদ্বীপে আসিলে তত্রস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং পাকার্থ তণ্ডুল ও অন্যান্য দ্রব্য সজ্জিত করিয়া রন্ধনের নিমিত্ত গঙ্গাতীর হইতে এক উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্র আনিয়া প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঙ্গিতে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমতের আভাষ পাইয়া সে যাত্রা বিনা বিচারেই প্রত্যাগমন করেন। যাহা হউক পরে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়।[১১]

১৮৪৮ অব্দে লর্ড ডালহোসী গবর্ণর জেনারল হয়েন। তাঁহার শাসন কালে কলিকাতার বিশ্ব বিদ্যালয়ের সূত্রপাৎ ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রাণ্ট ইন এড-সিষ্টেম্ প্রবর্ত্তিত হয় এবং নদীয়ার কলেজ ও দুই একটী স্কুলে উক্ত সাহায্য প্রদত্ত হয়। তাঁহার যত্নে এ দেশের যে সকল উন্নতি বিধান হইয়াছিল তাহার মধ্যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টল ডিপার্টমেন্ট এবং পূর্ত্ত বিভাগ সর্ব্বপ্রধান।

১৮৫৩ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পার্লিয়ামেন্ট হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হন তাহাতে বাঙ্গালায় লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর নামে একজন সতন্ত্র শাসন কর্ত্তা নিয়োগের আদেশ থাকে এবং এতদ্দেশবাসীগণ বিলাত যাইয়া সিভিল সার্ব্বিশ দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ সালের ১লা এপ্রেল তারিখে সার্ ফ্রেডরিক হ্যালিডে বাহাদুর বাঙ্গালার প্রথম লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর নিযুক্ত হয়েন[১২] ইনি বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হইয়াই প্রজাকুলের অবস্থা পরিদর্শন মানসে ষ্টীমার আরোহণ করিয়া জলপথে তাঁহার এলেকাধীন প্রধান প্রধান স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং তদনুসারে মাথাভাঙ্গা নদী বহিয়া নদীয়া জেলা পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। এবৎসর নদীয়ায় দারুণ প্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল;[১৩] এবং সে কারণে প্রজা সাধারণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছিল। ডাঙ্গাডহর এক হইয়া যাওয়ায় বহু গবাদি গৃহপালিত পশু ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

এইকালে (১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) হিন্দুগণের চড়ক পূজা উপলক্ষে বাণফোঁড়া

জিবফোঁড়া, কাঁচি, ছুরি, খুর, প্রভৃতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের উপর উচ্চ হইতে পতিত হওয়া প্রভৃতি নির্ম্মম অনুষ্ঠানের প্রতি কেরী প্রমুখ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু তদানীন্তন উন্নতমনা বঙ্গেশ্বর হ্যালিডে বাহাদুর ইহা জনসাধারণ স্বইচ্ছায় করে বলিয়া আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত করিতে অস্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ বিশেষ মিসিনারী এবং গ্রাম্য পণ্ডিতগণের প্রতি সাধারণকে বুঝাইয়া এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পরামর্শ দেন। যাহা হউক এ বিষয়ে পুনরায় বঙ্গেশ্বর গ্রাণ্ট বাহাদুরের শাসনকালে আন্দোলন হয় এবং বঙ্গেশ্বর নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে জনসাধারণকে বুঝাইয়া কচিৎ পুলিসের সাহায্য লইয়া দমন করিতে সমর্থ হন এবং তিনি এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

এই সময়েই নদীয়ায় তামাকের চাষ বিশেষভাবে জাঁকিয়া উঠে এবং কি স্বদেশ কি বিদেশেও উহা জাহাজযোগে প্রেরিত হইতে থাকে। কথিত আছে যে নদীয়া জেলাতেই দিল্লীশ্বর সাহানসা আকবরের সময় হইতেই প্রথমে তামাকের আবাদ আরম্ভ হয়।[৭৪] অদ্যাপি নদীয়ার সর্ব্বত্র বিশেষতঃ নদীয়ার অন্তর্গত বাগআঁচড়া, মহেশপুর, উত্তরাংশস্থ চাকদহ মদনপুর হরিণঘাটা কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি স্থানে নদীয়ার তামাকের চাষ বিশেষভাবে হইয়া থাকে।

১৮৫৬ অব্দে লর্ড ক্যানিং বাহাদুর ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন। ইঁহার শাসনকালে ১৮৫৭ অব্দে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর পরে ভয়ানক সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহ বৃটিশ রাজত্বের মূল পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল কিন্তু সুকৌশলী সহৃদয় দয়ালু ক্যানিংয়ের সদাশয়তায় শীঘ্রই বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই দুর্দিনে নদীয়া যদিও প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই, তথাপি স্বাভাবিক উদ্বেগ আবেগ ও ভীতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। নদীয়া বলিলে সে সময়ে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগকে বুঝাইত। ব্যারাকপুর বহরমপুর ছাউনির সিপাহীদের কতক বিদ্রোহী হইলে তাহাদের দমনের জন্য সৈন্যাদি প্রেরণ করায়, শান্তিপ্রিয় অধিবাসীগণের মনে স্বতঃই একটা অশান্তি ও আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। এতাবৎ বাঙ্গালা ও অন্যান্য বৃটিশাধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন ছিল। বিদ্রোহ শান্তির পর ১৮৫৮ অব্দের ১লা নভেম্বর এলাহাবাদের দরবারে লর্ড ক্যানিং বাহাদুর এই মর্ম্মে দয়াময়ী ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে কোম্পানীর হস্ত হইতে এদেশের শাসনভার মহারাণী স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রজাসাধারণের জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুমোদিত বিচার দ্বারা তাঁহাদের স্বত্ব রক্ষা করিবেন এবং উপযুক্ত দেখিলেই রাজ্যের সর্ব্ববিধ উচ্চপদে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। গবর্ণর জেনারেলগণ তদবধি রাজপ্রতিনিধী "ভাইসরয়" নামে অভিহিত হইলেন।

১৮৫৮ অব্দে এক দিকে সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হওয়াতে যেমন দেশে শান্তি পুনস্থাপিত হইতেছিল[৭৫] তেমনি আবার নদীয়া যশোহর পাবনা প্রভৃতি নীল প্রধান

জেলাতে দেশীয় ও বিদেশীয় বহু নীলকরের সহিত চাষী রায়তগণের বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছিল। একদিকে রায়তগণ যেমন কোন কোন নীলকরের অত্যাচার কাহিনী গবর্ণমেন্টের গোচর করিতেছিলেন, তেমনি অপরদিকে নীলকরগণও স্থান বিশেষের রায়তগণের দাদন লইয়া কার্য্য না করা প্রভৃতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা গবর্ণমেন্টকে জ্ঞাপন করিতেছিলেন।

১৮৫৯ অব্দে সদাশয় সারজন পীটার গ্র্যান্ট মহাশয় বঙ্গেশ্বর রূপে এদেশের শাসনভার হস্তে লয়েন। এ সময়ে নদীয়া ও যশোহর জেলার বহু প্রজা ও জমিদার বর্গের সহিত অনেক অত্যাচারী নীলকরের প্রকাশ্যভাবে বিবাদ বাধিয়া উঠে এবং লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় যে আর নীলের দাদন লইবে না বা নীলের চাষ করিব না; সুতরাং ঐ বিষয়ে তখন মহামান্য গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হইয়া উঠে।

এই সময়ের অবস্থা এতই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে তদানীন্তন উদার-হৃদয় রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাদুর তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান নীলকর ব্যাপারে প্রায় সপ্তাহব্যাপী আমার এতই উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে বুঝি দিল্লীর ব্যাপারেও তত হয় নাই। আমি ক্রমাগত ভাবিয়াছি কোন এক নির্ব্বোধ নীলকর যদি ভয় বা ক্রোধ পরবশ হইয়া একটিমাত্র প্রজাকেও গুলি করে তবে সেই মুহূর্ত্তেই নিম্ন বঙ্গের সকল কুঠীগুলিই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে।"[৭৬]

দেশের যখন এইরূপ ভয়ানক অবস্থা তখন সদাশয় গবর্ণর গ্র্যান্ট মহোদয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কিসে অশান্তি ও বিপ্লবের হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভবানীপুর বাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান হরিশ্চন্দ্র প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইয়া "পেট্রিয়টে" লেখনী ধারণ করিলেন এবং প্রতিদিন স্বয়ং সহস্র সহস্র প্রজাকূলকে প্রজাপালক গবর্ণমেন্টের নিকট বিচার প্রার্থী হইবার জন্য সৎপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন।[৭৭] চতুর্দ্দিক হইতে নীলকরগণের মধ্যে যাহারা অত্যাচারী তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল কিন্তু ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে অকালে হরিশের মৃত্যু হইল।[৭৮] যাহাই হউক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার সুফল ধরিয়াছিল। কারণ প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় সুশাসক গবর্ণমেন্ট "ইণ্ডিগো কমিসন" নামে নীলকর কৃত অত্যাচারের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত এক কমিসন নিযুক্ত করেন।[৭৯]

এই কমিসনের সভ্যগণ ১৮ই মে কৃষ্ণনগরেই প্রথম অধিবেশন করিয়া প্রকাশ্যভাবে নীলকর ব্যাপারের তদন্ত আরম্ভ করেন। তিন মাস ব্যাপী কমিসন সর্ব্বসমেত ১৩৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ১৫ জন গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন মিসিনরী, ১৩ জন জমিদার এবং ৭৭ জন রায়ত বা প্রজা। এই কমিসনে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু জয়চাঁদ পাল চৌধুরীর সাক্ষ্য মাননীয় বঙ্গেশ্বর বাহাদুর বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া প্রশংসা করেন।[৮০]

এদিকে যখন কমিশন প্রজাগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সদাশয় বঙ্গেশ্বর গ্র্যান্ট মহোদয় কার্য্যান্তর ব্যাপদেশে নদীয়া ও যশোহর মধ্যে প্রবাহিনী "কুমার" ও

"কালী গঙ্গা" দিয়া ষ্টীমার আরোহণে গমন করিতেছিলেন। তিনি বলেন "তখন নদী-তীরে দলে দলে প্রজাগণ সমবেত হইয়া আর নীল বুনিব না আপনি অনুমতি করুন এই কাতর প্রার্থনা উপস্থাপিত করে।"[৮১]

এইকালে স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হইল। নীলদর্পণ প্রকাশ হইবা মাত্র দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

এই নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ ব্যাপার লইয়াই সুবিখ্যাত জেমস্ লং সাহেব ও মানুয়েল সাহেবের ঐ পুস্তকের অনুবাদক ও প্রকাশক বলিয়া কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়, ইহা লইয়া সে সময়ে দেশে হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

এইরূপে নীলদর্পণের শেষ যবনিকা পতন হইলে বটে, কিন্তু এ বিষয় লইয়া বহুদিন ধরিয়া গবর্ণমেন্টের বহু কাগজ, কলম, কালী ব্যয়িত হইয়াছিল।[৮২] পরে বহু বাদানুবাদের পর মহামান্য সদাশয় প্রজাপালক গবর্ণমেন্ট, যাহাতে অসহায় প্রজাগণের উপর অযথা অত্যাচার না হয় এবং তাহাদের নিজ নিজ সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বামিত্ব সম্পূর্ণ বজায় থাকে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত ই, জ্যাকসন্ সাহেবকে নদীয়ার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। এ সময়ে সহৃদয় ডবলিউ, জে, হারসেল্ সাহেব নদীয়ার স্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। সদাশয় গ্রাণ্ট মহোদয় নদীয়ায় কেবল অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; যাহাতে সুদূর মফঃস্বলেও অত্যাচারী নীলকর বা জমিদার অসহায় প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিতে না পারে এবং যাহাতে প্রত্যেক প্রজা সহজেই রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে সেই নিমিত্ত সমগ্র নদীয়া ডিভিসনকে—যাহা এক্ষণে প্রেসিডেন্সী ডিভিসন বলিয়া খ্যাত—কয়েকটী সবডিভিসনে বিভক্ত করিয়া[৮৩] উহা এক, এক জন ডেপুটীর অধীন করেন এবং প্রত্যেক সবডিভিসনের হেড কোয়ার্টার, গমনাগমনের সুবিধার্থ রেল, নদী বা বৃহৎ রাজবর্ত্ম সন্নিকটে স্থাপন করেন। এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তীকালাপেক্ষা বিচারালয়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলে এক দিকে প্রজাকুল অত্যাচারী নীলকর বা জমীদারের হস্ত হইতে যেমন নিষ্কৃতি পাইতে লাগিল তেমনি অপরদিকে জেদে পড়িয়া তাহাদের মকর্দ্দমা চালাইবার ঝোঁক বৃদ্ধি হইতে লাগিল।[৮৪]

পূর্ব্ব হইতেই নদীয়ায় করীমপুর, শান্তিপুর ও দামুরহুদা প্রভৃতি স্থানে সব-ডিভিসনের ন্যায় ২।১টী ক্ষুদ্র বিভাগ ছিল বটে[৮৫] কিন্তু ১৮৬০ অব্দে মহামতি গ্রাণ্ট নদীয়া বিভাগকে রীতিমত চারিটী ডিষ্ট্রীক্ট ও ১৮টী প্রধান সবডিভিসনে বিভক্ত করেন এতৎ এই ১৮টী সবডিভিসনের ১৮টি মহকুমা নির্দ্দিষ্ট করেন;— ১। কুষ্টিয়া, গঙ্গা ও ই বি, এস, রেলওয়ের উপর অবস্থিত। ২। মেহরপুর। ৩। ঝিনেদহ—নবগঙ্গার উপর। ৪। চুয়াডাঙ্গা—ই, বি, এস, রেলওয়ের উপর। ৫। কৃষ্ণনগর (সদর)। ৬। মাগুরা—নবগঙ্গার উপর। ৭। কোটচাঁদপুর—রেলওয়ে হইতে পাকা রাস্তার উপর। ৮। নড়াইল। ৯। যশোহর (সদর)। ১০। বনগ্রাম—সরকারি বড় রাস্তার উপর। ১১। শান্তিপুর—(বর্ত্তমান রাণাঘাট)। ১২ খুলনা এখন খুলনা সদর। ১৩। সাত-

ক্ষীরা। ১৪। বসিরহাট। ১৫। বারাশত। (এই নামের ডিষ্ট্রীক্‌ট এই সময়ে উঠাইয়া দিয়া উহাকে সবডিভিজন করা হয়)। ১৬। আলিপুর (সদর)। ১৭। পোর্ট মাতলা (বর্ত্তমান বারুইপুর)—কলিকাতায় যাইবার রাস্তার উপর। ১৮। ডায়মণ্ড-হারবার। এতদ্ব্যতীত বারাকপুর ও দমদম ক্যান্টনমেন্টকে ২টী ক্ষুদ্র সবডিভিজন করিয়া তুইজন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন করা হয় ও শিয়ালদহে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রাখা হয়।

এতন্মধ্যে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর, চুয়াডাঙ্গা, শান্তিপুর ও বনগ্রাম লইয়া ক্ষুদ্রাকারে নদীয়া জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। নদীয়ার বিস্তৃতি পূর্ব্বে মুসলমান শাসনে যাহা ছিল এ সময়ে তাহাপেক্ষা বহু হ্রাস করা হয় এবং পরবর্ত্তী কালে বনগ্রামকে যশোহরের অন্তর্গত করায় ক্রমে উহা আরও ক্ষুদ্র কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নদীয়ার রাজস্বও এই কারণে কমিয়া গিয়াছে।[৮৬]

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ১৮৬২ অব্দে হিতকামী রাজার প্রজারক্ষার কল্যাণকর বিধানে নদীয়ায় এবং অন্যান্য নীলকর প্রপীড়িত জেলার আভ্যন্তরীন শান্তি পুনস্থাপিত হইলে, সার সিসিল্ বিডন সাহেব বাহাদুর বঙ্গের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। ইঁহার ৫ বৎসর কাল ব্যাপী রাজত্ব কালের মধ্যে নদীয়ায় এক হৃদয় বিদাকর তুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়। এই বৎসর নদীয়ার বিভিন্ন গ্রাম সমুদায়ে বিশেষতঃ নিম্ন ও আদ্র ভূমিতে এক প্রকার রোগের উৎপত্তি হয় যাহা ক্রমে মহামারী আকার ধারণ করিয়া গ্রামকে গ্রাম জনহীন, করিয়া দিয়াছিল। যে পবিত্র ধাম পূর্ব্বে স্বাস্থ্য ও উৎকৃষ্ট জল বায়ুর জন্য সুবিখ্যাত ছিল—যে নদীয়ায় পূর্ব্বকালে ইউরোপীয়গণও স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত আগমন করিতেন—যে স্থানে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনর্গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বহুদর্শী চিকিৎসকগণের ব্যবস্থানুযায়ী তদানীন্তন ইংরাজ কোম্পানীর গবর্ণর বাহাদুর আসিয়া বহুদিন যাপন করিয়াছিলেন[৮৭] এবং যে নদীয়ার উৎকৃষ্ট জল বায়ু হইতে তাঁহার বিনষ্ট স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া কিছুদিনে আবার তিনি রোগগ্রস্থ হইলে নদীয়ার পুনরাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,[৮৮] সেই স্বাস্থ্যময় ভূস্বর্গ নদীয়া এই সময় মহামারীর দারুণ কবলে এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। যে দিকে তাকাইবে সেই দিকেই কেবল বিষাদপূর্ণ শোকের দৃশ্য। রাস্তা ঘাট জনহীন—ক্বচিৎ তুই একজন বৈদ্য এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছে অথবা শিবাদল ও সারমেয় সম্প্রদায় শ্মশান হইতে বা গৃহ হইতে শব দেহ সংগ্রহ করিয়া ভীষণ কোলাহল করিতেছে। প্রথম প্রথম লোকে শবাদি শ্মশানে লইয়া দাহ করিতেছিল কিন্তু ক্রমে শব সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্মশানে আর স্থান না পাইয়া যেখানে সেখানে দাহ করিতে বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিতে থাকে। ক্রমে যখন সকলেই রোগগ্রস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল তখন আর কে কাহাকে শ্মশানে লইয়া যায়—কাজেই লোক গৃহাভ্যন্তরে মরিয়া পচিতে আরম্ভ করিল। গ্রামস্থ ২।১ জন যাহারা কোনরূপে নিস্তার পাইতে লাগিল তাহারা ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়নপর হইল। এইরূপে কত সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল—কত

বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী জনহীন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িল এবং কত শত শত গ্রাম, শিবাকুল ও শকুনী-গৃধিনী-পিশাচের ক্রীড়া ভূমিতে পরিণত হইল। এইরূপে যে সমস্ত গ্রাম শ্রীহীন হইয়া পড়িল নদীয়ার সমৃদ্ধ শোভাময় প্রাচীন গ্রাম বীরনগর তাহাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ যোগ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে এই বীরনগরেই প্রথম অশুভ তিথি নক্ষত্রাদি সঙ্গম-কালে, একটী শব বাহকগণের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হওয়ায় নদীয়ায় এই দারুণ দুর্দ্দৈব সংঘটিত হয় এখনও আমরা নদীয়াবাসী সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে প্রাচীনের নিকট একাগ্রমনে কত বিভীষিকাময় ভূত পিশাচ ঘটিত এই জনহীন বীরনগরের অবীরোচিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠি। কতদিন গত হইয়াছে কিন্তু বীরনগরের স্বাস্থ্য বা পূর্ব্বশ্রী কিছুই প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই; এখনও বীরনগরের শ্রীহীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে সেই মহামারীর নিদারুণ মূর্ত্তির অস্পষ্ট ছায়া কিছু কিছু উপলব্ধি হয়।

১৮৬২ সালের শেষভাগে এবং পরবর্ত্তী কালে যখন এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি নদীয়াকে কবলিত করিয়া যশোহর বারাসাত, বর্দ্ধমান, হুগলীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল;[৮৯] এবং সেই সেই স্থানেও অসম্ভবরূপ লোকক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল তখন গবর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ডাক্তার জে, ইলিয়ট নামে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসককে এই সর্ব্বনাশী ব্যাধির কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার ব্যাধিগ্রস্থ স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা বিশেষ কার্য্যকারী হয় নাই, তবে তাঁহার নির্দেশানুযায়ী অনেক গ্রামে জঙ্গলাদি কর্ত্তন করিয়া বা দাহ করিয়া ও পুলিস সাহায্যে পুষ্করিণী প্রভৃতি কেবল পানীয়র নিমিত্ত নির্দ্ধারণ করিয়া ও ডোবা ও বৃহৎ গর্ত্তাদি পরিপূরিত করিয়া এবং গ্রামাদির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্তু রোগ দমনে এ সকল অতি সামান্যই কার্য্যকারী হইয়াছিল। কারণ পরবর্ত্তী কালে বিশেষতঃ ১৮৮১ অব্দে নদীয়ায় ইহার প্রকোপ ও প্রতাপ অত্যাধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মৃত্যুসংখ্যা একেবারে চরমে উঠিয়াছিল। এক শত জনের মধ্যে ন্যূন্যাধিক ৬০।৭০ জন প্রানত্যাগ করিয়াছিল। দেশের বিভীষিকাময় হৃদয় বিদারক সেই শোকের ছবি বর্ণনা করিতে হস্ত হইতে লেখনী স্খলিত হইয়া পড়ে! এই সময় সদাশয় গবর্ণমেণ্ট অত্যাধিক প্রজাহানী দর্শন করিয়া সবিশেষ বিচলিত হইয়া উঠেন এবং বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও ঔষধ দাতব্য হিসাবে গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করেন, কিন্তু কোনরূপেই এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিতে না পারিয়া ইহার কারণ নির্দ্দেশার্থ ১৮৮১ অব্দে এক কমিসন নিযুক্ত করেন। কমিসন সমগ্র শীতকাল গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া জমিদার ও জনসাধারণকে বিশুদ্ধ পানীয়ের উপকারিতা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহারা পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ব্যাধির কোন বিশিষ্ট কারন নির্দ্দেশ হইতে পারে না—তবে সংক্ষেপতঃ বলা যায় যে, জনসাধারণ নিজে নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখলে এবং লোকালবোর্ড গ্রামাদি সংস্কারে মনোযোগী হইলে কালে এ ব্যাধি দেশ হইতে বিদূরিত হইতে পারে। এই সময়ে নদীয়ার মধ্য স্থল দিয়া

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল লাইনের নিমিত্ত মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় অনেকের মনেই এই ধারণা হয় যে রেলের উচ্চ ভূমির দ্বারা জল নিষ্ক্রামনের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হওয়ায় এই দারুণ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছে[২০] কিন্তু কমিসন তদন্তে প্রকাশ করেন যে রেল রাস্তা প্রভৃতিতে জল নিষ্কাশনের যেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা অধিকাংশ স্থলে বিশিষ্টরূপ বর্ত্তমান থাকায় ইহা ব্যাধির কারণ হইতে পারে না। পরিশেষে সমগ্র বিষয় অনুধাবন করিয়া বঙ্গেশ্বর সার জি, কাম্বেল বাহাদুর ১৮৭১ অব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েন যে "উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিক উপায়ের সহায়তায় আমরা এই ব্যাধি প্রশমনে যতই কেন প্রয়াস পাই না এখনও চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন কোন উপায় উদ্ভাবন হয় নাই এবং বহুদিনেও হইবে কিনা জানিনা যদ্দারা দেশ হইতে এই ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিতে পারা যাইবে।"[২১] এই রূপে বহু বর্ষ ধরিয়া এবং ক্রমান্বয়ে বঙ্গেশ্বর সার সিসিল বিডন, সার উইলিয়ম গ্রে, সার জর্জ কাম্বেল, সার রিচার্ড টেম্পেল এবং সার এস্‌লি ইডেন বাহাদুরের শাসনকাল পর্যন্ত দেশ বিদ্ধস্ত করিয়া এখন দারুণ ম্যালেরিয়ারূপে ইহা সমগ্র বঙ্গবাসীর অস্থি মজ্জায় প্রবেশ পূর্ব্বক জীবনের সারভূতশক্তি সামর্থ হরণ করিয়া দেশে সম্ভবাতীত অকাল মৃত্যুর আকর স্বরূপ বিরাজ করিতেছে, জানিনা কত দিনে কিম্বা আদৌ কখনও বঙ্গবাসী ইহার করাল কবল হইতে পরিত্রান লাভ করিবে কি না?

সার সিসিল বিডন মহোদয়ের আর এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি ১৮৬৪ অব্দে মফঃস্বলের মিউনিসিপালিটি ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। দেশের স্বাস্থ্য এই সময়ে একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি জেলাস্থ প্রধান প্রধান স্থানে মিউনিসিপালীটি স্থাপনে মনোযোগী হয়েন। তদনুসারে ঐ বৎসর ২১ সেপ্টেম্বর তরিখে নদীয়া জেলার সর্ব্ব প্রথম রাণাঘাটে এবং ১লা নবেম্বর তরিখে কৃষ্ণনগরে দুইটী আদর্শ মিউনিসিপালীটা স্থাপিত হয়, পরে ঐ দুইটীর দ্বারা সন্তোষজনক ফল লাভ হইলে ১৮৬৫ সালের ১১ জানুয়ারী শান্তিপুরে ও ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল নদীয়া, কুষ্টিয়া, কুমারখালি, মেহেরপুর এবং পরিশেষে ১৮৮৬ অব্দের ১লা মে তারিখে চাকদহে এক একটী মিউনিসিপালীটী স্থাপিত হয়। এবং ১৮৬০ অব্দে কৃষ্ণনগর দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮৬৩ অব্দে কুষ্টিয়ায়, ১৮৬৪ অব্দে রাণাঘাট ও চাকদহে ও চুয়াডাঙ্গায়, ১৮৬৮ অব্দে মেহেরপুরে, ১৮৭০ অব্দে কুড়ালগাছিতে ও শান্তিপুরে এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

সার সিসিল বাহাদুরের শাসনকাল নানারূপে নদীয়ায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইহাঁরই সময় ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কলিকাতা হইতে নদীয়ার উত্তর সীমা কুষ্টীয়া পর্য্যন্ত প্রথম খোলা হয়। কার্য্যতঃ এই রেল খুলিবার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫২—৫৩ খ্রীঃ অব্দে ইহার নিমিত্ত প্রথম প্রস্তাব উত্থিত হয় তদনুসারে ১৮৫৪ অব্দে লেফটেন্যান্ট গ্রেট হেড নামক একজন দক্ষ এনজিনিয়ার কলিকাতা হইতে ঢাকা, তথা হইতে চট্টগ্রাম ও তথা হইতে আকোয়াব পর্য্যন্ত জরীপ করিতে নিযুক্ত হয়েন। ইতি মধ্য মিষ্টার পাউন নামে একজন এন্‌জিনিয়ার কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত পথের নক্সা ও পদ্মার উপর একটি ব্রীজের অদর্শ অঙ্কন করিয়া গভর্ণমেণ্টে পেশ করেন, তদনুসারে ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে

৩০এ জুলাই ১৪৭৫৯৬৭২ পাউণ্ড মূলধনে লণ্ডনে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কম্পানী গঠিত হয়, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ঐ পথের কণ্ট্রাক্ট বিলি হয় পরে ১৮৬১ অব্দের ১৬ নভেম্বর তারিখে ঐ পথে প্রথম যাত্রী গাড়ী চলিয়াছিল। পরে পরবর্ত্তী শাসন কর্ত্তা সার রিভার টমসনের সময় ১৮৭৭ অব্দের ১লা এপ্রিল এই রেল গবর্ণমেণ্টের খাস অধীনে আইসে এবং ইহার ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে নাম করণ হয়। যে দিন প্রথম এই রেলপথে লৌহশকট চলিয়াছিল সে দিন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। দলে দলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা দূরান্তর হইতে আসিয়া লাইনের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গাড়ীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং অনেকেই কিরূপে লৌহ শকট অতলোক ও গাড়ী লইয়া অত দ্রুত আসিবে সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে ই, আই, আরের গাড়ী দেখিয়াছিল তাহারা অনেক বুঝাইলেও অন্যান্য সকলে কিছুতেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না করিয়াছিল ততক্ষণ এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। পরে যখন বংশীধ্বনি করিয়া প্রথম গাড়ী দেখা দিল—ঐ সমবেত সোৎসুক জনসমুদ্র বিশেষ কৌতুহলী হইয়া আনন্দ মিশ্রিত এক কোলাহল উত্থাপিত করিল এবং স্ত্রীলোকগণ কল্যাণ সূচক হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। এইরূপে ই বি লাইন প্রথম কৌতুহলী জনসঙ্ঘ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেশ মধ্যে ক্রমবিস্তার লাভ করিয়া আসিতেছে। যখন প্রথম ই, বি, লাইন খোলা হয়, তখন গাড়ীতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারি শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। স্ত্রীলোকগণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গাড়ীর বন্দোবস্ত থাকিলেও সমৃদ্ধ ঘরের স্ত্রীলোকগণ সাধারণের সহিত তখন গাড়ীতে উঠিতেন না। তাঁহাদের পালকী গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইত,—তখন নদীয়ার মধ্যে কাঁচড়াপাড়া, চাকদহ, রাণাঘাট, বগুলা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া এই কয়টী ষ্টেশনে প্রধানতঃ যাত্রী ও মাল যাতায়াত করিত।

১৮৬৪ অব্দে ৫ই অক্টোবর এক দৈব দুর্ব্বিপাকে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জের নিকট হইতে এক আবর্ত্তনময় মহা ঝটিকা উত্থিত হইয়া বরাবর উত্তরমুখে ঘন্টায় ২৬ মাইল বেগে ধাবিত হয়। উহা বাঙ্গালা ১২৭১ সালে আশ্বিন মাসে সংঘটিত হওয়ায় "একাত্তুরে ঝড়" বা "আশ্বিনে ঝড়" বলিয়া খ্যাত। অতি বৃদ্ধের মুখেও শুনা যায় এরূপ ভয়ঙ্কর ঝটিকা তাঁহারা কখন গল্পেও শুনেন নাই। যদিও ১৮৪২ অব্দে এবং ১৮৫২ অব্দের মে মাসে দুইটী প্রবল ঝটিকা সংঘটিত হইয়াছিল কিন্তু এরূপ সর্ব্বধ্বংশী সর্ব্বনাশী ঝড়ের সহিত তুলনায় সে দুটী কিছুই নহে। তখন মাত্র রেল খুলিতেছে, লোকে তখনও নদী দিয়াই বেশ দেশান্তরে গমন করিতেন। বিশেষতঃ পূজার সময় যিনি যেখানে বিদেশে ছিলেন সকলেই নৌকাযোগে নিজ নিজ জন্মভূমিতে আগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূজার পঞ্চমী দিনে বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৪টা অবধি ভীষণরূপে ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া ও ... কা বারিপাতে এক মহা প্রলয়ের সূচনা হইয়াছিল এবং নদী বক্ষঃস্থ সমস্ত নৌকা ও জাহাজ একেবারে চিহ্ন রহিত হইয়া ধ্বংস হইয়াছিল। প্রভঞ্জনের সেই ভৈরব ভীম মূর্ত্তি, স্বভাবের এই অস্বাভাবিক আক্রোশ,

সেই সুতীক্ষ্ণ ভেরী নিনাদবৎ কর্ণভেদী হুহুঙ্কার যে কেহ দেখিয়াছে বা শ্রবণ করিয়াছে সে ইহজন্মে আর ভুলিবে না। এই ভয়ঙ্কর ঝটিকায় নদী সকল উদ্বেলিত হইয়া যে মহাপ্লাবন আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে আজিও শরীর শিহরিয়া উঠে ও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গবর্ণমেন্টের রিপোর্টে প্রকাশ এই প্লাবনে ১৫০০ বর্গ মাইল প্লাবিত হইয়া ৪৭,৮০০ মনুষ্য ১৩৬,০০০ গবাদি পালিত পশু, ১,০০,০০,০০০ টাকা মূল্যের জলযানাদি ও ৪,৫০,০০০ টাকা মূল্যের গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি অননুমেয়রূপে নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। এই বিপদে সদাশয় গবর্ণমেন্ট দুঃস্থ, নিরাশ্রয়, নিরন্ন ব্যক্তিবর্গকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভগবানের রাজ্যে কিছুই একেবারে ভাল বা একেবারে মন্দ হয় না। এই সর্ব্বনাশী বিপদেও নদীয়ার এক মহান উপকার সাধিত হইয়াছিল। যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি, মহামারী আকার ধারণ করিয়া নদীয়ার অগণিত লোকের কালস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কিছুদিনের নিমিত্ত দেশ হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছিল।[২২] কিন্তু শীঘ্রই হতভাগ্য দেশ আবার উহার কবলে পতিত হয়।

১৮৬৪ অব্দের মহা ঝটিকায় নদীয়া জেলা একরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল বলা যায়। বিশেষতঃ পর পর দুই বৎসর পর্যন্যদেব কালে বর্ষণ করিতে কৃপণতা প্রকাশ করায় শস্যাদির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। যদিচ সায়েস্তা খাঁ বা নবাব সুজার সময়ের ন্যায় টাকায় অষ্ট মণ চাউল আর কখনই বিক্রয় হয় নাই তথাপি লোকে তখনও টাকায় একমণ, ত্রিশ সের চাউল অনায়াসে ক্রয় করিত এবং এতদপেক্ষা মূল্যাধিক্য হইলেই বিশেষ কষ্টে পতিত হইত। ১৮৫৯ অব্দের প্লাবনের পর ১৮৬০ অব্দে ২৸০ টাকা মণ চাউল বিক্রয় হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।[২৩] এই কষ্টসাধ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে না হইতে দেশে মহা ঝটিকা সংঘটিত হয় এবং ১৮৬৬ অব্দে দেশে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী কঙ্কাল বেশে দর্শন দেয়। প্রথমে দীন দুঃখী পরে কিছু দিনের মধ্যে অনেকেই ইহার দারুণ কবলে কবলিত হইতে থাকে। যে পরিমাণ চাউল পূর্ব্বে ৩ পয়সা ৪ পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইত তাহাই এক্ষণে চারি আনা বা পাঁচ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল। কিছুদিন পরে মূল্য দিলেও আর মিলিতেছিল না সুতরাং অনেকের পক্ষে পরিত্যক্ত ভাতের ফ্যান বা আমানী কিম্বা গাছের ছাল, পাতা, মূল সার হইয়া উঠিয়াছিল। গবর্ণমেন্ট যদিও পূর্ব্ব হইতেই বাজার দর প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন, তথাপি কার্য্যতঃ প্রথমে কোনও সাহায্য প্রদান করেন নাই। পরে যখন চতুর্দ্দিক হইতে বিশেষতঃ নদীয়া কাপাসডাঙ্গার মিশিনরীগণের পক্ষ হইতে সকরুণ আবেদন গবর্ণমেন্টের গোচর হইল[২৪] তখন নদীয়ার কালেক্টরের উপর এ বিষয়ের তদন্ত করিবার ভার পতিত হইল। কালেক্টার সবিশেষ তদন্ত করিয়া ১৮৬৬ অব্দে ৩০ এপ্রিল যে রিপোর্ট দেন তাহা পাঠ করিলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।[২৫] এই রিপোর্টের ফলে শীঘ্রই অনেক স্থানে সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপিত হইল এবং দলে দলে দুঃস্থ পরিবার আসিয়া সাহায্য প্রার্থী হইল। কিন্তু পরবর্ত্তী জুন মাসে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সদাশয় গবর্ণমেন্ট প্রজার কষ্টে অস্থির হইলেন, তখন বহুস্থানে অন্নছত্রাদি স্থাপন করা হইল এবং কর্ম্মকুশল ব্যক্তিগণকে কাপড়

বুনাইয়া লইয়া সাহায্য দান করা হইতে লাগিল।[২৬] এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের মোট ২৪০০ পাউণ্ড (৩৬৭৫০ টাকা) এবং সাধারণের চাঁদায় ১১০০ পাউণ্ড (১৬৫০০ টাকা) অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। আগষ্ট মাস হইতে আরম্ভ করিয়া অক্টোবর মাসেই এই দুর্দ্দৈবের প্রকোপ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হয় ক্রমে আবার শস্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে। তদনুসারে চলিত চতুর্ব্বিংশতি সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেসরকারি ভাণ্ডার ক্রমে ক্রমে বন্ধ করা হয়। এইরূপে মহামান্য গবর্ণমেন্টের সদাশয়তায় ও যত্নে নদীয়ার সে দুর্দ্দিন গত হয়। তদবধি এইরূপে দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ যখনই দেশে দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় তখনই শ্রমজীবি শ্রেণী অপেক্ষা অধিক কষ্ট হয় দরিদ্র গৃহস্থগণের যাঁহারা সমাজে ভদ্রনামে অভিহিত কারণ সামান্য শ্রমজিবীর ন্যায় কায়িক পরিশ্রমে তাঁহারা অনভ্যস্ত আবার অক্ষমতা বশতঃ তাঁহাদের পক্ষে উপার্জ্জনের অন্য পন্থাও বিরল, এ ক্ষেত্রে ৮।১০টি পোষ্য লইয়া পুত্রাদির লেখাপড়া শিখাইয়া কন্যাদির সৎপত্রে বিবাহ দিয়া "ভদ্রভাবে" সংসার চালান তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কষ্ট কর হইয়া উঠে।[২৭]

১৮৬৬ অব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষের কোপ প্রশমন হইতে না হইতেই নদীয়ায় আবার এক ভয়ঙ্কর দৈব বিপাক উপস্থিত হয় উহা সাধারণতঃ ৭৪ সালের বন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নদীয়ায় বার বার এতই জল প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে যে বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেকটীর উল্লেখ অসম্ভব।[২৮] নদীয়া জেলায় এতই নিম্নভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বর্ত্তমান যে, যে বৎসর একটু অধিক পরিমাণে বারিপাত হয় সেই বৎসরেই নদীয়ায় বন্যা হয়। এ সম্বন্ধে চলিত পদ "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বাণ"—এটী সার্থক লেখা মনে হয়। কারণ টাপুর টুপুর অর্থাৎ সামান্য মাত্র বর্ষণ হইলেই নদীয়ায় যত বাণ আসে এত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিগত ১৮৬৭ অব্দে নদীয়া ও যশোহরে যেরূপ বন্যা আসিয়াছিল এতদঞ্চলে বহুকাল সেরূপ সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ইহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেরূপ ক্ষতি হইবে অনুমান করা হইয়াছিল তাহা হয় নাই। বন্যার জল নামিয়া যাইলে সাধারণতঃ যেরূপ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুরন্ত ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় সেবৎসর সে রূপ কিছুই হয় নাই।

১৮৬৭ অব্দের বন্যার পর নদীয়ায় পর পর আরও কতকগুলি দৈব দুর্ব্বিপাক সংঘটিত হইয়াছিল। ১৮৬৮ অব্দে বাঙ্গালা ১২৭৫ সনে, ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে, শ্রাবণ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া সমগ্র নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। আবার এই মহাবৃষ্টির প্রকোপ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৯ অব্দে বা বাঙ্গালা ১২৭৬ সনে ২৮ আষাঢ় সমগ্র দিবাভাগ ব্যাপি প্রবল ঝটিকায় ও বৃষ্টিতে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট সংঘটিত হয় এবং পুনরায় পরবর্ত্তী ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বা ১২৭৮ সালের দারুণ প্লাবনে কত শত শত গৃহস্থ নিঃসহায়-সম্পত্তি হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সে বৎসর ভাগিরথীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া মুরসিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহরে দারুণ প্লাবন আনয়ন করিয়াছিল। মুরসিদাবাদের পাদদেশে যে বাঁধ ভাগিরথীর প্লাবন নিবারণের

নির্ম্মিত বর্ত্তমান আছে তাহা জল বেগে ধ্বংস হওয়ায় ভাগিরথীর জল ঘোর বেগে নদীয়া প্লাবিত করিয়া পরিশেষে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের কতিপয় স্থান ভঙ্গ করিয়া যশোহরের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এতদ্বারা নদীয়ায় যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল সেরূপ ক্ষতি আর কোন জেলায় হয় নাই। যদিও বহু নর নারী এই দারুণ দুর্দ্দৈব বশতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বটে কিন্তু গবাদি পালিত পশু এত অধিক সংখ্যক বিনষ্ট হইয়াছিল যে তাহা অপরিমেয়।[৯৯] গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে সাহায্য করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কোনরূপ সাহায্য গৃহিত হয় নাই। যদিও এই দুর্দ্দৈবে নদীয়ার সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল বটে কিন্তু পর বৎসর বন্যাপ্লাবিত মাঠ সকলে অত্যাধিক ফসল উৎপন্ন হওয়ায় প্রজাকুলের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু নদীয়াবাসীগণের ভাগ্যে এসুখ অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার বহু স্থানে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ মাস সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়া গবর্ণমেন্ট প্রজা রক্ষণ করিয়াছিলেন; থানা কালীগঞ্জ নাকাশীপাড়া, তেহাটা, চাপড়া ও কালান্তর প্রভৃতি স্থানেই লোকের কষ্ট অধিক হইয়াছিল।

ইহার পর কিছুদিন নদীয়াবাসীগণ হাঁপ ছাড়িতে সময় পাইয়াছিল। কিন্তু আবার ১৮৮৫ অব্দে বাঙ্গালা ১২৯২ সনে দারুণ বন্যায় সমগ্র নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। এই প্লাবনে ২,২০০ বর্গ মাইল জলাকীর্ণ হইয়া দেশে মহা দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছিল এবং তদুপলক্ষে দরিদ্রগণের সাহার্য্যার্থে চাঁদা সংগৃহিত হইয়া স্থানে স্থানে সাহায্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছিল। কমিটী মোট ৬৫, ৬৬৫ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে সমগ্র দুঃস্থ জেলার সাহায্যার্থ মোট ৩৭,০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। বাকী অর্থ ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা পীড়িত বঙ্গের সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্টের নিকট গচ্ছিত আছে।

পরবর্ত্তী কালে ১৮৯৭ অব্দে ১২ই জুন বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ৩০ জৈষ্ঠ্য তারিখে সমগ্র ভারতব্যাপী যে মহা ভূমিকম্পন অনুভূত হইয়াছিল তদ্বারা নদীয়ারও বহু ক্ষতি হইয়াছিল। নদীয়াবাসী অতি প্রাচীনের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা কখন গল্পেও এরূপ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের বিষয় শ্রবণ করেন নাই। এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই এমন বাটীই ছিল না—এই মহা কম্পনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে যে রথচক্র-ধ্বনিবৎ গুরু গম্ভীর নিনাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে আজিও হৃদকম্পন উপস্থিত হয়। এই দেশব্যাপী ভূমিকম্পে কত নদী শুকাইয়া গিয়াছিল এবং কত উচ্চ ভূমি ও পর্ব্বতাদি বসিয়া জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই মহান ভূমিকম্পের পরই নদীয়ার উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ১৯০০ অব্দের অক্টোবর মাসের মহাবৃষ্টী। সপ্ত দিবস ব্যাপী এই মহাবৃষ্টিতে সমগ্র নদীয়া জলপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অসংখ্য মৃণ্ময় ও ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ প্রাচীরাদি ভূমিসাৎ হইয়াছিল এবং ঘাট পথ বন্ধ হইয়া লোকে সশঙ্ক অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছিল।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে করুণাময়ি রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমনে নদীয়ায় সার্ব্বজনীন শোক প্রকাশিত হয় এবং পর বৎসর তাঁহারি প্রতিচ্ছায়া মহামহিমান্বিত

রাজরাজেশ্বর সপ্তম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক হয় কিন্তু তাঁহার পূর্ণ করুণা মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে না পাইতে ৬ মে ১৯১০ নিদারুণ কাল তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লয়। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র নদীয়ায় শোকের প্রবাহ বহিয়া যায়। নদীয়াবাসিগণ এই মহাপুরুষের স্মৃতি রক্ষা কল্পে বহু অর্থ চাঁদা তুলিয়া নদীয়ার সুদূর পল্লীর জলকষ্ট নিবারণার্থ বহুশত এডোয়ার্ড কূপ খননের কল্পনা করিয়াছেন।

শান্তিপ্রিয় রাজ্যেশ্বর পিতার মৃত্যুর পর উপযুক্ত পুত্র প্রজাবৎসল শক্তিধর রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ ও করুণাময়ী সাম্রাজ্ঞী মেরী রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদের ভারতবাসী প্রজাগণের চির অভিলষিত বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অশেষ পথ ক্লেশ সহ্য করিয়াও ভারতে পদার্পণ করেন। এতদুপলক্ষে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীতে এক বিরাট রাজসূয় দরবার অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সমগ্র নদীয়ায় যে বিরাট আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল নদীয়ার ভাগ্যে আর কখন সেরূপ হয় নাই। সম্রাটদম্পতির কল্যাণ কামনায় সমগ্র নদীয়া ঐ দিন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সংক্ষেপতঃ আজ পর্য্যন্ত ইহাই নদীয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী।

---

১ Gour called also Luknowti the ancient Capital of Bengal and supposed to be the Gangia regia of Ptolemy, stood on the left bank of the Ganges about 25 miles below Rajmahal. It was the Capital of Bengal 730 years before Christ.—Major Rennells' map of Hindusthan.

২ "জিত্বা বঙ্গাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজান্নিরস্তান।"—শব্দকল্পদ্রুম।

৩ ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্।

৪ বঙ্গ—গঙ্গাসঙ্গম স্থানের পূর্ব্ব, প্রধানতঃ বর্ত্তমান ঢাকা বিভাগ। রাঢ়—ভাগীরথীর পশ্চিমে এবং গঙ্গার দক্ষিণে, প্রধানতঃ বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ। বরেন্দ্র—পদ্মার উত্তরে এবং করতোয়া ও কুশীনদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ, বর্ত্তমান রাজসাহী। বাগড়ী—গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থল, বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগ। মিথিলা—মহানন্দার পশ্চিম প্রদেশে, বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্গত। প্রধানতঃ দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর ও পূর্ণিয়া।

৫ কথিত আছে ১২০৬ সনে ভাগীরথী এইরূপ গতি পরিবর্ত্তন করেন।

৬ On the other side of the river, there is a large mount still called after Ballal Sen. It was recently dug by one Mullah Shahib who discovered some *Barkoshes* or wooden trays and a box containing remnants of shawls and silken dresses and also some small silver coins.—Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. II. p. 142.

৭ মতান্তরে লক্ষ্মণ সেন দেব ১১০৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার প্রথম পুত্র মাধব

এক বৎসরের নিমিত্ত, পরে তাঁহার মধ্যম কেশব ১১০৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনিও অল্প বয়সে ১১১৮ খৃষ্টাব্দে এক গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী ও জনসাধারণ এই গর্ভস্থ সন্তানের গৌড়েশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। দশম মাসে সভাস্থ জোতির্ব্বিদগণ গর্ভস্থ সন্তানের শুভাশুভ গণনা করিয়া আসন্নপ্রসবা রাণীকে বলেন, "যদি গর্ভস্থ শিশু এখনই জন্মগ্রহণ করেন তবে দুর্ভাগা ও অল্পায়ু হইবেন, কিন্তু আর দণ্ড চারি পরে ভূমিষ্ট হইলে শিশু ভাগ্যবান হইবেন।" স্নেহশীলা মাতা পুত্রের ভাবী কল্যাণ কামনায় প্রসব বেদনা উপস্থিত হইবামাত্র স্বীয় পরিচারিকাগণকে ও রাজবৈদ্যগণকে আহ্বান করিয়া কোন উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রসবে বিলম্ব ঘটাইতে বলেন; কিন্তু ঔষধাদিতে স্বভাবের গতি রোধের উপায় না দেখিয়া রাণী স্বীয় পদদ্বয়ে রজ্জু বন্ধন করিয়া উর্দ্ধ পদে অবস্থান করেন। এই অস্বাভাবিক উপায়ে স্বাভাবিক নিয়মের যদিও একটু ব্যতিক্রম হইল এবং পুত্রও কিঞ্চিৎ বিলম্বে ভূমিষ্ট হইল কিন্তু স্নেহশীলা মাতা পুত্রমুখ দর্শনের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিলেন। ট্যালবয় হুইলার সাহেব, ইলিয়ট সাহেব প্রভৃতির মতে এই পিতৃমাতৃহীন দুর্ভাগা সন্তানই পরে লক্ষ্মণেয় নামে অভিহিত হয়েন। এবং ইহারই রাজত্বকালে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার বঙ্গদেশ জয় করেন। এ সম্বন্ধে হুইলার সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"The Raja of Nadia was named Rai Laksmaniya. His timidity may be in part ascribed to a belief in astrology. His mother is said, to have been put to horrible torment in order to delay his birth a couple of hours. The astrologers had assured him that he would be deprived of his kingdom by a man with long arms.—Wheeler's History of India. Vol. IV. part 1. p. 45.

৮ বেহার হইতে যে পথে বক্তিয়ার নবদ্বীপ জয় করিতে অগ্রসর হয়েন চেষ্টা করিলে তাহা বাহির হইতে পারে। নদীয়া জেলার যে স্থান দিয়া তিনি গমণ করিয়াছিলেন তাহা এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম বহন করিতেছে। শান্তিপুর ও বয়রার মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিনি গঙ্গা পার হইয়াছিলেন এখনও ঐ স্থানটী বক্তারের ঘাট নামে খ্যাত। এইরূপ অনেক স্থানে তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

৯ বক্তিয়ারের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে অধুনা নানারূপ তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু যে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস বিদ্যমান না থাকায় অতীতের অন্ধকারময় গর্ভে শেষ বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী কি ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা তাঁহার পক্ষে কলঙ্কের কি গৌরবের সে বিষয়ে কিছু বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে সপ্তদশ অশ্বারোহীর নবদ্বীপ অধিকার কাহিনী "তবকাৎ-ই-নাসেরী" লেখক মিনহাজউদ্দীনের কল্পনা প্রসূত মাত্র; তাহা তাঁহার স্বাভাবিক হিন্দু বিদ্বেষের পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। মিনহাজউদ্দীন বঙ্গবিজয়ের কিয়ৎকাল পরেই বক্তিয়ারের পার্শ্বচর জনৈক মুসলমানের নিকট শুনিয়াই সর্ব্বপ্রথম এই কলঙ্ককাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী

গ্রন্থকারগণ তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। এবম্বিধ বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা লক্ষ্মণ সেনের ললাট হইতে ভীরুতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক চিহ্ন মুছিয়া লইতে চাহেন, এবং তৎস্থলে "অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি" "অরিরাজ মদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব নামে তাঁহাকে মহিমান্বিত করিতে চাহেন। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ মতের একজন পরিপোষক তিনি নবপর্য্যায় ৩য় বর্ষের বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

১০ Vide Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. P. 143.

১১ তবকাৎ-ই—নাসিরী নামক প্রাচীন মুসলমান ইতিহাসে বঙ্গবিজয়ের সময় ৫৯০ হিজরী বা ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত আছে। Blochman's Contribution to the Geography and History of Bengal in J. A. S. B. 1873 Pt. I p. 2II মতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে, Asiatic Researches, Vol. IV. p. 203 তে উইলসন সাহেবের মতে ১২০৭ খৃষ্টাব্দে, এবং Thomas' Initial Coinage of Bengalএ ১২০৫ খৃষ্টাব্দে, উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেব প্রাগুক্ত সমস্ত পুস্তকগুলি বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়া "১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার কর্তৃক বঙ্গবিজয় হইয়াছিল" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১২ In the early period of the Mahomedan rule Satgaon was the seat of the Governors of Lower Bengal and a mint town. It was also a place of great commercial importance. —Encyclopedia Brittanica. 9th Edition Vol. XII Page 148.

১৩

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈলা রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘর দ্বার লোটে তার নাগপাশে বাঁধে॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যা বাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ॥

গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকিও প্রমাদ হবে পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা॥
এই মিথ্যাকথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল"॥

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের ভাগ্যবান পুত্র শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাত্র জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে বিবৃত করিয়াছেন। জয়ানন্দ এই ঘটনার প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি, সুতরাং তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার কথায় অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। এই উৎপীড়িত পিরল্যাগ্রামবাসীগণের "পিরালী" নাম করণ সম্বন্ধে দুই মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই পিরল্যাবাসী নষ্টধর্ম্মী ব্যক্তিগণই পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা ব্যক্তির নাম হইতে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন থাকের উৎপত্তি তেমনি পিরল্যা হইতে "পিরালী" থাকের উৎপত্তি হয়। আবার কেহ বলেন, বাগের হাটের পীর আলি সাহেব হইতে পিরালীর উৎপত্তি, এবং বাগের হাটে পীর আলি সাহেবের যে কবর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে উহাতে পীর আলির মৃত্যু তারিখ ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে, অতএব পীরালীর সৃষ্টি জয়ানন্দ বর্ণিত ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ ঐ নষ্টধর্ম্মী পিরালীগণের মধ্যে বহু লোক আসিয়া নবদ্বীপের পল্লীবিশেষে বাস করায় উহাই পীরল্যা গ্রাম নামে অভিহিত হয় এবং উক্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া গৌড়েশ্বর নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি প্রদান করেন। ঐ গ্রাম অদ্যাপি "পারুলে" নামে খ্যাত রহিয়াছে।

১৪ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ আইনের ৭ ধারা দৃষ্টে জানা যায় ম্লেচ্ছাচারী পিরালীগণের শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নিষিদ্ধ জাতির তালিকা হইতে পিরালী নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৫ জয়ানন্দ বর্ণিত পিরালী বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক।

১৬ Vide Hunter's Satistical Account of Jessore.

১৭ ভক্ত শিরোমণি হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বূঢ়ণ গ্রামে মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, প্রথমে তিনি বনগ্রামের অন্তর্গত বেনাপোলের বনাভ্যন্তরে নিভৃত কুটীরে নাম যজ্ঞ আরম্ভ করেন। কিন্তু ঐ স্থানের জমিদার রামচন্দ্র খানের পীড়নে তিনি উক্ত আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রথমে শান্তিপুরে, পরে সপ্ত গ্রামের সন্নিকটস্থ চাঁদপুর গ্রামে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন, পরে তথা হইতে আসিয়া শান্তিপুরের সন্নিকটে ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গা-তীরে এক গুহা নির্ম্মান করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার প্রতি শান্তিপুরের কাজীর বিদ্বেষ জন্মে। ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের গুহার কোনও চিহ্ন ছিল না। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যশোহর জেলার চাঁচুড়ি পুড়ুরী গ্রামের জগদানন্দ গোস্বামী বহু কষ্টে ও

অনুসন্ধানে হরিদাসের আশ্রম ও ভজন গুহাটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও কোনও দানশীলা মহিলার অর্থে গুহাটীকে কূপাকারে সংরক্ষণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে আশ্রমের তলে গঙ্গা না থাকিলেও গঙ্গার গভীর খাত বিদ্যমান আছে। ইহার উপর কবি কৃত্তিবাসের বাস্তুভিটা।

১৮ "When the collector or the Dewan askc them (the Hindus) to pay the tax they should pay it with all humility and submission If the collector wishes to spit into their mouth, they should open their mouth without the slightest fear of contamination so that the collector may do so. The object of such humiliation and spititing into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam—the true religion and to show contempt to false religions."—Von. Noha's Akbar.

এই বর্ব্বরোচিত আইন মহামতি আক্‌বরের সময় রহিত হয়।

১৯ "The existence of a large Musalman population in the district (Nadia) is accounted for by wholesale forcible conversation at a period anterior to the Mogul Emperors during the Afgan supremacy.—Hunter's S, Account Vol. II p. 51.

২০ পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুলেখক রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস্, মহোদয় যখন বনগ্রামের সব ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন বহু অনুসন্ধানে এই চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গস্বামীর বীরত্ব-কাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস "বঙ্গ বিজেতা" প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানকালে চৌবেড়িয়াতে পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কোনরূপ চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। চতুর্ব্বেষ্টিত স্থানটীর মধ্যে এক্ষণে রাজার বাগান, ফুল বাড়ী ও সেহালাপাড়া নামে তিনটী ম্যালেরিয়া পীড়িত ক্ষুদ্র পল্লী বিদ্যমান আছে। তাহারা তাহাদের নামের সহিত যেন একটা পূর্ব্বস্মৃতির আভাসমাত্র বহন করিতেছে। এই চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ এখানে সাধারণতঃ রাজা সতীশের দুর্গ বলিয়া খ্যাত। সতীশ ইছাপুরের জমিদার ও সমরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার বংশ অদ্যাপি ইছাপুরে বিদ্যমান। ইছাপুর চৌবেড়িয়া হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী। এই চৌবেড়িয়া সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ প্রণেতা ৺দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের জন্মস্থান।

২১ Grant's Analysis of the Bengal Finances.

২২ কথিত আছে এইকালে আড়ংলিয়া (রাণাঘাটের সন্নিহিত) গ্রামে পাঠানদিগের ধনাগারের একাংশ স্থাপিত ছিল। দাতারাম মহেন্দ্রনাথ সিংহের তত্ত্বাবধানে উহা

সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু রক্ষক হইয়াও তিনি উহা আত্মসাৎ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই।

২৩ "This is said to be the fort of a Mohajan Raja, who on going out to fight a battle, carried with him a pigeon giving his Ranis orders, that they should watch for the return of the pigeon. If he won the battle, he would return himself, if he lost he would loose the pigeon, whose return would intimate to the Ranis the loss of battle, and if they had any regard for the honor, they would destroy themselves. He won the battle but the pigeon got loose by accident and returned to the Raja's palace, whereupon the Ranis drowned themselves and their treasure in the "Khirki" tank behind the palace. The Raja hastened home but arrived too late to save the Ranis, whereupon in despair he drowned himself also in the tank, The tank has stone "ghats" all round and is covered on three sides with ruins of brick buildings, four high circular towers stood at the four corners of the oblong fort, which is of earth. Outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity, as evidenced by the size of the bricks. They are the only pre-Mahomedan ruins seen or heard of in the District."—"List of Ancient Monuments &c." Published by the Government of India.

২৪ সম্প্রতি কলিকাতা Asiatic Society হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E., কর্তৃক সন্ধ্যাকর নন্দী কৃত "রামচরিত' নামক এক অতি প্রাচীন পুঁথী নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে ১০৮০ খৃষ্টাব্দে উত্তর বঙ্গের কৈবর্ত্ত ও পালেদের এক মহাযুদ্ধ বর্ণিত আছে ; ঐ যুদ্ধে পাল রাজা রামপালের বীরত্বে কৈবর্ত্তগণের পরাজয় ঘটে। বাগড়ী প্রদেশের দেবগ্রাম নগরস্থ বিক্রমরাজ, রামপালের মিত্ররাজা বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই দেবগ্রাম কোন দেবগ্রাম তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহার সহিত বর্ত্তমান দেবগ্রামের সম্বন্ধ নাই।

২৫ Early in ye morning we passed by a village called Sreenagar and by 5 o'clock this afternoon (October, 1682) we got as far as Rewee—a small village belonging to Woodoy Roy, a Jamindar that owns all the country on that side of the water almost as far as over against Hughly. It is reported by ye country people that he pays

more than twenty lacks of Rupees per annum to ye king, rent for what he possesses and that about two years since he presented above a lack of rupees to ye Mogoul and his favourite, to divert his mention of hunting and hawking in his country, for fear of his tenants being ruined the plundered by the Emperor's lawless and unruly followers. This is a fine pleasant situation, full of great shady trees, most of them tamarins, well stored with peacocks and spotted deer like our fallow deer. We saw two of them near the river side on our first landing. Hedge's Diary Vol. I. P. 29.

তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Agent and Governor of their affairs in Bay of Bengal and of the British Factories (November 25, 1681, Mr. Hedges এর দৈনিক রোজনামচা হইতে আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটী গ্রহণ করিয়াছি ; উক্ত বিবরণীতে আমরা তদানীন্তন নদীয়াধিপতির নাম পাইতেছি "উদয় রায়" কিন্তু আমরা "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্" সংস্কৃত এবং Translation by W. Pertsch, Published at Berlin in 1852, W. W. Hunter's Statistical Account of Nadya. স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় রায় প্রণীত ক্ষিতীশ বংশাবলী এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের ইংরাজীতে লিখিত যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন, তৎসমুদায় প্রামাণিক বিবরণে তদানীন্তন কৃষ্ণনগরাধিপতির নাম পাইয়াছি "রুদ্র রায়"। এখন কোন নামটী বাস্তবিক তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। মতান্তরে এই রেউই গ্রাম এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমূহ তখন পাটুলীর ভূস্বামী উদয় রায়ের জমিদারী, ভুক্ত ছিল। নদীয়ার রাজাগণ, কি সূত্রে জানি না, ঐ গ্রামখানি প্রাপ্ত হন এবং তথায় রাজধানী স্থাপনা করেন। বংশবাটীর স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজাগণই পূর্ব্বে পাটুলীর রাজা নামে খ্যাত ছিলেন। পাটুলী অগ্রদ্বীপের সন্নিহিত একখানি গ্রাম এবং পূর্ব্বে নদীয়ার এলেকাধীনই ছিল। নদীয়ার বহু গ্রামই তখন পাটুলীর রাজ্যান্তর্গত ছিল। পরে তাঁহারা পাটুলী হইতে তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করায় নদীয়াবাসীর স্মৃতি হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িয়াছেন।

২৬ On the 19th February 1666, I passed a large town called Nadiya, and it is the furthest point to which the tide reaches. —Tavernier's Travels in India. Vol. I, p. 133.

২৭ "अथ ससैन्यबलवाहनशोभासिंहः समागत्य हतपरिवारं कृष्णरामरायं निहत्य वर्द्धमानमुपप्लावयामास। पलायनपरायणञ्च जगत् रामं रामकृष्णरायीमाटियारि प्रदेशे निभृतं स्थापयामास। शोभासिंहश्च हतशेषे कृष्णरामपरिवारे पलायमाने वर्द्धमाने स्वाधिपत्यं विस्तारयामास।"—क्षितीश वंशावली चरितम्।

২৮ Vide Memoirs of the Mogoul Empier by Eradut Khau p. 330.

২৯ Thus while the prince was amusing himself at Burdwan, receiving the congratulation of the Zemindars and principal men of the province, the rebels again collected in greatest force and had the audacity, not only to plunder the districts of Nuddeah and Hooghly, but to encamp within a few miles of Burdwan.—Memorirs of Mogoul Empire, Eradut Khan. p. 34$\frac{}{1}$.

৩০ Ram Krisna lived happily at Krisnagar for a long time and any matter of interest of which be gave notice to the grandson of the Sultan of Delhi, who resided at Jahangira was executed without fail by the latter who scarcely having got notice of it gave his instruction in a letter of answer.—Kshitish Vansabali Charitam.

৩১ ইহাদের বাটীতে অদ্যাপি মহাসমারোহে দুর্গোৎসব ও মহরম দুইই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণনগরের রাজবংশীয়গণের সহিত ইহাদের বেশ সৌহৃদ্য বিদ্যমান আছে শুনা যায়।

৩২ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রকাশিত প্রতিলিপি (সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩০৬)।

৩৩ লুপ লাইনে মুরারই রেল ষ্টেসনের পশ্চিমে মহেশপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণে বীরকিটী গ্রাম। ক্ষিতীশ বংশাবলীতে ইহাই বীরকাটী নামে অভিহিত। দেবীনগর অদ্যাপি বর্ত্তমান—এই সকল স্থানে ভগ্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেস অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়।

৩৪ কথিত আছে নবাব মুরসিদকুলী (তৎকালিন দেওয়ান জাফর খাঁ) এক সময়ে বাদসাহী দরবারে পেশ করিবার নিমিত্ত নিকাশী কাগজে প্রথামত সদর কাননগু দর্প-নারায়ণের মোহর ছাপ করাইতে চাহিলে দর্পনারায়ণ তাঁহার প্রাপ্য রসুম বাবদ তিন লক্ষ মুদ্রা দাবী করেন এবং উক্ত মুদ্রা না পাইলে কোন মতেই মোহর ছাপ করিবেন না প্রকাশ করেন ; কিন্তু দেওয়ানের তখন অত মুদ্রা সংগ্রহ না হওয়ায় দর্পনারায়ণের কর্ম্মচারী রঘুনন্দনকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাঁহার দ্বারা নিকাশী কাগজের কাননগুর মোহর ছাপ করিয়া লন। এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ ভবিষ্যতে মুরসিদকুলী রঘুনন্দনকে রাজসাহী জমিদারী প্রদান করেন।

৩৫ "রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগিরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার। পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গাপার॥" অন্নদামঙ্গল।

৩৬ Holwell, in his work, quoted under Jafar Khan p. 202, says that he (Krisna Chandra) possesed a tract of country of about twelve days' journey and that he was taxed at 2 lacs per annum, though his revenue exceeded twenty-five lacs of rupees.—Kshitish Bangsabali Charitam—Translation by W. Pertsch p. 69. (Index).

৩৭ এই জাফর খাঁ সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি নাকি একজন যথার্থ সাধক ছিলেন এবং কোনও সময়ে শিবনিবাসে থাকিয়াই যোগবলে শ্রীধাম-পুরীর মন্দিরের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। শিবনিবাসে অদ্যাপি ইঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। হিন্দু-মুশলমান জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই এখানে সিন্নি মানসিক করিয়া থাকে।

৩৮ Riyaz-us-salatin- -p. 274.

৩৯ He (Fattauah Chand) had about this time married his youngest grandson named Set Mohtab Roy to a young creature of exquisite beauty, aged about 11 years. The fame of her beauty coming to the ears of the Soubah, he burned with curiosity and lust for the possessession of her and sending for Jagut Set demanded a sight of her.—Holwell's Interesting Historical Events. Part I. Ch. II. p. 70.

সম্ভবতঃ এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বঙ্গ কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধে" সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক জগৎ শেঠের নিষ্কল কুলে কালি দিয়াছেন। হতভাগ্য সিরাজ ! মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের যাবতীয় সত্য ও মিথ্যা দোষ ভাগ্যক্রমে তোমার স্কন্ধে আরোপিত—জানি না তোমার প্রেতাত্মা কিরূপে এই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতেছে।

৪০ The young woman was sent to the Palace in the evening, and after staying there a short space, returned unviolated indeed, but dishonoured to her husband.—Orme Vol. p. 30.

৪১ আজিও অশান্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে, বঙ্গজননী

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥"

বলিয়া তাহার চঞ্চল মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করেন।

৪২ শিবনিবাস এক্ষণে লুপ্ত-শ্রী। কৃষ্ণপুরের গোয়ালাদের বংশাবলী অদ্যাপি আছে ও লাঠী ধরিতে আজিও মজবুত।

৪৩ "শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে। (১৬৬৪ শাকে)
বর্গীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥
আলিবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রে ধরে লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বন্ধ করি রাখিবেক মুরসিদাবাদে।
মোর স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥" অন্নদামঙ্গল

৪৪ Holwells—Interesting Historical Events p. 151.

৪৫ Vide Life of Lord Clive (1836) Vol. I, p. 147, and Orme's

History of the Military Transactions of the British Nation, Vol. II, p. 49.

৪৬ পলাসী সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ তথ্য জানিতে হইলে Bolt's consideration on Indian affairs. Malleson's Decisive Battles of India. Orme. Firminger অক্ষয় বাবুর "সিরাজদ্দৌল্লা", নিখিলবাবুর "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী", কালীপ্রসন্ন বাবুর "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশীক্ষেত্রের এক্ষণে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পলাশী যুদ্ধে ইংরাজসৈন্যের আশ্রয়ক্ষেত্র সেই আম্রকুঞ্জ এবং এই কুঞ্জের উত্তরদিকে স্থাপিত নবাবের সেই শিকার মঞ্চ, যেখানে ভাগীরথী অত্যন্ত বক্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই বেগবতী স্রোতস্বতী ভাগিরথী সেই ভাগিরথী তীরস্থ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গ্রামাদি সকলেরই পরিবর্ত্তন অথবা ধ্বংস হইয়াছে। সেই বিশাল আম্র কুঞ্জের সমস্ত বৃক্ষ ধ্বংস হইলেও একটী বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল এবং অঙ্গে গোলার চিহ্ন ধারণ করিয়া বহুদিন একাকী পলাসী যুদ্ধের শেষ স্বাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল। ১৮৭৯ অব্দে উহা শুষ্কাবস্থায় পরিণত হওয়ায় তাহার মূলদেশ পর্য্যন্ত খনন করিয়া পলাসী বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। পলাশী প্রবাহিত ভাগীরথীও স্বাভাবিক চঞ্চলতা হেতু বহুল পরিমাণে গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এবং ১৮০১ সালে উহা পলাসী উদরস্থ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় বহু গ্রামাদির স্থান পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিধুপাড়া গ্রামখানী যাহা পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে স্থাপিত ছিল তাহা এক্ষণে বাঁকের মধ্যস্থ সংকীর্ণ ভূমি ধ্বংস হওয়ায় নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী হইয়াছে; একটি বিস্তীর্ণ বাঁধ ভাগীরথীর প্লাবন নিবারণার্থ পূর্ব্বদিক দিয়া বরাবর মুর্শিদাবাদ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পলাসীর যুদ্ধকালে যে দুইটী বৃহৎ বাঁক বিদ্যমান ছিল এক্ষণে তাহাদের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এবং প্রশস্ত বাঁকটি একেবারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। এবং অর্দ্ধ চন্দ্রাকার বাঁকটী বেষ্টনকারী ভাগীরথীর দুই মুখ এক হইয়া এক্ষণে এক প্রকার বিলে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম্য বিদ্যমান আছে তাহা যুদ্ধকালীন আম্রকুঞ্জের অতি সন্নিহিত ছিল। এক্ষণে উক্ত স্থান হইতে অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে লোকনাথপুর গ্রামের পাদদেশ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে অনেক সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে ফরিদতলার ফকীর ফরীদ সাহেবের সমাধির পশ্চাতে সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের সমাধি উল্লেখযোগ্য। ইংরাজের এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মহা বিজয়ের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ পলাসীক্ষেত্রে প্রথমে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একটী ক্ষুদ্রকায় বিজয় স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, পরে বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালে তিনি পলাসীক্ষেত্র দেখিতে আসিয়া এই ক্ষুদ্র স্তম্ভটীকে পলাসীর অযোগ্য মনে করিয়া একটী বৃহদাকার প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহারই সন্নিকটে পলাশী দর্শনেচ্ছু জনসাধারণের থাকিবার জন্য একটী ডাক বাঙ্গালা স্থাপিত হইয়াছে। পলাশী এক্ষণে রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেলওয়ের উপর একটী ষ্টেসন।

৪৭ Mr. Luke Scrafton writes from Maradabad to Government complaining of the arrears of revenue due in Nadia—'It is possible that by threat ening the Raja with loss of his caste and such corporal punishments as are in practice among those people something more may be extorted from him. However, I suppose Ruaydulab will either pay the balance out of the 9 lacks for the ensuing year. therefore, it is requisite some methods must be taken to make the best of the ensuing year. As the chief cause of balance is Raja's extravagance. it, therefore appears to me to send a trusty person into his country to collect his revenue for him, only to deprive the Raja of all power in his country allowing him only Rs. 10,000 per annum or whatever your honour &c, may think proper for his expenses and keep the son in Calcutta as security for the father's good behaviour : this method if persued, it is probable the Hon'ble Company, may within two years receive the full of Toncaws on him.' —Vide Long's Selections from Unpublished Records No. 337.

৪৮ Fort William 28th April, 1770.

To.

The Honble john Cartier Esq. President & Governor and The gentlemen of the select committee.

"In Mr. Verelst and my Joint addresses which accompanied the Statement at the commencement of this season we informed you that the Rajah of Nuddea had behaved so ill and owed so considerable a sum on account his Mulguzary that ministers recommended his not being confided in and we thought it prudent to endeavour to let the country to farm for three years on terms that would have proved very advantageous term to Employers and reserved to the Rajah his rights and a stipulated annual salary of one lac of rupees. Nobkissen & several other principal Calcutta Merchants offering themselves to become farmers on terms which appeared advantageous to the company, just to the Rajah and equitable to the ryots—their terms were accepted and they sent people to begin the collections but it was soon found that the farmers required being invested with powers that would deprive the Rajah of his just right

and that they acted oppressively in the distress and did not pay the revenue according to their agreement. The Rajha at the same time jealous of their authority and earnest to be again reinstated offered to comply with the terms agreed on by the farmers to pay his former balance and to give security for the due completion of his agreement. The ministers were very urgent for closeing with the Rajah's people and I was induced to acquiesce in the measure from the following consideration. The farmers absolutely demanded to be invested with the Rajah's rights of Zamindary which could not be granted without deposing the oldest Zemindar in the country of his hereditary right in which neither equity nor our Honble Master's orders would have justified us. The farmers have behaved ill and seemed either aiming at getting power and wealth than benefiting and improving the country committed to their charge. An English gentleman being appointed to supervise the Nuddea Province and superintend the collections. I thought he would be such a check on the Rajah as to prevent his being able to demand the Sircars of its just revenues or to distress his own Ryots. The security offered by the Rajah being indubitable was another motive with me for assisting to the measure which I still hope will prove to have been rightly judged the only difficuly which seems to present itself is as to the sum of Rs 225000 said by the Rajah to have been received by the farmers does not prove this sum against the farmers he and his securities are to make it good if he does I hope there will be no difficulty in obtaining payment of Nobkissen and the other farmers. Mr. Ryder is now employed in setting this account. &c. &c. &c.

Moidepore — With respect &c.
30th March, 1770. — Richard Bechee.

—Long's Selection of U. P. R. No. 5 10.&

৪৯ "I promise to pay the above sum of Rs. 835, 952 agreeable to the kist-bandi without delay or failure. I will pay the same into the Company's Factory. I have made this that it may remain in full force and virtue. Dated the 23rd of Julhaid (Sic) and the 4th August

of Bengal year 1166."—Vide Hunter's Statistical Account Vol. II page 159.

৫০ মিঃ ইলিয়টের পরে মিঃ ব্যালকুয়ার নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়েন। মিঃ ব্যালকুয়ার একজন বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, উঁহার বুদ্ধি, সাহস ও কার্য্য-কুশলতায় দস্যুতা তখন দমিত হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে নদীয়া, যশোর, হুগলী ও বাখরগঞ্জ এই ৪ জেলায় পুলিশের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়াছিলেন। ইহাই Inespecter General of Police পদের সূত্রপাত।—Vide Bengal District Gazetteer, Vol, XXIV. p. p. 30-1.

৫১ নদীয়ার প্রায় প্রতি গ্রামেই দু চারিজন চোর বা ডাকাতের বাস ছিল, তন্মধ্যে হুণ্ডীমারা জাগুলী, ডাকাতে কুলবেড়ে প্রভৃতির ডাকাতগণের নাম শুনিলে লোকের হৃৎকম্প হইত। এই কুলবেড়েকে লোকে বিষম কুলবেড়ে বলিত। মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাইতে তখন এই গ্রামের উপর দিয়া যাইতে হইত। ইহারই নিকট গোছা সন্ন্যাসীর মঠ; শুনা যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা মঠের সন্ন্যাসীর উপর সন্তুষ্ট হইয়া এই মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের সমসাময়িক দস্যুগণের মধ্যে কড়ূর সর্দ্দার ও বলরাম সর্দ্দারের অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। অমানুষিক অত্যাচার ও নৃশংসতায় তাহারা বিশ্বনাথকেও পরাস্ত করিয়াছিল তাহারাও কয়েক মাস মধ্যে সদলে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।—Fifth Report of the Select Commitee p. p. 817-20.

৫২ The Musalmans when they came into Bengal and acting on Fudal principles were opposed to that beautiful system of village Self-Goverment which had so long been tower of strength to the rayats, instead of it a military tenure was adopted and the revenues were collected by sepoys, the Zemindars were a semi millitary cellector of revenue, which was realized at the point of the Sword, a practice adopted even by the English when they first took possesion of Burdwan Birbhum & Nadyia.—Introduction to Long's Unpublished Records, page LIV.

৫৩ Vide Lord Macaulay's Graphic Description of the great Famine in his essay on Lord Clive.

Vide Hunter's Unpublished Bengal Mss. Records No. 211.

৫৪ Vide Letter from Mr. John Shore reporting that he has dispossed the Zemindar of Nadiya from charge of collections (March 25. 1782).—Letter No. 100. Hunter's Unpub. Bengal Mss. Records.

৫৫ Vide petetion from the Raja of Nadiya binding himself on the settlement of current year being made with him to pay up the revenue list together with balance of last year on pain of his forfeitury of Zemadary in case of faliure.—Letter No. 147 Hunter's Bengal Mss. Records.

৫৬ Vide Letter from Mr. Mc. Dowel reporting that Zemindary officers have begun to collect revenue of Nadiya for current year. (June 24. 1782).—Letter No. 166. H. U. P. Mss. Records.

৫৭ Calcutta Review. Vol. VI. 1846, page 410.

৫৮ Advertisement forbiding any collection being made in Nadiya by the Raja or his Amla 17th. April, 1783.—No 397. Hunter's U. P. Bengal Mss. Records.

৫৯ Vide Letter from Governer General in council respecting the repeeling the reestablishment of the Raja of Nadia in management of his zemindary.—No. 995. Hunter's U. P. B. Mss. Records.

৬০ Vide Letter from Collector of Nadiya forwarding a Petition from the Zemindar and rayats of Nadiya Complaining of the distressed State of Country from innundation. —No. 6188. Hunter's, U. P. B. Mss. Records.

Collector ordered to enquire October 7th. No. 281796.

৬১ Vide Letter from Collector of Nadiya enclosing representation from the Zemindar on the calamity of the season and and his inablity to discharge revenue. November 30th. 1791.—No. 2199 Hunter's U. P. B. Mss. Records.

৬২ Letter from Secretary to Board stating that he has repeatedly found difficulty in procuring an accurate Bengali Almanac and Suggesting that collector, Nadiya be directed to transmit one properly authenticated by Brahmanical Astronomy for the use of Office. July 5th 1799.—No. 8217 U. P. B. Mss. Records.

Collector transmits the same, August 9th.—No. 8305. Hunter's U. P. B. Mss. Records.

পঞ্জিকা প্রণয়নে কালেক্টরের প্রতি উপদেশ ও কালেক্টরের কর্ত্তৃক পঞ্জিকা প্রেরণ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কাল অতি সংক্ষেপ, সে কারণে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, এইরূপ

পত্রিকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ও প্রচলিত ছিল, কালেক্টর কেবল তাহা প্রেরণ করিয়াছিলেন মাত্র।

৬৩ No. 8385 Hunter's Unpub. Bengal Mss. Records.

৬৪ At the commencement of the period dealt with (1782—1807) the military and Political ascendency of the East India Company had been firmly established in Bengal. The Company was the undisputed central Governing Power but it had not yet been able to construct an orderly or efficient administration for the districts which had passed under its rule. * * * Each landholder held his own Civil Court and kept up a private defencive Police.—Introduction, Bengal Mss. Records page 14—15.

৬৫ Vide Letter No. 13440 Hunter's Bengal Mss. Records.

৬৬ এই শান্তিপুরের আড়ং হইতে বাৎসরিক ১৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের মসলিন কোম্পানির কমারসিয়াল এজেন্ট কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হইত।—Vide. Imp. Gazetter of India Vol. X.

৬৭ Vide Letter from Secretary to Government authorizing an assignment in favour of the commercial resident at Santipur for providing Rum. August 19th 1806.—No. 13414 Hunter's Bengal Mss. Records.

৬৮ "That a sum of not less than a lac of rupees in each year shall be set apart, and applied to the revival and improvement of literature and encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of the Sciences among the British Territories of India."

৬৯ Fortytwo years ago the case was very different and the fanatic leader Titu-Miyan found in Nadiya a sufficient body of disaffected Faraizi husbandmen, as to lead him to set up the Standard of revolt, for a short time to defy the British Government.--Hunter's Statistical Account Vol. I. page 51.

"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হ'য়ে।
সদরে করেছ রিপোর্ট বিধবা রমণীর বিয়ে॥
কবে হবে হেন দিন, প্রকাশ হবে এ আইন,
জেলায় জেলায় থানায় থানায় বেরবে হুকুম
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।

কে যাবে এদের সনে বরণ ডালা মাথায় ল'য়ে ॥
কবিবর হেসে কয়, ঘুচিল নারীর ভয়
সকলের হাতের খাড়ু হইল অক্ষয়।
সবে বল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয় ॥"

এই গানের ব্যঙ্গ পালটা গানও হইয়াছিল ;—
"শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চির রোগী হয়ে।"

৭১ The first clause of the Act was—"No marriage contracted between Hindus shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person who was dead at the time of such marriage, any custom and any interpretation of Hindu law to the contrary notwithstanding."

৭২ The extent of the provinces included within the Lieutenant Governorship of Bengal was stated in the first Adminstration Report of the year 1855—56. The provinces were divided into seven portions, namely :—

Bihar, having an area of about	...	42,000 sq. miles.
Bengal, ...	...	85,000 ... „
Orissa, ...	...	7000 ... „
Orissa Tributary mahals ...	...	15,5000 ... „
Chota Nagpur and the tributary-States on the S. W. Frontier	...	62,000 ... „
Assam	...	27,000 ... „
Arracan	...	14,000 ... „

Total arrea—2,53,000 sq. miles.

পূর্ব্বোক্ত আসাম প্রদেশ মধ্যে আবার বঙ্গেশ্বরের শাসনাধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একজন স্বতন্ত্র চিফ কমিসনারের হস্তে ন্যাস্ত করা হয় এই ব্যবস্থাই বহুদিন অব্যাহত ছিল ; বিগত ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্জ্জন, বঙ্গেশ্বরের শাসনাধীনতা হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ ও আসামের চিফ কমিশনার পদ রহিত করিয়া সমগ্র আসাম প্রদেশ লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টি করিয়া ঢাকাকে রাজধানী করিয়া একজন লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের অধীন করেন। কিন্তু এইরূপ বিভাগ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায় বিগত ১২ ডিসেম্বর ১৯১১, দিল্লীর রাজসূয় দরবারে মহামান্য করুণাময় রাজরাজেশ্বর সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়ের আদেশে পূর্ব্বোক্ত

বিধান রহিত হইয়া যায় এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত করিয়া অর্থাৎ যাঁটী বাঙ্গালা ভাষা চলিত এমন বিভাগ কয়টী (প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান, ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম) এক করিয়া একজন মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরের অধীন করিবার আদেশ প্রদত্ত হয় ; এই যুক্ত বঙ্গের পরিমাণ ফল সত্তর হাজার বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা চারকোটী কুড়ীলক্ষ হইবে এইরূপ অনুমতি হয়।

(২) বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইবার ও উহা একজন ছোটলাটের শাসনাধীনতায় থাকিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। এই প্রদেশের পরিমাণ কুড়িলক্ষ তের হাজার বর্গমাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা সাড়ে তিনকোটী হইবে অনুমিত হয়।

(৩) ১৯০৫ অব্দের পূর্ব্বে আশামপ্রদেশ যেরূপ চিফ কমিশনারের অধীন ছিল উহার নিমিত্ত পুনরায় সেইরূপ শাসনাধীনতার ব্যবস্থার আদেশ প্রদত্ত হয়। এই প্রদেশের পরিমাণ ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ হইবে অনুমিত হয়।

এই দরবারে বাঙ্গালা দেশ যেমন পূর্ব্বোক্ত বিধি বিধানের আমলে আসিয়াছিল সেইরূপ বাঙ্গলা দেশের কলিকাতা মহানগরী হইতে ভারতের ব্রিটিশ রাজধানী অপসারিত করিয়া দিল্লী নগরীতে লইয়া যাইবার আদেশও মহামান্য সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত হয়।

৭৩ Sir F. Haliday, subsequently proceeded to Calcutta by the unusual route of the Matabhanga, to observe the state of Nadia district. It was evidently a year of high floods, as the whole country was one sheet of water, so that it was difficult to distinguish even the course of river ; and the villages, except those on the higher lands were nearly submerged.—Vide Buckland's Bengal Undar Lieutenant Gevernors. Page 32.

৭৪ "Nuddea was one of the places at which the tobacoo plant was first introduced into India by Europeans during the reign of Akbar, and it is still extensively cultivated in this part of the country". —Vide "Travels in India a Hundred years ago" by Thomas Twining, p.p. 94.

৭৫ দেশ তখনও সর্ব্বতোভাবে শাশিত হয় নাই সুতরাং দেশের শান্তি তখন প্রায়ই চৌর ডাকাতের উপদ্রবে অব্যাহত থাকিত না। সুবিধা পাইলেই দেশের নিম্ন শ্রেণীস্থ বলিষ্ঠ দুই দশজনে একত্র হইয়া দল বাধিত ও দেশের সর্ব্বনাশসাধন করিয়া বেড়াইত। এইরূপ চৌর ও ডাকাত সব গ্রামেই দু চারিজন দেখা যাইত ; এমন কি, চৌর তাড়াইতে জমীদারগণ কেহ কেহ ডাকাত পুষিতেন। এই সময় যাহাদের উপদ্রবে নদীয়াবাসীগণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত ছিল তাহাদের মধ্যে মনোহর দাস সর্ব্বপ্রধান ছিল। মনোহর জাতিতে গোয়ালা, নবদ্বীপের পশ্চিমদিকে একডালা পরাণপুরে তাহার বাসস্থান ছিল। মনোহর

দস্যুপযোগী বহুগুণেই শোভিত ছিল। লাঠিখেলা, সিন্ধুচুরী, ডাকাতি রাহাজানি, নৌকামারা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহার শারিরীক শক্তি সম্বন্ধে বলেন যে "সে চিত হইয়া শুইয়া থাকিত এবং তাহার গলার উপরে একখণ্ড বাঁশ দিয়া বাঁশের দুই প্রান্তে দুইজন বলিষ্ঠ মনুষ্য চাপিয়া থাকিলেও মনোহর মৃত্তিকার উপরে হস্ত পদের ভর করিয়া বাঁশ সমেত সেই দুই জনকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিত"। নয়না, মানিকা প্রভৃতি তাহার সময়ের নদীয়ার অন্যতম দস্যুনায়ক। সমগ্র নদীয়া জেলা এই দলপতিত্রয়ের কার্য্যক্ষেত্র ছিল। ইহারা তখন এতদূর অকুতোভয় হইয়া উঠিয়াছিল যে অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক ইহারা বারংবার কৃষ্ণনগরের সাহেবদিগের মেস কোর্টের ও জজ ব্রাউন সাহেবের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বোঝাই নৌকা লুট করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। মনোহর অন্যত্র যাহাই করুক নিজ গ্রামে কখন সে চুরী বা ডাকাতি করে নাই। মনোহর তাহার জীবনে যে কত ভীষণ ডাকাতি কার্য্য সমাধা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, যাহা হউক পরিশেষে সে শান্তিপুরের (বর্ত্তমান রাণাঘাট) সবডিভিসনের ডেপুটি বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এবং কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট মন্টেছর সাহেব বাহাদুরের যত্নে ও নদীয়ার কর্ম্মদক্ষ দারোগা বাবু গিরিশ্চন্দ্র বসুর চেষ্টা ও অসমসাহসিকতায় এবং তাহার নিজ মাতুলের বিশ্বাসঘাতকতায় ধৃত হইয়া তাহার আজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে। সঙ্গে সঙ্গে মনোহরের সঙ্গীদেরও রাজদণ্ড হয়। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বস্থলীর গোপাল পোদ্দার বিশেষ প্রসিদ্ধ, সে মনোহরের "থাঙ্গিদার" অর্থাৎ মাল সামালদার ছিল। জজ ব্রাউনের বিচারে মনোহরের চিরনির্ব্বাসন দণ্ড হয়। তদানীন্তন রীত্যানুসারে এই আদেশ সদর নিজামত হইতে কায়েম হইয়া আসিলে মনোহর আলিপুর জেলে প্রেরিত হয় তথা হইতে কয়েকমাস পরে ৫০/৬০ জন পাঞ্জাবী ও পশ্চিমে দায়মালী আসামীর সহিত নির্ব্বাসনের জন্য ব্রহ্মদেশে থায়েটমিউ নগরে ক্লারিসা নামক জাহাজে চালান হয়। সমুদ্র মধ্যে মনোহর তাহার সঙ্গী কয়েদীদের সহিত এক যোগে মহাবিপ্লব বাধাইয়া জাহাজের কাপ্তেন ও অন্যান্য সাহেবকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া বধ করে। কেবল জাহাজ চালাইবার জন্য কয়েকজন দেশী খালাশীর প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাদের দ্বারায় ভিন্ন রাজার এলেকায় জাহাজ চালাইয়া পালাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ একখানা রণতরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই মানোয়ারের কাপ্তেন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আকায়েব বন্দরে লইয়া যান এবং তথায় বিচার হইয়া তাহাদের ফাঁসী হয়।

১৬ **"I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi, and from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames."—Lord Canning, Buckland's Bengal Under Lt. Govers. Page 192.**

১৭ নদীয়ার প্রজাকুল হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিত। এ সম্বন্ধে

কৃষ্ণনগরে নীল কমিসনের সমক্ষে সাক্ষী দিবার কালে তদানীন্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ, জে, হারসেল সাহেব ১৮৬০ সালে ৯ই জুলাই এইরূপ বলিয়াছেন :—

Commission—"Are you in a position to state, who in Calcutt or else where have furnished the rayats with advice ?"

Mr. Harsehel—" * * * I have heard that they used to go to the Editor of the Hindu Patriot ; and the rayats, in the case which I reffered to before, admitted the fact. But I have no reason to suppose that the advice was improper".

৭৮ হরিশের অকাল মৃত্যুতে নদীয়ার জন সাধারন বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের জুলাই তারিখে "নীলদর্পণ" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্রের উদ্যোগে এবং নদীয়াধিপতি মহারাজা বাহাদুর সতীশচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে কৃষ্ণনগরে এক শোক-সভা আহ্বান করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতিরক্ষা কল্পে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় 'হরিশচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে' প্রেরণ করেন। এইরূপে আমরা "নীলদর্পণের" অমর গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্রকে (যিনি তখন নদীয়ার পোষ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে বিরাজিত ছিলেন) নীলকর পীড়িত প্রজাকুলের অকৃত্রিম হিতৈষী হরিশের পূজার প্রধান পুরোহিত রূপে দেখিতে পাই। এই সময়ে নদীয়ায় হরিশ সম্বন্ধে যে সকল গান উঠিয়াছিল তন্মধ্যে এইটী বিশেষ প্রসিদ্ধ—

"ভাস্‌ছে মন মনের হরিষে।
(আগে) লুটে খেত এক হরিশে,
(এখন) বাঁচালে এক হরিশে।
বুনে বুনে নীল কত জমি খীল
(এখন) হতেছে তায় অঢ়র কলাই সরিষে॥"

প্রথম—হরিশ নীল কুঠীর এক অত্যাচারী কর্ম্মচারী।

দ্বিতীয়—সুপ্রসিদ্ধ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৭৯ Indigo commisson ;—W. S. Seaton-Karr. Esq. C. S. —President. R. Temple. Esq. C. S. Member. Rev. J. Sale, to represent the interests of the rayats in the committee, and the missionaries. W. F. Furgusson Esq. nominated by the Indigo Planters' Association to represent the interest of that body and Babu Chandra Mohan Chatterjee nominated by the British Indian Association to represent the Landholders interest.

৮০ "Babu Joychand Pal Choudhury—a great Zemindar, who is or was a great indigo planter (having had thirty two concerns in his Estate and shares in 9 other concerns) is asked "If the rayats

have for the last twenty years been unwilling to sow indigo, how then have they gone on cultivating the plant up to the present time" ? To this he answerd "by numerous acts of oppression and violence, by locking them up in godowns, burning their houses, beating them etc." The whole of this gentleman's evidence is very instructive as proceeding from a great Zemindar and practical native indigo planter. This dileuted into becoming official language, I find to be the conclusion of the commission and it is certainly the inevetable deduction from the whole body of evidence."—Minute of the Ltnt. Governor on the Report of the indigo Commission. Para 40.

৮১ "On my return a few days afterwards along the same two rivers, from dawn to dusk, as I steamed along these 2 rivers for some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with crowds of villagers claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves; the males who stood at and between the river-side villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants for justice ; all were most respectful and orderly but also were plainly in earnest. It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women, and children has no deep meaning. The organization and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration."—vide Sir J. P. Grants Minute of 17th Sept. 1860.

৮২ Vide the different Minutes and the animated correspondence that ensued between the Government of India and Sir, J. P. Grant.

Vide Bengal under Ltnt Governors By C. E. Buckland Esqr I, C, S, CIE.

৮৩ In 1860, the Goverment of Bengal undertook the rearran-

gement of subdivisions in the districts throughout the Province, making a commencement with the Nadia (now the Presidency Division). No more improtant measure, with a view to bringing justice home to the doors of the people, was ever undertaken. The views of Government were contained in a resolution of the 7th November of the year. * * Subdivisions were placed (as was the case with Khulna) where perhaps some man of influence and power hapend to reside, who misused his position; or in the centre of some distant part of an unusually extensive district; * * On the otherhand, some of the older subdivisions had been constituted in large towns or marts, places of intrinsic and permanent importance; and such positions were in their nature fixed.—Bengal under Ltnt Goveronrs pp 219—222.

৮৪ In 1706, there was only one Civil Court and one covenented English officer. In 1800, there were 39 courts and two covenented English officers in Nadiya. In 1883, there were 26 magistrial courts and of revenue and Civil 18, with four covenented English officers. —Vide Hunter's Imperial Gazetteer Vol X.

ষ্ট্যাম্প রেভিনিউ বৃদ্ধি হইতেও মকর্দ্দমা বৃদ্ধি বুঝা যায়,—

"The receipts upon sale of stamps have been steadily increasing since the year 1896-97. They avaraged Rs. 3,37,000 for the quinquenium ending with that year, during the following quinquenium they avaraged close on Rs. 3,73,47?, and in the year 1908-09 judicial stamp to the vale of Rs. 3,87,022. were sold." Gazetter Vol XIIV. p p 116.

৮৫ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীল কমিসনে সাক্ষী দিবার কালে নদীয়ার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট হারসেল সাহেব এইরূপ বলেন :—

প্রশ্ন—"Previous to this year what number of Duputy and Asst. Magistrates were in this District, besides the Magistrate ?

উত্তর—"There was one subdivision in Kareempur and another at Santipur; and in the later part of 1869 one was established at Damurhuda and since then another at Bongong.—Vide Minutes of evidence taken before the Indigo Commission at Krishnagar. Para 2867.

৮৬ The area of the district at present smaller by third than it was in 1790. Land Tax was £ 13,59,935 in 1850, £ 11,74,492 in 1870 and £ 9,11,053 in 1883—84.—Hunter's Imperial Gazetteer. Vol X.

৮৭ "January 3rd. 1713 A.D.

The Governor having for several months been very much indisposed and being adviced by the physicians to go up to Nadyia for change of air as the only means left for the recovery of health. Agreed that during his absense the worshipful Robert Hedges Esq. act as chief and transact all affairs with the rest of the Council and also take charge of the cash. Ordered that doctor go with the Governor and considering the troubles in this Country that Captain Woodvil with fifty soldiers go as guards.

৮৮ February 23rd. 1713 A. D.

The Governor not being perfectly recovered of his illness and begining to relaps which the doctors impute to the difference between the air of this place and Nadiya where he has lately been for the recovery of his health and therefore advice him to go up thither again.

Ordered that thirty soldier go up with the Governor as a guard, also that several of the Company's servants who are now indisposed go up with the Governor for the recovery of their health. Mr. Hedges act as chief."—Vide Abstract of Letters from Bengal to the Court of Directors also Wilson's Early Annals of the English. Vol II page 96.

৮৯ It began to rise about ten years ago (1892) in Jessore and Nadiya and caused much consternation and havoc in several parts of the 24 Parganas, and in 1864—65 crossed the Hugly district. In 1866 it appeared in the eastern and southern parts of the Burdwan district. During 1867—68 it continued to prevail and spread in these ditricts along the course of the Damodar river and 1867 the town of Burdwan was attacked and many places in both districts suffered severely. In 1870 the type and mortality were not so severe but in 1871 fever broke out with renewed violence, and was more wide spread and fatal than ever, it also

extended to the parts of Birbhum and Midnapur bordering on Burdwan and Hugly.—Buckland's Bengal under the Ltnt. Governor page 505.

২০ Buckland's Bengal under Lt. Governors.

২১ "The observation of the desease seem, however to show that it creeps over the country, taking hold in many cases of highlands and low lands alike and after a period of retaining its hold in a away, which seems to indicate, if not contagion or infection at least of some kind of local prograssion which we do not understand, And however we may mitigate the descase by drainage on other engineering expediants there is still much for medical science to discover before we can understand it so as to cope with it effectually Sir G. Campbell

২২ Buckland's B. U. L. G. page 292.

২৩ Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. II. page 87.

২৪ Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. II. page 89.

২৫ Hunter's Statis. Act. Vol. II. page 92.

২৬ East of the Hooghly the District most afflicted with famine was Nadia in which the official courge of Lord Ulick Browne, the collector, secured efficient relief. In June the distress became very severe and money was rapidly expended both in giving employment to those who could work and feeding those who could not. On 18th June about 2,5000 persons were employed in the special relief works of all kinds. At the worst time the number fed exceeded 10,000.—Bengal under L, G's. page 353.

২৭ সুখের বিষয় সর্ব্বাচক্ষুষ্মান, হিতকামী, প্রজাপালক সুসভ্য ইংরাজ রাজের প্রজার এই দুঃখ কষ্টের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রজারক্ষাকল্পে তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টা সমধিক এমন কি দৈব বিড়ম্বনার প্রতিবিধান মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইলেও উহার প্রতিকারকল্পেও তাঁহাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। কিসে প্রজা সাধারণ সুখে থাকে, কিসে দ্রব্যাদির মূল্য অত্যাধিক না হয়, কিসে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, কিসে জল কষ্টাদি দূর হয় এই সমুদয় বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা অসাধারণ এবং এই চেষ্টার ফলেই আজি নদীয়ার বহুস্থানেই স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য Anti Malarial Measure এর কার্য্য, দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির কারণানুসন্ধানের জন্য Commission of Enquiry into High prices of Food stuff, সাধারণে যাহাতে অল্প হারে কর্জ্জ পায়, সেই জন্য গ্রামে গ্রামে Co-operative Credit Society, জল-

প্লাবন নিবারণার্থ যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই বাঁধ, ও জলকষ্ট নিবারণার্থ নদী প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিতে অজস্র অর্থব্যয় হইয়া থাকে, এই সব দেখিয়া স্বতই মনে ভরসা হয় যে, এই সুশিক্ষিত ভাগ্যবান রাজার অকপট যত্নে, উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়েই হউক বা অর্থ ও সামর্থ দিয়াই হউক দেশের প্রতি দৈবের প্রকোপও শীঘ্রই দূরীভূত হইবে।

২৮ ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বের এতদ্দেশের শাসন বিভাগের বিশ্বাসযোগ্য যথাযথ ইতিহাস না থাকায় তৎপূর্ব্বের দুর্ভিক্ষাদির ও তজ্জনিত অসংখ্য লোকক্ষয়ের বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না, সুতরাং ইংরাজের সুরক্ষিত বিবরণী যাহাতে এতদ্দেশে যখন যে ব্যাপারটী ঘটিয়াছে তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে যখন ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বের ইতিবৃত্তে দুর্ভিক্ষ বা জলপ্লাবনাদির বিষয় কিছুই লিখিত হয় নাই তখন ঐ সকল কালে কোনও রূপ দৈববিড়ম্বনা সংঘটিত হয় নাই। পরন্তু ঐ সব কালের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস থাকিলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে ঐ সব কালে দুর্ভিক্ষাদি আরও কঠোরতর মূর্ত্তিতে দেখা দিত, কেন না তখন এখানকার মতন সুশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় রাজার কর্ণে প্রজার কষ্টের কথা পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হইত এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে এত সহজে রেল বা জাহাজযোগে চাউলাদি সাহায্য পাঠান অসম্ভব ছিল, প্লাবনের সময় উপযুক্ত বাঁধ বাধিয়া প্লাবন নিবারণে এমন সব সুশিক্ষিত এনজিনিয়ারে ঐকান্তিক অভাব ছিল, আর ঘন ঘন ঐ সকল দুর্দ্দৈব সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে বলা যায় যে এখনও অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জল প্লাবন প্রভৃতি যে সব কারণে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হয় তখনও ঐ সকল কারণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল।

২৯ It is estimated that 200,000 heads of cattles perished either from starvation or decease,—Mr Garrets, gazetter Vol XXIV. pp. 74.

নদীয়ায় বিদ্যাচর্চ্চা

ন্যায়-দর্শন

নবদ্বীপ আবহমান কাল জ্ঞান-গৌরবে গৌরবান্বিত। বিদ্যাচর্চ্চার বিবরণ ও জ্ঞানী মহাত্মার জীবনী লইয়াই নবদ্বীপের ইতিহাস বিরচিত। সুবিখ্যাত হিন্দু-নরপতি বল্লাল-সেন যে অবধি নবদ্বীপে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি নবদ্বীপে বিদ্যা-চর্চ্চার গৌরব বৃদ্ধি হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে। কথিত আছে, তাহার পূর্ব্বে একজন যোগী গঙ্গার চরে ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া কেবলমাত্র কতিপয় ছাত্রকে পাঠ দিতেন। ইঁহার ছাত্রগণের মধ্যে শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং ব্যায়াপ্তি শিরোমণি প্রধান। ইঁহাদের উভয়েই ন্যায়ের বহু গন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্কর তর্কবাগীশের অসাধারণ বিদ্বাবত্তা ও তৎকারণে জনসমাজে তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে একদিন তর্কবাগীশ কোনও ধনী-গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইবার সময় উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া তথায় ত্বরায় গমনমানসে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া সত্বরে তাঁহাকে পারে লইয়া যাইবার জন্য নাবিককে বারম্বার আদেশ করায়, নাবিক তাঁহার কথায় বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল "ঠাকুর যেন নদের শঙ্কর তর্কবাগীশ এলেন আর কি, তাই সব কাজ রেখে ওনাকে পার করে দেও"। মূর্খ নাবিকের মুখে আপনার অসাধারণ প্রতিষ্ঠার এই রূপ অপূর্ব্ব প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার যে আনন্দ হইয়াছিল, শত সভা বিজয়েও বুঝি তত হয় নাই।

বল্লালসেন একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বঙ্গের আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বর্দ্ধমান বংশা-বলীকে আচারভ্রষ্ট দেখিয়া শিথিলপ্রায় সমাজবন্ধন দৃঢ় করেন। ইহার সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ উন্নতি লাভ করে। বল্লালসেনের পরে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতৃতুল্য বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাসবান ছিলেন। এই অন্ধ বিশ্বাসই পরে তাঁহার ও সমগ্র বাঙ্গালার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। ইঁহার সময়ে হলায়ুধ, পশুপতি, ধোয়ী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হয়। সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব এবং উমাপতিধর ইঁহারই সভা-উজ্জ্বলকারী রাজকবি ছিলেন।

"ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব", "স্মৃতি সর্ব্বস্ব" এবং "মীমাংসা সর্ব্বস্ব" ও "ন্যায় সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি

হলায়ুধ। গ্রন্থের গ্রন্থকার। ইনি আপনাকে বাৎস্য গোত্রীয় ধনঞ্জয়ের পুত্র বলিয়া স্বীয়

সংগৃহীত "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। পশুপতি হলায়ুধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার কৃত "শ্রাদ্ধাদি কৃত্য" পশুপতি-পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধ।

ধোয়ী

"পবন দূত" প্রণেতা, এই পুস্তকে লক্ষণসেন দেবের দক্ষিণ ভারত বিজয় বর্ণিত আছে। ইহাতে এইরূপ বর্ণনা আছে যেন মলয় পর্ব্বতাধিপতি গন্ধর্ব্ব-রাজের কন্যা মলয়াবতি মহারাজা লক্ষণসেন দেবের প্রতি প্রেমাশক্ত হইয়া পবনকে দূতরূপে স্বীয় প্রাণনাথের নিকট প্রেরণ করেন। পবন দেবও এই দৌত্য স্বীকার করিয়া মলয়াচল হইতে বহির্গত হইয়া বহু পথ অতিক্রম পূর্ব্বক বৈদ্যবাটীর নিকট গঙ্গাতীরে উপনীত হয়েন, পরে তথা হইতে গঙ্গার তীরে তীরে উত্তর মুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ত্রিবেণী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান পশ্চাতে রাখিয়া তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ের জয়পুর ও বিজয়পুর নগরে উপস্থিত হয়েন। সম্ভবতঃ এই বিজয়পুর বর্ত্তমান "বল্লালঢিবী"। ধোয়ী কবি নিজ বাটী নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীধর দাস

লক্ষণ সেনের সেনাপতি বটুদাসের পুত্র। ইনি "সদুক্তি কর্ণামৃত" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ লক্ষণসেনের রাজ্যচ্যুতির দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১১২৯ শক বা ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে সংগৃহীত হয়।

জয়দেব গোস্বামী

ইঁহার নিবাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে। কিন্তু ইনি লক্ষণসেনের সময়ে রাজসভাসদ্ ও রাজকবি-রূপে নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। ইহার অমৃতময়ী লেখনী বঙ্গে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও জননীর নাম বামা দেবী। জয়দেব অল্প বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণে বাঞ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। এক অপুত্রক ব্রাহ্মণের জগন্নাথদেবের নিকট মানসিক ছিল যে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে প্রথমটীকে জগন্নাথের পদে অর্পণ করিবেন। উক্ত মানসে ব্রাহ্মণ আপন প্রথম তনয়াকে জগন্নাথসমীপে আনয়ন করিলে ব্রাহ্মণের প্রতি জগন্নাথ দেব প্রত্যাদেশ করেন যে জয়-দেবকে কন্যা দান করিলে সে তাঁহারই পাওয়া হইবে; এই কন্যার নাম পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশক্রমে সন্ন্যাসী জয়দেব পদ্মাবতী দেবীর পাণি গ্রহণ করিয়া সংসারী হন। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন; তিনি প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে মধুর কান্ত পদাবলী রচনা করিতেন, তাহা অতুলনীয়। কথিত আছে, স্বয়ং বৈকুণ্ঠনায়ক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমে মর্ত্তে আসিয়া শ্রীহস্তে তাঁহার পুঁথির পৃষ্ঠায় "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিয়া অপূর্ণ পাদ পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। ভক্ত জয়দেব সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। জয়দেব প্রত্যহ কেন্দুবিল্ব হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ পদব্রজে চলিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন; বৃদ্ধ বয়সে তিনি চলচ্ছক্তিহীন হইলে, তাঁহার প্রার্থনামতে কেন্দুবিল্বে গঙ্গা প্রবাহের আবির্ভাব হইয়াছিল।

একবার তদ্গতপ্রাণা দেবী পদ্মাবতী কোন সূত্রে অবগত হয়েন যে জয়দেবের মৃত্যু হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্রে পতিগতপ্রাণা সাধ্বী তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করেন। কথিত আছে, জয়দেব মৃত পত্নীর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। এইরূপ শত শত অলৌকিক গল্প তৎসম্বন্ধে প্রচলিত আছে। তাঁহার মাধুর্য্যময় "গীত গোবিন্দ" আজিও সর্ব্বত্র সাতিশয় আদৃত। শ্রীক্ষেত্রে ইহা জগন্নাথ দেবের পূজার অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থে পর্য্যটন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে কেন্দুবিল্ব গ্রামে অপ্রকট হয়েন। অদ্যাপি তথায় প্রতিবৎসর মাঘী সংক্রান্তিতে তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এবং "গীত গোবিন্দ" গীত হয়।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির পর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০ বৎসর ব্যবধান। এই সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশ প্রায়শঃ মুসলমানগণের শাসনাধীন ছিল। ইঁহাদের সকলেই গৌড়ে বাস করিতেন এবং গৌড়েশ্বর বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের শাসনাধীনতায় দেশে বিদ্যাচর্চ্চা সমভাবেই চলিতেছিল। দেশে ভূম্যধিকারী সকলেই প্রায় হিন্দু ছিলেন, সুতরাং বিচার ও শাসন প্রত্যক্ষতঃ হিন্দুগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বরগণও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং সংস্কৃত ও গৌড়ীয় ভাষায় বহুতর গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন।[১] যে "কৃত্তিবাস-রামায়ণ" আজ হিন্দুর গৃহে গৃহে আদৃত ও পূজিত হইতেছে, তাহা গৌড়েশ্বরেরই আদেশক্রমে রচিত। এই সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সুললিত প্রেমময় পদাবলী রচনা দ্বারা গৌড়ে ভাবী দেশোন্মাদকর বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া যান। চণ্ডীদাস ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে)[২] বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা বলে সমগ্র দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন।

বিদ্যাপতি ঠাকুর চণ্ডীদাসের সমসাময়িক, তিনি মৈথিল।[৩] মিথিলাই তৎকালে দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য সকল বিষয়ে অগ্রগামী। এইস্থানে মহামুনি গৌতম[৪] স্বীয় অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে যে ন্যায় শাস্ত্রের সূত্রপাত করিয়া যান, উদয়নাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশোপাধ্যায় ও তৎপুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় তাহাকে বহু টীকা ও ভাষ্য দ্বারা অলঙ্কৃত ও ভূষিত করেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁহার প্রকৃত নাম জয়ধর মিশ্র তর্কালঙ্কার। কথিত আছে যে, তিনি কোনও কথা একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া বিনা আলোচনাতেও এক পক্ষকাল স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন, ও যে কোনও শাস্ত্রীয় বিচার এক পক্ষকাল ধরিয়া করিতেন এবং তিনি পূর্ব্ব বা উত্তর যে পক্ষেই থাকিতেন, তাহা কখন স্খলিত হইত না বলিয়া তাঁহার পক্ষধর উপাধি হইয়াছিল। ইনি আপনাকে যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র এবং হরি মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। পক্ষধর মিশ্র তাৎকালিক পণ্ডিতগণের শীর্ষস্থানীয় এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সুদূরদেশ হইতে তাঁহার নিকট বহু ছাত্র পাঠার্থ সমবেত হইত। অধিকাংশ ছাত্র ন্যায় পড়িবার জন্যই মিথিলায়

আসিত, কারণ ন্যায়শাস্ত্র ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থাদি তখন অন্য কুত্রাপি পাওয়া যাইতনা। মিথিলার পণ্ডিতগণ সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদের বহু পরিশ্রমের গ্রন্থগুলি অতিসংগোপনে ও যত্নে রাখিয়া ছিলেন। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিলনা, সকলকেই স্বীয় স্বীয় পাঠ্য পুথি স্বহস্তে লিখিয়া লইতে হইত। যখন কোন ছাত্র ন্যায়াধ্যয়নার্থ মিথিলায় আসিতেন, অধ্যাপকগণ তাঁহাদের অভ্যাসের নিমিত্ত পুথি সকল প্রদান করিতেন, আবার পাঠান্তে সে গুলি পুনর্গ্রহণ করিতেন, এবং পাছে কেহ কোন অংশ গোপনে লইয়া যান, এই জন্য সকল ছাত্রকেই বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া মিথিলার বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত; এইরূপ এতাবৎ মিথিলার অধ্যাপকগণ বহু যত্নে ন্যায়শাস্ত্রে আপনাদের প্রাধান্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং সে সময়ে ন্যায়পাঠার্থী ছাত্রগণের মিথিলায় গমন ব্যতীত গত্যন্তর ছিলনা। বিশেষতঃ মৈথিলী অধ্যাপক ব্যতীত অপর কাহারও উপাধিদানের ক্ষমতা ছিলনা।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম

যে সকল ছাত্র মিথিলা হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা কোন না কোন ধনবানের আশ্রয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দেশে শিক্ষার বিস্তার করিতেন। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্র, উপযুক্ত গ্রন্থ ব্যতিরেকে তাহার সম্যক্ শিক্ষাদান অসম্ভব; সুতরাং উপযুক্ত গ্রন্থ অভাবে নবদ্বীপে তখন ন্যায়ের আশানুরূপ অনুশীলন ছিলনা, কিন্তু শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় শীঘ্রই এ অভাব মোচন হয়। মিথিলার বহুযত্নার্জ্জিত গৌরব খর্ব্ব করিতে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরম মেধাবী অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন শ্রুতিধর বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ ভট্টাচার্য্য। তিনি স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং আপনার পুত্রকে তৎকালপ্রচলিত রীত্যনুসারে ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠান্তে স্মৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করান। বাসুদেব অল্পকালমধ্যেই পিতৃনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র সমুদয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন এবং ন্যায় শিক্ষার জন্য উৎসুক হইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে মিথিলায় গমন করেন। তৎকালে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার পণ্ডিতগণের মধ্যে একচ্ছত্রী সম্রাটরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। বাসুদেব মিথিলায় তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া ন্যায় শিক্ষা করিতে থাকেন। ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নে তিনি দিন দিন যতই উন্নতি করিতে লাগিলেন, ততই অসীম আনন্দে আপ্লুত হইতে লাগিলেন এবং কিরূপে এই অমূল্য রত্নে আপনার মাতৃভূমিকে অলঙ্কৃত করিবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মৈথিল অধ্যাপকগণের সম্ভবাধিক যত্নে ন্যায়শাস্ত্রকে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে স্বদেশে লইয়া আসা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র বিশেষতঃ গঙ্গেশ-উপাধ্যায় কৃত চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্র একেবারে কণ্ঠস্থ করিলেন, পরে যখন দেখিলেন, উক্ত শাস্ত্র সম্যক কণ্ঠস্থ হইয়াছে, তখন তিনি কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন, কিন্তু অচিরে তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ হওয়ামাত্র শ্লোকভাগ ব্যতীত আর তাঁহার কুসুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করা হইল না; তখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য

হইলেন, এবং পক্ষধর-মিশ্র কর্তৃক "শলাকা পরীক্ষায়" সসম্ভ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া "সার্ব্বভৌম" এই সম্মানিত উপাধিভূষিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু পাছে তিনি কোন গ্রন্থ সঙ্গোপনে সঙ্গে লইয়া যান, এই আশঙ্কায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী প্রত্যেক বস্তু অতি সাবধানে পরীক্ষা করিলে বাসুদেব বলিলেন, "আমার স্মৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অঙ্কিত রহিয়াছে, আমার কোন গ্রন্থ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।" এই কথায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ ঈর্ষান্বিত হইলেন বুঝিতে পারিয়া বাসুদেব, পাছে নিজের জীবনের উপর কোন অত্যাচার হয়, এই আশঙ্কায় নবদ্বীপের পথে না আসিয়া নবদ্বীপ-যাত্রাচ্ছলে কাশী যাত্রা করেন এবং কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া তিনি বেদান্তে ব্যুৎপন্ন হয়েন; পরিশেষে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রথমে ন্যায় শাস্ত্র ও কুসুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ লিপিবদ্ধ করিয়া পরে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। এই হইতেই নবদ্বীপে ন্যায়ের বিধিমত চর্চ্চা আরম্ভ হয়; এবং দলে দলে পাঠার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট ন্যায়ের পাঠগ্রহণ করিতে থাকে, কিন্তু ন্যায়ের কয়েক খানি মাত্র গ্রন্থে তিনি পাঠ দিতেন, সুতরাং তখনও অনেকে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য মিথিলায় গমন করিতেন। বাসুদেবের বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে "অনুমান মণিব্যাখ্যা" প্রণেতা কনাদ ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রধান মধ্যে গণ্য ছিলেন। এই রঘুনাথই স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে মিথিলা হইতে নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের উপাধি দানের ক্ষমতা আনয়ন করেন। বাসুদেব জীবনের শেষ বয়সে (১৫২০ খৃষ্টাব্দে) যখন প্রবল প্রতাপান্বিত গঙ্গাবংশীয় রাজা গজপতি প্রতাপ রুদ্রের ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁহার সভাসদরূপে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার মতানুগামী হয়েন। কথিত আছে, বাসুদেবের শেষ বয়সে নবদ্বীপে মুসলমানগণ ঘোর অত্যাচার করিতে থাকে, তিনি তাহাতেই ঘোর উত্যক্ত হইয়া সপরিবারে উৎকলে যাত্রা করেন এবং তথায় রহিয়া "সার্ব্বভৌম নিরুক্ত" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। সার্ব্বভৌম উপাধিধারী আরও ৪।৫ জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সার্ব্বভৌমের বংশাবলী নদীয়ার বহু স্থানে অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

রঘুনাথ শিরোমণি

বাসুদেব সার্ব্বভৌম আপনার অনন্যসাধারণ মেধা ও স্মৃতি শক্তির সাহায্যে মিথিলার দারুণ কবল হইতে যে ন্যায়শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া আপনার মাতৃভূমি অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য রঘুনাথ স্বীয় অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে তাহার উন্নতি সাধন ও মিথিলা হইতে উপাধি দানের ক্ষমতা আনয়ন করিয়া নবদ্বীপকে তদানীন্তন দেবভাষার "বিশ্ববিদ্যালয়ে" পরিণত করেন। রঘুনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপে এক দুঃখী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শিশুকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং তাঁহার কাঙ্গালিনী মাতা সার্ব্বভৌমের বাটীতে পরিচারিকার কার্য্য করিয়া দুঃখে দিনপাত করিতে থাকেন। মতান্তরে রঘুনাথ শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈদিক সংবাদিনী নামক কুলগ্রন্থে প্রকাশ, সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডে তিনি

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই পক্ষখণ্ডে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীধর আচার্য্য মিথিলা হইতে ৫৩ ত্রিপুরাব্দে বা ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। রঘুনাথের পিতা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি "দীপিকা প্রধান" নাম্নী একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার মাতার নাম সীতাদেবী। রঘুনাথের পিতার অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। তিনি অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলে রঘুনাথের দুঃখিনী মাতা অতিশয় কষ্টে শিশু রঘুনাথের ভরণ পোষণ করিতে থাকেন। এই সময়ে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তিনি স্বগ্রামবাসী নিজ জনের সঙ্গে সপুত্র নদীয়ায় যাত্রা করেন। এখানে আসিতে পথে তিনি কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহার সহযাত্রীগণ সপুত্র তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যান। কিছু দিন রোগ ভোগের পরে আরোগ্য লাভ করিলে স্বজাতীয় স্বগ্রামবাসীর এই নিষ্ঠুর আচরণে তাঁহাদের উপর তাঁহার বিশেষ বিরাগ উপস্থিত হয়, সে কারণে আর স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া তিনি কোন এক বণিককে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে সপুত্র নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাৎকালিক বিদ্যারাজ্যের অধিপতি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আশ্রয় লাভ করেন। জন্মাবধি রঘুনাথ একচক্ষুহীন ছিলেন; এই কারণে যখন তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েন, তখন কাণভট্ট শিরোমণি নামে খ্যাত হয়েন।[৭]

রঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই অতি মেধাবী ছিলেন। কথিত আছে, একদা তিনি মাতার নিদেশানুসারে টোলের কোন ছাত্রের নিকট অগ্নি আনিতে যান। ঐ ছাত্র বার বার এইরূপে ত্যক্ত হইয়া রঘুনাথকে অপ্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক হাতা জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া রঘুনাথের হস্তে দিতে যাইলে বালক রঘুনাথ পাত্রাভাবে স্বীয় প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব গুণে ঝটিতি এক অঞ্জলি ধূলি গ্রহণ করিয়া অগ্নি লইতে প্রস্তুত হয়েন। ঐ সময়ে বাসুদেব স্বীয় চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পঞ্চম বর্ষীয় বালকের এতাদৃশ বুদ্ধি দর্শন করিয়া রঘুনাথের মাতাকে বলিয়া স্বয়ং রঘুনাথের পঠনের ভার গ্রহণ করেন। কথিত আছে, রঘুনাথ "ক," "খ" শিখিতে আরম্ভ করিয়াই "ক" অগ্রে না বলিয়া "খ" অগ্রে বলিলে কি দোষ হয়"; ব্যঞ্জনবর্ণে দুইটী "জ" দুইটী "ন" দুইটী "ব" তিনটী "স" ইহারই বা প্রয়োজন কি ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হয়েন, সুতরাং রঘুনাথকে বর্ণমালা শিখাইতে গিয়াই সমস্ত ব্যাকরণ পড়াইতে হইয়াছিল। রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্য অভিধান শেষ করেন এবং কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াই বাসুদেবের নিকট ন্যায়ের পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতি মেধাবী রঘুনাথকে বাসুদেব সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না, পরন্তু রঘুনাথ ইতিমধ্যেই "সার্ব্বভৌম নিরুক্ত" নামক গ্রন্থের বহুদোস বিচার করিয়া "কৃত বিদ্যা গুরুং দ্বেষ্টি" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন পুরঃসর নিজ গুরু সার্ব্বভৌমের উক্ত পুস্তকের অসারতা প্রতিপাদন করিলেন। বাসুদেব রঘুনাথের এবম্বিধ অসাধারণ ক্ষমতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে মিথিলায় ন্যায় আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। রঘুনাথ মাত্র বিংশতি বৎসর বয়সে (খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) মিথিলায় উপস্থিত হয়েন। বাসুদেবের

গুরু সুপ্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র তখনও জীবিত। রঘুনাথ তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে নিম্ন শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিম্নশ্রেণীতে প্রবেশ করিলেও অধিক দিন তাঁহাকে নিম্ন শ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই, কারণ তিনি নবদ্বীপ হইতেই চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং শীঘ্রই সকল ছাত্রকে তর্কে পরাস্ত করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র 'সামান্য লক্ষণা' নামক পুথি প্রণয়ন করিতেছিলেন, রঘুনাথ এখন ন্যায়ে সম্যক ব্যুৎপন্ন হইয়া তাহারই দোষ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষধর মিশ্র তাঁহার এই অসাধারণ তর্কশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন এবং মনে মনে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেও এবং পুনঃ পুনঃ রঘুনাথের সহিত তর্কে পরাস্ত হইলেও লোকলজ্জায় ও বৃথা অভিমানে রঘুনাথকে প্রকাশ্যে কটুবাক্যে বিলক্ষণ অবমাননা ও বিদ্রূপ করিলেন। পক্ষধর কুপিত হইয়া তাঁহাকে শ্লেষাত্মক রুক্ষ বাক্যে কহিলেন :—

"বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটে।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥"

"রে স্তন্যপায়ী কাণা ; যখন সুপরিব্যক্ত সংশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন কি করিয়া সহসা 'সামান্য লক্ষণা' লোপ করিবে ?"

রঘুনাথ এক চক্ষুহীন বিধায় তাঁহাকে কাণা বলাতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হওয়ায় তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন :—

"যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেকাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ ॥"

তখন পক্ষধরের সহিত তাঁহার রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তিনি অসাধারণ বুদ্ধি ও অপূর্ব্ব তর্কশক্তি প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপকের কূট বাগ্‌জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন ; তখন পক্ষধর উপায়ন্তর না দেখিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিলেন এবং তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছাত্রগণও তাঁহাকে অযথা মনঃকষ্ট দিবার নিমিত্ত তাঁহার এক চক্ষুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন :—

"আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ ॥"

রঘুনাথও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও সগৌরবে উত্তর করিলেন—

"কুশদ্বীপ-মহাদ্বীপ-নবদ্বীপ নিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মনীষিণঃ ॥"

এইরূপ অযথা লাঞ্ছিত হইয়া রঘুনাথ ভগ্নমনে নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং হয় স্বীয় মত স্থাপন নতুবা আচার্য্যের প্রাণ হনন এই স্থির করিয়া তীক্ষ্ণধার এক অস্ত্র গ্রহণ করিয়া নিশাযোগে গুরু-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সে দিন পূর্ণিমা রাত্রি, পূর্ণিমার শশধর বিমল জ্যোৎস্না বিকিরণ করিতেছিলেন। রঘুনাথ তখন ক্ষিপ্তপ্রায় ; শোকে, ক্ষোভে ও অপমানে উত্তেজিত হইয়া দারুণ প্রতিহিংসাবশে পক্ষধরকে অনুসন্ধান

করিতেছিলেন। দেখিলেন, পক্ষধর সস্ত্রীক অলিন্দায় উপবিষ্ট এবং উভয়ে কথোপ-কথনে নিযুক্ত আছেন। পক্ষধরগৃহিণী বিমল জ্যোৎস্নায় প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"নাথ! জগতে এই জ্যোৎস্না অপেক্ষা বিমল প্রীতিপ্রদ বস্তু আর কিছু আছে কি?" পক্ষধর তখন উন্মনা, বুঝি রঘুনাথের অযথা অপমানে আত্মগ্লানি আসিয়াছে, স্ত্রীর বারংবার প্রশ্নে আত্মস্থ হইয়া উত্তর করিলেন "কি ছার এই কলঙ্কী চাঁদের জ্যোৎস্নার প্রশংসা করিতেছ, তোমার গৃহে নবদ্বীপের যে অকলঙ্ক চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার বুদ্ধির নিকট জগতে বিমলতর আর কিছুই হইতে পারে না।" রঘুনাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন এবং আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সহসা গুরুপদে একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন গুরু ও শিষ্য উভয়ে উভয়কে চিনিয়াছেন—উভয়ে বহুক্ষণ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিলেন এবং এই দুই মহাপ্রাণ এক হইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে পক্ষধর এক মহতী সভা আহ্বান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বীয় পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং সর্ব্ববাদসম্মতিক্রমে রঘুনাথকে নবদ্বীপে থাকিয়া উপাধিদানের ক্ষমতা প্রদান করিলেন। তদবধি মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল এবং মিথিলার যশঃশ্রী নবদ্বীপের অঙ্কশায়িত হইলেন। এই দিন নবদ্বীপের একটী স্মরণীয় দিন।

এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে অভিলাষ করিলেন। রঘুনাথ অতি দরিদ্র ছিলেন, এমন কি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। এ সময়ে নবদ্বীপে হরিঘোষ নামে এক ধনাঢ্য গোপ বাস করিতেন; তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার সুবিস্তীর্ণ গোশালা চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য শিরোমণিকে দান করেন। এই গোশালাতেই রঘুনাথ তাঁহার বহুযত্নার্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া অজেয় টোল স্থাপন করিলেন। এক্ষণে তিনি টোল স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া নানা দিগ্দেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র আসিয়া তাঁহার সুবিস্তীর্ণ চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ করিল। এই সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর পাঠাভ্যাস কালীন কোলাহল বহুদূর হইতে শ্রবণগোচর হইত। এখনও লোকে কোনও স্থান জনাধিক্য বশতঃ কোলাহলপূর্ণ হইলে "হরিঘোষের গোয়াল" বলিয়া থাকে।

রঘুনাথকৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "চিন্তামণি-দীধিতি" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা "নবন্যায়" নামেও খ্যাত। এতদ্ব্যতীত তিনি "পদার্থ খণ্ডন" "আত্মতত্ত্ববিবেকের টীকা" এবং সুবিখ্যাত বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ও উদয়নাচার্য্য কৃত গ্রন্থ সমুদয়ের টীকা ও "নঞবাদ" "প্রামাণ্যবাদ," "নানার্থবাদ," "আখ্যাতবাদ," "ক্ষণভঙ্গুরবাদ" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল সদ্যুক্তিপূর্ণ ন্যায়ের গ্রন্থরাজী ব্যতিরেকে স্মৃতিশাস্ত্রীয় "মলিম্লুচ-বিবেক" (মলমাস) নামে একখানি গ্রন্থ দেখা যায়।

এই সময়ে শ্রীচৈতন্য দেবও নদীয়ার অধ্যাপকরূপে বিরাজমান। তাঁহার অলৌকিক দিগ্বিজয়ী মেধা, উজ্জ্বলতর রূপে পরিস্ফুট হইয়া অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষা সম্পাদন করিতেছিল; কিন্তু শীঘ্রই তিনি পার্থিব জ্ঞানকে জীর্ণবস্ত্রখণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া

অপার্থিব সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য মনোনিবেশ করেন এবং ধর্ম্মপথের পথিক হয়েন। নবদ্বীপের ইহাই স্বর্ণযুগ! রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব হইতেই নবদ্বীপের মহিমা পূর্ণভাবে বিকশিত। তাঁহাদের উভয়ের জ্ঞানগরিমা ও অনন্যসাধারণ চরিত্রমহিমা জনসমাজে প্রচারিত হইবার পরেই সুদূর দ্রাবিড় কাঞ্চী, মিথিলা, কাশী, তৈলঙ্গ প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্র ও ভক্তগণ আসিয়া নবদ্বীপকে এক তীর্থে পরিণত করে। তদবধি নবদ্বীপ শ্রীধাম ও সরস্বতীর পীঠস্থানরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীচৈতন্য দেব ও রঘুনাথের সময়ে নবদ্বীপ সর্ব্বতোমুখী বিদ্যালোচনায় উন্নতির শিখরদেশে উন্নীত হইয়াছিল। এই সময়ে ও ইহার পরবর্ত্তীকালে বহু মেধাবী পণ্ডিত এই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কিংবা বাস করিয়া তাঁহাদের নিজরচিত মৌলিক পুস্তকাদির দ্বারা নবদ্বীপের জ্ঞানগরিমা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের বিবরণ পাওয়া দুর্ল্লভ এবং পাইলেও এ স্থলে বিশদভাবে উহা দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইল। এই যুগে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ ও অসংখ্য ভক্তবৃন্দের দ্বারা বঙ্গভাষা বিশেষরূপে অলঙ্কৃত ও মার্জ্জিত হয়। যে সকল মহাত্মা এই সুকোমল বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অত্যাধিক; মধ্যে কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত চরিত স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হইল। নবদ্বীপের প্রতি এই সময়ে বাণীর অসীম কৃপা দেখা যায়। এই যুগে নবদ্বীপে যেরূপ ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, সেরূপ আবার নবদ্বীপবাসী স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও অন্যান্য বহু পণ্ডিত কর্ত্তৃক স্মৃতি, তন্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্র সবিশেষ উন্নতি লাভ করায় নবদ্বীপ সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইবে।

রামভদ্র সার্ব্বভৌম

বহু পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপে ন্যায়ের চর্চ্চা থাকিলেও রঘুনাথই নবদ্বীপের ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং তৎকালে তিনিই প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়েন। তদবধি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক সমাজে প্রধান নৈয়ায়িকের মৃত্যুর পর তদুপযুক্ত একজন ঐ পদে বৃত হইয়া আসিতেছেন। রঘুনাথের পর তাঁহারই বংশাবলীকে বহুদিন ন্যায় রাজ্যে একাধিপত্য করিতে দেখা যায়। রঘুনাথের পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম।[৮] ইহাঁর উপাধি সার্ব্বভৌম। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। ইনি স্বরচিত পদার্থমণ্ডলের টীকায় নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন :—

"তাতস্য তর্ক-সরসী-রুহ-কাননেষু
চূড়ামণে র্দিনমণেশ্চরণং প্রণম্য।
শ্রীরামভদ্র সুকৃতিঃ কৃতিনাং হিতায়
লীলা বশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি।"

ইনি "পদার্থ মণ্ডলের" টীকা, "পদার্থ-তত্ত্ব বিবেচনা প্রকাশ" ব্যতীত উদয়নাচার্য্য কৃত সমগ্র "কুসুমাঞ্জলির" টীকা করিয়াছিলেন। "কুসুমাঞ্জলি কারিকা ব্যাখ্যা," "গুণকিরণাবলী-রহস্য," "সমাসবাদ," "বুৎপত্তিবাদ," "প্রামাণ্যবাদ," "নঞার্থবাদ," "ক্ষণভঙ্গুরাবাদ," "আখ্যাতপদ," "আত্মবিবেক টীকা," "তর্ক দীপিকা প্রকাশ," গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত "চিন্তামণির ভাষ্য," "খণ্ডনখণ্ড খাদ্য টীকা," "গুণ কিরণাবলী," "প্রকাশদীধিতি," "ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ দীধিতি," "ন্যায় লীলাবতি দীধিতি," "ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি," "মনিম্নূচ বিবেক," "অদ্বৈতেশ্বরবাদ" "অপূর্ব্ববাদ রহস্য," "আকাঙ্ক্ষাবাদ" প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ

ইঁহারই সময় ইঁহারই সহাধ্যায়ী সূচ্যগ্রবুদ্ধি শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যগুণে দেশমান্য হয়েন। তিনি পঠদ্দশাতেই দীধিতির টীকা লিখিয়া যশস্বী হয়েন, পরে পিতৃনির্দেশানুসারে গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত চিন্তামণি গ্রন্থের এক অতি প্রাঞ্জল ভাষ্য প্রণয়ন করেন। কথিত আছে—মথুরানাথ কণাদ নামে একটী উপযুক্ত শিষ্যের অনুরোধে "অবয়বের" টীকা লিখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। কণাদের ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে গুরুর গ্রন্থাবলীর সহিত তাঁহারও একখানি গ্রন্থ প্রচলিত হয়। মথুরানাথের টীকা গ্রন্থসমূহের মধ্যে কণাদকৃত অবয়ব টীকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মথুরানাথের তিরোভাবের পর তাঁহার পুত্র প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিখণ্ড চিন্তামণির পিতৃপ্রণীত টীকা পাঠ করিয়া বিনা গুরুপদেশেই সুপণ্ডিত হয়েন। মথুরানাথের এই সকল টীকা ব্যতীত বল্লভাচার্য্যের "ন্যায়লীলাবতী প্রকাশের" ও "গুণকিরণাবলীর ভাষ্য" নৈয়ায়িক সমাজে অতি আদরের বস্তু। তাঁহার কৃত অসংখ্য টীকা ও ভাষ্য "মাথুরী রহস্য" নামে খ্যাত।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ

তাঁহার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রধানরূপে পূজিত হয়েন। ইঁহার কৃত টীকা "ভবানন্দী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার কৃত "মণি দীধিতি" "গুঢ়ার্থ প্রকাশিকা," "শব্দার্থ সার মঞ্জুরী," "লটার্থবাদ" "কারণত্ববাদ বিচার," "কারকষত্র" প্রভৃতি পুস্তক অদ্যাপি সমাদরে পঠিত হইতেছে।

রুদ্ররাম তর্কবাগীশ

ইনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। নবদ্বীপবাসীগণের সহিত বিবাদ হওয়ায় ইনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া দাঁইহাটের সন্নিহিত নলাহাটী গ্রামে বাস করেন। বিখ্যাত "বৈশেষিক শাস্ত্রীয় পদার্থ নিরূপণ," "অধিকরণ", "চন্দ্রিকা চিত্ররূপ," "বাদ পরিচ্ছদ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা রুদ্ররাম এই ভবানন্দের পুত্র। পিতার ন্যায় ইঁহার টীকাও আদরের সহিত গৃহীত হয়; ইঁহার কৃত টীকা সাধারণতঃ "রৌদ্রী" নামে খ্যাত।

এই কালের পণ্ডিতগণের মধ্যে দুইজন বিশ্বনাথের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় একজন নবদ্বীপবাসী অপর নদীয়ান্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী ; প্রথম, বিশ্বনাথ পঞ্চানন নামে প্রসিদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বা স্তুধু "চক্রবর্ত্তী" বলিয়া খ্যাত। বিশ্বনাথ পঞ্চানন সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সর্ব্বভৌমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র বিদ্যানিবাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইঁহারা তিন সহোদর প্রথম বিশ্বনাথ, দ্বিতীয় নারায়ণ, তৃতীয় "ভাববিলাস" প্রণেতা রুদ্র বাচস্পতি। বিশ্বনাথ পরম বৈষ্ণব ছিলেন জীবনের অধিকাংশ কাল শ্রীধাম বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন, এখানে বসিয়াই তিনি গৌতম সূত্রের শিরোমণির মতানুসারি এক গবেষণণাপূর্ণ টীকা প্রণয়ন করেন, "রস বার তিথৌ শকাব্দে" (১৫৭৬ শক) ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা ঐ গ্রন্থ রচনার কালে নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ টীকা ব্যতীত তিনি "ন্যায় তন্ত্রবোধিনী," "ন্যায় সূত্রবৃত্তি," "পদার্থ তত্ত্বাবলোক," "সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর টীকা" এবং ভাষা পরিচ্ছেদ নামক ন্যায় শাস্ত্রের এক সংক্ষিপ্ত উপাদেয় প্রাঞ্জল টীকা প্রণয়ন করেন। এই ভাষা পরিচ্ছেদই তাঁহার স্মৃতি আজিও জাগরূক রাখিয়াছে, ভারতের সর্ব্ব প্রদেশে আজিও এই গ্রন্থ আদরের সহিত অধীত হয়। বিশ্বনাথের পিতা বিদ্যানিবাস মহাশয়ও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মানসিংহ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং টোডর মল্লের সভায়, কাশীর তদানীন্তন জগৎগুরু নারায়ণ ভট্টকে বিচারে পরাস্ত করেন। তিনিই মুগ্ধবোধের টীকা লিখিয়া বঙ্গদেশে কলাপের স্থলে মুগ্ধবোধের প্রচলন করেন।

বিশ্বনাথ পঞ্চানন

১৫৮৬ শকে দেবগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার অপর নাম হরি বল্লভ, ইনি "শ্রীমদ্ভাগবৎ," "শ্রীমদ্ভাগবত গীতা," "অলঙ্কার কৌস্তভ" ও "বিদগ্ধ মাধব" প্রভৃতির প্রসিদ্ধ টীকাকার, বিশেষ ভাগবতের টীকা চক্রবর্ত্তীর টীকা বলিয়াই খ্যাত ও উহা প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে আদৃত এতদ্ব্যতীত "ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী," "মাধুর্য্য কাদম্বিনী," "স্বপ্নবিলাসমৃত," "গৌরাঙ্গলীলামৃত," এবং "চমৎকার চন্দ্রিকা" প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের গ্রন্থকার। পদাবলীতে হরিবল্লভ নামে পরিচিত। ইনি "পদামৃত সমুদ্র" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থের সংস্কৃতে টীকা প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। ইনি বাল্য বধি সংসার বিরাগী, জীবনের অধিকাংশ ভাগ শ্রীধাম বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

সুবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণির বংশে যে সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, হরিরাম তর্কবাগীশ, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ; ইনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার সময়ে দেশের কোন ক্রিয়া কাণ্ডে ইনি ন্যায়ের প্রধান বিদায় প্রাপ্ত হইতেন ; ইঁহার কৃত বহু গ্রন্থের মধ্যে "নব্যমত রহস্য," "আচার্য্যমতরহস্য," "মঙ্গলাবাদ," "প্রমাণপ্রমোদ" "অনুমিত পরামর্শ, "বাদবুদ্ধি," "বিষয়তা বাদ," "বিশিষ্ট বৈশিষ্ট বোধ বিচার," "প্রতিবন্ধকতা বিচার, "প্রত্যাশত্ব বিচার," ও

হরিরাম তর্কবাগীশ

"সপ্তপদার্থ নিরূপণের ব্যাখ্যা" "রত্নকোষের ব্যাখ্যা" প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহার টোলে বহু দূরদেশ হইতে ছাত্রগণ পাঠার্থ আগমন করিত।

এই সকল ছাত্রের মধ্যে রঘুদেব ন্যায়লঙ্কার ভট্টাচার্য্য, ও গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রধান ছিলেন।

রঘুদেব ন্যায়লঙ্কার

রঘুদেব নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবানন্দ সিদ্ধান্ত-বাগীশের তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ অধস্তন বংশধর হইবেন। ইনি শিরোমণি-কৃত "নঞ বাদের" "নঞবাদ বিরেচন" নামক টীকা রচনা কালে গ্রন্থারম্ভে এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।—

"শিবং প্রণম্য তৎপশ্চাত্তর্কবাগীশ্বর গুরুম্।
ক্রিয়তে রঘুদেবেন নঞর্থস্য বিবেচনম্।"

এই শ্লোকে তিনি আপনার গুরু হরিরাম তর্কবাগীশকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, আবার গ্রন্থের শেষে বলিতেছেন :—

"অত্র সুক্তং দুরুক্তং বা যৎ কিঞ্চিৎ জল্পিতং ময়া।
তৎ সর্ব্বং জগদীশস্য প্রীত্যর্থং লিখিতং হি তৎ।
রঘুদেবকৃতগ্রন্থালোকনেন মনীষিণঃ।
অধ্যাপয়ন্তু সন্তোষৈর্নঞ বাদমবিবাদতঃ॥"

ইহাতে স্পষ্ট বলিতেছেন যে, তিনি জগদীশ তর্কলঙ্কারের প্রীত্যর্থে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে তিনি হরিরাম ও জগদীশ উভয়েব নিকটেই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাব "পদার্থখণ্ডন বিবরণ" ১৬৪১ শকে অর্থাৎ ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি মহর্ষি কণাদের "বৈশেষিক সূত্রের" "কণাদ সূত্র ব্যাখ্যান" নামে টীকা, গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত "তত্ত্ব চিন্তামণিব" গূঢ়ার্থে "তত্ত্বদীপিকা" নাম্নী ব্যাখ্যা পুস্তিকা, "পরামর্শ বিচার," "অবয়ব গ্রন্থ" রঘুনাথ কৃত "আখ্যাতবাদের" টীকা, "আকাঙ্ক্ষাবাদ," "কার্য্য কাবণ ভাব বিচাব," "চিত্ররূপবাদ," "জ্ঞানদ্বয়বাদ," "জ্ঞানলক্ষণ বিচার," "তর্ক বিচার" "নঞবাদ টিপ্পনী," "নবীন নির্ম্মাণ," "নানার্থ বাদ," "নিরুক্তি প্রকাশ," "মনোবাদ," "লক্ষণাবাদ" "বিশিষ্ট বৈশিষ্টবোধ বিচার," "বিশিষ্ট বৈশিষ্ঠ বাদ" "বিষয়তাবাদ" "স্মৃতি সংস্কাব বিচাব" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ টীকাগুলি সাধারণতঃ "রঘুদেবী" নামে খ্যাত।

গদাধর ভট্টাচার্য্য পাবনা জেলাব লক্ষীচাপড়া গ্রামের জীবাচার্য্য ভট্টাচার্য্যের পুত্র।

গদাধর ভট্টাচার্য্য

কিন্তু বাল্যকাল হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে নবদ্বীপের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইয়া যায় এবং কথিত আছে, গদাধর তাঁহার পৈতৃক জন্ম স্থান পাবনা হইতে ছাত্র সংগ্রহের নিমিত্ত বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করেন। এই কালে দেবভাষাধ্যয়ন-কারী ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইবার প্রথম কারণ—মুসলমান সভ্যতার বিস্তৃতি ও তদনুযায়ী ফারসী ভাষায় উন্নতি ও প্রচাব। এই সময়ে মুসলমানগণের দোর্দ্দণ্ড শাসনে, এবং বিলাস আয়েস দর্শনে দেশ "মোছলমানী" প্রচাব বিস্তার। দ্বিতীয় কারণ—শ্রীমন্

মহাপ্রভুর স্থাপিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ও তদঙ্গীভূত পদাবলীর রচনা ও প্রচার এবং বঙ্গভাষায় শ্রীবৃদ্ধি।

জগদীশ তর্কালঙ্কার

কিন্তু এই সকল বাধা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা তখনও সমাজে সমাজে সমাদৃত ছিল এবং তখনও মেধাবী অধ্যাপকগণের অভাব আদৌ অনুভূত হয় নাই। এই সময়ে "শব্দ শক্তি প্রকাশিকা," "তর্কামৃত" প্রভৃতির গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার বর্ত্তমান ছিলেন; জগদীশের জীবনী এক অদ্ভুত উপন্যাস। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ইহাদের আদি নিবাস মিথিলা, জগদীশ তাঁহার পিতার তৃতীয় পুত্র। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠীদাসের উপর তাঁহাদের পঞ্চ ভ্রাতার ভরণপোষণের ভার বর্ত্তে। ষষ্ঠীদাস চৈতন্যানুরক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি চৈতন্যের সেবায় কোনও রূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং ভ্রাতৃগণের বিদ্যাচর্চ্চা ও নৈতিক উন্নতির দিকে আদৌ মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। জগদীশ স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন, এক্ষণে পিতৃবিয়োগ ও ভ্রাতার অমনোযোগিতায় উচ্ছৃঙ্খলতা ঘোর দুষ্টামীতে পরিণত হয়। তখন তাঁহার বর্ণশিক্ষা হয় নাই বলিলেও হয়। ভাগ্যনেমির পরিবর্ত্তনে কাহার কিরূপ হয়, কে বলিতে পারে। কথিত আছে, একদিন জগদীশ পক্ষীশাবক অপহরণেচ্ছু হইয়া এক বৃহৎ তালবৃক্ষে আরোহণ করেন, দৈববশতঃ এক সুবৃহৎ বিষধর সর্প ঐ পক্ষীনীড়ে অবস্থান করিতেছিল। জগদীশ যেমন পক্ষীশাবক লইতে ঐ কুলায় হস্ত প্রবেশ করাইয়াছিলেন—ঐ সর্পও ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে দংশনোদ্যত হইল। জগদীশ তদ্দর্শনে কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চকিতে ঐ সর্পের ফণা ধরিয়া ফেলিলেন সর্পও তাহার শরীরের দ্বারা তাঁহার হস্ত দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিল; কিন্তু জগদীশ তৎক্ষণাৎ উহার মুণ্ড তালের সূচাগ্র বাকলে ঘর্ষণ করিয়া কর্ত্তনান্তর দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে নাগপাশমুক্ত হইয়া তিনি সহর্ষে বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

এতক্ষণ এক সন্ন্যাসী ঐ বৃক্ষমূলে বসিয়া জগদীশের কার্য্য অবলোকন করিতেছিলেন। জগদীশ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলে তিনি তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার অসীম সাহস ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর ঐ সন্ন্যাসী জগদীশের সমস্ত তথ্য অবগত হইলেন ও কৃপাপরবশ হইয়া জগদীশকে পাঠের মনোযোগী করিতে যত্নবান হইলেন। এতদিনে জগদীশের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল; তিনি সন্ন্যাসীর আগ্রহে তাঁহার নিকট পাঠগ্রহণে সম্মত হইলেন। এই দুরন্ত অশিষ্ট জগদীশ পরে সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক হইয়া নবদ্বীপের মুখোজ্জ্বল করেন। জগদীশ পাঠে মনোযোগী ছিলেন বটে, কিন্তু অর্থাভাবে তৈল ক্রয় করিতে না পারায় তাঁহার রাত্রিতে পাঠাভ্যাসের সুবিধা হইত না, কিন্তু অসাধারণ উদ্যমশীল জগদীশ দিবাভাগে শুষ্ক বংশপত্র সংগ্রহ করিয়া রাত্রিতে তাহারই আলোকসাহায্যে অধ্যয়ন

করিতেন। হায়! এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় অধুনা দেশ হইতে একেবারে বিদায় হইয়াছে।

জগদীশ ক্রমে কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের টোলে ন্যায়-শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন এবং শীঘ্র আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে ভবানন্দের প্রিয় হইয়া উঠেন এবং তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

উপাধি প্রাপ্তির পর গ্রামাসাহায্যে জগদীশ চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। এই সময়ে যদিও সংস্কৃত শিক্ষার আদর কিছু কমিতেছিল, তথাপি তাঁহার টোল শীঘ্রই ছাত্রপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু দরিদ্র জগদীশের অত ছাত্রের ভরণপোষণের ক্ষমতা কোথায়? অবশ্য অধ্যাপক বিদায়ে তখনও তাঁহাদের বিশেষ প্রাপ্য ছিল কিন্তু অধ্যয়ননিরত জগদীশের সর্ব্বদা দূরদেশে গমনে নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল, অতএব তিনি গৃহে বসিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে মহাপ্রভুআচরিত ধর্ম্মে, জনসাধারণের মধ্যে তুমুল অন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। এতাবৎকাল মাত্র ব্রাহ্মণেই যথাবিহিত শাস্ত্র পাঠ ও অধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু মহাপ্রভুর উদার ধর্ম্মে শূদ্রকেও শাস্ত্রে অধিকার দিয়াছিল এবং এখন শূদ্র কর্ত্তৃক শাস্ত্র অধীত ও রচিত হইতেছিল। তাঁহাদের মধ্যেও জ্ঞানী লোকের অভাব ছিলনা। সেজন্য জগদীশ জ্ঞানী আচারবান দেখিয়া শূদ্র শিষ্য গ্রহণ করিলেন; সুপণ্ডিত জ্ঞানবান জগদীশের শিষ্য হইতে সকলেই আগ্রহান্বিত হইলেন এবং শীঘ্রই ৩৬০ ঘর শিষ্য-সংখ্যা পূর্ণ হইল। তিনি নিয়ম করিলেন যে প্রত্যেক শিষ্যকে বৎসরে একদিন তাঁহার যাবতীয় খরচের ভার লইতে হইবে; শিষ্যেরাও সাহ্লাদে এইভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থাতেও গ্রন্থ লিখিতে সর্ব্বদা রত রহিতেন। তাঁহার কৃত গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত "অনুমানময়ূখ" গ্রন্থের "ভাষ্য" ও "প্রশস্তবাদ," আচার্য্যকৃত "বৈশেষিক শাস্ত্রীয় দ্রব্য ভাষ্যের" টিপ্পনী ও রঘুনাথের "ন্যায় লীলাবতী প্রকাশ" প্রভৃতি দীধিতি গ্রন্থের টীকা কি অদ্ভুত বিচার শক্তি ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তাহা আর্য্য ন্যায়পাঠক মাত্রেরই গোচর আছে। তাঁহার গ্রন্থসমূহ 'জগদীশী' বলিয়া খ্যাত।

জগদীশের দুই পুত্র—রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর। রঘুনাথ "সাংখ্য তত্ত্ব বিলাস" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রুদ্রের কোন গ্রন্থ বা টীকা প্রকাশ নাই। সুবোধিনী নাম্নী শব্দশক্তি-প্রকাশিকার টীকাকার রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ রুদ্রের পুত্র।

জগদীশের তিরোভাবে পূর্ব্বোক্ত গদাধর, প্রধান নৈয়ায়িকরূপে বৃত হয়েন। ইনি ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে দেশদেশান্তর হইতে ছাত্র আনাইয়া নবদ্বীপের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত চিন্তামণি আলোকের টীকা "বৌদ্ধাধিকার" "নানার্থবাদ," "নব্য মতবাদার্থ," "রত্নকোষ পদার্থ," "উপসর্গবিচার," "সাদৃশ্যবাদ" "প্রথমা ব্যুৎপত্তি," "অনুকরণ বিচার," প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজী অদ্যাপি বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। এই সময় হইতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের নবদ্বীপের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং পরে মহারাজ রামকৃষ্ণ নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যকল্পে বহু মুদ্রা আয়ের

ভূসম্পত্তি দান করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "নবদ্বীপাধিপতি" এই মহা সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন।

সুবিখ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে নবদ্বীপের ম্রিয়মাণ বিদ্যাচর্চ্চা আবার নবশক্তি প্রাপ্ত হয়। ইঁহারই অধিকারকালে নবদ্বীপের হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি, গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ সুকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণের যশঃসৌরভে বঙ্গভূমি আমোদিত হইতেছিল।

হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত

হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত শুধু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাউজ্জ্বলকারী পণ্ডিত, ছিলেন না, তিনি রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর নবদ্বীপে প্রধান নৈয়ায়িকরূপে বরিত হয়েন। ইঁহার মৃত্যুর পর শঙ্কর তর্কবাগীশ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্রের সভায় ও নবদ্বীপে প্রাধান্য লাভ করেন। ইঁহার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বুনো রামনাথ, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার প্রভৃতি উদ্ভূত হয়েন।

বুনো রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত

কথিত আছে, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত তদানীন্তন নৈয়ায়িকপ্রধান রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের শিষ্য। তিনি পঠদ্দশায় বিবাহ করেন এবং অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন। সে সময়ে পাঠান্তে সকলেই নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণনগরের রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিতেন, কিন্তু দাম্ভিক রামনাথ তাহা না করিয়া নবদ্বীপের উপকণ্ঠে বনের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সমাগত ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যাদান করিতে থাকেন। বনে কুটীর মধ্যে বাস করায় লোকে তাঁহাকে বুনো রামনাথ বলিত। যদিও তাঁহার যশঃসৌরভে বিদ্যার্থীর অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু সনাতনপ্রথানুযায়ী তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার ঐকান্তিক অভাব ছিল। এসময়ে দেশের অবস্থাও শোচনীয়—ইংরাজ তখন কেবল আধিপত্য গ্রহণ করিতেছেন; দেশ সুশাসিত হয় নাই—দস্যু ও চৌর্যভয়ে দেশ সশঙ্কিত—ধনী আর অর্থ ব্যয় করে না, পাছে ধনাপবাদে গৃহে ডাকাতি হয়, সুতরাং বহিঃসাহায্য তখন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে; এ অবস্থায় বিদ্যা ও পুঁথিমাত্রসম্বল দরিদ্র অধ্যাপকগণের আর পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্রপোষণে ক্ষমতা ছিল না, তাই রামনাথ তাঁহার ছাত্রগণকে কেবল বিদ্যাদান করিতেন, তাহারা নিজ ব্যয়ে আহারাদির ব্যবস্থা করিত। এই সময় হইতে "ছাত্র পোষণের" মনুপ্রচলিত সনাতন নিয়ম বিশিষ্টরূপে শিথিল হইয়া যায়।

রামনাথ দরিদ্র হইলেও সর্ব্বদা তাঁহার অবস্থায় সন্তুষ্ট রহিতেন। রামনাথের গৃহিণীও তাঁহার ন্যায় অল্পে সন্তুষ্টা ছিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে স্বামীর উপযুক্তা ছিলেন। কথিত আছে, একদিন ঘরে রন্ধনোপযোগী দ্রব্যসম্ভার কিছু না থাকায় রামনাথগেহিনী স্বামীকে কি ব্যঞ্জন হইবে জিজ্ঞাসা করায়, শাস্ত্রচিন্তায় তন্ময় রামনাথ উদাস দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে নিকটস্থ এক তিন্তিড়ী বৃক্ষের দিকে কিয়ৎক্ষণ মাত্র তাকাইয়া চলিয়া যান। অবোধ

গৃহিণী—বুঝি স্বামী তিন্তিড়ী পত্রের ব্যঞ্জন রাঁধিতে অনুমতি করিলেন ভাবিয়া, মধ্যাহ্নে তিন্তিড়ী পত্রের ব্যঞ্জন ও অন্ন প্রদান করেন। পণ্ডিতও তখন সমস্ত বুঝিয়া সাহ্লাদে তাই অমৃত বোধে ভোজন করিলেন।

এইরূপে যখন তাঁহাদের আকাঙ্খারহিত পুণ্যময় জীবন অতিবাহিত হইতেছিল, তখন তদানীন্তন নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র তাঁহাদের এই দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া কিছু সাহায্য-মানসে এক দিন তাঁহাদের কুটীরে পদার্পণ করেন। রামনাথ তখন একাগ্রমনে পাঠ দেখিতে ছিলেন, সুতরাং প্রথমে রাজাকে দেখিতে পান নাই। পরে সবিশেষ আদর করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা উপবিষ্ট হইয়া কথান্তরে রামনাথকে তাঁহার কিছু অনুপপত্তি আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে রামনাথ উত্তর করেন, "মহারাজ! সম্প্রতি চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, আর এখন কিছুই ত অনুপপত্তি দেখিতেছিনা।" এই উত্তরে মহারাজ আশ্চর্য্য হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও সস্ত্রীক রমানাথ তাঁহার দান অস্বীকার করেন। এই সময়ে কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণের বাটী জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগমন করেন ও তদুপলক্ষে এক মহতী সভা আহূত হয়। সেই সভায় ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপের নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ শিবনাথ বাচস্পতিপ্রমুখ পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু দিগ্বিজয়ীর প্রশ্নের উত্তরদানে সকলে অক্ষম হইলে এই নির্লোভী মহাপণ্ডিত বুনো রামনাথই নদীয়ার চিররক্ষিত সম্মান পাইয়াছিলেন।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি তাঁহার পিতা শঙ্কর তর্কবাগীশের পরলোকের পর প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়েন। কথিত আছে, ইঁহার পিতার শ্রাদ্ধসভায় দেশমান্য যাবতীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর সমাবেশ হয় এবং সেই সভায় ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়া সমবেত পণ্ডিতগণের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে ও নবদ্বীপের যশোহানি করিতে উদ্যত হয়েন। এই সময়ে শিবনাথ দানোৎসর্গ করিতেছিলেন; তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহার প্রিয় ভূমি নবদ্বীপের যশোহানি হয় দেখিয়া দানোৎসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগন্নাথের সম্মুখীন হইয়া তর্কদ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করেন।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি

শিবনাথের পর কাশীনাথ চূড়ামণি প্রধানরূপে গণ্য হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর দণ্ডী নামে একজন কিয়দ্দিবসের জন্য প্রধানরূপে গণ্য ছিলেন। তৎপরে শ্রীরাম শিরোমণি প্রাধান্য লাভ করেন। ইঁহার সময়ে নলডাঙ্গার মাধব তর্কসিদ্ধান্ত নামে একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, তিনি "সুবোধ" নামে শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বের এক টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীরাম শিরোমণির পরে তৎপুত্র হরমোহন চূড়ামণি প্রাধান্য লাভ করেন। ইনি ১৭৮৫ শকে বা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে "সামান্য লক্ষণা ব্যাখ্যা" নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রাধান্য সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও প্রসন্ন তর্করত্ন প্রধান পণ্ডিত। এই সময়ে ১৮৬৪ অব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল সাহেব গবর্ণমেন্টনিয়োজিত হইয়া নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর সবিশেষ তথ্য

সংগ্রহ করিতে আগমন করেন। তিনি যখন এখানে আসেন, তখন প্রধান পণ্ডিত সকলেই কুচবিহারের বৃদ্ধ রাজার শ্রাদ্ধে আহুত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে সমগ্র নদীয়ায় দ্বাদশটী টোল ও সেই সকলে সার্দ্ধ একশত মাত্র ছাত্র গণনা করিয়াছিলেন এই সকল টোলের মধ্যে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রসন্ন তর্করত্ন মহাশয়ের টোলই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছিলেন।[৯] এই টোলগৃহ বাবুলাল নামক জনৈক লক্ষ্ণৌবাসী বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দেন এবং তথাগত ছাত্রবৃন্দের অশনের ব্যয় ও স্বীয় স্কন্ধে বহন করেন।

হরমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রধান পদে বৃত হয়েন। ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রাধান্যকালমধ্যে মহামহোপাধ্যায় ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ৺প্রসন্নকুমার তর্করত্ন, ৺হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ৺মথুরানাথ পদরত্ন, ৺লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, ৺প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, ৺রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ৺শ্রীনাথ শিরোমণি প্রমুখ অধ্যাপক মহাশয়গণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরে ১৮১৭ শকাব্দে ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে নবদ্বীপাধিপতি কর্ত্তৃক মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রধান নৈয়ায়িক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।[১০] এক্ষণে নবদ্বীপে তাঁহার চতুষ্পাঠী ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম,[১১] অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং আশুতোষ তর্কভূষণ এই তিন জন অধ্যাপকের ৩ খানি ন্যায়ের চতুষ্পাঠী আছে। এই চারি খানি ন্যায়ের চতুষ্পাঠীতে বৎসরে অনূ্যন ৫০ ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্মৃতির দশখানি চতুষ্পাঠী সম্প্রতি নবদ্বীপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্র

নবদ্বীপ বিগত কয়েক শতাব্দীতে ন্যায়শাস্ত্রে যেরূপ উন্নতি করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রের আমূল সংস্কার ও আলোচনা করিয়া উক্ত শাস্ত্রেও আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। স্মৃতির অপর নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র সকল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুনিগণ কর্তৃক তৎকালীন সমাজবন্ধনের জন্য সংগৃহীত। শাস্ত্রে মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি প্রধানতঃ উনবিংশ জন স্মৃতিকারের সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।[১২] অনেক বিষয়ে এই সকল বিভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয় সুতরাং কোন মত গ্রাহ্য অথবা কোন্ মত প্রামাণিক, তাহা স্থির করা অতি দুরূহ—এই কারণে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদী মতের মধ্যে একটা সাম্যতা রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে তীক্ষ্ণধী পণ্ডিতগণ মীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল মীমাংসকগণের মধ্যে জৈমিনী, মনুটীকাকার মেধাতিথি, কুল্লুকভট্ট, "ধর্ম্মরত্ন" কার জীমূতবাহন, বিবাদচিন্তামণিকার, মিশ্র বাচস্পতি, শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রধান মধ্যে পরিগণিত। ইঁহাদের মধ্যে কুল্লুকভট্ট ও শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালী।

কুল্লুকভট্ট তৎকৃত মনুসংহিতার টীকায় এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

কুল্লুকভট্ট

"গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টোঽভবৎ।

ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কাশীতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া "মন্বর্থমুক্তাবলী" নাম্নী মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষকালে নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ শ্রীকরাচার্য্য ইঁহার পিতা, ইঁহার কৃত কৃত্যতত্ত্বার্ণব, দায়তত্ত্বার্ণব, উদ্বাহ-তত্ত্বার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে আদৃত। ইঁহার সময় হইতেই নবদ্বীপে স্মৃতি-শাস্ত্রচর্চ্চার বিকাশ হয় এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উহার প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য

রঘুনন্দন খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।[১৩] ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তদানীন্তন স্মার্ত্ত পণ্ডিত "সময় প্রদীপ" রচয়িতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঔরসে রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি রঘুনন্দন যেমন মেধাবী,



[illegible]

[illegible]





নকশী কাঁথা : শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

নকশী কাঁথা : নদীয়া





[illegible]



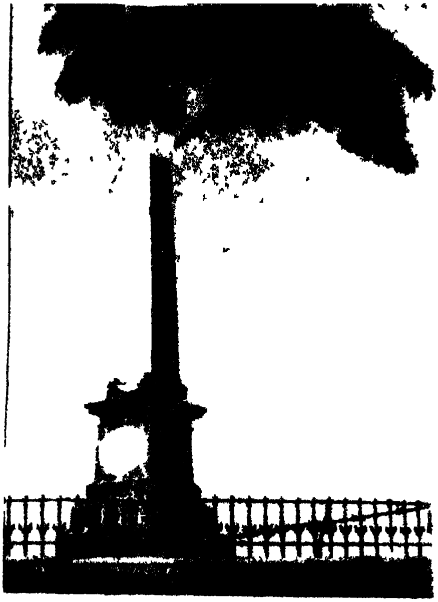




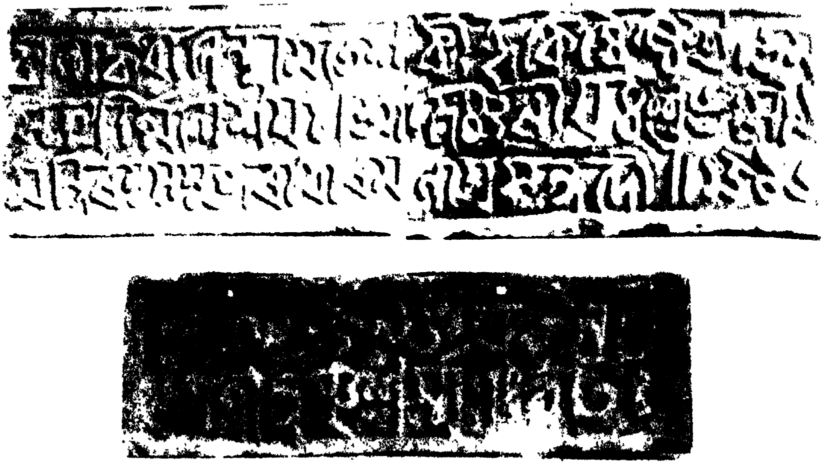
বল্লালঢিপি : পিরামিডাকৃতি মূল ধর্মীয় স্থাপত্য

বল্লালঢিপি মূল স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে প্রাচীর বেষ্টনী



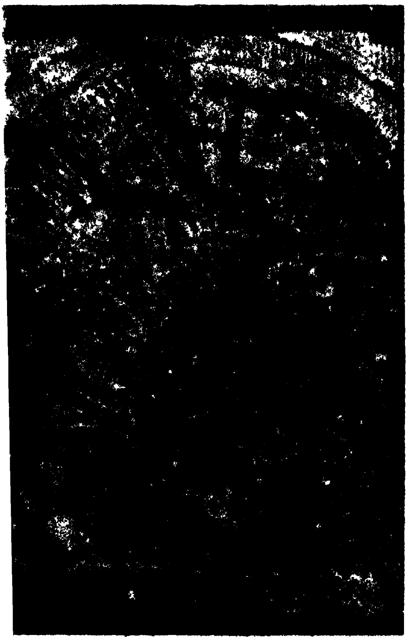






পোড়ামাটির মন্দির-প্রতিষ্ঠাফলক · গোঁসাই-দুর্গাপুর, কুষ্টিয়া

মন্দির-ভাস্কর্য · গোঁসাই দুর্গাপুর, কুষ্টিয়া



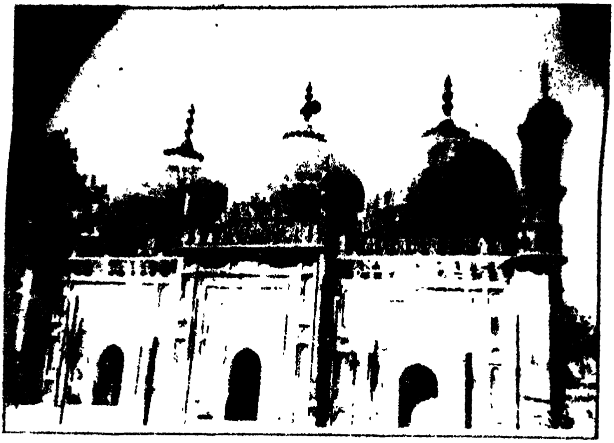




কৃষ্ণনগর কলেজ   স্থাপিত ১৮৪৬

প্রবেশতোরণ . কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি



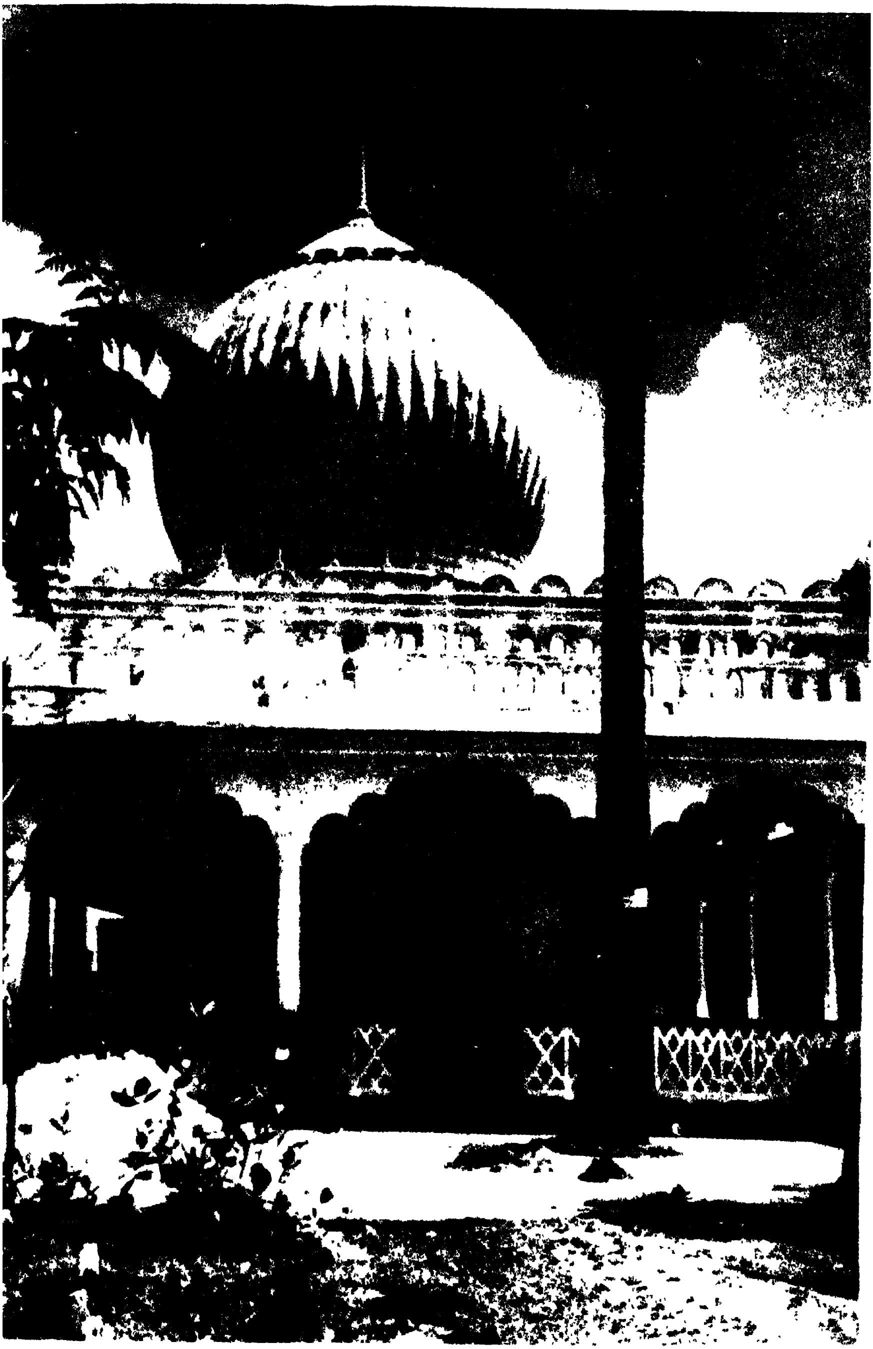


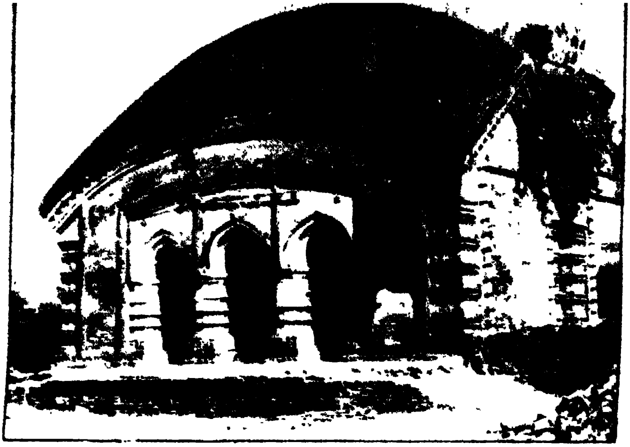
প্রাচীন মসজিদ ঝাউদিয়া, কুষ্টিয়া

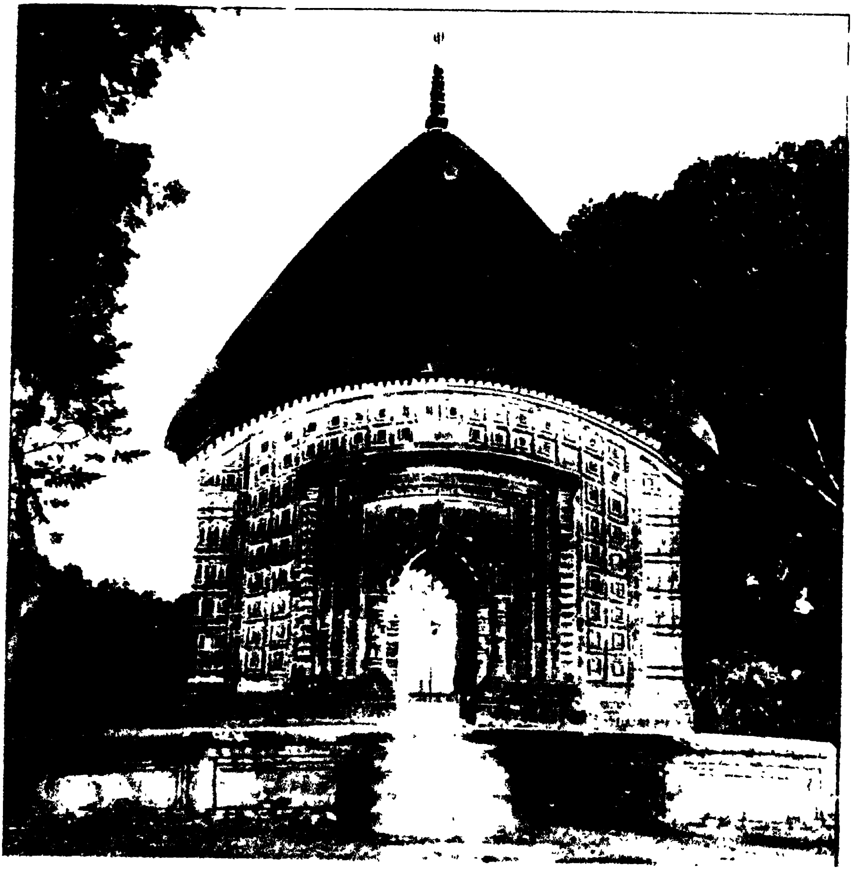
[illegible]

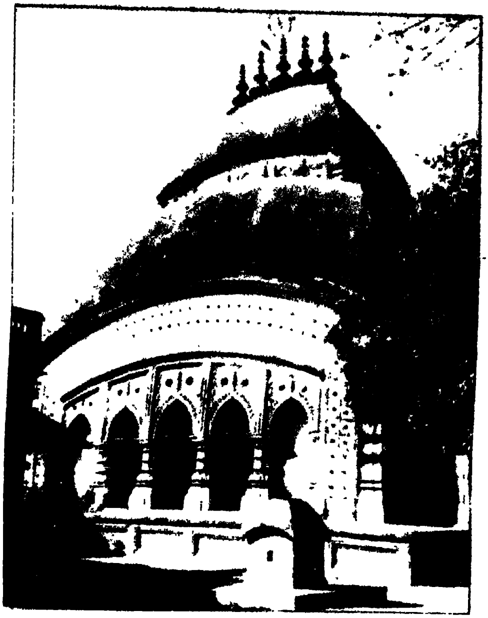


লালনমাজার ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া



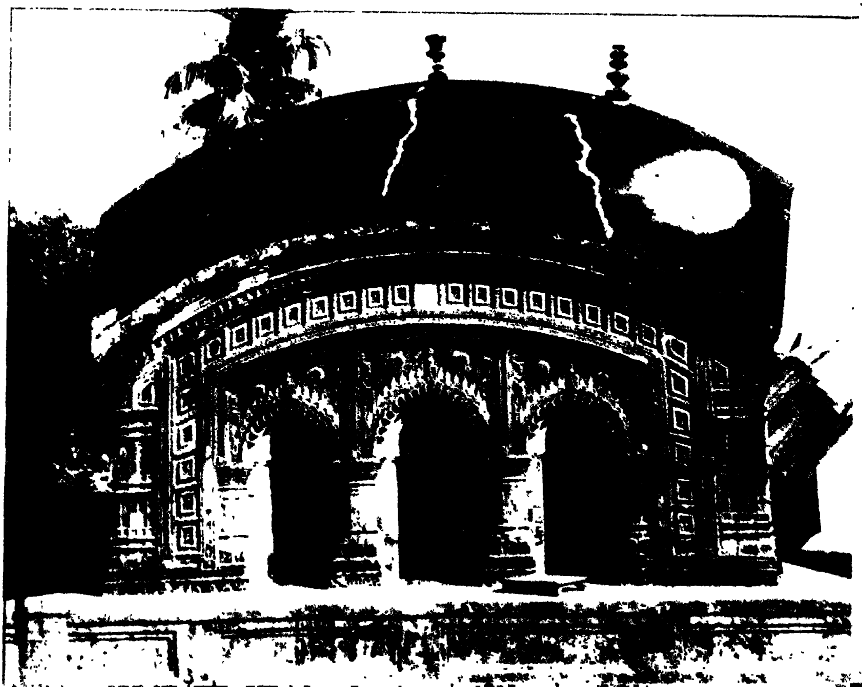






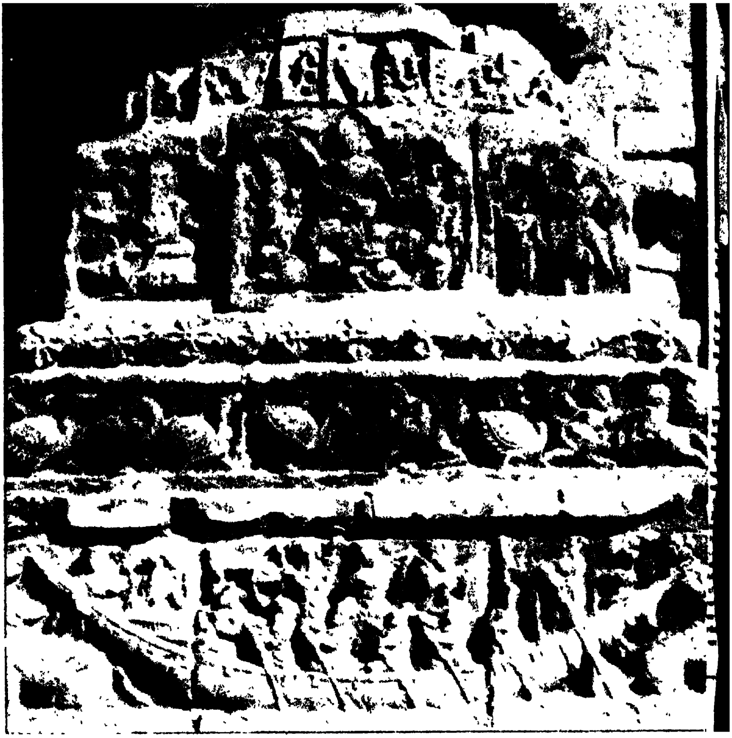
[illegible] মন্দির [illegible]

[illegible] মন্দির [illegible]





১ মন্দিরগাত্রে · দারু-ফলক
শিল্পের নিদর্শন



[illegible] মন্দির
[illegible] বীরনগর

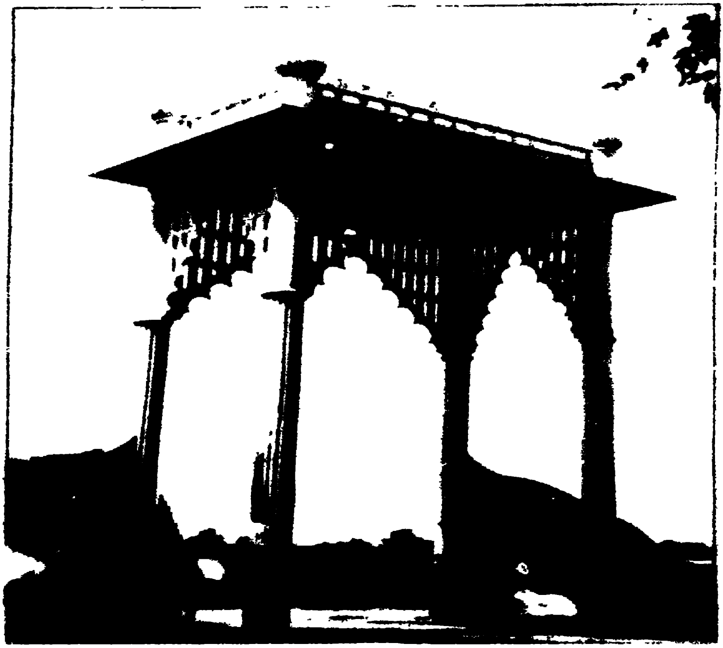


পদ্ম অলঙ্কৃত মণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমা
কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি



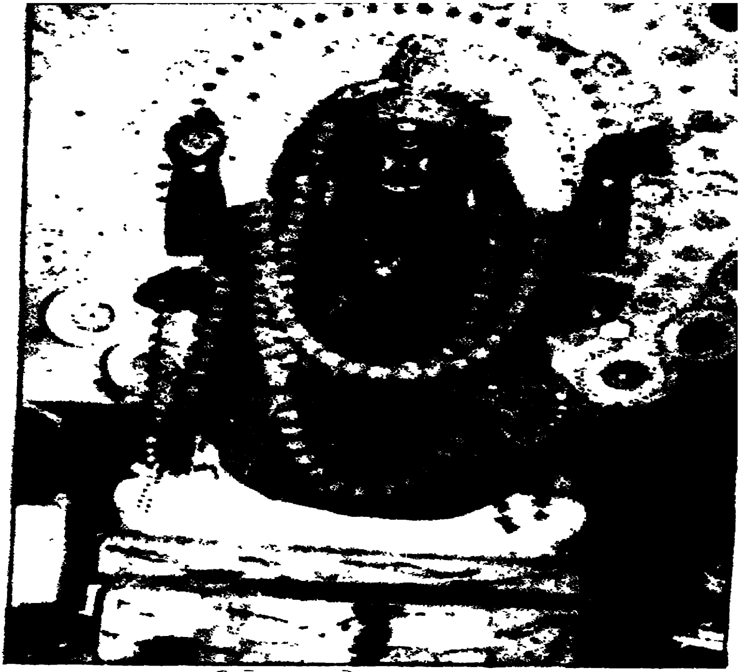
ঘোষপাড়ার সতীমা

প্রবেশ তোরণ, লালনমাজার, ছেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া



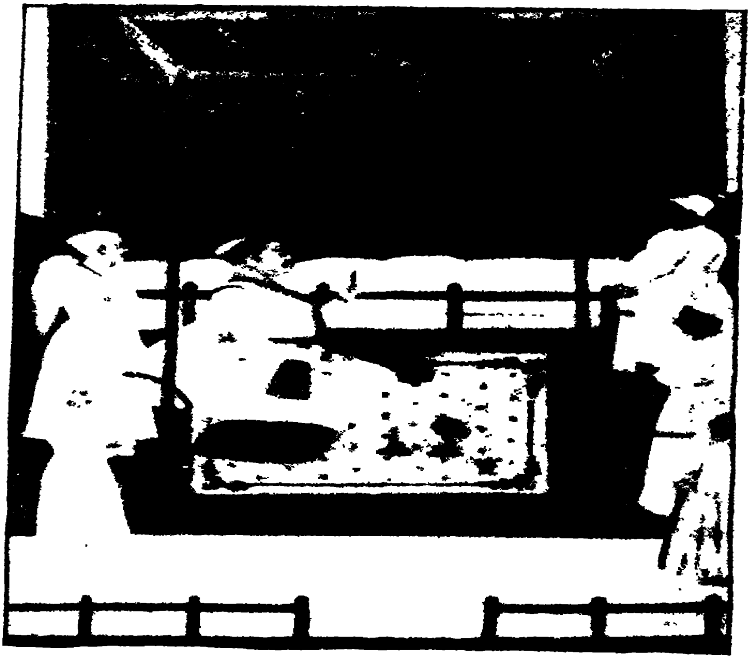
পোড়ামাতলা : নবদ্বীপ

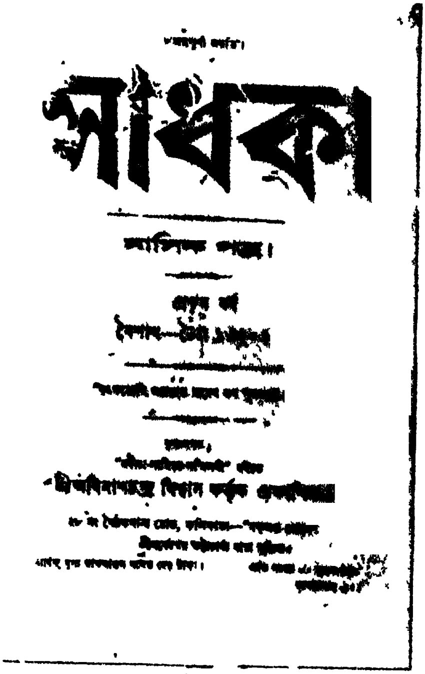




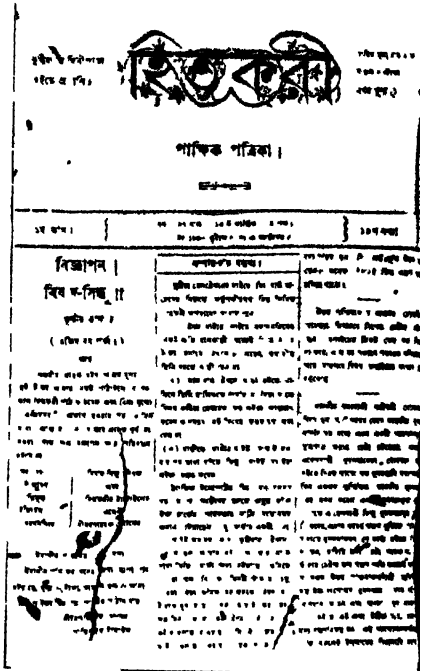
ভবতারিণী নবদ্বীপ

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র



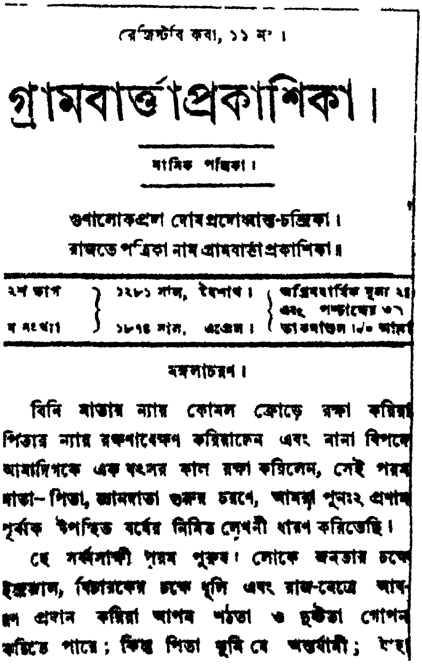


সাধক সতীশচন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত



হিতকরী মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত



রেজিষ্টরি করা, ১১ নং।

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা।

মাসিক পত্রিকা।

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোধান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা॥

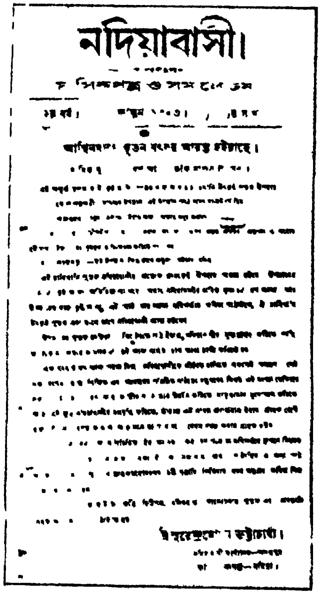
২শ ভাগ	১২৮১ সাল, বৈশাখ।	অগ্রিমবার্ষিক মূল্য ২।
১ম সংখ্যা।	১৮৭৪ সাল, এপ্রেল।	এবং পশ্চাদ্দেয় ৩। ডাকমাশুল ।৵০ আনা

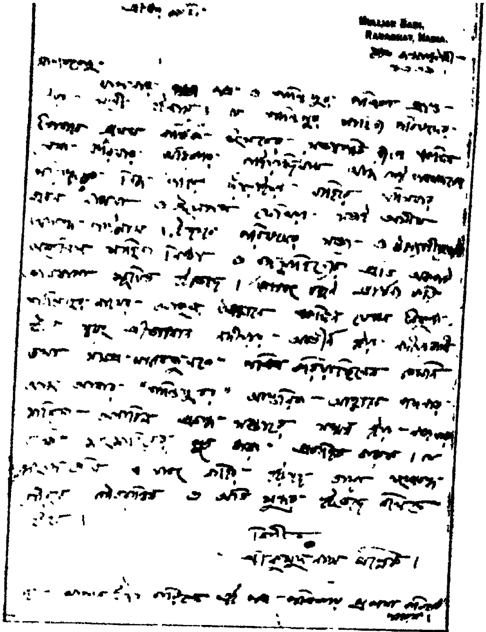
মঙ্গলাচরণ।

যিনি মাতার ন্যায় কোমল ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া পিতার ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন এবং নানা বিপদে আমাদিগকে এক বৎসর কাল রক্ষা করিলেন, সেই পরম মাতা-পিতা, জ্ঞানদাতা গুরুর চরণে, আমরা পুনঃ২ প্রণাম পূর্ব্বক উপস্থিত বর্ষের নিমিত্ত লেখনী ধারণ করিতেছি।

হে সর্ব্বসাক্ষী পরম পুরুষ! লোকে জনতার চক্ষে ইন্দ্রজাল, বিচারকের চক্ষে ধূলি এবং রাজ-নেত্রে আব-রণ প্রদান করিয়া আপন শঠতা ও চতুরতা গোপন করিতে পারে; কিন্তু পিতা তুমি যে অন্তর্যামী; ইহা

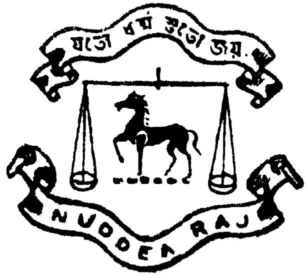
নদিয়াবাসী সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত



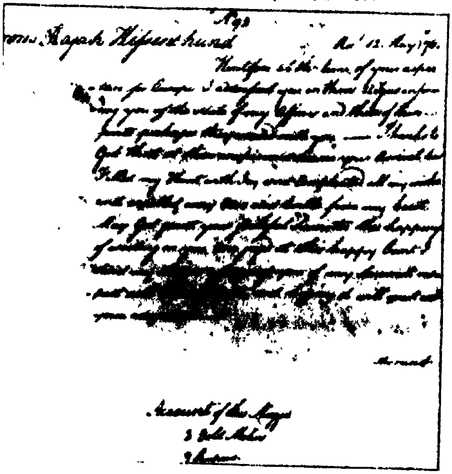


কুমুদনাথ মল্লিকের হস্তাক্ষর

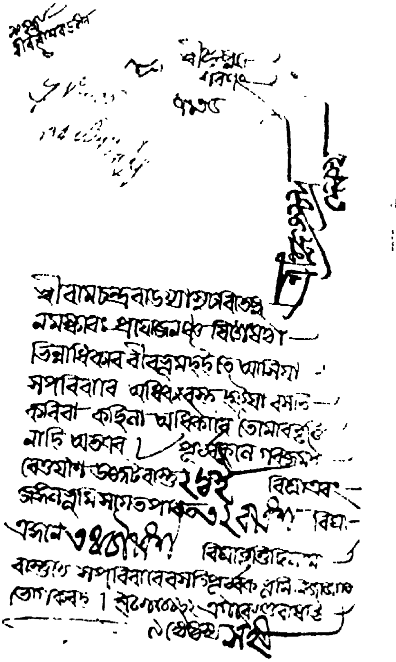
নদীয়ারাজের শীলমোহর

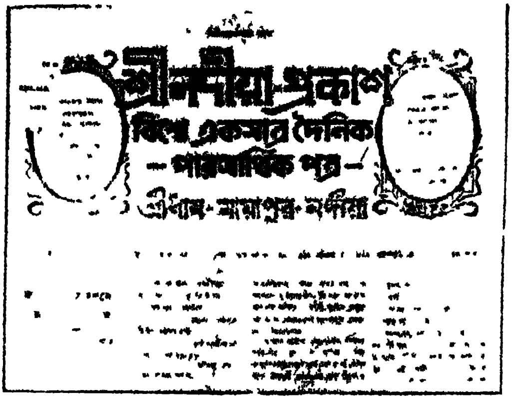


ক্লাইভকে লেখা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চিঠি



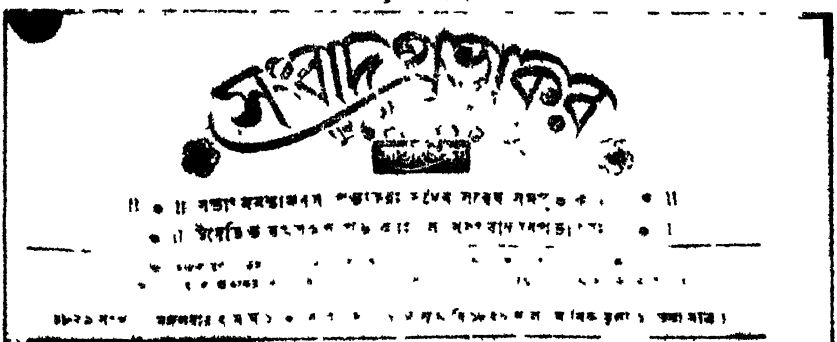
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বাক্ষরিত দানপত্র

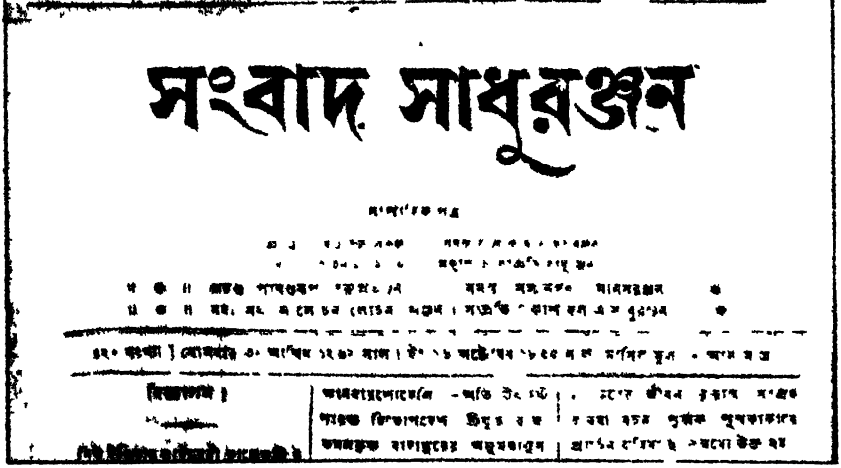




নদীয়ার প্রথম দৈনিক পত্রিকা

[illegible] দুটি [illegible]





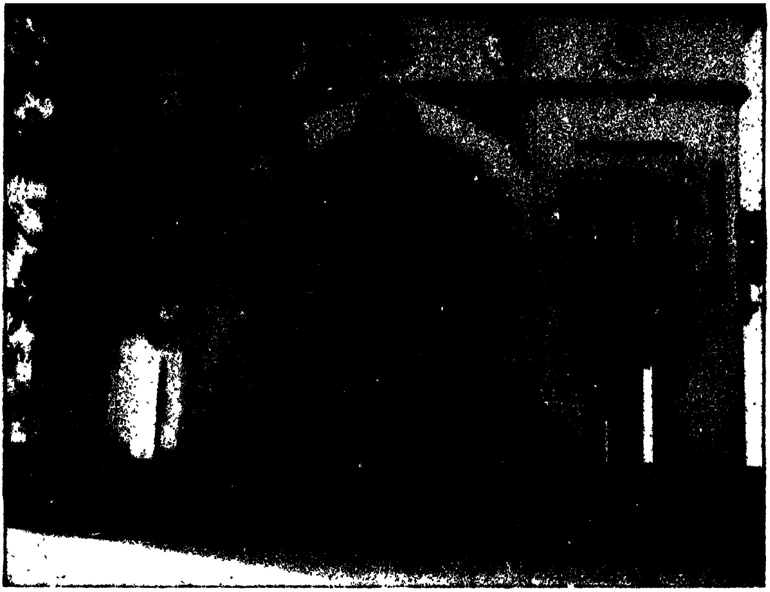


পুরস্কৃত মৃৎশিল্পের নিদর্শন . কৃষ্ণনগর





নবদ্বীপ ধামেশ্বর শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু   শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেবিত।



যোগপীঠ মন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, নদীয়া

ইস্কন : মায়াপুর, নদীয়া



তেমনি শিষ্ট ও শান্ত স্বভাব ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্যাদিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং সুন্দর সুন্দর শ্লোকরচনায় পারদর্শী হয়েন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই সময় নবদ্বীপের নবযুগ। পরম ভাগবত শ্রীমন্ কৃষ্ণচৈতন্য, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি মনীষিগণ এই সময়ে বিদ্যমান। দেশ তখন সর্ব্ববিষয়ে নবহিল্লোলে টলটলায়মান।

মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বলে জাতিভেদপ্রথা শিথিল হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণের গুরুত্বের অনেক লাঘব হইয়াছিল। রঘুনাথের নব ন্যায় দেশে একপ্রকার নাস্তিকতা আনয়ন করিতেছিল, তন্ত্রোক্ত মত বামাচারের কৃষ্ণ আবরণে ব্যভিচার ও সুরা স্রোতের প্রশ্রয় দিতেছিল; অদিকে মুসলমানগণের সুদীর্ঘকালের শাসনে ও সংস্পর্শে সমাজের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার সর্ব্বপ্রকারে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। এই টলটলায়মান সমাজ দৃঢ়ীকরণে ও তৎকালোচিত সমাজগঠনের ঐকান্তিক প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিতে বর্ত্তমান যুগের মনু, রঘুনন্দন অগ্রসর হইয়াছিলেন। রঘুনন্দন সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত সমস্ত বিধি যথাযথ আচরিত হইতে পারে না; সুতরাং এই সকল কঠোর বিধি কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দেশকাল পাত্রোচিতরূপে সংস্কারে মনোনিবেশ করেন এবং স্বীয় মত দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থের তিনি এইরূপ তালিকা প্রদান করিয়াছেন:—

"মলিম্লুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধিনির্ণয়ে। প্রায়শ্চিত্তে বিবাহে চ তথা জন্মাষ্টমী ব্রতে॥
দুর্গোৎসবে ব্যবহারে একাদশ্যাদি নির্ণয়ে। তড়াগভবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গ ত্রয়ে ব্রতে॥
প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তুযাগকে। দীক্ষায়ামাহ্নিকে কৃত্যে, ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্যবিচারণে। অষ্টাবিংশতিস্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥"

সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র একরূপে সংস্কৃত হইবার পর তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণানন্তর ও সর্ব্বস্থানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের সহিত বিচারে স্বীয় মত সংস্থাপন করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচারার্থী হয়েন এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে শীঘ্রই আত্মমত স্থাপনে সমর্থ হয়েন। এই সময়ে 'স্মার্ত্ত' শব্দ যোগরূঢ় হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিত। তাঁহার মত তখন সকলে এতই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে থাকেন যে, কথিত আছে—একদিন প্রাতঃকালে নবদ্বীপের গঙ্গাতটে শিবপূজাকালীন রঘুনন্দনের বস্ত্রের কচ্ছদেশ তাঁহার অজ্ঞাতসারে মুক্ত হইয়া যায়. রঘুনন্দন তখন ধ্যানমগ্ন—বাহ্যবিষয়ে একেবারে অজ্ঞান, সুতরাং কাছা খুলিয়া গিয়াছে, ইহা আদৌ জানিতে পারেন নাই। এই কালে নবদ্বীপের ঘাট সমুদায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।[১৪] সহস্র সহস্র লোকে সকল সময়েই এই ঘাট পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর স্নান, পূজার্চ্চনা, পাদচারণ এমন কি ছাত্রাধ্যাপন ও তর্কযুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই এখানে সমাহিত হইত। সমস্ত পূজানিরত পণ্ডিতমণ্ডলী স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকে ঐরূপে মুক্তকচ্ছ হইয়া পূজায় নিরত দেখিয়া উহাই শাস্ত্রোক্ত প্রথা মনে করিয়া সকলেই মুক্তকচ্ছ হইয়া পূজা করিতে থাকেন।

পূজান্তে স্মার্ত্ত, সকলকে তদবস্থ দেখিয়া কারণানুসন্ধানে সমস্ত অবগত হইয়া মহাকৌতুক করিতে থাকেন।

কথিত আছে :—রঘুনন্দন তাঁহার মত স্থাপনার্থ দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া ৺গয়াক্ষেত্রে পিতৃ মাতৃ কার্য্যের জন্য উপস্থিত হয়েন, তখন গয়ালী পাণ্ডাগণ অনেক পণ গ্রহণ করিয়া তবে ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে যাত্রীদিগকে পিণ্ডদান করিতে দিতেন। লোকমুখে রঘুনন্দনের খ্যাতি ও যশ শ্রুত থাকিলেও পাণ্ডাগণ তখনও কেহ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, সুতরাং তদানীন্তন প্রথানুযায়ী গয়ালী পাণ্ডাগণ তাঁহার নিকটেও উচ্চপণ চাহিয়া বসেন এবং স্মার্ত্তের ঐকান্তিক কাতরতায় দয়ার্দ্র না হইয়া অর্থের জন্য জেদ করিতে থাকেন। উহাতে স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন শাস্ত্রানুযায়ী ক্রোশব্যাপী গয়াক্ষেত্রে ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া মন্দির হইতে দূরে এক প্রান্তরে পিণ্ডদানের উদ্যোগ করেন। এখন পাণ্ডারা তাঁহাকে স্মার্ত্ত ভটাচার্য্য জানিতে পারিয়া নিজেদের ত্রুটী স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে সমাদরে মন্দিরে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। কারণ, তাঁহারা বেশ জানিতেন সেই দিন স্মার্ত্ত যদি প্রান্তরে পিণ্ড দান করিতেন, তাহা হইলে আর কেহ পাণ্ডাদের অযথা অত্যাচারে পীড়িত হইতে মন্দিরে গমন করিত না। এই সকল কাহিনী হইতে রঘুনন্দন তদানীন্তন হিন্দুসমাজে কি উচ্চতম আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়।

এই সময় হিন্দুবিধবাগণের আচার-ব্যবহার ঠিক শাস্ত্রসম্মত না থাকায় এবং তৎসম্বন্ধে সমাজের শিথিলতা দেখিয়া স্মার্ত্ত একাদশীতে উপবাসাদির কঠোর নিয়ম প্রচলিত করেন। তিনি তিথিতত্ত্ব নামক গ্রন্থে প্রত্যেক তিথিতে আচরণীয় কার্য্যাদির ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন; এবং আহারাদির বিষয়েও সবিশেষ সংস্কার করিয়া যান। কথিত আছে, এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক গোপনে সিদ্ধ চাউল মসুর ডাইল ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। স্মার্ত্ত উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের প্রকাশ্য ব্যবহার বিধি দেন। এইরূপে সর্ব্ববিষয়েই তিনি সংস্কার সাধন করিয়া যান।

স্মৃতিরাজ্যে এইরূপে একাধিপত্য করিয়া স্মার্ত্তপ্রধান রঘুনন্দন সপ্ততি বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম

রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর অনেকেই তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া গ্রামে গ্রামে ব্যবস্থাদি দিবার নিমিত্ত টোল স্থাপন করেন। তিনি এইরূপে বহুশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতের আয়ের সংস্থান করিয়া যান। অদ্যাপি তাঁহার স্থাপিত নব্যস্মৃতি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে। ইঁহার পরে সময়ে সময়ে এক এক জন পণ্ডিত তাঁহারই গ্রন্থ সমূহের টীকা ও ভাষ্য সংকলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাজা রামজীবনের সভায় শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমকে প্রধান স্মার্ত্তরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি স্মৃতি ব্যতীত কাব্য রচনাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার "পদাঙ্কদূত" একখানি কৃষ্ণলীলাময় সুখপাঠ্য কাব্য। তিনি উক্ত গ্রন্থে এই রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"শাকে নায়ক-বেদ -ষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা স্মরন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতরচনং বিদ্বন্-মনোরঞ্জনং
শ্রীল শ্রীযুত রামজীবন-মহারাজা দৃতঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমের পর চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নবদ্বীপে স্মৃতির মান রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত 'স্মৃতিপ্রদীপ' ও 'স্মৃতিসার-সংগ্রহ,' 'সংকল্পতর্গভঞ্জন' ও 'ধর্ম্মবিবেক' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য দিতেছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল পণ্ডিত বর্ত্তমান থাকিয়া বিশেষ রূপে খ্যাত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, দৈত্য বীরেশ্বর ও রামানন্দ বাচস্পতি শীর্ষস্থানীয়। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের টীকা ও "দায়ক্রমসংগ্রহ" নামক দায়ভাগ সম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক সাহেব এই "দায়ক্রমসংগ্রহ" ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ইঁহার পূর্ণনাম রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার। ইনি উদ্বাহ, আচার, তিথি, দায়, সম্বন্ধ, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, দুর্গোৎসব প্রভৃতি অনেকগুলি নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কথিত আছে;—তাঁহার সময় ঢাকার রাজা রাজবল্লভের কন্যা বালিকা-বয়সে বিধবা হওয়ায়, তাঁহাতে বাল-বিধবার বিবাহ দেওয়া প্রচলিত হয়, তাহার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজবল্লভ কতিপয় পণ্ডিতকে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রেরণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এই বিষয়েই রাজবল্লভের নিকট ঋণী ছিলেন, সুতরাং এ বিষয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েন। কিন্তু এই গোপাল-ন্যায়ালঙ্কারই অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ বলে বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশ কাল পাত্রের অনুপযুক্ত, তাহা প্রতিপন্ন করেন। বিধবা-বিবাহের ঘোর সমর্থকদিগের এইরূপে মুখবন্ধ হইয়া যায়। এই সময়ের ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালার শাসন ও বিচার সম্বন্ধে নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিচার সম্বন্ধে হিন্দুর ব্যবস্থা তাঁহারা একেবারে অজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং দেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন হয়। এই গোপাল ন্যায়ালঙ্কারই প্রথম মাসিক বৃত্তি লইয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হন। ইঁহার পর বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন এই পদে নিযুক্ত হয়েন।[১৪]

বীরেশ্বর পঞ্চানন

বীরেশ্বর পঞ্চানন ও "আহ্নিক-আচার" প্রণেতা রামানন্দ বাচস্পতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। উক্ত বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননই "দৈত্য বীরেশ্বর" নামে খ্যাত। কথিত আছে, একদিবস বীরেশ্বর তাঁহার কোন এক ভৃত্যের উপর অতিশয় রোষপরায়ণ হইয়া তাহাকে একটা চড় মারেন। তাঁহার একমাত্র চপেটাঘাতেই ভৃত্যটী প্রাণ ত্যাগ করে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দয়ায় ব্রাহ্মণ সে যাত্রা অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু মহারাজ বলিলেন—"পণ্ডিত! আপনার কার্য্যটী দৈত্যের ন্যায় হইয়াছে," তদবধি

তিনি ও তাঁহার বংশীয়েরা দৈত্য নামে খ্যাত হয়েন। সে কালে কোনও লঘু পাপের শাস্তি দিতে হইলে কুক্রিয়াশীল ব্যক্তির নামের সহিত উক্ত কার্য্যের যোগ করা হইত। এই রূপ শুনা যায় যে, একবার কোন এক ব্যক্তি প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন না করিয়াই বাসিমুখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়। রাজা তাহার শ্লেষ্মা ও লালাসংলিপ্ত মুখ দর্শনে তাঁহাকে "বাসিমুখো" বলিয়া সম্বোধন করেন; তদবধি ঐ ব্যক্তি "বাসি মুখো" নামে খ্যাত হয়। ইহাদের বংশ শান্তিপুরে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সভায় কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ও লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ প্রধান স্মার্ত্তরূপে বিরাজিত ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত, ন্যায় ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ন্যায়ের গ্রন্থ "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" এবং জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের টীকা লিখিয়া উভয় শাস্ত্রেই বুৎপত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপস্থ উত্তর মাঠে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে এক গোপালমূর্ত্তি উত্থিত হয়েন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তিনি "গোপাল-লীলামৃত" রচনা করেন। এই গোপাল অদ্যাবধি রাজবাটীতে আছেন। কথিত আছে; কৃষ্ণকান্ত অতিশয় দাম্ভিক ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত অতি হীন অবস্থায় পরিণত হইতেছিল এবং একমাত্র তিনিই নবদ্বীপের জ্ঞানগৌরব রক্ষা করিতে-ছিলেন। তাঁহার আসন্নকালে যখন আত্মীয় স্বজনে তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করেন, তখন তাঁহার একজন আত্মীয় কহিলেন, "খুড়া মহাশয় গঙ্গায় আনা গেল প্রণাম করুন"। তাহাতে বিদ্যাবাগীশ বলেন "বাপু হে আনা গেল নহে, আনা রহিল; আমি গেলে নদের পনর আনা যাইবে, আনা রহিবে।" কেহ কেহ বলেন "তিনি মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করেন :—

"অধিগগনমনেকাস্তারকা দীপ্তিভাজঃ
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্ত প্রভুত্বং।
দিশি দিশি বিলসন্তঃ সন্ত খদ্যোত-পোতাঃ
সবিতরি পরিভূতে কিন্নলোকৈর্ব্বালোকি।"

অর্থাৎ সূর্য্যাস্তে তারাগণও দীপ্তিভাজন হয়, প্রতিগৃহে দীপসকল প্রভুত্ব প্রদর্শন করে এবং চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোত সকলও দীপ্তি পায়, অতএব আমার ন্যায় সূর্য্য গমন করিলে নদীয়ায় বিদ্যাকাশে এখন ক্ষুদ্র পণ্ডিতগণও প্রভুত্ব করিবে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন নবদ্বীপে প্রধান স্মার্ত্তরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। এই মহাপুরুষ পূর্ব্বে শাক্ত-মতাবলম্বী থাকিলেও শেষ জীবনে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হয়েন এবং "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং স্বীয় চতুষ্পাঠীতে একটী হরিসভা স্থাপন করেন। এই অবধি নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই মহাপ্রভুর মতানুবর্ত্তী বৈষ্ণবগণের উপর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন। কথিত আছে;—কৃষ্ণনগরের রাজগণেরও মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ভাল লাগিত না। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় একজন বৈষ্ণবের সহিত আলাপ-কালীন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ

ভাবের কোন বাক্য বলিয়াছিলেন ; তাহাতে ঐ স্পষ্টবাদী বৈষ্ণবটী শ্লেষব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করেন, "মহারাজ আপনার এই চৈতন্যদ্বেষ স্বাভাবিক ও শাস্ত্রসম্মত ; কারণ পুরাণাদি সমস্ত পাঠ করিয়া দেখুন, যে দেশে যখনই বিষ্ণু কলেবর গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই সেই দেশের পরপারবাসী রাজগণের (দৈত্যগণের) সঙ্গে তাঁহার বিবাদ ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অযোধ্যায় রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে অপর পারস্থ রাবণের সহিত বিবাদ হয়। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে পরপারস্থ কংসের বিদ্বেষ জন্মে। এইরূপে প্রমাণিত হইতেছে আপনার এই বিদ্বেষ শাস্ত্রানুমোদিত ও স্বাভাবিক। ব্রজনাথের পুত্র মথুরানাথ পদরত্ন প্রধান পদে ; পরে লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, তৎপরে শিবনাথ বাচস্পতি প্রধান পদে বৃত হয়েন, তৎপরে পূর্ব্বস্থলী নিবাসী মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন বহুদিন প্রধান স্মার্ত্তের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন

খ্যাত নামা মৈথিলী পণ্ডিত অর্জ্জুন মিশ্রের বংশে নিম্নতর নবম পুরুষে কৃষ্ণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের নিবাস নবদ্বীপ হইলেও কৃষ্ণনাথের পিতামহ অভয়াচরণ তর্কবাচস্পতি পূর্ব্বস্থলীতে এক বাসবাটী নির্ম্মাণ করেন, তদবধি ইঁহারা তথায় বাস করিতেছেন, ১০৫৫ শকাব্দে কৃষ্ণনাথ জন্মগ্রহণ করেন ; কৃষ্ণনাথ শৈশবেই পিতৃহীন হয়েন। তাঁহার তুল্য অশেষ শাস্ত্রজ্ঞানী সুপণ্ডিত অধুনা বঙ্গদেশে বিরল। ইনি বহু গ্রন্থের টীকা; ভাষা ও মীমাংসাদি প্রণয়ন করিয়া দেশমান্য হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর তালিকা সংক্ষেপতঃ এইরূপ,—"কর্পূরাদি স্তোত্রের টীকা," "বাতদূত," অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের টীকা," "সমাস তত্ত্ব টীকা," "দায়ভাগ টিপ্পনী," "বেদান্ত পরিভাষার টীকা," "শ্যামা-সন্তোষ," "বৃহৎ মুগ্ধবোধ," "অর্থ সংগ্রহের টীকা," "মীমাংসা ন্যায় প্রকাশ," "তত্ত্ব-কৌমুদী," "স্মৃতি সিদ্ধান্ত।" ইনি স্বীয় নিরপেক্ষতা গুণে শ্রীভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক পদে গৃহীত হয়েন ও ঐ সভার সভাপতি দ্বারবঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক "পণ্ডিত কুল চক্রবর্ত্তী" উপাধি ভূষিত হয়েন। নবদ্বীপাধিপতি কর্ত্তৃক ইনি নবদ্বীপের প্রধানস্মার্ত্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হওয়ায় তাঁহার স্থলে পণ্ডিতপ্রবর হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়[১৩] ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। বিগত ১২ই ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনাথ স্বর্গারোহণ করেন।

এখন নবদ্বীপে সর্ব্বসমেত দশখানি স্মৃতির টোলে অন্যূন ১০০ শত জন ছাত্র প্রতিবৎসরে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অধ্যাপকগণের মধ্যে বঙ্গবিবুধী জননী সভার সম্পাদক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ স্মৃতিভূষণ, বর্দ্ধমানরাজের স্মার্ত্ত-পণ্ডিত শ্রীসিতিকণ্ঠ বাচস্পতি (ইনি এখন বর্দ্ধমানে থাকেন) শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন, চৈতন্যচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীতারাপ্রসন্ন চূড়ামণি, শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, নদীয়া রাজপুরোহিত শ্রীনিরঞ্জন বিদ্যাভূষণ—প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল অধ্যাপক মহাশয়গণের মধ্যে পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন কাব্য ও অলঙ্কারে অদ্বিতীয়।

সুচারু দেবভাষায় সুললিত কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। উপস্থিত পাদপূরণে ও মুখে মুখে শ্লোক রচনাতেও তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব।[১৭] এই সকল টোল ধারী অধ্যাপক ব্যতীত নবদ্বীপে এক্ষণে শ্রীকেদারনাথ স্মৃতিভূষণ, শ্রীহরিদাস ন্যায়সিদ্ধান্ত, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীদ্বারিকানাথ শিরোমণি, শ্রীউমেশচন্দ্র তর্করত্ন, শ্রীদ্বারিকানাথ শিরোমণি—প্রমুখ বহু অধ্যাপককল্প পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন।

বেদান্তশাস্ত্রে স্বামী শিবগোবিন্দ ভারতী ও শ্রীদামোদর শাস্ত্রী বিখ্যাত।

এতৎ প্রসঙ্গে নিকটবর্ত্তী বিল্বপুষ্করিণীর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ তর্করত্ন, শ্রীদেবীপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযদুনাথ সার্ব্বভৌম, শান্তিপুরের শ্রীরামনাথ তর্করত্ন, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, উলার শ্রীগদাধর শিরোমণি, কাঞ্চননগরে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় স্মৃতিতীর্থ, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, পূর্ব্বস্থলীর শ্রীগঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ন; চাকদহের শ্রীদুর্গাগতি শিরোমণি, খাইসমালীর শ্রীস্মৃতিকণ্ঠ শিরোরত্ন, মারিটারির শ্রীকুমারনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম নদীয়ার বর্ত্তমান চতুষ্পাঠীধারিগণের নামের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন পুরাণ বা ভক্তিশাস্ত্রে নদীয়ার মহাপ্রভুর সেবক শ্রীযুক্ত প্যারীলাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভাগবতভূষণ, শ্রীমাধবচন্দ্র গোস্বামী ভাগবতভূষণ প্রভৃতি পৌরাণিকগণ, বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

জ্যোতিষ

ন্যায় এবং স্মৃতিশাস্ত্রের ন্যায় নবদ্বীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। কত কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে পৃথিবীর আদি জ্ঞানভাণ্ডার বেদের মধ্যেও নাতি-বিস্তৃত ভাবে জ্যোতির্ব্বিদ্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ যজ্ঞকর্ম্মাত্মক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞানের আবশ্যক। জ্যোতিঃশাস্ত্রই সেই কাল-জ্ঞানের একমাত্র উপায়। এই জন্যই জ্যোতিষ বেদের ছয়টি অঙ্গের অন্যতম অঙ্গ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে উল্লিখিত হইয়াছে,—ময়নামক অসুরের প্রার্থনায় স্বয়ং সূর্য্যদেব তাহার অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত স্বীয় দেহ হইতে এক ঋষিকে সৃষ্টি করেন; তিনি ময়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ বিরচিত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচিত হইবার পর আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য, কেশব-দৈবজ্ঞ, গণেশ-দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অসংখ্য জ্যোতির্ব্বিৎ ভারতীয় জ্যোতিষ-বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভট্টই সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর গতি নির্ণয় করেন। বরাহমিহিরের গ্রন্থে জ্যোতির্ব্বিদ্যা-সংক্রান্ত নবাবিষ্কৃত অনেক তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভাস্করাচার্য্যই প্রথম মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কার করেন। কেশব-দৈবজ্ঞ ও গণেশ-দৈবজ্ঞ প্রভৃতির গ্রন্থে তিথি নক্ষত্র ও গ্রহণ-গণনাদির সুন্দর নিয়ম দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন অনন্ত-দৈবজ্ঞ-প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার জাতক-সংক্রান্ত (জন্মপত্রিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে) বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গদেশে কতকাল পূর্ব্বে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সঠিক কোন লিখিত বিবরণ নাই, তবে জ্যোতির্ব্বিৎসম্প্রদায়ের কুল গ্রন্থ হইতে এই জ্যোতির্ব্বিদ্-বংশীয়দের বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়।

এইসকল পুস্তক পাঠে জানা যায় যে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই নদীয়ার জ্যোতিষী গ্রহ বিপ্রগণের বাস ছিল, এবং তাঁহারা "নদীয়া বঙ্গ-সমাজ" নামে পরিচিত ছিলেন, কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশাবলী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহারা ম্লান হইয়া পড়িয়াছিলেন মাত্র। দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে যখন সেনবংশীয়গণ নবদ্বীপ-রাজধানীতে অবস্থান করিয়া বঙ্গদেশ শাসন করেন, তখন গতাবশিষ্ট গ্রহবিপ্র বা জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলেও নিতান্ত অল্প ছিল না। সেনবংশীয়দের সময়েও জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ সমাদর ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেও নবদ্বীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে তাঁহার জীবনের ভাবি ফলাফল গণনা করিয়া নবদ্বীপের জ্যোতির্ব্বিৎ গ্রহবিপ্রগণ পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দমজুমদার যখন আন্দুলিয়া গ্রামে বাস করেন, সেই সময়ের কয়েকটি জ্যোতির্ব্বিৎ গ্রহবিপ্রবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে যথানুক্রমে ঐ সকল বংশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

গর্গ-গোত্রীয় হৃদয়ানন্দ-বিদ্যার্ণব

হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণব একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি গণিত ও জাতক উভয়বিধ জ্যোতিঃশাস্ত্রেই বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তদানীন্তন কালে হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণবের ন্যায় কৃতী জ্যোতির্ব্বিৎ বঙ্গে কেহই ছিলেন না। ভবানন্দ মজুমদার এই বিদ্যার্ণব মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। হৃদয়ানন্দের কৃত "জ্যোতিঃ-সারসংগ্রহ" একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণব বোধ হয় অতিশয় দীর্ঘজীবী ছিলেন, তজ্জন্যই আমরা ভবানন্দমজুমদারের প্রপৌত্র মহারাজ রামজীবনের সময়েও যে তিনিই নদীয়া রাজধানীর জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত ছিলেন, এইরূপ প্রাচীন পরম্পরার মুখে গল্প শুনিতে পাই। রাজা রঘুরামের সময় হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণবের পুত্র বিষ্ণুদাস জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত হন। ইঁহার কোন উপাধি ছিল কি না জানা যায় না। তাহার পর, রাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়েই নদীয়ার রাজবংশের চরম উন্নতি হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার আকারে স্বীয় রাজধানীতে একটি "পঞ্চরত্নসভা" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় বরাহমিহিরের ন্যায় বিষ্ণুদাসের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রামরুদ্রবিদ্যানিধি অন্যতম রত্ন ছিলেন। এই রামরুদ্রবিদ্যানিধি অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার কৃত কতিপয় জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং পঞ্জিকা গণনার সহজ সঙ্কেত-সূচক পুস্তকসমূহ অদ্যাপি এই বংশের কোন আত্মীয়ের গৃহে বিদ্যমান আছে।

রামরুদ্র বিদ্যানিধি

রামরুদ্রবিদ্যানিধি সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি উল্লেখ করা যাইতেছে। এক সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় স্বীয় বিস্তৃত জমীদারীর কর যথাসময়ে না দিতে পারায় নবাবকর্ত্তৃক আহূত হইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ যখনই মুর্শিদাবাদ যাইতেন, তখনই কয়েকটি প্রিয়পাত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। যে সকল পণ্ডিত মহারাজের প্রীতিভাজন ছিলেন, তন্মধ্যে রামরুদ্রবিদ্যানিধি অন্যতম। প্রতিদিনই মহারাজকে পারিষদগণ সহ নবাবের দরবারে হাজির থাকিতে হইত। নবাব তদানীন্তন বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের রাজা বলিয়া মহারাজকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার নিকট কোন না কোন হিন্দুশাস্ত্রের কথা উত্থাপন করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চাপ্রসঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতেন। এক দিবস মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পারিষদগণ সহ নবাবের দরবারে উপস্থিত আছেন, এমন সময় নবাব প্রশ্ন করিলেন;—"আজ কি তিথি?" মহারাজ রামরুদ্রবিদ্যানিধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি বলিলেন "আজ পূর্ণিমা"। নবাবের জানা ছিল, পণ্ডিতদের অনেক সময় ভুল হয়, তিনি একটু রহস্য করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আজ সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎস্নাময় থাকিবে?" বিদ্যানিধি উত্তর করিলেন "হাঁ হুজুর আজ সমস্ত রাত্রিই জোৎস্নাময় থাকিবে"। নবাব

হাঁসিয়া বলিলেন "পণ্ডিতজী আপনি মিথ্যাকথা বলিতেছেন"। বিদ্যানিধি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "না খোদাবন্দ! আমি ঠিক বলিতেছি"। নবাব একটু রুক্ষভাবে বলিলেন "কেন আপনিই না গণিয়া লিখিয়াছেন, আজ "চন্দ্রগ্রহণ" এখন আবার কেমন করিয়া বলিতেছেন "সমস্তরাত্রি জ্যোৎস্নাময় থাকিবে?" ঐসময়ে বঙ্গদেশে একখানি মাত্র পঞ্জিকা গণিত হইত, ঐ পঞ্জিকার গণক উক্ত রামরুদ্রবিদ্যানিধি। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, স্বতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় স্বয়ং পঞ্জিকা স্বহস্তে লিখিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একখানি পঞ্জিকা নবাব সরকারে ও বঙ্গের বিশেষ বিশেষ রাজা জমিদার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট কয়েকখানি পঞ্জিকা প্রেরণ করিতেন। ঐ সময় রঘুনন্দনের স্মৃতির অপেক্ষাও অপ্রতিহতপ্রভাবে এই পঞ্জিকার ব্যবস্থা বঙ্গের সর্ব্বত্র গৃহীত হইত। নবাবের কথায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণ হইল যে, সে দিবস চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ব্ব দিবসেই গ্রহণ কালে কর্ত্তব্য বৈধ কার্য্যাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। স্বতরাং তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন "কি দুর্ভাগ্য! নিতান্ত গ্রহবৈগুণ্যবশতই রুদ্রবিদ্যানিধির নবাবের সম্মুখে এই দুর্দ্দশা ঘটিল"। মহারাজ লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। রামরুদ্রবিদ্যানিধি একটু চিন্তা করিয়াই সপ্রতিভাবে বলিলেন "খোদাবন্দ! আজ চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাইবেন না, আজ সমস্ত রাত্রি জ্যোৎস্নাময় থাকিবে।" নবাব তখনি পঞ্জিকা আনাইয়া ঐ দিনের নিম্নের-টিপ্পনিতে অঙ্গুলিসংযোগ পূর্ব্বক বলিলেন "সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ" এ কথাটী কাহার হাতের লেখা?" বিদ্যানিধি বলিলেন "আমি লিখিয়াছি বটে কিন্তু ঐ গ্রহণ আজ দেখা যাইবে না।" নবাব বলিলেন "যদি দেখা না যায়, তাহা হইলে পুরস্কৃত করিব কিন্তু যদি দেখা যায়?" বিদ্যানিধি বলিলেন "আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন।" এমন সময় দরবার ভঙ্গ হইল। মহারাজ বাসায় আসিয়া বলিলেন "বিদ্যানিধি করিলে কি? নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের রাজা বলিয়া নবাবের নিকট যে প্রতিপত্তিটুকু ছিল আজ হইতে সে সমুদয়ই নষ্ট হইল, এখন উপায়? আগামী কল্য তোমার কি দশা হইবে এবং কি প্রকারেই বা আমি নবাবের দরবারে মুখ দেখাইব।" বিদ্যানিধি বলিলেন "মহারাজ চিন্তা করিবেন না, গ্রহণ হইবে না।" মহারাজ বলিলেন "সর্ব্বগ্রাস গ্রহণও কি কখন না হইয়া যায়, তুমি এ কি প্রলাপ বকিতেছ, এক বৎসর মাথা ঘামাইয়া যাহা স্থির করিয়াছ, এক কথায় বলিলে তাহা হইবে না?"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় দুশ্চিন্তায় অভিভূত, তিনি তখন স্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামরুদ্রবিদ্যানিধি মহারাজকে বলিলেন "মহারাজ আপনি নিশ্চিন্তমনে স্নানাদি করুন। আমার একটি নিবেদন, অদ্য দিবারাত্রির মধ্যে আর আমাকে খোঁজ করিবেন না, আগামী কল্য প্রত্যূষে আসিয়া আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" মহারাজ বলিলেন "বুঝিয়াছি তুমি পলাইবে, কিন্তু পলায়ন বৃথা, বাদ্‌সার মুলুক ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যেখানে যাইবে, সেখানেই ধরা পড়িবে।" বিদ্যানিধি বলিলেন "মহারাজ! প্রাণের মায়া কি এতই অধিক যে, মহারাজকে ছাড়িয়া নিজের ধিক্কৃত ক্ষুদ্র প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব?" মহারাজ বিদ্যানিধির তেজস্বিতাপূর্ণ স্বভাব অবগত

ছিলেন, আর কিছু বলিলেন না কিন্তু নানা সন্দেহ ও কল্পনায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া রহিল। এদিকে বিদ্যানিধি মহারাজের কর্ম্মচারীদের দ্বারা একশত আটটি লোহিতবর্ণ জবাকুসুম সংগ্রহ করিলেন এবং একটি তামার ক্ষুদ্র কলস, একখানি তাম্রথালা ও অন্যান্য পূজোপকরণ লইয়া গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিলেন। তাহার পর, জলের ধার দিয়া বরাবর উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। যতদূর দেখা দেখা গেল, মহারাজের লোকেরা তাকাইয়া রহিল; তাহার পর ফিরিয়া গিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল। মহারাজ কোন কথাই বলিলেন না। বিদ্যানি[illegible] সহর অতিক্রম করিয়া বহুদূরে গঙ্গাগর্ভস্থ এক নির্জ্জন স্থানে পূজার দ্রব্য রাখিয়া স্নান করিলেন। তাহার পর সন্ধ্যা শেষ করিয়া একশত আটটি জবাকুসুম দ্বারা যথাবিধি স্বীয় লৌকিক উপাস্যদেব ভগবান সহস্রাংশুর অর্চ্চনা করিলেন; সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই তাম্র-কলসটি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া মন্ত্রবলে রাহুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐ কলসের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাহার পর, উহার উপরিভাগে তাম্রথালাখানি রাখিয়া পাঁচটি শিবলিঙ্গ তদুপরি স্থাপনপূর্ব্বক পূজা শেষ করিয়া একাগ্রমনে জপ আরম্ভ করিলেন। রজনী সমাগত হইল, জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক পুলকিত। প্রাসাদের উপরিভাগে ছাদে নবাব ও তাঁহার পারিষদগণের জন্য আসন স্থাপিত হইল। সপারিষদ নবাব উৎসুকচিত্তে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। নক্ষত্রমালা-পরিশোভিত পূর্ণশশধর নবাবের উৎকণ্ঠা দেখিয়া দূর হইতে যেন হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রহরে প্রহরে ঘড়ী বজিতে লাগিল। যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত তখনও আকাশ নির্ম্মল, সামান্য একখণ্ড মেঘ পর্য্যন্ত আকাশে নাই, পূর্ণশশধরের অনন্ত জ্যোৎস্নারাশিতে জগৎ উদ্ভাসিত। নবাবের চক্ষু নিদ্রার আকর্ষণে ঢুলু ঢুলু করিতেছে, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন—"নদীয়ার রাজার পণ্ডিতটা একটা বুজরুক, কেন না আমি মৌলবী সাহেবের পত্রেও জানিতে পারিয়াছি—দিল্লীর পঞ্জিকায় লেখা আছে, রাত্রি ৪দণ্ডের সময় গ্রহণ লাগিবে, ও ২য় প্রহর সময় ছাড়িবে এবং পূর্ণগ্রাস হইবে" সেই গ্রহণ হইল না, আর বসিয়া থাকিয়া কি হইবে, চল আমরা শুইতে যাই"। নবাব শয়ন করিতে গেলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে পুলকিত। তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছে যে বিনিদ্র অবস্থায়ই তিনি রাত্রি কাটাইলেন। এদিকে জনপ্রাণিবিহীন গঙ্গাগর্ভে মাঘমাসের দারুণ হিম-পাতেও অটলদেহে রামরুদ্রবিদ্যানিধি নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। আর রাত্রি নাই রজনীর বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া নিশানাথের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল। ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্রসকলও ক্রমে ক্রমে কোন অজানা প্রদেশে লুকাইতে লাগিল। বিদ্যানিধি জপ শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি শিব পাঁচটি গঙ্গাস্রোতে বিসর্জ্জন করিয়া তাম্রাধারটি তুলিলেই সেই প্রভাতকালে পৃথিবী যেন ধূসর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইল। নবাব শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিলেন গ্রস্তাস্ত চন্দ্রের ছায়া আকাশপটে বিলীন হইতেছে।

যখন, বিদ্যানিধি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাসায় আগমন করিলেন, তখন মহারাজ

হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন "বিত্তানিধি তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ, আজ আমি যথার্থ নবদ্বীপের পণ্ডিতের রাজা"। যথাসময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সপরিসদ্ নবাবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। সেদিন নবাবের দরবারের সমস্ত রাজা, জমিদার, আমির ওমরাহের দৃষ্টি রাজা এবং বিত্তানিধির দিকে পড়িল। সকলেই বিদ্যানিধিকে দেখিবার জন্য উৎসুক। বিদ্যানিধি, গৌরাঙ্গদেহ তেজঃপুঞ্জ-কলেবর গরদের ধুতি ও উত্তরীয় দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া মহারাজের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। নবাব, জ্যোতিঃশাস্ত্র ও যোগ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং বিত্তানিধির উত্তরে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর, প্রকাশ্য দরবারে বিত্তানিধির প্রশংসা করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যানিধি বলিলেন,—"খোদাবন্দ! মহারাজের অভীষ্টের সহিত আমার অভীষ্টের কোনই পার্থক্য নাই। অতএব মহারাজকে সন্তুষ্ট করিলেই আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব"। প্রভুর প্রতি এইরূপ অকৃত্রিম প্রীতি দেখিয়া নবাব অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং বাঁকী রাজস্ব রেহাই দিয়া সে যাত্রায় মহারাজকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। এই রামরুদ্রবিত্তানিধি পঞ্চকোট রাজধানী ও নদীয়া-রাজধানী উভয়স্থানেই জ্যোতির্ব্বিৎ সভাপণ্ডিত ছিলেন। রামরুদ্রবিত্তানিধির যে সকল ছাত্র ছিলেন, তন্মধ্যে হরিদেব বিত্তানিধিই প্রধান। হরিদেবের গণনার নিপুণতার অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। হরিদেব বিত্তানিধি বর্দ্ধমানের মহারাজের জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে স্বীয় পাণ্ডিত্যের অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়া বর্দ্ধমান রাজের নিকট হইতে কয়েক সহস্র বিঘা ব্রহ্মত্রভূমি ও বহু অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। হরিদেব বিত্তানিধির বংশধরেরা বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধমান নগরের অনতিদূরে গোবিন্দপুরে বাস করিতেছেন। অদ্যাপি ঐ বংশীয় গ্রহবিপ্রগণই বর্দ্ধমানের মহারাজের জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় ও পণ্ডিত রামরুদ্রবিদ্যানিধি হইতে রাজবংশের এক এক রাজার সময়ে বিদ্যানিধি-বংশের এক এক পণ্ডিত পঞ্জিকাকার হইয়া আসিতেছিলেন।

রাজ-বংশ।	পঞ্জিকাকার বংশ
(১) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়। (১৭২৮ খ্রীঃ)	পণ্ডিত রামরুদ্রবিদ্যানিধি।
(২) „ „ শিবচন্দ্ররায়। (১৭৮২ খ্রীঃ)	„ রামকৃষ্ণবিদ্যানিধি।
(৩) „ „ ঈশ্বরচন্দ্ররায়। (১৭৮৮ খ্রীঃ)	„ প্রাণনাথবিদ্যাভরণ।
(৪) „ „ গিরিশচন্দ্ররায়। (১৮০২ খ্রীঃ)	„ রামজয়শিরোমণি।[১৮]

রামজয়শিরোমণি, একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই বিচক্ষণ ছিলেন। এক বার তিনি স্বীয় পঞ্জীকায় দুই দিনে শারদীয় দুর্গোৎসবের তিনি পূজা হইবে লেখেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে নবদ্বীপের পঞ্জিকা ব্যতীত আরও কয়েকখানি পঞ্জিকা গণিত হইত। ঐ সকল পঞ্জিকায় তিন দিনে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা লিখিত হয় কিন্তু অধিকাংশ লোক নবদ্বীপের পঞ্জিকার মতে বৈধ কার্য্য সম্পন্ন করেন, সুতরাং তাঁহারা অত্যন্ত সন্দিহান হইলেন। বঙ্গে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। এই বিষয়ের

মীমাংসার নিমিত্ত কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবাটীতে এক মহতী পণ্ডিত-সভা আহূত হয়। তাহাতে বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। নবদ্বীপ-প্রদেশের অধ্যাপকগণ ব্যতীত সকলেই রামজয়শিরোমণির বিরোধী। সকলেই রামজয়কে অপদস্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু রামজয়শিরোমণি ভীত হইবার পাত্র নহেন, তিনি স্থির অচল। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ;—"কে কে আমার ব্যবস্থার বিরোধী, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অগ্রসর হউন।" এই সময় স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। তাহার পর, তিনি সকলের মতানুসারে প্রথমে তিথি গণনা করিয়া দেখান। তিনি যে দিন যে তিথি যতক্ষণ অবস্থিতি করিবে লেখেন, তাহা কেহই উন্টাইতে পারেন না। তাহার পর স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার আরম্ভ হয়। শিরোমণি স্মৃতিশাস্ত্রেও বিলক্ষণ বুৎপন্ন ছিলেন। তিন দিন বিচারের পর তাঁহারই লিখিত ব্যবস্থার অনুকূলে অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রদান করেন। তাহার পর, সর্ব্ববাদী-সম্মতি ক্রমে দুইদিন পূজার ব্যবস্থা-পত্র সমস্ত পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। ঐ বৎসর বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র রামজয় শিরোমণির ব্যবস্থা অনুসারেই শারদীয়-পূজা সম্পন্ন হয়। এই সভায় রামজয় শিরোমণি সর্ব্বোচ্চ বিদায় প্রাপ্ত হন।

একবার গবর্ণর্‌জেনেরাল্ হার্ডিঞ্জ সাহেব নবদ্বীপে চতুষ্পাঠি পরিদর্শনার্থ আগমন করেন। নদীয়ার সমুদয় পণ্ডিতমণ্ডলী ষ্টীমারে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারকালে লাটসাহেবকে একটু উৎকণ্ঠিত দেখায়। কথা-প্রসঙ্গে লাটসাহেব বলেন "তাঁহার পত্নীর যে দিবস কলিকাতা পৌঁছিবার কথা ছিল, সে দিবস অতীত হইয়াছে। লেডী হার্ডিঞ্জ বিলাত হইতে যাত্রা করিয়াছেন এ সংবাদও তিনি পাইয়াছেন, অথচ কলিকাতায় জাহাজ না পৌঁছায় সাহেব বিপদাশঙ্কা করিতেছেন"। সকল পণ্ডিতই রামজয়শিরোমণির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। শিরোমণি, সেই সময় যে লগ্নে প্রশ্ন হইয়াছিল, তদনুসারে গণনা করিয়া বলিলেন :—"আপনার পত্নী এখন কলিকাতায় অতি সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। আপনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে"। লাটসাহেবের মুর্শিদাবাদে যাইবার কথা ছিল, তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়াই দেখেন "লেডী হার্ডিঞ্জ, লাটসাহেব মুর্শিদাবাদ গিয়াছেন শুনিয়া সেখানে যাইবার জন্য অন্য একখানি ষ্টীমারে উঠিয়াছেন"। গঙ্গার ঘাটেই পরস্পর দর্শনোৎসুক পতি পত্নীর সাক্ষাৎ হইল। লাটসাহেব রামজয়শিরোমণির গণনায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া শিরোমণিকে তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত নদীয়ার কলেক্টর-সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। ঐ পত্রে শিরোমণির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং পুরস্কার-প্রদানেচ্ছারও আভাস ছিল। কিন্তু শিরোমণি লাটসাহেবের নিকট হইতে কোন পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই।

(৫) " " শ্রীশচন্দ্র রায় (১৮৪২ খ্রীঃ) " শ্রীদাম বিদ্যাভূষণ।
(৬) " " সতীশচন্দ্র রায় (১৮৬০ খ্রীঃ) } " তারিণীচরণ বিদ্যাবাগীশ।
" " ভুবনেশ্বরী দেবী (১৮৭০ খ্রীঃ) }
(৭) " " ক্ষিতিশচন্দ্র রায় " দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন।

উল্লিখিত রাজগণের অধিকারকালে যে সকল পঞ্জিকা গণিত হইত, উহার মঙ্গলাচরণের শ্লোকে যে রাজার আদেশে এবং যাঁহার কর্তৃক পঞ্জিকা গণিত উভয়েরই নাম থাকিত। নবদ্বীপ রাজবংশের প্রথম হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, ইহা নদীয়ার রাজবংশের হিন্দু-সমাজের উপর অসাধারণ অধিপত্যের প্রাধান পরিচায়ক ছিল। মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্ররায় বাহাদুরের সময় হইতে এই প্রথার লোপ হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বের সময় নদীয়ার মহারাজের হস্তে মুর্শিদাবাদের নবাব প্রতিবৎসর একখানি করিয়া পঞ্জিকা গ্রহণ করিতেন, ঐ পঞ্জিকা অনুসারেই তদানীন্তন কালে রাজকার্য্যাদি সম্পন্ন হইত। ইংরাজ রাজও উক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করেন নাই। অদ্যাপি নদীয়ার জজ্ সাহেবের (এখন কলেক্টর সাহেবের) হস্তে নবদ্বীপের পণ্ডিতের গণিত একখানি পঞ্জিকা প্রতিবৎসর গ্রহণ করেন। উক্ত পঞ্জিকার সাহায্যেই বঙ্গদেশের পর্ব্বদিনের অবকাশাদি সমুদয় নির্ণীত হইয়া থাকে।

নদীয়ার আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌বংশের আদিপুরুষ সুপ্রসিদ্ধ কমলাকর-জ্যোতিষী। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কমলাকরের কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রের কয়েকখানি টীকা গ্রন্থ আছে।[১৯] কমলাকরের পুত্র সুধাকর। সুধাকরের পুত্র হৃষীকেশ। হৃষীকেশের পুত্র গোপীনাথ। ইঁহারা সকলেই বংশপরম্পরাগত জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গোপীনাথের যে কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর দ্বিতীয়।[২০] রাজীবলোচন পূর্ব্বোক্ত রামরুদ্রবিদ্যানিধির সমসাময়িক। তিনি ব্যাকরণ কাব্য, অলঙ্কার ন্যায় স্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সময়ে সময়ে পণ্ডিত-সমাজ বিস্মিত হইতেন। শুনা যায়, রাজীবলোচন বিদ্যাসাগরের একটি বড় চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাতে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য স্মৃতি জ্যোতিষ সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতেন। গ্রাম্য ছাত্র ব্যতীত অনেক বৈদেশিক ছাত্রও তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিত। তখনও বোধহয় শ্লেটের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই, কাষ্ঠফলকে ধূলা মাখিয়া বাঁশের কাঠীর সাহায্যে আঁক কসা হইত। রাজীবলোচনের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া কোন কোন রাজা ও জমিদারের বাটী হইতে তাঁহার জ্যোতির্ব্বিৎ-সভা-পণ্ডিতের পদ গ্রহনের অনুরোধ আসে, স্বাধীনচেতা রাজীব বিদ্যাসাগর তাহা গ্রহণ করেন নাই।

মৌদগল্য-গোত্রীয়-কমলাকর-জ্যোতিষী

রাজীবের পুত্র প্রাণবল্লভ। প্রাণবল্লভের প্রথম পুত্র কেশব-বিশারদ। ইনি যে পঞ্জিকা গণনা করিতেন, তাহাও বহুস্থানে প্রচলিত ছিল। কেশবের দুই পুত্র। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র কমললোচনবিদ্যাবিনোদ। ইঁহার বংশধরেরা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

প্রাণবল্লভের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ভৃগুরামবাচস্পতি। তাঁহার শতানন্দ, শ্যামানন্দ প্রভৃতি কয়েকটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম পুত্র শতানন্দ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত-বাগীশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেরও নবদ্বীপ-প্রদেশে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি প্রবীণ বয়সে কোন আত্মীয়ের অনুরোধে বর্ত্তমান নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার সন্ধিস্থলে ফরিদপুরের অন্তর্গত ধর্ম্মহাটীতে আসিয়া কিছুদিন থাকেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ নবদ্বীপেই বাস করেন। নূতন বাসস্থলীতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হওয়াতে সিদ্ধান্তবাগীশ ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানেই সপরিবারে বসতি করেন। তাঁহার পাঁচপুত্র, তন্মধ্যে উমাকান্ত বিদ্যানিধিও সুপণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্রীয় ব্যবসায় ব্যতীত কয়েকখানি গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভারও তাঁহার উপর ছিল। জমিদারে জমিদারে বিবাদ হওয়ায় তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন না করিয়া উক্ত গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার পশ্চিমভাগে রমণীয় চন্দনানাম্নী স্রোতস্বতীর তীরে আসিয়া ভ্রাতৃগণ সহ বসতি করেন। অসংখ্য-নারিকেল-গুবাক-বৃক্ষশ্রেণী-পরিশোভিত উমাকান্তের পল্লীভবনের দৃশ্য নদীতীর হইতে অতি মনোরম বোধ হইত। বিদ্যানিধি শাস্ত্রীয় ব্যবসায়ে বহু অর্থ অর্জ্জন করিতেন কিন্তু ব্রত নিয়ম পূজা অর্চ্চাও দানাদিতে সমস্তই ব্যয়িত হইত। তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল সন্নিহিত জানিতে পারিয়া বহু-ব্যয়-সাধ্য নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক কাশী যাত্রা করেন এবং বারাণসীধামে পৌঁছিবার দুইদিন পরে তৃতীয় দিবসের অরুণোদয়-কালে মণিকর্ণিকাতীর্থে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

পীতাম্বর-বিদ্যাবাগীশ

উমাকান্তের চারিপুত্রের মধ্যে তৃতীয় সুপ্রসিদ্ধ পীতাম্বরবিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শৈশবে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, তাহার পর জ্যোতিশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হন। তিনি জন্ম-পত্রিকায় যাহা যাহা লিখিতেন অবিকল উহা ফলিত। অনেকে উহা পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছেন। কোন সময়ে বঙ্গের কোন ব্রাহ্মণ-জমিদারের একমাত্র পুত্রের এক জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করেন। উহাতে মাস ফল লিখিত হইয়াছিল। উনিশ বৎসর সাত মাসে বিবাহ হইবে লেখা ছিল। ঐ জমিদার প্রতিজ্ঞা করেন, ঐ সময়ের দুই বৎসর পরে পুত্রকে বিবাহ দিবেন। তজ্জন্য অনেক সম্পন্ন কন্যাদায়গ্রস্তকে নিয়ত প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে এমন একটী অপরিহার্য্য ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল যে, ঠিক উনিশ বৎসর সাত মাস শেষ হইবার দুই দিন পূর্ব্বে পুত্রের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া স্নান সন্ধ্যা পূজাদি শেষ করিতেন। সমস্ত রাত্রি ঝড় বহিয়াছে, প্রভাতেও বৃষ্টির বিরাম নাই, এ অবস্থায়ও তিনি প্রাতঃ-স্নান পরিত্যাগ করেন নাই। সদাচার ও নিয়ম পালনের নিমিত্ত তাঁহার দেহে কোনই ব্যাধি ছিল না। লোকে তাঁহাকে "বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ" বলিত। তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাই সিদ্ধ হইত।

বিদ্যাবগীশ মহাশয় যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন কিন্তু সঞ্চয় করিতেন না, সমুদয়ই সৎকর্ম্মে নিয়োগ করিতেন। দোল দুর্গোৎসব বাসন্তী-পূজা প্রভৃতি নিত্যক্রিয়া তাঁহার বাটীতে অতিসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। এতদ্ভিন্ন সমুদায় ব্রত ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, গৃহোৎসর্গ প্রভৃতি অনেক নৈমিত্তিক ব্যাপারও তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী ছিলেন। কুঠিয়াল্ সাহেবেরা অনেক সময় প্রজাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং আবদ্ধ করিয়া রাখিত। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পত্র পাইলে দেওয়ান বা অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ ঐ সকল কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্তি দিতেন। ঐ প্রদেশের নীলকুঠীর সাহেব, জমিদার, জেলার জজ, মাজিষ্ট্রেট্ সকলেই তাঁহাকে জানিতেন এবং বাঙ্গালী কর্ম্মচারীগণ ত তাঁহাকে দৈবক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় চিরকাল সদাচার এবং সুস্থদেহে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ষাট বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার চারিপুত্র বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠ শ্রীবিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব, দ্বিতীয় শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, তৃতীয় মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র আচার্য্য M. A. P. H. D., শ্রীযতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য। ইঁহারা সকলেই পুনরায় পূর্ব্বপুরুষদের অধ্যুষিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছেন।

শ্রীবিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব

এখন ইনি নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ এবং পঞ্জিকাকার। বিদ্যানিধিবংশের শেষপুরুষ দুর্গাদাসের পরলোক গমনের পর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ই হাইকোর্টের পঞ্জিকা প্রণয়নের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নদীয়ার কলেক্টরের হস্তে দুইখানি পঞ্জিকা দিতে হয়। একখানি নদীয়ার কলেক্টরের অফিসে থাকে, অপরখানি কলিকাতা হাইকোর্টে প্রেরিত হয়। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান পঞ্জিকা এই পঞ্জিকার প্রণেতাও জ্যোতিষার্ণব মহাশয়।

কাশ্যপ-গোত্রীয়—সুবুদ্ধি শিরোমণি

নবদ্বীপের আরএকটী প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ বংশের আদিপুরুষ সুবুদ্ধি শিরোমণি। ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বনিবাস যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ছিল। চৌগাছা গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকায় "চতুঃপলাশী নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পলাশী অর্থ বৃক্ষ (গাছ) চতুর্ অর্থে (চারি) সুতরাং চতুঃপলাশী অর্থে চৌগাছা। "চিত্রাকুমারোর্ম্মিবিধৌতপাদঃ" চৌগাছা গ্রামের এই বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় ঐ গ্রামের নিকটে চিত্রা এবং কুমার নদের সংযোগ হইয়াছিল ও সর্ব্বদা ঐ নদীদ্বয়ের উর্ম্মিমালা দ্বারা ঐ গ্রামের প্রান্তভাগ বিধৌত হইত। এক সময়ে ইনি কোন কার্য্যবশতঃ নদীয়া জেলার আন্দুলিয়া গ্রামে আগমন করেন। তখনও ভবানন্দ মজুমদারের উন্নতির সূত্রপাত হয় নাই। একজন অধ্যাপক ভবানন্দ মজুমদারের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত সুবুদ্ধিশিরোমণির সাক্ষাৎ ও আলাপ হইলে তিনিই শিরোমণিকে সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ মজুমদারের নিকট উপস্থিত

করেন।[২১] মজুমদার নিজের জীবনের ফলাফল জানিতে চাহেন। সুবুদ্ধি-শিরোমণি কোষ্ঠী দেখিয়া বলেন "আপনার অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্যান্ত জীবনের উৎকৃষ্ট সময়। ঐ সময় আপনার এত সৌভাগ্য হইবে যে, তদ্দ্বারা আপনি চিরসুখী ও বহুসম্মানে সম্মানিত হইতে পারিবেন"। ভবানন্দ মজুমদার উহার অর্থ কিছুই বুঝিলেন না, বলিলেন "এমন কি সৌভাগ্যের সম্ভাবনা আছে, যদ্দ্বারা আমি চিরসুখী হইব"। তাহার পরই মানসিংহ জাহাঙ্গীর বাদসাহের সৈন্য সহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালায় আগমন করেন। ভবানন্দ বর্দ্ধমানে গিয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মজুমদারের সাহায্যে মানসিংহ কৃতকার্য্য হইয়া দিল্লী গমনকালে মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া যান। ভবানন্দমজুমদার বাদসাহকে সন্তুষ্ট করতঃ বহু জমিদারির সনন্দ লইয়া গৃহে আগমন করিয়াই সুবুদ্ধিশিরোমণিকে ডাকিয়া পাঠান। শিরোমণি মাটিয়ারিতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন এবং মাটিয়ারিতেই বাস করিতে অনুরোধ করেন। শিরোমণি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ। তিনি এই বয়সে বাসস্থান ও ভূমিবিত্ত ত্যাগ করিয়া আসিতে সম্মত হন না।

গোকুলানন্দ বিদ্যানিধি

তাঁহার প্রপৌত্র গোকুলানন্দবিদ্যামণি বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। নদীর প্রবলবেগে স্বীয় ভবন ও ভূমিবিত্ত জলসাৎ হওয়ায় তিনি কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের পরিচয় প্রদান করিয়া কিছু বৃত্তি প্রার্থনা করেন। মহারাজ পরম্পরাগত জনশ্রুতিতে সুবুদ্ধিশিরোমণির গণনার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন "আমি তোমাকে অন্যতম জ্যোতির্ব্বিদ্ পদে নিযুক্ত করিয়া বৃত্তি দিতে পারি কিন্তু এখানে আসিয়া বাস করিতে হইবে। অন্যস্থানে থাকিলে এ বৃত্তি পাইবে না। গোকুলানন্দ মহারাজের নির্দ্দেশ অনুসারে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিলেন।

গোকুলানন্দ এক উৎকৃষ্ট ঘটীকাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন বৈদেশিক ঘড়ীর সৃষ্টি হয় নাই. ঐ ঘড়ীর সাহায্যে সময় নির্ণীত হইত। তাম্রের চারটী মৎস্য পরস্পর মুখোমুখী করিয়া গঠন করা হইত। ঐ মৎস্যগণের পুচ্ছ উর্দ্ধ ও মস্তকস্থিত তাম্রাধারে সংলগ্ন থাকিত উহাদের মস্তকে একটি তাম্রাধারে অতি উষ্ণ তরল পারদ রাখা হইত। তাম্রাধারের গাত্রে ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র ছিল। ঐ ছিদ্র দিয়া পারদ পরবর্ত্তী আধারে পতিত হইত। পারদের ন্যূনতা অনুসারে দণ্ড পল বিপল অনুপল পর্য্যন্ত স্থির হইত। ছায়াদৃষ্টে অঙ্ক কসিয়া মধ্যাহ্নকাল নিরূপণ পূর্ব্বক তাহাতে পারদ রক্ষিত হইত। পরদিন মধ্যাহ্নে ঘটিকা যন্ত্রের একটি স্থান টিপিলেই মৎস্য পুচ্ছ দিয়া পারদগুলি প্রথম পাত্রে উত্থিত হইত। গোকুলানন্দ নিজে বিলক্ষন পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ঘড়ি নির্ম্মাণের উপদেশ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন।

অতিপূর্ব্বে নবদ্বীপে এক সিদ্ধপুরুষ আগমন করেন; তিনি নবদ্বীপের মালঞ্চপাড়ায় গঙ্গাতীরে (এখন পুরাতন গঙ্গার চিহ্ন পলতা ঐ স্থানে বিদ্যমান)

এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গোকুলানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমাই বহুদিন পরে ঐ স্থানে সমাগত অপর এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়া বামাচার মতে সাধনা করিতেন। গভীর রাত্রিতে নিমাই সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালীর সম্মুখে বসিয়া জপ করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীতে চলিয়া যান। পরে গোকুলানন্দের পৌত্র নন্দরাম ব্রহ্মচারীও ঐ স্থানেই সিদ্ধ হন। সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালী পল্লীমাতা সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ কালী অতিশয় জাগ্রত। নদীয়ারাজ গোকুলানন্দের প্রতি ঐ কালীর সেবার ভার অর্পণ করেন। ঐ কালীর অনেক দেবোত্তর ভূমী ছিল, এখন গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের অনেক প্রসিদ্ধ সাধক পল্লীমাতা বা পাড়ার মার সম্মুখে জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নবদ্বীপের পাড়ার মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনদেবতা, ইনি আগমবিত্তাবাগীশের প্রতিষ্ঠিত আগমেশ্বরীর অপেক্ষাও পূর্ব্ববর্ত্তিনী।

গোকুলানন্দের তৃতীয় পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র আচার্য্য রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব ছিল। তিনি "রাজবংশাবলী" নামক নদীয়ারাজ বংশের কীর্ত্তি সূচক একখানি বাঙ্গালা কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ভবানীশঙ্কর। ভবানীশঙ্করের পুত্র কাশীনাথ আচার্য্যের প্রণীত কয়েকখানি বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কাশীনাথের তিন পুত্রের তিন পৌত্র আছেন। প্রথম পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ আচার্য্য। দ্বিতীয় পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন আচার্য্য। তৃতীয় পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কবিভূষণ। ইনি কলিকাতা সেন্টমেরি হাই স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ট।

অন্যান্য জ্যোতির্বিদ-বংশ

এতদ্ভিন্ন নদীয়ার গৌতমগোত্র-সম্ভূত গণিতাচার্য্যের বংশ পাণ্ডিত্যের জন্য অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশে বিশ্বেশ্বরবাচস্পতি, হারাধন-বিদ্যাভরণ, সন্তোষ তর্কবাগীশ, বিজয়রামবিদ্যার্ণব প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতি বহুশাস্ত্রে কৃতী ছিলেন। দুঃখের বিষয় এইবংশের আর এখন কেহই নাই। অভিরাম চক্রবর্ত্তী, রূপরাম অধিকারী এবং নরসিংহের বংশধরেরাও বেশ পণ্ডিত ছিলেন।

নবদ্বীপের আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ মৌদ্গল্যায়নগোত্রীয় গৌরীবরবিদ্যালঙ্কার। তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ যাদবেন্দ্রবিদ্যাবাচস্পতি পূর্ব্ববঙ্গের চন্দনানদীর তীরবর্ত্তী মথুরাপুরে অনেক সময় বাস করিতেন। নবাবী আমলের প্রাচীন বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারী রাধাবল্লভ রায় ইঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া পদ্মাতীরে স্বপ্রতিষ্ঠিত মেঘনা গ্রামে লইয়া স্থাপন করেন। ইঁহার বংশধরেরা ধারাবাহিক ক্রমে জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত। এই বংশের পরম পণ্ডিত গৌরচাঁদবিদ্যালঙ্কারের মুখে নৈষধচরিতের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য কাব্যরসজ্ঞেরা একান্ত উৎসুক হইতেন। ইঁহারা রাধাবল্লভ রায়ের প্রদত্ত প্রভূত ব্রহ্মত্রভূমি ভোগ করেন। এখনও এই বংশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চা আছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ আচার্য্য প্রভৃতি কয়েকটি বংশধর এখন বিদ্যমান। শান্তিপুরের ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় কালীদাস চক্রবর্ত্তী শিরোমণিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ কৃতী ছিলেন। পাটুলির জমিদার হরশঙ্কর রায় ও সীতারাম রায়, শিরোমণি মহাশয়কে অনেক ব্রহ্মত্র ভূমি প্রদান করেন। কয়েক পুরুষ ভোগ করার পর গঙ্গার প্রবলবেগে উক্ত ভূমি জলসাৎ হয়। সেই সময় শান্তিপুর-সংলগ্ন সূত্রগড়ে কেবল নূতন বসতি হইতেছিল। জমিদারের নিকট উক্ত ব্রহ্মত্র নষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়ায় তাঁহারা সূত্রগড়ের মধ্যে পুনরায় ঐ পরিমাণ জমিদান করেন। এখনও চক্রবর্ত্তী শিরোমণির বংশীয়েরা উক্ত ব্রহ্মত্র ভোগ করিতেছেন। এখন সূত্রগড় কৃষ্ণনগরের মহারাজার। চক্রবর্ত্তী শিরোমনি-বংশীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল আচার্য্য সুশিক্ষিত। ইনি কিছু কাল তিব্বতের গিয়াংশি নগরে গবর্ণমেণ্টের অফিসে কার্য্য করিয়া এখন কলিকাতার অপর কোন গবর্ণমেণ্টের অফিসে চাকরী করিতেছেন।

যে সকল জ্যোতির্বিবৎ বংশের বিষয় উল্লিখিত হইল, উহা ব্যতীত নদীয়া জেলার হরধাম, কৃষ্ণনগর নেদিয়ার পাড়া, নৃসিংহ দে পাড়া, খুরসিদপুর চুনিয়াদহ, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের বংশধরেরা বাস করিতেছেন। বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয়ের উল্লেখ করা হইল না।

তন্ত্র

বৌদ্ধদিগের অবনতির পর হইতেই ভারতে তন্ত্রমতের উদ্ভব হয়;[২২] কিন্তু এতাবৎ বাঙ্গালাদেশে উহার বিস্তৃতি ও চর্চ্চা সেরূপ হয় নাই। লক্ষণ সেনের রাজ্যচ্যুতির পর বঙ্গদেশ হিন্দুশাসনচ্যুত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ অধোগতির দিকে অগ্রসর হয়। লোক যথেচ্ছাচারী, সুরাপায়ী ও সর্ব্ববিষয়ে ব্যভিচারী হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে বঙ্গে তান্ত্রিক মতের প্রচার হয়। তন্ত্রে মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির প্রশংসা থাকায় দুর্ব্বলচিত্ত, বাসনাচালিত অনেকেই তন্ত্রমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, কোনও কোনও কুলগুরু স্ব স্ব কাপুরুষ শিষ্যগণকে অত্যাচারী মুসলমানগণের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার জন্য এই উত্তেজনাপূর্ণ বীরাচার গ্রহণে তাহাদিগকে বাধ্য করেন। যে কারণেই হউক, সমগ্র দেশ তখন তান্ত্রিকমতে অনুপ্রাণিত হয়। এই নবদ্বীপ হইতেই উক্ত মত সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তান্ত্রিক গুরুগণ স্থানে স্থানে ঘটস্থাপনা করিয়া স্বীয় স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র সাধন করিতেন; কেহ কেহ বা মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধপুরুষরূপে লোকের নিকট সম্মানিত হইতেন। নবদ্বীপে যে "পোড়ামাতা" দেবীর পীঠস্থান দৃষ্ট হয়, উহা জনৈক তেজস্বী ক্রিয়াবান সন্ন্যাসী দ্বারা স্থাপিত।[২৩] কথিত আছে, উক্ত সিদ্ধপুরুষ নবদ্বীপের কোনও ব্রাহ্মণ-কুমারের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন এবং দীক্ষাদানকালে ভ্রমবশতঃ স্বীয় সিদ্ধমন্ত্র উপদেশ দেন। সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ হওয়ায় সন্ন্যাসী বিশেষ দুঃখিত হইয়া উক্ত শিষ্যকে তাঁহার স্থাপিত ঘটে দক্ষিণাকালীকাদেবীর পূজা করিতে উপদেশ দিয়া চিরদিনের নিমিত্ত নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন। ঐ ব্রাহ্মণকুমার ও গ্রামস্থ অনেকেই ঐ ঘটে পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে থাকেন। পরে যখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপের ন্যায়দর্শনের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন, তৎকালে গ্রামের প্রান্ত হইতে এই ঘট আনয়ন করিয়া গ্রামের মধ্যস্থানে এক বটবৃক্ষমূলে স্থাপন করেন। তদবধি উক্ত দেবী গ্রাম্য দেবীরূপে পণ্ডিতমণ্ডলী ও সাধারণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। কিছু দিন পরে উক্ত বটবৃক্ষ অগ্নিদগ্ধ হইলে ঐ স্থান পোড়া বটতলা ও দেবী "পোড়া মা" বা বিদগ্ধ জননী নামে খ্যাত হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'পোড়া মা' শব্দ 'পরামায়া' শব্দের অপভ্রংশ।

তখন পূর্ণানন্দের ন্যায় বহুলোকেই মন্ত্র সিদ্ধ হইতেন। প্রতি গ্রামেই ২।১ জন অমানুসিক ক্ষমতাপন্ন বামাচারী পাওয়া যাইত; তাঁহাদের অনেকেই গভীর নিশীথে দুর্গম শ্মশানে বসিয়া সাধনা করিতেন। "পঞ্চ মকার"[২৪] তখন গ্রামে গ্রামে আধিপত্য করিতেছিল এবং দেশ এক বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর স্রোতে বাধা

দিতে নবদ্বীপে শীঘ্রই এক শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষ আগমবাগীশ নামে খ্যাত। ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণানন্দ; তাঁহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য ও কনিষ্ঠের নাম মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ। এই মাধবানন্দ একজন বিশুদ্ধ শান্ত বৈষ্ণব ছিলেন এবং গোপালের উপাসনা করিতেন। আধুনিক প্রসিদ্ধ কবি ও নৈয়ায়িক অজিতনাথ ন্যায়রত্ন ইঁহার বংশধর। কৃষ্ণানন্দের আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি হইতে ও তাঁহার বংশাবলীর নিকট হইতে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাঁহার "ষ্টাটিসটিকেল অ্যাকাউন্ট" নামক পুস্তকে নদীয়ার রাজবংশের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণানন্দকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২৫] কিন্তু এ মতটী নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। যাহাহউক তিনি যে একজন মহা ক্ষমতাশালী সাধক ছিলেন, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। কৃষ্ণানন্দই প্রথমে তন্ত্রোক্ত দেবী মূর্ত্তি সকলের সাকার পূজা প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান সময়ে যে শ্যামামূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে, তাহা এই কৃষ্ণানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। কথিত আছে, দেবীর তন্ত্রোক্ত মূর্ত্তি কিরূপ গঠিত হইবে এবং বরাভয়প্রদ হস্তদ্বয়ের কি ভ্রূভঙ্গিমা ও ভ্রূদ্বয় কি রঙ্গে রঞ্জিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি দেবীর শরণাপন্ন হয়েন। দয়াময়ী দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন, "কল্য প্রভাতে উঠিয়া যাহার মূর্ত্তি সর্ব্বপ্রথমে দেখিবে, তাহারই ভঙ্গিমায় ও রূপে আমাকে গঠিত করিবে"। কৃষ্ণানন্দ সোৎসুকে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া যেমন বহির্দেশে পদার্পণ করিলেন, অমনি দেখিলেন, এক শ্যামাঙ্গিনী গোপবালা দক্ষিণপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৃহের ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত গোময় গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত উত্থাপিত করিয়া ভিত্তিগাত্রে গোময়পিষ্টক রচনা করিতেছে, শ্রমাধিক্যে ঐ রমণীর কপোল দেশ ঘর্ম্মাক্ত হওয়ায় দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করায় তাহার সীমন্তের সিন্দুরবিন্দু ভ্রূদ্বয় রঞ্জিত করিয়াছে, অবগুণ্ঠন স্থানচ্যুত হওয়ায় আলুলায়িত কেশরাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এতদবস্থায় সহসা তাঁহাকে দর্শন করিয়া তিনি রমণীসুলভ লজ্জায় দন্তাগ্রে জিহ্বা ঈষৎ কর্ত্তন করিলেন, কৃষ্ণানন্দ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ছলছল নেত্রে এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া হৃদয়ে মায়ের কাল্পনিক মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইলেন এবং পরে তাহাই প্রকাশ করিয়া পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিলেন। এতদবধি ভূতচতুর্দ্দশীতে দীপদানের প্রথা সৃজিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে ও ক্রমে এই প্রথা সমগ্র ভারত ব্যাপ্ত হইয়াছে।

শিবমুখ হইতে আগত পার্ব্বতী হৃদয়ে গত এবং কেশবের ইহাই মত বলিয়া তন্ত্রের অপর নাম আগম। তন্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি আগমবাগীশ নামে খ্যাত হয়েন। উচ্ছৃঙ্খল বামাচারীগণের যথেচ্ছাচার রহিত করিতে তিনি "তন্ত্রসার" নামে এক সুবৃহৎ তন্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তন্ত্রের নাম করিয়া যে সকল নিষ্ঠুরতা ও মদ্যপানাদি কুক্রিয়া প্রচলিত ছিল, এই গ্রন্থ প্রকাশের পর হইতেই দেশ হইতে তাহা

অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র গোপাল "তন্ত্রদীপিকা" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

"সিদ্ধান্ত কুমুদ চন্দ্রিকা" গ্রন্থকার স্মার্ত্ত রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র "রামেশ্বর" একজন সাধক বলিয়া খ্যাত। তৎকালে সকলেই ইহাকে রামেশ্বর তান্ত্রিক বলিয়া ডাকিত। ইনি দীক্ষা ও হোমাদি বিষয়ে "তন্ত্র প্রমোদন" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার সহোদর রঘুমণি "আগমসার" নামক পুস্তকের গ্রন্থকার, এইরূপ উল্লেখ আছে।

সেই সময়ে গণ্য মান্য ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও তন্ত্রের প্রচার হইয়াছিল। রাণী ভবানীর পুত্র রামকৃষ্ণ একজন উৎকৃষ্ট সাধক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন সাধনা "আনরে ভোলা জপি মালা" প্রভৃতি গান দেশবিখ্যাত। বিখ্যাত সাধনসঙ্গীতরচয়িতা রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন বামাচারী ছিলেন। রামমোহন রায় নামক একজন বিখ্যাত গায়কের বহুতর সাধনসঙ্গীত দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণনগর রাজবংশের অনেকেই সাধক ছিলেন। রাজা গিরীশচন্দ্র শেষ জীবনে দেবীসাধনায় নিযুক্ত হন এবং নবদ্বীপে দুই বৃহৎ মন্দির স্থাপন পূর্ব্বক ভবতারিণী ও ভবতারণ নামে দুই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই সময়ে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মশাসন গ্রামে চন্দ্রচূড় ন্যায়পঞ্চানন নামে জনৈক ক্রিয়াবান তান্ত্রিক জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তী প্রকাশ ও তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। এই সময় হইতেই স্মৃতি ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্রেরও অবনতি ঘটিতে থাকে এবং মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম্মের প্রবল স্রোতে তন্ত্রোক্ত মত ভাসিয়া যায়।

ইহাই সংক্ষেপতঃ নবদ্বীপের সংস্কৃতচর্চ্চার ইতিহাস। ৯৯৯ শকে মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়া এতদঞ্চলে বিদ্যাচর্চ্চার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, কালে মহারাজ বল্লালসেনের সময় উহা অঙ্কুরিত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যুগে সমগ্র নবদ্বীপকে এক মহান্ কল্পদ্রুমে পরিণত করে। এই সময়ে নবদ্বীপ সর্ব্ববিষয়েই উন্নতির শিখরদেশে আরূঢ়। নৈয়ায়িক প্রধান সার্ব্বভৌম অজেয় তার্কিকশিরোমণি, তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ আগমবাগীশ এবং পরমভাগবত হরিনামমূর্ত্তি মহাপ্রভু ঐ মহাদ্রুমের অমিয় ফল। সমগ্র ভারতবর্ষ তখন এই অমৃতময় ফলের সুধাধিক রসাস্বাদনে মত্ত, কালে কল্পদ্রুম শুষ্ক হইতে থাকে। মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যত্নে এই শুষ্কপ্রায় বৃক্ষে দুই একটী নবমুকুল মঞ্জুরিত হইয়া তাহাদের যশঃসৌরভে দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ইহারা—বাণেশ্বর, ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন, বীরেশ্বর প্রভৃতি।

বৈদেশিক শাসনে দেশ তখন সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি দিন দিন হতশ্রদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; কারণ তখন উহা আর অর্থকরী বিদ্যা ছিল না। মুসলমান শাসনে ফারসীর আদর ছিল, কিন্তু এই সময়ে কোম্পানীর হস্তে রাজত্ব যাওয়ায় উহার আদরও কমিয়া আসিতেছিল। ক্রমে এই দুই ভাষার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। শাসন কোম্পানীর হস্তে আসিলেও সর্ব্বদা শাসন সৌকর্য্যার্থে উপযুক্ত সংস্কৃতব্যবস্থাপক ও মৌলবীর সাহায্য প্রয়োজন হইত, কিন্তু অনেক সময়েই উক্ত কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি

পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিত। তন্নিমিত্ত এই অভাব দূরীকরণার্থ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের সময়ে মুসলমানগণকে ফারসী ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য এক মাদ্রাসা ও ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জেনাথান ডান্‌কান নামক কোন ইউরোপীয়ের যত্নে কাশীধামে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির শিক্ষার জন্য চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক ব্যয় নির্দ্ধারণে এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণের সময় উপস্থিত হয় এবং পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে চার্লস্ গ্রাণ্ট এবং ক্রীত দাসের চিরবন্ধু উইলবারফোর্স সাহেব প্রমুখাৎ কতিপয় উন্নতহৃদয় সাহেব ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির সমধিক প্রচার হয়, তৎসংক্রান্ত এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। দেশের অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃতচর্চ্চা দেশ হইতে একরূপ অপসারিত হইয়াছিল বলিলেও হয়; কচিৎ কোথাও দুই একটী পাঠশালা এক কিম্ভুতকিমাকার শিক্ষা বিস্তার করিতেছিল এবং এইসময়ে দেশের এই বিদ্যাহীনতাভাব গবর্ণমেন্টের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিন্টো বাহাদুর এ সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন।[২৬] তাহাতে তিনি তাৎকালীন দেশের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতির বিষয় বর্ণন, ও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "এ দেশে কেবল যে বিদ্বজ্জনের হ্রাস হইতেছে তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যার ক্ষেত্রও নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। মনোবিজ্ঞান দর্শন আর অধীত হয় না; সুকুমার সাহিত্যের আর আদর নাই এবং জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ ভিন্ন অন্য সাহিত্যের চর্চ্চা নাই। এই অনাদরের ফলে দেশ হইতে সদ্ গ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে এবং ভয় হয়, অচিরে উপযুক্ত গ্রন্থ ও অধ্যাপক অভাবে দেশ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা একেবারে তিরোহিত হইবে। আমার মতে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কাশীতে যেরূপ সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, সেইরূপ বিদ্যালয় নদীয়া ও মিথিলাতেও স্থাপিত হউক"। এই মন্তব্যের পর মহামতি মিন্টো বাহাদুর নদীয়ায় কিরূপ ধরণে ও ব্যয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে কার্য্যকর হইবে, তাহারও একটা আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কেবল প্রস্তাবমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। পরন্তু, নদীয়ার সুবিখ্যাত রাজবংশের বদান্য রাজগণ তাঁহাদের নিজ বিষয়ের আয় হইতে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হস্তে নদীয়ার টোলে মাসিক সাহায্যকল্পে যে ১২০ পাউণ্ড বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি দান করেন এবং কমিটী অব্ রেভিনিউ যাহা এতাবৎ মঞ্জুর করিয়া নিয়মিত দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বন্ধ করা হয়। পরে নদীয়ার ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের এবং মুর্শিদাবাদের কমিসনর সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় উহা আবার মঞ্জুর করা হয়।[২৭] তদবধি নিয়মিত মাসিক ২০০ টাকা নদীয়ার ছাত্রগণের বৃত্তিস্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া নদীয়া কালেক্টরেট হইতে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্বর্গীয় সার জন উডবরণ মহোদয় নদীয়া দর্শনে আসিয়া পণ্ডিতদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আর একশত টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া যান,[২৮] তাহাতে গবর্ণমেন্টবৃত্তি মোট মাসিক

৩০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মহীষাদলের রাজবৃত্তি, ভূদেব বৃত্তি, গিরীশচন্দ্র বসুর দত্ত বৃত্তি, বৈষ্ণবচূড়ামণি বনমালী রায় প্রদত্ত বৃত্তি, প্রভৃতি অনেকগুলি বৃত্তির অর্থে বর্ত্তমান চতুষ্পাঠীগুলি কোনরূপে চলিতেছে। সংপ্রতি নবদ্বীপে টোলের সংখ্যা পঞ্চদশ; ইহাদের মধ্যে চারিখানিতে ন্যায়, আট খানিতে স্মৃতি, একখানিতে বেদান্ত এবং একখানিতে স্মৃতির সহিত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও ষট্‌সন্দর্ভ ও আর একখানিতে স্মৃতির সহিত ব্যাকরণ ও কাব্যের পাঠ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত বিল্বপুষ্করিণী, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, উলা, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান সমূহে আরও কতিপয় চতুষ্পাঠী বিদ্যমান আছে।

যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞানের স্পর্দ্ধা করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬৮৪ অব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃত শিক্ষার্থ এই স্থানে বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। নবদ্বীপনিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব রামগোপাল কবিভূষণ তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। ডাক্তার কেরিসাহেব ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন এখানে অতিবাহিত করেন। ডাক্তার লিডেন বহুদিন এখানে ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে, তদানীন্তন কমিটী অব্ পাবলিক ইন্‌সট্রাকশনের সম্পাদক ডাক্তার এইচ, এইচ উইলসন সাহেব এই বিদ্যামন্দিরেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সেকালের পণ্ডিতগণ কি ভাবে সভারোহণ করিয়া তর্ক করিতেন ও কি কি গ্রন্থে সমধিক বুৎপন্ন ছিলেন, তাহা জয়নারায়ণ সেন কৃত চণ্ডীকাব্যে সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত অংশটী উদ্ধৃত করিয়া আমরা নদীয়ায় সংস্কৃতবিদ্যাচর্চ্চার ইতিহাস সম্পন্ন করিব, :—

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহণে।
কেবল অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম্ম সংস্থাপন কারণে॥
তেজঃপুঞ্জ সুকীরণ, শুক্লবর্ণ সুবসন, ভালেতে গঙ্গা মৃত্তিকা ফোটা।
শুক্ল যজ্ঞ উপবীতে, রক্ত ভোট আসনেতে, বসিতে হি বিচারের ঘটা॥
অনুমান প্রত্যক্ষতে, পরস্পর সম্বন্ধেতে, তার্কিক ঘটায় নানা তর্ক।
প্রমাণ কুসুমাঞ্জলী, নানামতে ব্রহ্ম বলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক॥
পদ পদার্থ বিচারেতে, একদণ্ড সমাসেতে, কার কত নিন্দিত ঘটাইয়া।
বৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার কর্কশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া॥
মধুর কাব্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিকে কহিছে রসেতে।
ধ্বনি বাক্য ক'য়ে ক'য়ে, ব্যঞ্জনাদিকল'য়ে কাব্য প্রকাশ উদাহরণেতে॥
নানাচ্ছন্দে শ্লোকপাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কত মত বর্ণনা ভাবের।
রসিক বিবুধগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রঘু, ভট্টি, মাঘ, নৈষধের॥
পৌরাণিক পণ্ডিতে, নানামত, প্রসঙ্গেতে বিচার করিছে ভাবি মনে।

বশিষ্ঠাদি বেদ জানে, স্তনূফ ভাবগণে, অন্ত প্রত্যন্তর লিখি।
দশা, বিদশা বসতি, জানায় সাধু প্রতি, সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত দেখি॥
সকলেতে ব্রহ্মময়, বেদান্তে এ মত কয়, ।।প পুণ্যালয় নিরঞ্জন।
শত্রু-মিত্রময় তিনি, জ্ঞানভেদে ভিন্নমানি, শঙ্করাচার্য্যের লিখন॥
পড়িলে বিপত্তি-কালে, দোষ যদি ঘটে বলে, ধর্ম্মশাস্ত্র মতে পাপ নহে।
স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা এই, শূলপাণি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হ'য়ে মনু কহে॥"

বঙ্গভাষা ও শিক্ষা

বঙ্গভাষা কতদিনের পুরাতন, সে সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে বৌদ্ধাধিকার সময়ে যখন পৃথক্ বঙ্গলিপি ছিল, তখন যে পৃথক্ বঙ্গভাষাও ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা ভাষার আদিমকালে ডাকের বচন সৃষ্ট হয়। ডাক অর্থাৎ প্রচলিত বাক্য প্রথমে একটী, পরে আর একটী, এইরূপ দিনে দিনে উহা বর্দ্ধিত আয়তন হইয়া বংশপরম্পরায় বাঙ্গালীর মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গালাভাষার ক্রমোন্নতির সহিত এগুলিও কালে মার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের আড়ম্বরহীন সরল ভাষা ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহাদের প্রাচীনত্ব বেশ উপলব্ধি হইবে। এই ডাকের পর তাহারই অনুসরণ করিয়া শুভ মুহূর্ত্তে খনার বচন প্রকাশিত হয়, ইহাদের বর্ণিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশমালা চিরদিনই বাঙ্গলাভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। বাঙ্গালীমাত্রেই সাধারণতঃ শান্ত হিন্দু গৃহস্থ। সাধারণ দেবদেবীতে তাহার চিরদিনই অচলা ভক্তি, সুতরাং যে মুহূর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হয়, সেই মুহূর্ত্তে পৌত্তলিক হিন্দু আবার চিরঅভিলষিত দেবদেবীর গঠনে ও পূজনে নিযুক্ত হয়। বাঙ্গালী তখন আপনার একটা ভাষা পাইয়াছে, সুতরাং আপনার ভাষায় আপনার অভীষ্ট দেবদেবীকে পূজা করিতে ও তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তনে স্বতই আগ্রহবান হইয়াছে, সুতরাং তদানীন্তন অব্যবহিতধর্ম্ম বাঙ্গালী স্বীয় স্বীয় কল্পনা অনুযায়ী দেবতার মহিমা গাহিয়া গিয়াছেন। কালে শিব, চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনী "পালা" কারে ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং এই আন্তরিক আগ্রহ হইতেই কালে আমরা কৃত্তিবাসের মধুর রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাকটাক্ষে এই সুকুমার ভাষা তদীয় অসংখ্য প্রেমিক ভক্ত কর্ত্তৃক নানালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া বর্ত্তমান কমনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। যে দিন নদীয়া দেবগ্রামবাসী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ সংস্কৃতে প্রগাঢ় জ্ঞানশালী পণ্ডিতমণ্ডলী বাঙ্গালীর নিমিত্ত গ্রন্থ প্রণয়নে সংস্কৃত অপেক্ষা বাঙ্গালাকে প্রাধান্য দিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল বাঙ্গালাভাষায় প্রণয়ন, এমন কি বঙ্গভাষারচিত "পদামৃত সমুদ্রের" সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন, সেই দিন বঙ্গভাষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় রহিবে।

বঙ্গভাষার সৃষ্টি ও পুষ্টি নদীয়ায়। যদিও বাঙ্গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি ও রচনা বহুদিন হইতে দেখা যায় বটে, ও "বিদ্যাপতি" প্রভৃতি আধাবাঙ্গালী কবি বঙ্গকবিরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন বটে, কিন্তু প্রসিদ্ধ

কৃত্তিবাস

রামায়ণকার কৃত্তিবাসই খাস বাঙ্গালী আদি কবি। ইনি নদীয়াজেলার অন্তর্গত ফুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তিনি যে মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া, যাহা এক্ষণে বনাকীর্ণ হইয়া আছে, তাহা তাঁহার সময়ে গঙ্গাতীরস্থ এক সমৃদ্ধ স্থান ছিল। কবি অনেক স্থলেই

"স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস। রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥"

প্রভৃতি বাক্য দ্বারা তাঁহার জন্মভূমির যশোগান করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি ইহাকে "গ্রামরত্ন" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। চঞ্চলা ভাগীরথী এখন ফুলিয়ার বহুদূরে প্রবাহিতা কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১৬৮২ অব্দেও ফুলিয়ার নিম্নে গঙ্গা বহতা ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরি সমূহের এজেন্ট ও গবর্ণর সাহেব তাঁহার রোজনামচায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।[২১]

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহা তাঁহারই স্বরচিত আত্মচরিত হইতে গৃহীত। সম্প্রতি এই পদ্যময় জীবনীটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হস্তলিখিত বহু পুরাতন পুঁথিতেই এই বিবরণ দেখা যায়; সুতরাং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কবি স্বয়ং নিঃসন্তান। তাঁহার পিতৃব্য অনিরুদ্ধের বংশাবলী অদ্যাপি ফুলিয়াতে বাস করিতেছেন।

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার কালে গৌড়েশ্বরগণ এতদঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা বিদ্যোৎসাহী ও স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন; ইঁহাদের অনেকেই মুসলমান হইলেও উদারহৃদয় ছিলেন এবং নিজেও হিন্দু পৌরানিককাহিনী বঙ্গভাষায় লিখিতে ও শিখাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুপ্রসিদ্ধ হুসেন সাহার যত্নেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী কর্ত্তৃক মহাভারত অনুবাদিত হয় এবং 'গুণরাজ খাঁ' শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন।

লক্ষণসেনের রাজত্বান্তে মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত অনুশীলন করিলে আমরা বহু গ্রন্থকারের নাম প্রাপ্ত হই। কত অমূল্য প্রাচীন পুঁথি যত্নাভাবে কত পল্লীতে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যতগুলি এ পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমরা অনেক মেধাবী লেখকের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ভারত-অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত প্রভৃতি এবং মঙ্গলচণ্ডী ও মনসার ভাসান প্রভৃতি গীত প্রণেতাগণ বাঙ্গালা ছড়ায় গীত রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই সময়েরই কবিতাকুঞ্জের কলকণ্ঠ কবি। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় যে প্রেমের বীজ বপন করিয়া যান, কালে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপ প্রেমবৃক্ষের উদ্ভব হয়। এই মহাপুরুষের অনন্ত কৃপায় দীনা বঙ্গভাষা সমৃদ্ধিসম্পন্না হইয়াছিল। ইঁহারই অসংখ্য ভক্তবৃন্দ, অসংখ্য প্রেমময় পদাবলী রচনা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই অসংখ্য মেধাবী গ্রন্থকারগণ দ্বারা সমগ্র বঙ্গভূমি পরিব্যাপ্ত। প্রায় প্রতি জেলাতেই দুই দশজনের আবির্ভাব দেখা

যায়। ইঁহাদের কেহ কেহ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা আজীবন এখানে বাস করিয়াছেন।৩০ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্শ্বদবৃন্দ যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, এই নবদ্বীপকেই তাঁহারা প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন এবং এই নবদ্বীপচন্দ্রকে লইয়াই তাঁহাদের কাব্য স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। সুতরাং ইঁহাদের গ্রন্থার্জ্জিত যশের উপর নদীয়ার সম্পূর্ণ দাবী আছে। শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক ও পশ্চাদ্বর্ত্তী ভক্তগণ কর্ত্তৃক একদিকে বঙ্গভাষার প্রেমের সাহিত্য যেরূপ পুষ্ট হইতেছিল, অন্যদিকে দামুন্যাবাসী প্রসিদ্ধ চণ্ডীলেখক কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, শিবসংকীর্ত্তন প্রণেতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ঘনরাম চক্রবর্ত্তি, পদ্মাবতীপ্রণেতা আলোয়াল এবং কাশীরাম দাস প্রমুখ মহাভারত অনুবাদক পণ্ডিতমণ্ডলী ভাষাকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিতেছিলেন। চৈতন্যমঙ্গলের গ্রন্থকার জয়ানন্দ এইসময়ের ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সাহিত্যের একটী সুন্দর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা :—

"চৈতন্য অনন্তরূপ অনন্তাবতার। অনন্ত কবীন্দ্র গায়ে মহিমা যাঁহার॥
রামায়ণ করিল বাল্মিকী মহাকবি। পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত করিল ব্যাস মহাশয়। গুণরাজ খাঁন্ কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার। চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রকাশ॥
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে। সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥
শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে। সংক্ষেপে করিল তিঁহ গোবিন্দ বিজয়ে॥
আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড, শেষ খণ্ড করি। শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিল সর্ব্বোপরি॥
গৌরী দাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী। সংগীত প্রবন্ধ তার পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিনি পরমানন্দ গুপ্ত। গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপাল বসু করিলেন সংগীত প্রবন্ধে। চৈতন্য মঙ্গল তার চামর বিচ্ছন্দে॥
ইবে শব্দ চামর সংগীত বাদ্য বসে। জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল গাএ শেষে॥"

এই ক্রমোন্নত বঙ্গভাষা পরবর্ত্তী কালে বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যত্নে সমধিক শ্রীসম্পন্না হয়। বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নদীয়া যতটুকু চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে মহাপ্রভুর পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই উল্লেখযোগ্য। ইঁহার অসাধারণ যত্নে ও অর্থব্যয়ে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ কর্ত্তৃক অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষা এই সময়ে আর কষ্টকল্পিত, গ্রাম্য ভাব ও ভাষা দুষ্ট পল্লী গীতি নহে, ইহা তখন অলঙ্কারবহুল, রসাশ্রিত, কবিকল্পিত, রাজানুগৃহীত, বিদ্বজ্জনাদৃত সুললিত ভাবময় এক মধুর ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যে যেমন মৈথিলী ভাষা ও ব্রজবুলির মিশ্রণ দেখা যায়, এই সময়ে তেমনি মুসলমানী ভাব ও ভাষা প্রকাশ্যরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান অধিকার করে। বাঙ্গালা ভাষা এইরূপে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত এবং মৈথিলী, ব্রজবুলী

প্রভৃতি ভাষা দ্বারা পুষ্ট হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে হিন্দী, ফারসী, ইত্যাদি ভাষা দ্বারা অলঙ্কৃত হয়।

এইরূপে সুচারুভাবে অলঙ্কৃত কমনীয় বঙ্গভাষা ক্রমে উন্নত হইয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বিবুধ মনস্বীগণ কর্তৃক পরিমার্জ্জিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই বর্ত্তমানকাল প্রচলিত বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে যাঁহারা ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্যামাচরণ সরকার, প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি অনেকেরই জন্মভূমি নদীয়ায়। স্থানাভাবে তাঁহাদের কতিপয়ের মাত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইল।

জয় গোপাল তর্কালঙ্কার

জন্ম ১৭৭৫ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৪৪ খ্রীঃ। নদীয়া জেলার (বর্ত্তমান যশোহর জেলার) অন্তর্গত জবরাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা কেবলরাম ভট্টাচার্য্য তর্কপঞ্চানন নাটোররাজের সভাসদ ছিলেন। জয় গোপাল পিতার সহিত ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশীবাসী হয়েন ও তথায় শিক্ষালাভ করেন। সাহিত্যশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার কালে তাঁহার তুল্য শাব্দিক আর দেখা যায় না। ১৭৯৫ অব্দে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। পরে ৪৬ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। ১৮০৫ অব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়। বহুস্থানে বহুচেষ্টার পর ত্রিশ বৎসর বয়ক্রমকালে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামপুরের কেরী সাহেবের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। পরে ১৮১৩ অব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৬ বৎসর তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন প্রভৃতি মনীষীগণ সকলেই তাঁহার ছাত্র। তিনি তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের জজ পণ্ডিতের অন্যতম ছিলেন। মিসনরী কেরী ও মার্শম্যান সাহেব তাঁহার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলে সর্ব্বপ্রথম জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্তৃক পরিশোধিত হইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত প্রকাশিত হয়। সুতরাং তিনিই বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির সূত্রপাত করিয়া যান স্বীকার করিতে হয়। তিনি একজন সুকবি ও ক্ষমতাপন্ন লেখক ছিলেন। তিনি যদিও রামায়ণাদি প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থ রামায়ণের ও মহাভারতের পাঠ বিকৃত করিয়া সাহিত্যের ঘোর অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দুই গ্রন্থ ব্যতীত, বিল্বমঙ্গলকৃত হরিভক্ত্যাত্মিকা সংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ, "পারসী অভিধান" নামাভিধেয় একখানি অভিধান ও কতিপয় ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিল্বমঙ্গলের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় আপনার আবাসস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি, ভূমিপতি ভূমিসুর পতি।
তাঁর রাজ্য শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজপূজিত গ্রাম, বঙ্গরা পুরেতে নিবসতি ॥
শ্রীজয়গোপাল নাম, হরিভক্তি লাভ কাম, উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।
ভক্তবৃন্দ মধ্য রবি, শ্রীবিল্বমঙ্গল কবি, কবিতায় প্রকাশে পয়ার ॥"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

জন্ম ১২১৮ সাল, মৃত্যু ১২৬৫ সাল। ইনি কাঁচড়াপাড়া নিবাসী হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার পিতা কাঁচড়াপাড়ার সন্নিহিত শিয়ালডাঙ্গার নীলকুঠিতে চাকুরী করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে সাতিশয় দুরন্ত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার পিতা পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। এই বিবাহ, বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়ায়, পরম অভিমানী বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া দারুণ ক্রোধে পিতার কাঞ্চনপল্লীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিলেন এবং এখানে থাকিয়া ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত জন্মকবি, বাল্যকালে সেখ সাদী প্রভৃতির কবিতার অর্থ শুনিয়া বাঙ্গলায় পদ্য রচনা করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র মহেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতে কবিতা রচনা করিতেন এবং তিনিও একজন সুকবি ছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। ইঁহার সাহায্যে ১২৩৭ সালে ১৬ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র "সংবাদ প্রভাকর" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন, কিন্তু ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে "প্রভাকর" উঠিয়া যায়। অনন্তর তিনি ১২৪২ সালের পুনরায় প্রভাকর বাহির করিতে আরম্ভ করেন। ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে 'প্রভাকর' দৈনিকরূপে বাহির হয়। ইহাই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকা।

১২৫৩ সালের ৭ই আষাঢ় তিনি "পাষণ্ড-পীড়ন" নামে একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় "ভাস্কর" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য) "রসরাজ" নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরও পাষণ্ডপীড়নে তার প্রতিবাদ করিতে থাকিলে বহুদিন ধরিয়া বহু কুৎসাপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়। উহা তখনকার সমাজে একটী আমোদের বিষয় হইয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই পত্র দুইখানি উঠিয়া যায়। অতঃপর ১২৪৫ সালের ঈশ্বর গুপ্ত "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রগণের কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৫০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে তিনি একখানি বৃহৎ কলেবর মাসিক "প্রভাকর" বাহির করেন। ইহাতে অধিকাংশই তাঁহার স্বরচিত কবিতা প্রকাশিত হইত। ১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের "প্রভাকরে" তিনি 'প্রবোধ প্রভাকর' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন। উহা ১লা ভাদ্র শেষ হয়। পরে "হিত প্রভাকর" ও "বোধেন্দু বিকাশ" শেষ করেন। তিনি দশ বৎসর কাল বঙ্গদেশের বহুস্থান ভ্রমন করিয়া বহুকষ্টে রামপ্রসাদ সেন, রাম বসু, রামনিধি সেন

(নিধুবাবু,) হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বসু, নৃসিংহ প্রভৃতি বহুখ্যাতনামা প্রাচীন বঙ্গ কবির জীবনচরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। পরে ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ ভারতচন্দ্রের জীবনী ও অনেক লুপ্ত পদাবলী প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা ও ক্ষুদ্র ছড়া প্রভৃতি রচনা করিয়া বঙ্গভাষাকে সমধিক গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কবির কাব্য ও জীবনচরিত প্রকাশের তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

জন্ম ১৮১৫ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৫৮ খ্রীঃ। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে মদনমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের একজন পুস্তকলেখক ছিলেন। মদনমোহন অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন এবং প্রথমে স্বগ্রামের চতুষ্পাঠীতে কিছু ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করিয়া ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজিতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক কলেজে অধ্যয়ননিরত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই "রসতরঙ্গিণী" ও "বাসবদত্তা" নামে দুই খানি সুললিত পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তি দেখিয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-প্রমুখ অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহাকে কাব্যরত্নাকর উপাধি দেন, পরে তিনি বন্ধুগণ কর্তৃক তর্কালঙ্কার উপাধিভূষিত হয়েন। পাঠ সমাপন করিয়া তিনি যথাক্রমে বারাসাত, কলিকাতা ফোর্টউইলিয়ম কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরিশেষে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই সময় তিনি কতিপয় দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি কলিকাতায় "সংস্কৃত যন্ত্র" নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বহু প্রাচীন অনেক বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। এইকালে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ জে, ই, ডি, বেথুন সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্যে ও পরামর্শে বেথুন সাহেব, হেদুয়ার ধারে বাঙ্গালী বালিকাগণের শিক্ষার্থে বেথুন কলেজের স্থাপনা করেন। মদনমোহন মহানির্ব্বান তন্ত্র হইতে "কন্যাপেবং পালনীয়া, শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" বচন উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে বালিকাবিদ্যানুরাগী করিতে প্রয়াস পান এবং সমাজের ভ্রূভঙ্গি অবহেলা করিয়া প্রথমেই আপনার দুই কন্যাকে ঐ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই সময় তিনি বালিকাগণের পাঠোপযোগী গ্রন্থের অভাব অনুভব করিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ "শিশুশিক্ষা" পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং "সর্ব্ব শুভঙ্করী" নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং ছয় বৎসর ঐ কার্য্যে থাকিয়া পরে ঐ স্থানেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়েন, অনন্তর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিসূচিকা রোগে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত চূপী[৩১] নামক গ্রামে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার দিনে অক্ষয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পিতাম্বর, মাতা দয়াময়ী, অক্ষয়কুমারের প্রথম শিক্ষা চূপী গ্রামেই আরম্ভ হয়; পরে ১০ বৎসর বয়সে খিদিরপুর আসিয়া কলিকাতা গৌরমোহন আঢ্যের "ওরিয়েন্টাল সেমিনারী" নামক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় অর্থাভাবে তাঁহাকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু অসীম অধ্যবসায়ী অক্ষয়কুমার এক দিনের জন্যও পাঠে বিরত হইলেন না। বরং অত্যাধিক পরিশ্রম সহকারে গৃহে থাকিয়াই ইংরাজী, জর্ম্মাণ, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাপাঠে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহারই অনুরোধক্রমে অক্ষয়কুমার "প্রভাকরে" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৭৬২ শকে কলিকাতায় "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমার ইহাতে আট টাকা মাহিনায় ভূগোলশিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হয়—অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে দ্বাদশ বৎসর কাল তিনি উহা যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন করেন। এই কালেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সমধিক আগ্রহবান হয়েন; ১২৯০ সালের আষাঢ় মাসে একদিন উপাসনা কালে তিনি অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার নিদারুণ শিরঃপীড়ার নিদান। ১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ:— "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধে বিচার," "চারুপাঠ প্রথম ভাগ চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ, পদার্থ বিদ্যা, ধর্ম্মনীতি।" "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগ এবং ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ"—ইহাই তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থ।

অক্ষয় কুমার দত্ত

নদীয়া কাঁচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী চৌবেড়ীয়া গ্রামে ১২৩৬ সালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। এই চৌবেড়ীয়া পূর্ব্বে বহু সমৃদ্ধ নগরী ছিল এবং চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ নামে খ্যাত ছিল। দীনবন্ধুর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ইহা যশোহরের এলেকাধীন হইয়াছে। দীনবন্ধু আপনাকে নদীয়াবাসী বলিয়া সর্ব্বদা গৌরব অনুভব করিতেন। কলিকাতায় থাকিয়াই দীনবন্ধু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলেজ ছাড়িয়া দেড়শত টাকা বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েন। পরে এই পোষ্টাল লাইনের কার্য্যই তিনি সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদা মফঃস্বলের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইত; এইরূপে তিনি মনুষ্যচরিত্র পাঠের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার অতুলনীয় নাটক সকলের সৃষ্টি হয়। কার্য্যোপলক্ষে তিনি উড়িষ্যা হইতে নদীয়ায় পরে নদীয়া হইতে ঢাকায় প্রেরিত হয়েন; এই সময়ে নীলের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। মফঃস্বলের অভিজ্ঞতার ফলে "নীলকর-বিষধর-

দীনবন্ধু মিত্র

গণের" নিদারুণ অত্যাচার সকল বহুপরিমাণে অবগত হইয়া দীনবন্ধু জগদ্বিখ্যাত নাটক "নীলদর্পণ" প্রণয়ন করেন। নীলদর্পণ প্রকাশিত হইলে চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া যায় এবং রেভারেণ্ড লং সাহেব ইহার ইংরাজিতে অনুবাদ করাইয়া প্রচার করেন। ইহার জন্য তিনি সুপ্রিমকোর্টের বিচারে কারারুদ্ধ হয়েন। "নীলদর্পণই" দীনবন্ধুর প্রথম নাটক। তাহার পর "নবীন তপস্বিনী," "বিয়ে পাগলা বুড়ো," "সধবার একাদশী" পরে "লীলাবতী"। অতঃপর "সুরধনী কাব্য," "জামাই বারিক," এবং "দ্বাদশ কবিতা" প্রকাশিত হয়। "কমলেকামিনী" দীনবন্ধুর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল। "যমালয়ে জীবন্ত মানুষ," "পোড়া মহেশ্বর" "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ" এবং "গদ্য সংগ্রহ" নামে আর কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু কলিকাতার সুপার নিউমারারি ইনস্পেকটিং পোষ্টমাষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েন, পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের সাহায্য করাই এ পদের কার্য্য। ১৮৭১ সালে ইনি যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিতে কাছাড় গমন করেন এবং তথায় অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করায় তিনি গভর্মেন্ট কর্ত্তৃক "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষিত হয়েন। এই সময়ে কোনও কারণে পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ও ডিরেক্টর জেনারেলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, দীনবন্ধু পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের পক্ষ অবলম্বন করেন, ফলে তাঁহাকে পোষ্ট বিভাগ ছাড়িয়া কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময়ে তাঁহার বহুমূত্র রোগ দেখা দেয় এবং তাহারই ফলে ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে তিনি কৃতবিদ্য কয়েকটি পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র শ্রীললিতমোহন মিত্রও এক জন সুলেখক। নীলহাঙ্গামার ইংরাজী ইতিহাস লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ইঁহারা এখন কলিকাতাবাসী।

শ্যামাচরণ সরকার

শ্যামাচরণ নদীয়া জেলার অন্তর্গত মামজোয়ান গ্রামবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় হরনারায়ণ সরকারের পুত্র। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে শ্যামাচরণের দুঃখিনী মাতা বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের এক আত্মীয় কৃপাপরবশ হইয়া এবং শ্যামাচরণের বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া কৃষ্ণনগরের স্বীয় ভবনে রাখিয়া পার্শী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। যাহার বাটীতে তিনি থাকিতেন, তাঁহার হাট বাজারাদি ভৃত্যোচিত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত; সুতরাং অবসর মতে পার্শী পুস্তকাদি স্বহস্তে লিখিয়া তাহাই পাঠ করিয়া বহু কষ্টে উক্ত ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময়ে তাঁহার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় তিনি রীড সাহেব নামক এক জমিদারের সেরেস্তায় ১০ টাকা বেতনে এক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু নানা কারণে শীঘ্রই তিনি এ চাকরী পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত প্রসিদ্ধ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের আলাপ হয়। তাঁহারই পরামর্শে শ্যামাচরণ কলিকাতায় আগমন করেন এবং রামতনু বাবুর বাসায় থাকিয়া ইংরাজী অধ্যয়নে মন দেন। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর। এই বয়সে অদম্য উৎসাহে দিবা রাত্র পরিশ্রম করিয়া তিনি ইংরাজী

ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি প্রত্যহ, বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন এবং কোন সাহেবের সহিত আলাপ হইলে যদ্যপি তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করিতেন। এইরূপে বহু সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং কিছু উপার্জ্জনও হইতে থাকে। এই সময়ে বড় লাট সাহেবের কৌন্সিলের মেম্বার সার্ চার্লস্ ট্রিবিলিয়ন সাহেব ইংরাজী, বাঙ্গালা, উর্দ্দুতে একখানি ক্ষুদ্র অভিধান প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। এই উপলক্ষে শ্যামাচরণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং সাহেব তাঁহাকেই একার্য্যের ভারার্পণ করেন। এই সময় তিনি কয়েকখানি উর্দ্দু গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। উক্ত সাহেব তাঁহার এই সকল কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতা মাদ্রাসায় একটী চাকরী করিয়া দেন। এখানে থাকিতে থাকিতে তিনি ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালি প্রভৃতি নানা ভাষার ব্যাকরণ মুখস্থ করেন। এইরূপে ত্রিশবৎসর বয়সের পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ বহুভাষাবিৎ হইয়া উঠেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য জন্মে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়নে রত হয়েন এবং অল্প দিনের মধ্যে ঐ ভাষা আয়ত্ত্ব করিয়া লইয়া সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। এখান হইতে তিনি সদর দেওয়ানীতে পেস্কারের পদে নিযুক্ত হন। পরে ঐ আদালতে উকিল হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে উক্ত আদালতে তর্জ্জমা দপ্তরের সৃষ্টি হইলে জজগণ তাঁহাকেই ৪০০ টাকা মাহিনায় প্রধান অনুবাদক নিযুক্ত করেন পরে কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য করিলে তিনি ৬০০ টাকা বেতনে সুপ্রীম কোর্টের ইন্‌টার প্রেটার অর্থাৎ দ্বিভাষী নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিয়া হিন্দু ও মুসলমানগণের যাবতীয় আইন অধ্যয়ন করেন; এবং পরে ইংরাজীতে ও বাঙ্গালার দায়ভাগানুযায়ী এক বৃহৎ "ব্যবস্থাসার সংগ্রহ" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। অল্পদিনেই উক্ত গ্রন্থ বাঙ্গালায় ও বিলাতে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হয়। এই গ্রন্থের প্রসারে উৎসাহ পাইয়া তিনি মিতাক্ষরানুযায়ী ব্যবস্থা চন্দ্রিকা নামক পুস্তক রচনা করেন। পরে মুসলমানগণের নিমিত্ত উক্তরূপ গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় আইনের গ্রন্থরচনার তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। এইসময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায় এবং সাধারণের উপকারের নিমিত্ত স্বগ্রামে একটী স্কুল, দুইটী রাস্তা, দুইটী কূপ, ও একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—"ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত"। এই পুস্তক সংস্কৃত "ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত" নামক পুস্তকের অনুকরণে লিখিত। এই সংস্কৃত পুস্তকখানি এখন অতি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে ইহা পার্চ্চ সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে বার্লিন নগরীতে ছাপা হইয়াছিল। ১২৭৭ সালের কাত্তিক সংক্রান্তিতে কার্ত্তিকেয় বাবু কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ

দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়

করেন। ইঁহাদের বংশ দেওয়ান চক্রবর্ত্তীর বংশ বলিয়া খ্যাত। এই বংশের অনেকেই কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ানের কার্য্য করাই পূর্ব্বোক্ত খ্যাতির কারণ।

কার্ত্তিক বাবু প্রথমবয়সে পার্শী শিক্ষা করেন, পরে বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়েন। ইনি কিছুদিন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে রাজা শ্রীশচন্দ্রের আগ্রহে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। এইস্থানে থাকিয়া তিনি আপনার আদর্শ-চরিত্র বলে সামান্য পদ হইতে ৩০০ শত টাকা বেতনে সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হয়েন। তিনি একদিকে যেমন কৃষ্ণনগরে রাজাগণ ও কৃষ্ণনগরবাসীগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও আদৃত হইতেন তেমনি গবর্ণমেন্টেও তাঁহার অতীব সম্মান ছিল। "ক্ষিতিশবংশাবলী" চরিত ব্যতীত আত্মজীবন চরীত নামে আপনার জীবনী কথা লইয়া একখানি সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন এবং গীতমঞ্জরী নামক একখানি সঙ্গীত পুস্তকও রচনা করিয়াছেন তাঁহার অন্যান্য গুণের মধ্যে তিনি একজন সুগায়ক ছিলেন, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কয়েকটী কৃতী পুত্র রাখিয়া তিনি স্বর্গ গমন করেন। পুত্রগণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র বাবু এম, এ; বি, এল পাস করিয়া উকিল হয়েন এক্ষণে নদীয়াধিপতি মহারাজা ক্ষৌনীশচন্দ্রের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পিতার ন্যায় ইনিও একজন সাহিত্যসেবী, বহুদিন "পতাকা" নামক মাসিক পত্র দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইনি কিছুকাল সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গবাসী" পত্রেরও সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু নদীয়াধিপতির বর্ত্তমান ম্যানেজার, এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা স্বনামধন্য সুনাম প্রসিদ্ধ দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয় নিজগুণে দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়

সাধুহরিনাথ ১২৪০ সালে নদীয়ার কুমারখালি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন; শৈশবেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়, একারণে তাঁহার পিতৃব্য পত্নীই তাঁহাকে লালন পালন করেন। দরিদ্রের সংসারে জন্ম হইলেও পাঠের প্রতি তাঁহার অতিশয় যত্ন ছিল। অর্থের অভাবে স্কুলে যথারিতি পাঠাভ্যাস তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই বটে কিন্তু তিনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ বুৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা কৃতবিদ্য অনেকের ভাগ্যেও ঘটে না, তাঁহার লিখিত ফকিরচাঁদ ভণিতা যুক্ত সহস্র সহস্র সাধন সঙ্গীত এবং সুবিখ্যাত পুস্তক বিজয়বসন্ত ও পরমার্থগাথা, কবিকল্প, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়া, অক্রুর সংবাদ, ভাবোচ্ছাস, মাতৃমহিমা, ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রভৃতি তাঁহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতেছে। পদ্য রচনায় কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত তাঁহার পথ প্রদর্শক। "সংবাদ প্রভাকরে" তাঁহার বহু প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। ১২৭০ সালে ১লা বৈশাখ "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রথমে ইহা ছিল মাসিক পরে হয় পাক্ষিক পরে সাপ্তাহিক। বাইশ বৎসর কাল এই পত্র চলিয়াছিল। হরি নাথ একদিকে যেমন সুলেখক ছিলেন তেমনি অপর দিকে তত্ত্বদর্শী ও সাধক ছিলেন, তাঁহার সরল উদার ভাব তাঁহাকে "কাঙ্গাল" উপাধি দিয়াছিল। ১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে হরিনাথ

হরিনাথ মজুমদার

দেহত্যাগ করেন। তিনি শেষ জীবনে একখানি সুবৃহৎ আত্মচরিত লিখিয়া গিয়াছেন, উহা এক্ষণে তাঁহার পুত্রের নিকট আছে কিন্তু এখনও ছাপা হয় নাই, তাহাতে কুমারখালির ইতিবৃত্ত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ইতিহাস ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিশিষ্ট আছে।

যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামের সন্নিকটস্থ স্বর্ণপুর গ্রামে সৎব্রাহ্মণ কুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সহরেই ইঁহার শিক্ষালাভ হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভরত শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্করত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির সাহায্যে ইঁহার শিক্ষা সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয় এবং এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একদিকে ইংরাজীতে যেমন তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তেমনি সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার সবিশেষ দখল ছিল। স্বনামপ্রসিদ্ধ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিদুষী কন্যাই ইঁহার প্রথমা স্ত্রী। ক্যাথিড্রাল মিসন কলেজে ইনি কিছু কাল সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। এই সময়েই ইঁহার "আর্য্যদর্শন" নামক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন বঙ্গসমাজে আর্য্যদর্শনের সবিশেষ প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অবসর কাল পুস্তক রচনায় সমর্পন করেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন যথা—গ্যারিবাল্ডির জীবনচরিত, ওয়ালেসের জীবন বৃত্ত, আত্মোৎসর্গ, জন ষ্টুয়ার্টমিলের জীবন বৃত্ত, ম্যাটসিনির জীবন বৃত্ত, হৃদয়োচ্ছাস, প্রাণোচ্ছাস, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন বৃত্ত, শান্তি পাগল, কীর্ত্তিমন্দির, সমালোচনা মালা, জ্ঞানসোপান, চিন্তাতরঙ্গিনী শিক্ষাসোপান ৩ ভাগ, আইন সংগ্রহ ৮ ভাগ, জ্ঞানসোপান ৩ ভাগ ইত্যাদি। পুস্তক রচনার অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং মফঃস্বলের দূষিত জল বায়ুতে ভুগিয়া তিনি শীঘ্রই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং ১৩১১ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। তিনি তদানীন্তন সমাজের একজন প্রথম সংস্কারকরূপে গণ্য ছিলেন। বর্ত্তমান কালের কলিকাতার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কালীময় ঘটক

"চরিতাষ্টক" প্রণেতা পণ্ডিত কালীময় ১২৪৭ সালের কোজাগর রাত্রিতে রাণাঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত; ইঁহাদের আসল উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। পণ্ডিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কালীময় পিতা, পিতামহের ন্যায়ই পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার যেমন প্রগাঢ় অনুরাগ দৃষ্ট হইত, তেমনি নর্ম্মালস্কুলে পাঠহেতু বাঙ্গালা ভাষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তাঁহার প্রথম চাকরী নদীয়ান্তর্গত ভালুকা গ্রামের বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে, পরে তথা হইতে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি বেলেড়া গ্রামে বঙ্গবিদ্যালয়ে গমন করেন। তথা হইতে নিজগ্রাম রাণাঘাটে আসিয়া রাণাঘাটবাসী জনসাধারণের সাহায্যে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার প্রধান পণ্ডিত হয়েন। এই বঙ্গবিদ্যালয়টী পরে রাণাঘাটের ইংরাজী

বিদ্যালয়ের সহিত এক হইয়া যায় এবং কালীময় ইংরাজী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি বহু পরিশ্রমে, স্বয়ং বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দুইভাগ চরিতাষ্টক রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষার স্কুলপাঠ্যরূপে এরূপে স্বদেশী লোকের জীবনচরিত প্রচার এই প্রথম; সে কারণে ইহা টেক্সট বুক কমিটী কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়। এই চরিতাষ্টক ব্যতীত তাঁহার "ছিন্নমস্তা" "শর্ব্বাণী" "ইংরাজী ফলাহারের বাঙ্গালী চাট" নামে কয়েকখানি উপন্যাস ও "পদ্যময়," "মেলা," "মিত্রবিলাপ," "কৃষিশিক্ষা" "কৃষিপ্রবেশ" প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কতিপয় পুস্তক দৃষ্ট হয়। সন ১৩০৭ সালে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রায় রাধিকা-প্রসন্ন মুখো-পাধ্যায়, রাজ কৃষ্ণ মুখো-পাধ্যায়

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী গোস্বামী দুর্গাপুরে ১৮৪৫ খ্রীঃ ৩১শে অক্টোবর তারিখে রাধিকাবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দ চরণ মুখোপাধ্যায় এক নীলকুঠীতে কর্ম্ম করিতেন এবং তৎসূত্রে বহু অর্থোপার্জ্জন করিলেও অসাধারণ দাতা বিধায় মৃত্যুকালে কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার দুই পুত্র; প্রথম রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর C. I. E. এবং কনিষ্ঠ রাজকৃষ্ণ। পিতার মৃত্যুতে দুই ভাই কষ্টে পড়িলেও লেখা পড়ায় একদিনও কেহ অমনোযোগী হয়েন নাই। জ্যেষ্ঠ রাধিকাপ্রসন্ন প্রশংসার সহিত "জুনিয়ার" "সিনিয়ার" পাশ করিয়া পরে স্বীয় অসাধারণ গুণে বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েন। এই কালে তিনি বঙ্গভাষার বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হয়েন। বহুদিন উক্তপদে অবস্থান করিয়া পরিশেষে কিছুদিন স্পেষল পেন্সন ভোগ করিয়া এবং গবর্ণমেন্ট কর্তৃক C. I. E. উপাধি ভূষিত হইয়া চারিটি উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে গমন করেন।

কনিষ্ঠ রাজকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের যত্নে সচ্ছন্দে থাকিয়া একে একে F. A., B. A., M. A., ও B. L. পরীক্ষায় অতি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে কলিকাতায় আসিয়া প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত, ফরাসী, জার্ম্মনি, উর্দ্দু, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। এইরূপে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া তিনি ক্রমান্বয়ে জেনারেল এসেম্বিলিজ কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কটক কলেজ, বহরমপুর কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যাপনা কার্য্য করেন। পরে কিছু দিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া পরিশেষে ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ৭০০ টাকা বেতনে অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিনিই গবর্ণমেন্টের প্রথম বাঙ্গালাঅনুবাদক। তিনি কার্য্যোপলক্ষে বহু স্থানে অবস্থিতি করিলে এবং শত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও চিরদিনই মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত যৌবনউদ্যান, মিত্রবিলাপ, কাব্যকলাপ, রাজবালা, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গলা এলজেবরা, কবিতামালা এবং নানা প্রবন্ধ প্রভৃতি পুস্তকাবলী বাঙ্গালীর মনে চিরদিন তাঁহার নাম

জাগরূক রাখিবে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহার সাতিশয় আনুরক্তি দৃষ্ট হইত।৩২ ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী

জন্ম ১২১৭, মৃত্যু ১২৯০ সালে। নিবাস ভাজনঘাট, পিতা মুরলীধর গোস্বামী; জাতি বৈদ্য। ইনি বাল্যকালে পিতার সহিত বৃন্দাবনে বাস করেন ও তথায় ব্যাকরণ পাঠ করেন; পরে নবদ্বীপে পাঠ সমাপ্ত করেন। হুগলী সোমড়া বাঁকীপুর গ্রামে ইঁহার বিবাহ হয়। লিখিত গ্রন্থ—"রাই-উন্মাদিনী, ""স্বপ্নবিলাস," "স্ববল সংবাদ" প্রভৃতি। রচনার পারিপাট্যে, ছন্দের মনোমুগ্ধকর ঝঙ্কারে, অলঙ্কারের ছটায় "রাই-উন্মাদিনী" বঙ্গভাষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

দামোদর মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১২৫৯, মৃত্যু ১৩১৬ সাল। কৃষ্ণনগর মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম। পৈত্রিক নিবাস শান্তিপুর। বৈয়াকরনীক লোহারাম শিরোরত্ন ইঁহার মাতুল। মাতুলালয়েই ইনি প্রতিপালিত হয়েন ও বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী তিন ভাষাতেই ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। উপন্যাস রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লিখিত পুস্তক—"মৃন্ময়ী," "মা ও মেয়ে," "দুই-ভগ্নী," "বিমলা," "কর্ম্মক্ষেত্র," "শান্তি," "সোনার কমল," "যোগেশ্বরী," "অন্নপূর্ণা," "সপত্নী," "নবাব-নন্দিনী," "ললিতমোহন," "অমরাবতী," "নবীনা," "কমলকুমারী," "প্রতাপসিংহ," "শুক্লবসনা-সুন্দরী," "শম্ভুরাম," প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত নয়টী টীকা ভাষ্য ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্ভাগবতগীতার এক সুবৃহৎ অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন। "জ্ঞানাঙ্কুর." "প্রবাহ" ও একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রও ইঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। ফলতঃ নদীয়ার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে ইনি অন্যতম।

মতিলাল রায়

জন্ম ১২৪৯, মৃত্যু ১৩১৫ সালে। কৃত নিবাস নবদ্বীপ। পৈত্রিক নিবাস বর্দ্ধমান ভাৎসালা। ইঁহার পিতার নাম মনোহর রায়। নবদ্বীপের মিসনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বাঙ্গালা রচনা করেন। লিখিত পুস্তক—"রামবনবাস," "রাবণবধ," "ভীষ্মের-শরশয্যা" "দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ," "নিমাইসন্ন্যাস," "কর্ণবধ," "গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ" প্রভৃতি বহুতর পালা। ইঁহার যাত্রাদল সমগ্র বাঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ। রায় মহাশয় সুরসিক, সুলেখক ও সুকবি ও ভাবগ্রাহী। নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহার বাক-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধী ভূষিত করেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাস রায়ও একজন সুলেখক ও সুগায়ক। তিনি তাঁহার পিতার যাত্রারদল অক্ষুন্ন রাখিয়া নবদ্বীপেই বাস করিতেছেন।

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী

জন্ম ১২৬৫, সাল, মৃত্যু ১৮২৪ খ্রীঃ। পৈত্রিক নিবাস শিবনিবাসের সন্নিকট মাজদিয়া গ্রাম। জন্ম শান্তিপুর মাতুলালয়ে। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ অব্দে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বাঙ্গালা দেশে হোমিওপ্যাথির পশারবৃদ্ধি তাঁহার

জীবনের লক্ষ্য ছিল। এতদর্থে তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া একদিকে যেমন "হোমিও-প্যাথি মতে গৃহ-চিকিৎসা," "হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তিখণ্ডন," "ওলাউঠা চিকিৎসা," "নবশরীর তত্ত্ব," "জ্বর চিকিৎসা," "চিকিৎসাতত্ত্ব," "ভৈষজ্যচিকিৎসা," "সদৃশ চিকিৎসা" প্রভৃতি পুস্তক রচনা ও "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা," ও "Medical Recods" নামক মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন, তেমনি হোমিওপ্যাথি বিশুদ্ধ ঔষধের অবাধ প্রচারের জন্য, কলিকাতায় "লাহিড়ী এণ্ড কোং" নামক হোমিওপ্যাথি ঔষধালয় স্থাপন ও একটী হোমিওপ্যাথি স্কুল স্থাপন করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া ছিলেন।

যদুনাথ ও শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১২৪৬, মৃত্যু ১৩০০ সাল। শান্তিপুর মাতুলালয়ে জন্ম। পৈত্রিক নিবাস গরীবপুর কৃতনিবাস রাণাঘাট। ইনি বাঙ্গালার সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের অন্যতম। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, কার্য্যকুশল, সহৃদয় বিদ্বান ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনিই সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা পুস্তক বঙ্গভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন। লিখিত পুস্তক "চিকিৎসাদর্পণ," "ধাত্রী শিক্ষা," "উদ্ভিদ বিচার," "সরল শরীরপালন," "সরল জ্বরচিকিৎসা," "রোগ-বিচার," প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" নামক একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র ও "সমাজ ও সাহিত্য" নামক একখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রও তাঁহার সম্পাদকতায় বাহির হইত। তাঁহার চারিপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীকুমারনাথ একজন ভক্তিমান সাধক ও তান্ত্রিক উপাসক; এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীগিরিজানাথ একজন সুকবি। "বেলা" ও "পরিমল" নামক দুই খানি কবিতা পুস্তক লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রাণাঘাট নিজবাটী হইতে প্রকাশিত "বার্ত্তাবহ" নামক সংবাদ-পত্রও ইনি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন।

জগদীশ্বর গুপ্ত, রমনীমোহন মল্লিক

জন্ম ১২৫২ সাল, মৃত্যু ১৮৯২ খ্রীঃ। জন্ম মেহেরপুর মাতুলালয়ে। অত্রস্থ বিখ্যাত মল্লিক বংশই তাঁহার মাতুলাশ্রয়। কৃষ্ণনগর কলেজে এল, এ, পরীক্ষায় ২৫ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া পরে মুন্সেফীপদ প্রাপ্ত হয়েন এবং বহু-তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি সাধক ও ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" "লীলাস্তবক" এবং "শ্রীচৈতন্য লীলামৃত" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ সংকলনও প্রণয়ন করেন।

ইঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মল্লিক বংশীয় ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় "চণ্ডীদাস," "জ্ঞানদাস," "বলরাম দাস," প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর সুন্দর সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ধনীর-সন্তান হইলেও রমণীবাবু যেমন বঙ্গসাহিত্য-সেবক ছিলেন, বর্ত্তমানে নিজগ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের দিকেও তাঁহার তেমনি পূর্ণ দৃষ্টি ছিল।

যদুনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ রায়

জন্ম ১৮৩৫ খ্রীঃ মৃত্যু ১৮৮৮ খ্রীঃ ২৩শে নবেম্বর। কৃষ্ণনগর রাজদৌহিত্র বংশে জন্ম। লিখিত পুস্তক "শিক্ষাবিচার," অতঃপর "ধর্ম্মসামঞ্জস্য" নামক এক পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিবার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ইনি রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় তাঁহার ব্যবসার উপযোগী তিনখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন প্র্যাকটিস অফ্ মেডিসিন, হাইজিন এবং মেডিকাল জুরিসপ্রুডেন্স। কর্ম্মোপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি তথায় একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত নেতা স্বরূপ ছিলেন। তিনিও গবর্ণমেন্ট হইতে রায়বাহাদুর উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। ৬২ বৎসর বয়সে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে নবেম্বর পরলোক গমন করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীয়া নারায়ণপুরে ইঁহার জন্ম। বহুদিন ধরিয়া পোষ্ট্যাল স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি "সাধারণী" "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতির নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং নানাবিধ প্রাচীণ কাব্য প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ রচনার কাল নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার লিখিত পুস্তকের মধ্যে "গ্রীক ও হিন্দু" সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১২৫৭সাল, মৃত্যু ১৩১৭ সাল। নিবাস শিবনিবাস। ইনি কিছুদিন কলিকাতা মেডিকাল কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পাঠ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যৌবনে ইনি মনিষী শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পাদিত "সাধারণীর" সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন পরে স্বনামখ্যাত বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার স্বাভাবিক রচনা পারিপাট্যে উহার শ্রী সংবর্দ্ধন করেন। অতঃপর দৈনিক চন্দ্রিকার সম্পাদকতা করিতে থাকেন পরিশেষে নাড়াজোল রাজের ম্যানেজারী পদ গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন। এইখানে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া চাকুরী ছাড়িয়া দেন এবং যোগসাধনায় নিযুক্ত হয়েন, ইনি ১৩১৭ সালের মাঘীপূর্ণিমায় কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

শ্যামাধর রায়

জন্ম ১২৫৭ সাল মৃত্যু ১৩০৭ সাল। নিবাস কৃষ্ণনগর। ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের দৌহিত্র। শ্যামাধর বাবু সুপ্রসিদ্ধ লেথব্রিজ সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। যৌবনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি কবি রসসাগরের জীবন চরিত লেখন এবং তাঁহার অনেক কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। বহু সাময়িক পত্রেও তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার রচনায় বেশ মাধুর্য্য ছিল। মিঃ টয়েনবী সাহেবের হুগলীর ইতিবৃত্ত তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণ ব্যতীত নদীয়ার পরলোকগত নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণের নাম উল্লেখ যোগ্য :—

বহুতর সাধনসঙ্গীত প্রণেতা—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র। "শ্রীমদ্ভাগবত" অনুবাদক তন্তুবায় কুলোদ্ভব—লালু নন্দরাম। "প্রভাসখণ্ড" লেখক ফুলিয়া নিবাসী-শিশুরাম দাস। "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" লেখক উলা নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। "রামায়ণ" অনুবাদক মাটীয়ারি নিবাসী রামমোহন বন্দোপাধ্যায়। হাস্যামোদী রসসাগর উপাধীক বাড়ে বাঁকা বাসী কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী। "রাসেলাস", "কাদম্বরী", অনুবাদক কাচকুলী গ্রাম নিবাসী তারাশঙ্কর কবিরত্ন। "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রণেতা কৃষ্ণনগর নিবাসী লোহারাম শিরোরত্ন। "রাজস্থানের পুরাবৃত্ত", "জয়াবতীর উপাখ্যান", "মনিমালিনী নাটক", "পত্র-পাদপ", "কবিচরিত" প্রণেতা কৃষ্ণনগর নিবাসী—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। "কোকিল দূত" প্রণেতা শান্তিপুর নিবাসী—হরিমোহন প্রামাণিক। "বাসুদেব বিজয়", "প্রভাত স্বপ্নম্" প্রণেতা শান্তিপুর নিবাসী—রামনাথ তর্করত্ন। "মুদ্গর" সম্পাদক শান্তিপুর নিবাসী—শ্যামাচরণ সান্যাল। "নারীরত্নমালা", "জীবন সঙ্গার" প্রভৃতির লেখক শান্তিপুরের—যোগীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" টীকাকার দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—মদনগোপাল গোস্বামী। "বিষ্ণুপ্রিয়া" সম্পাদক শান্তিপুর নিবাসী পরম ভাগবত—রাধিকানাথ গোস্বামী। "ফুলহার" প্রণেতা শান্তিপুরের রামলাল চক্রবর্ত্তী ও সুলেখক নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। 'নবোপাখ্যান' প্রণেতা রাণাঘাট নিবাসী—রাধাময় দেচৌধুরী। "মালতীমাধব" প্রণেতা রাণাঘাট নিবাসী—কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়। "কবির গীত" রচক রাণাঘাট নিবাসী—জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়। "কবির গীত" রচক শান্তিপুর নৈচি নিবাসী—সাতু রায়। অসংখ্য সাধনসঙ্গীত প্রণেতা—ফকীর লালন সাহী। "চপলা." "কবিতা-প্রসূন" প্রণেতা হরিপুর নিবাসী—কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কাঁচড়াপাড়া নিবাসী সুলেখক—বৈদ্যনাথ আচার্য্য এবং প্রেমচাঁদ কবিরত্ন ও হরিমোহন সেন। "সুধীরঞ্জন" প্রণেতা গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী—দ্বারকানাথ অধিকারী। "রামবালালীলামৃত" লেখক মাটীয়ারি নিবাসী—বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি।

বর্ত্তমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থকারগণ উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম ১২৭০ সাল। সাধারণতঃ ডিঃ, এল, রায় নামে ইনি প্রসিদ্ধ। নিবাস কৃষ্ণনগর। ইনি সুলেখক কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি গবর্ণমেন্ট ষ্টেট স্কলার্শিপ লইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে বিলাতে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গবর্ণমেন্টের নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত আছেন। কর্ম্মের অবসরে সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া ইনি বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ হাসির গান ও রহস্য অবতারণায় ইনি সিদ্ধহস্ত। ইঁহার লেখার মধ্যে সর্ব্বত্র একটা নিজস্ব ভাব দেখা যায় যাহা অন্যত্র. দুর্ল্লভ। বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ নাটককার বলিয়া ইঁহার খ্যাতি লাভ হইয়াছে। ইঁহার লিখিত পুস্তক—

"কল্কী-অবতার", "আর্য্যগাথা", "আষাঢ়ে", "হাসির গান", "ত্র্যহস্পর্শ", "বিরহ", "পাষাণী", "রাণাপ্রতাপ", "দুর্গাদাস", "নুরজাহান", "হরিনাথের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা" ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত মাসিক পত্রাদিতে ইঁহার বহুতর সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ দেখা যায়।

শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

জন্ম ১৮৬১ খ্রীঃ। নিবাস কুমারখালির সন্নিকট নওয়াপাড়া থানার অধীন শিমলাগ্রাম। ইনি রাজসাহীর সর্ব্বপ্রধান উকিল। ইনি কিছুদিন কুমারখালি হইতে প্রকাশিত "গ্রামবার্ত্তা" সম্পাদন করেন ও সাধনা, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখেন। পরে ঐতিহাসিকচিত্র নামে একখানি মাসিক পত্রও সম্পাদন করিয়াছিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মৈত্রেয় মহাশয়ের পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মৌলিক গবেষণা ও পণ্ডিত জনোচিত সৎসাহস তাঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধে পরিদৃষ্ট হইবে। লিখিত পুস্তক "সিরাজদ্দৌলা", "সীতারাম রায়", "মীরকাশিম", "রাণীভবানী", 'গৌড়কাহিনী' ইত্যাদি।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর

জন্ম ১২৬৮। জন্মভূমি মাগুরার অন্তর্গত মজাপুর গ্রামে। কৃত নিবাস কৃষ্ণনগর শৈশবে পিতৃহীন হইয়া গুণবতী মাতার যত্নে বিদ্যালাভ করেন এবং ১২৮৮ সালে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০ টাকা বৃত্তি পান। ১২৯০ সালে বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতি যোগী পরীক্ষা দিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনুরাগী; পঠদ্দশায় "শারদবকাশ" নামক যুক্তাক্ষর বিহীন এক ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করেন। যৌবনে অনেকগুলি গার্হস্থ উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। নবদ্বীপস্থ পণ্ডীত মণ্ডলী ইঁহার রচনা চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে "বিদ্যাবিনোদ" উপাধি দান করিয়াছেন। লিখিত পুস্তক "অনাথবালক", "সুরবালা" "সৎকথা, ছ আনাজ, পাপের পরিণাম ইত্যাদি।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ M. A., PH. D. মহাশয়ের নাম সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। ইনি এক্ষণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত। এতদ্ভিন্ন ইনি বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্য করী সভার সদস্য এবং ভাষা তত্ত্ব সমিতির সহযোগী সম্পাদক গভর্ণমেন্ট ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি ভূষিত করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভারতবর্ষে সিংহল ও ইয়ুরোপের বহু বিদ্বৎ সমিতির সদস্য। ইঁহার রচিত ও সম্পাদিত সংস্কৃত পালি বাঙ্গালা, ইংরাজি ও তিব্বতীয়ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রসিদ্ধ, এতদ্ভিন্ন ইনি Bible Indica series, এর অন্যতম সম্পাদক এবং তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে জৈন ন্যায় সম্বন্ধে মৌলিক অত্যুৎকৃষ্ট এক ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তজ্জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার PH.D. (Doctor of philosophy) উপাধি প্রদান

করিয়াছেন। লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থ, "ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য", "আত্মতত্ত্ব প্রকাশ", "বুদ্ধদেব" প্রভৃতি।

জন্ম ১৭৮৪ শক নিবাস নবদ্বীপে। ইনি একজন সুপণ্ডিত ও সুলেখক বলিয়া খ্যাত। দর্শন জ্যোতিষ, বেদ অলঙ্কার কাব্য সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতা দেখা যায়,

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষমূলার ইঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে স্বহস্তে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া তাঁহার যশোগান করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি কলিকাতা রাজকীয় বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক, তাঁহার লিখিত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ বহু মাসিক পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। লিখিত গ্রন্থ সংস্কৃত পরিচয়, নীতি সন্দর্ভ। বাঙ্গালা পুস্তক চারু সন্দর্ভ, দক্ষিণাপথ ভ্রমণ, রচনা-সোপান, শঙ্করাচার্য্য চরিত, রামানুজ চরিত। সম্পাদিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, স্বর্ণপ্রভা, করুণা পুণ্ডরিক, মধ্যমিকা বৃত্তি।

জন্ম ১২৭৬। নিবাস খাঁটুরা গ্রাম। ইনি প্রাতঃস্মরণীয়, বরেণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। দক্ষতার সহিত স্বনাম খ্যাত সাহিত্যপত্র সম্পাদন করিয়া ইনি সুলেখক বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। ১৪। ১৫ বৎসর বয়ক্রম কালেই ইনি

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

"পতাকা," "সমাচার চন্দ্রিকা," প্রভৃতিতে প্রবন্ধ লিখিতেন। পরে ১২৯২ সালে "সুরভি ও পতাকায়" নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন, এই কালে "কপিপুরাণ" বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত করেন। পরে ইঁহার লিখিত কয়েকটী ক্ষুদ্র গল্প "সাজি" নামে প্রকাশিত হয়। ইনি যেমন সুলেখক, তেমনি সদ্বক্তা ও মিষ্টভাষী মাসিক সাহিত্য সমালোচনায় তাঁহার স্পষ্টবাদিতার পরিচয় পরিস্ফুট। এক্ষণে তিনি "বসুমতী" নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক।

জন্ম ১২৬৭ সাল। পিতা হলধর সেন, জাতি কায়স্থ, নিবাস কুমারখালি। বাল্যাবধি বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতি ইনি অনুরাগী। "সোমপ্রকাশ" ও "গ্রামবার্ত্তার"

শ্রীজলধর সেন

ইনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে কিছুদিন গ্রামবার্ত্তার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে, স্ত্রী, কন্যা, মাতাকে হারাইয়া ইনি লোটা ও কম্বল সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশভ্রমণে বাহির হয়েন, তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষায় সুলিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত সকল লাভ হইয়াছে। ইনি বহুদিন দক্ষতার সহিত "বসুমতী" ও "হিতবাদী" পত্রদ্বয়ের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এক্ষণে "সুলভ সমাচারের" সম্পাদক পদে নিযুক্ত আছেন। লিখিত পুস্তক—"হিমালয়," "নৈবেদ্য," "প্রবাসচিত্র," "পথিক," "ছোট কাকী," "নূতন গিন্নি," "বিশুদাদা" প্রভৃতি।

নিবাস মেহেরপুর। জাতি তিলি। বাঙ্গালা ভাষার একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক। সমাজচিত্র ও পল্লীচিত্র লিখিতে বিশেষ নিপুণ। বহুদিন "বসুমতী" পত্রিকার সম্পাদক

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

ছিলেন। এক্ষণে স্বগ্রামে বসিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন। লিখিত পুস্তক "অজয়সিংহের কুঠী", "পল্লীচিত্র", "পল্লীবৈচিত্র", "নন্দনে

নরক", "সর্দ্দার অমৃতলাল", "জালামহান্ত", "বাসন্তী" "হামিদা", "পট", "পিশাচ পুরোহিত" ইত্যাদি।

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী — নিবাস শান্তিপুর। সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণের জন্য ইঁহার খ্যাতি। লিখিত পুস্তক "কাব্যদর্পণ", "সীতাহরণ", শৈবলিনী "রত্নযুগল" প্রভৃতি। ইঁহার উপযুক্ত পুত্র বেনোয়ারীলাল গোস্বামীও একজন সুলেখক বলিয়া খ্যাত। ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতে ইঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। লিখিত পুস্তক "খিচুড়ী"।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু — জন্ম ১২৪০। নিবাস উলা। চন্দ্রশেখর বাবু বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য, আরবী ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি সাধারণতঃ দার্শনিক লেখক বলিয়া খ্যাত। তিনি বহুদিন দ্বারবঙ্গাধিপতির সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের ম্যানেজারী অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া এক্ষণে উক্ত ষ্টেট হইতে মাসিক ৫০০ টাকা পেন্সন লইয়া পুত্রাদির সহিত কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্রগণও এক একটী রত্নবিশেষ। মধ্যম পুত্র রাজশেখর বসু মহাশয়ের যত্নেই সুবিখ্যাত Bengal chemical & pharmeceutical works বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। চন্দ্রবাবু যৌবনে ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন এক্ষণে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুর ন্যায় জীবন যাপন করেন। তাঁহার লিখিত সমুদয় পুস্তকই ধর্ম্মক্রিয়া ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক। লিখিত পুস্তক "অধিকার-তত্ত্ব", "বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি", "বেদান্ত-প্রবেশ", "সৃষ্টি", "বেদান্তদর্শন", "প্রচারতত্ত্ব," "পরলোকতত্ত্ব," "হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ" প্রভৃতি।

শ্রীজগদানন্দ রায় — জন্ম ১২৭৬ সাল; নিবাস কৃষ্ণনগর। পিতা অভয়ানন্দ রায়। ১৮৮৩ খ্রীঃ কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। সাময়িক সমস্ত পত্রিকায় ইনি প্রবন্ধ লেখেন; বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় ইঁহার দক্ষতা অসাধারণ।

শ্রীকেদারনাথ ভক্তি বিনোদ — ১৭৬০ শকে, উলা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম কৃতনিবাস স্বরূপগঞ্জ। কেদারবাবু যৌবনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। চাকরীতে থাকিতে থাকিতেই ভগবৎ-প্রেমে রতি হওয়ায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমার্গ গ্রহণ করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সম্প্রতি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মায়াপুরকে শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি বলিয়া যাঁহারা মত প্রচার করেন কেদার বাবু তাঁহাদের অগ্রণী। তিনি একজন ভাবুক লেখক। লিখিত পুস্তক—"শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত" "জীবধর্ম্ম" "প্রেমপ্রদীপ" "বিজনগ্রাম" "সন্ন্যাসী"। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী, উর্দ্দু, সংস্কৃত প্রভৃতিতে তাঁহার বহু পুস্তক দৃষ্ট হয়, যথা—ইংরাজী, Pourade, The Muts of Orrissa, Our wants, The Bhagabat speech, Gautam speech; উর্দ্দু—"বালিদে রেজিষ্ট্রী"; সংস্কৃত—"শ্রীকৃষ্ণসংহিতা" "শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গলস্তোত্র", "দত্ত কৌস্তুভ," আম্নার সূত্র প্রভৃতি কেদার বাবুর ৪র্থ পুত্র শ্রীবিমলাপ্রসাদ ভক্তি সিদ্ধান্তও একজন সুলেখক। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ, লিখিত পুস্তক—"সূর্য্যসিদ্ধান্তর অনুবাদ", "শ্রীভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি গোলাধ্যায়ের অনুবাদ",

"ঐ গ্রহগণিতাধ্যায়ের বিবৃতি", "আর্য্যভট্টের আর্য্যসিদ্ধান্ত", "পাশ্চাত্যগণিত রবিচন্দ্র স্পষ্ট সাধন প্রণালী", "ভৌমসিদ্ধান্ত", "দিনকৌমুদী", "লঘুজাতক" "লঘুপরাশরী" টীকা প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত "বৃহস্পতি", "জ্যোতির্বিদ্" প্রভৃতি সম্পাদন করিতেছেন। ইনি আকুমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক মায়াপুরে স্বধামে পুণ্যজীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি

কৃত নিবাস শান্তিপুর, পূর্ব্বনিবাস ধর্ম্মদা। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাতঃ কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। লিখিত পুস্তক—"সম্বন্ধনির্ণয়", "কাব্যনির্ণয়", "আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা," প্রভৃতি। ইনি বর্ত্তমানকালে একজন তত্ত্বদর্শী ভাবুক লেখক বলিয়া খ্যাত। "সম্বন্ধ-নির্ণয়" পুস্তকে গ্রন্থকারের প্রচুর গবেষণার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

জন্ম ১২৬৬ সাল। নিবাস কুমারখালি। সর্ব্ববিষয় লিখনে সুপটু। "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রে ইঁহার নানাবিধ চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রায়ই বাহির হয়। লিখিত গ্রন্থ "তন্ত্রতত্ত্ব", "শৈবী গীতাবলী" প্রভৃতি। তন্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

নিবাস চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থানার অন্তর্গত অনন্তপুর গ্রামে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশ সিদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিত বংশ বলিয়া খ্যাত। দার্শনিক ঔপন্যাসিক বলিয়া ইনি সাধারণতঃ পরিচিত। দামোদর বাবুর ন্যায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও বঙ্গভাষায় রাশিকৃত পুস্তক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার গ্রামের প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎ। তিনি যেমন বিদ্বান, তেমনি বিনয়, মিষ্টভাষী ও সজ্জনসেবী বলিয়া খ্যাত। লিখিত পুস্তক—"পুরোহিতদর্পণ", "ভিখারিণী", "হেমচন্দ্র", "ছিন্নমস্তা", "ভবানী-পাঠক", "যোগরাণী", "জাহানারা", "সোনার রুক্মী", "দীক্ষা ও সাধনা", "ভবানীর মঠ", "জন্মান্তর রহস্য", "ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা", "দেবতা ও আরাধনা", "রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব", "লুকোচুরী", "পথের আলো", সোণার পারিজাত", "লাল-পল্টন", "মিলনমন্দির". 'ফুলওয়ালী" প্রভৃতি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

নিবাস ভাজনঘাট। ইনি একদিকে এল, এম, এস, ডাক্তার অপরদিকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে কবিরাজ। ব্যবসায়ের সুখ্যাতির সহিত সুলেখক বলিয়া ইহার খুব খ্যাতি আছে। লিখিত পুস্তক "স্নেহময়ী" ইত্যাদি।

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র

নিবাস উলা। ইনি একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের "বীরঙ্গনার পত্রোত্তর কাব্য" লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এতদ্ব্যতীত "নরসিংহ", "কলিনা", "পার্ব্বতী" প্রভৃতি বহু বাঙ্গলা পুস্তক ও কয়েকখানি ইংরাজি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহার জীবি।

"ভূতের খেলা", "স্বদেশরেণু" প্রভৃতি লেখক বাগাঁচড়া নিবাসী সুলেখক ও সুকবি শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"নবদ্বীপ-মহিমা" লেখক নবদ্বীপ নিবাসী—শ্রীকান্তিচন্দ্র রাঢ়ী। "প্রসাদী", "ঝরাফুল", প্রভৃতি গীতিকাব্য প্রণেতা শান্তিপুর নিবাসী—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। "অদ্ভুত-রামায়ন" লেখক কুড়ুল নিবাসী—রায় রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর। "ধাত্রী-শিক্ষা" প্রণেতা হরিপুর নিবাসী—শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, বি। "বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু" প্রণেতা হরধাম নিবাসী শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ। বিখ্যাত পাঁচালিকার ব্রহ্মশাসন নিবাসী—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপুর নিবাসী—শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, শ্রীকালাচাঁদ দালাল, শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত।

এই সকল গ্রন্থকারগণ ব্যতীত আরও অসংখ্য সাহিত্যসেবী নদীয়ায় বিদ্যমান আছেন। তন্মধ্যে মুসলমান গ্রন্থকারগণের প্রধান কয়েকজনের বিষয় এই পুস্তকের "নদীয়ায় ধর্ম্মচর্চ্চা" শীর্ষক অধ্যায়ের "মুসলমান" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

নদীয়ার স্বর্গগত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, গঙ্গাধর আচার্য্য, মৃত্যুঞ্জয় রায় প্রভৃতি মনিষীগণের নাম উল্লেখ যোগ্য।

ভারতের এই দুইটী উপযুক্ত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া নদীয়ায় গৌরবান্বিত হইয়াছে। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের নিবাস বিক্রমপুর। ইঁহাদের পিতা রামলোচন

শ্রীমনমোহন,
লালমোহন ঘোষ

ঘোষ তদানীন্তন "সদরআলা" পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তদুপলক্ষে বহু স্থানে চাকুরী করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণনগরে স্থায়ী বাস বাটী নির্ম্মাণ করেন, এবং এখানেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। রামলোচন বাবু তদানীন্তন সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তাঁহার প্রথম পুত্র মনমোহন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মাঘ ঢাকা "বয়রা গাড়ীতে" জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার অপর দুই পুত্র সুবিখ্যাত লালমোহন (১৮৪৯ খ্রীঃ) ও মুরলীমোহন কৃষ্ণনগরের বাটীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মনমোহনের ও লালমোহনের বাল্যশিক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজ স্কুলেই সমাহিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীর গৌরবমণি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও মনমোহন এক সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন, এবং পরিশেষে একজন প্রথম সিভিলিয়ান ও একজন প্রথম ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। যদিও জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি একদিনও স্বদেশ আসিয়া এই পথ অবলম্বন করেন নাই, সুতরাং, মনমোহনকেই এতদ্দেশীয় আদালতে বাঙ্গালীর প্রথম ব্যারিষ্টার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (নবেম্বর ১৮৬৬ খ্রীঃ) তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আপনার অনন্য সাধারণ গুণে একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার হইয়া উঠেন।—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লালমোহনকে ব্যারিষ্টারি শিক্ষার জন্য বিলাত প্রেরণ করেন। ইনিও আপনার অগ্রজের ন্যায় আপনার অসাধারণ মেধা বলে শীঘ্রই সমস্ত পরীক্ষা

উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং অল্প কালের মধ্যেই স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতায় ও বাগ্মীতা প্রভাবে দেশপূজ্য হইয়া উঠেন। তাঁহার ন্যায় বাগ্মী আজ পর্য্যন্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। সাহিত্য জগতেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" কাব্যের ইংরাজী অনুবাদে তাঁহার কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিলাতে পার্লিয়ামেন্টে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দুই ভ্রাতার আন্তরিক যত্নে ও চেষ্টায় ভারতের ন্যাসন্যাল কংগ্রেস্ আজি সাফল্য লাভ করিয়াছে। মনমোহন নদীয়ায় নীল হাঙ্গামা কালে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রজার পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং "হরিশের" অকাল মৃত্যুতে হিন্দু পেট্রিয়টের অবস্থাহানি ঘটিলে মনমোহনই প্রথমে পাক্ষিক "ইণ্ডিয়ান মিরর" বাহির করেন (১৮৬১ খ্রীঃ) পরে মাননীয় নরেন্দ্র নাথ সেনের হস্তে ইহা দৈনিক রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মনমোহন তাঁহার উপযুক্ত পুত্র মহীমোহনকে ১৩ বৎসর বয়সে বিলাত লইয়া যান। ইনি এক্ষণে সিভিলিয়ান। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মনমোহন ঘোষ ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লাল মোহন পরলোক গমন করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ৺গঙ্গাধর আচার্য্য মহাশয় অন্যতম। ইনি ইংরাজী ১৮৩০ সালের ১লা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন, এবং কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নানাস্থানে কার্য্য করার পর মেদিনীপুর কলেজের প্রিন্সিপাল হন। গঙ্গাধর বাবু সঞ্চিত বিত্তের অর্দ্ধাংশ প্রায় পনর হাজার টাকা গরীব দুঃখীর জন্য দান করিয়া গিয়াছেন; উহার সুদ হইতে যাহা আয় হয়, উহা প্রতিমাসে গরীব ছাত্র ও অনাথা বিধবাদিগকে দান করা হয়। ইনি ইংরাজী ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গঙ্গাধর আচার্য্য

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাশয়গণ সবিশেষ প্রসিদ্ধ—

কৃষ্ণনগর বাসী সুবিখ্যাত বিদ্বান শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত যিনি "দি উমেশ চন্দ্র দত্ত" নামে খ্যাত; বার্গাচড়া নিবাসী মুঙ্গের কলেজের প্রিন্সিপাল বৈদ্যনাথ বসু; কুমারখালি নিবাসী সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীহেরম্ব চন্দ্র মৈত্র; ভাজনঘাট নিবাসী শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী ও তদীয় ভ্রাতাগণ, সুবিখ্যাত বেঙ্গল কেমিকাল ও ফার্ম্মেসিউটিকাল ওয়ার্কসের সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীরাজশেখর বসু, রায়চাঁদ স্কলার শান্তিপুর নিবাসী শ্রীফণীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি। জয়দিয়া (বর্ত্তমান যশোহর) নিবাসী সুবিখ্যাত শ্রীনীলাম্বর ও ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতাদ্বয় বিলাত প্রত্যাগতগণের মধ্যে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের স্কুল ইনস্পেক্টর জয়দিয়া নিবাসী মিঃ পি, মুখার্জ্জি, শান্তিপুর নিবাসী সিভিলিয়ন মিঃ অতুলচন্দ্র চাটার্জ্জী ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীচারুচন্দ্র চাটার্জ্জী কৃষ্ণনগর নিবাসী সিভিলিয়ান ব্যারিষ্টার মিঃ মহীমোহন ঘোষ, সিভিলিয়ান মিঃ জ্যোৎস্নাকুমার ঘোষাল, আড়বন্দীগ্রাম নিবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ এস, সি, ব্যানার্জ্জী,

কৃষ্ণনগর নিবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ বি, কে, লাহিড়ী, শান্তিপুর নিবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ সতীশচন্দ্র বাগচী, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার-স্বর্ণপুর নিবাসী ডাক্তার এম্, এন্, ব্যানার্জ্জী, দেবগ্রাম নিবাসী ডাক্তার ইউ, এন, ব্যানার্জ্জী, ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও তৎপুত্র সুবিখ্যাত ডাক্তার জে, এন্, মজুমদার, মহেশগঞ্জ নিবাসী মিঃ বি, পালচৌধুরী প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ যোগ্য, এতদ্ব্যতীত নদীয়ার প্রতি গ্রামেই বহুতর জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তি আছেন।

---

১ গৌড়েশ্বর নসরত খাঁ মহাভারত অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

২ "বিধুব নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চ বাণ।
নবহু নবহু রস ইহ পরিমাণ" ॥

৩ "জনম দাতা মোর গণপতি ঠাকুর
মৈথিলি দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধীপ শিব সিংহ ভূপ
কৃপাকরি লেউ নিজ পাশ" ॥

৪ ন্যায় শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক মহর্ষি গৌতম, উতথ্যের পুত্র ও অঙ্গিরার পৌত্র। ইঁহার নামান্তর—দীর্ঘতমাঃ এবং অক্ষপাদ। পিতৃব্য বৃহস্পতির শাপে ইনি জন্মান্ধ হন, তাই নাম হয় "দীর্ঘতমাঃ"। পরে যোগবলে স্বীয় পদে চক্ষুঃ উন্মীলিত করেন, তজ্জন্য নাম হয় "অক্ষপাদ"। অনেকে এরূপও বলেন যে স্বীয় শিষ্য বেদব্যাস তদীয় বেদান্ত সূত্রে ন্যায়মত খণ্ডনের চেষ্টা করিলে, বৃদ্ধ মহর্ষি গৌতম এ চক্ষুতে আর ব্যাসের মুখাবলোকন করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। পরে ব্যাস কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে সংপূজিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ স্বাভাবিক নয়নে তাঁহার মুখদর্শন না করিয়া স্বীয় পদে চক্ষুঃ সৃজন করেন।

৫ কাহারও কাহারও মতে পক্ষধর মিশ্র বাসুদেবের সহাধ্যায়ী, কোনও সময়ে পক্ষধরের নিকট তর্কে পরাজিত হইলে বাসুদেব প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহার কোনও শিষ্য দ্বারা তিনি পক্ষধরের দর্প চূর্ণ করিবেন, পরে সেই জন্য রঘুনাথকে মিথিলায় প্রেরণ করেন।

৬ Vide L. 2854. Rajendra Lal Mitras Notice's of Sanskrit Mrs. vols, I—IX, Sastri X—XI.

৭ কেহ কেহ বলেন যে তিনি আজন্ম এক চক্ষু ছিলেন না, কোনও এক সপ্তমী নিশিতে আকাশের দিকে চাহিয়া যখন একাগ্রমনে শাস্ত্রচিন্তা করিতেছিলেন, তখন একটা পতঙ্গ তাঁহার একটী চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই তাঁহার সেই চক্ষুটী নষ্ট হইয়া যায়। সপ্তমী রাত্রিতে পাঠ একে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহাতে রঘুনাথের এই দৈব বিড়ম্বনায় নৈয়ায়িকগণ সপ্তমী রাত্রিতে একেবারেই শাস্ত্র-চর্চ্চা করেন না।

৮ কেহ কেহ বলেন যে রঘুনাথের পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ ইহার রচিত পুস্তক "গুণশিরোমণি প্রকাশ"। Vide Catalongramme by Aufresht.

৯ এই চতুষ্পাঠী গৃহ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"It was built for him by a Hindu gentleman of Lucknow and is really an elegant buildig, occupyinng about half an acre of land. The quadrangle inside, is about 30 yds square and contains 30 rooms for the students. The rooms are generally about 9 feet long and 8 wide, with a window and a door; The corner rooms are rather longer. More than half of one side is given up to lecture-hall. This stands on a platform raised sone five feet from the ground, it has two apartments, each about 33 feet in length, the outer is ten and the inner 12 feet wide, and the front is supported by 6 pillars, which produce a very good effect." এই টোল নবদ্বীপে সাধারণতঃ পাক টোল খ্যাত এবং ইহাই বুনো রামনাথের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

১০ মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়,—কুসুমাঞ্জলী ও গৌতম সূত্রের পদার্থ খণ্ডনের টীকাকার রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রপৌত্র, ইঁহার পিতা স্বর্গীয় গোপিনাথ ন্যায় পঞ্চানন একজন ঋষি-কল্প পণ্ডিত ছিলেন। ১৭৭৫ শকাব্দে ২৯ পৌষ ইনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে স্বীয় পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন; শৈশবেই ইঁহার প্রতিভা দর্শনে ভবিষ্যতে ইনি যে একজন মহাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইবেন তাহা সকলেই অনুমান করেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট ইনি ন্যায়ের পাঠ সমাধা করেন এবং তাঁহার পরলোক হইলে ১২৭১ সালে ইনি স্বীয় অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনারম্ভ করেন। তাঁহার তুল্য অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত এখনকার দিন দেখা যায় না। ইনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছেন।

১১ মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়,—১৭৬৩ শকাব্দে আশ্বিন শুক্ল ষষ্ঠী তিথিতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামমোহন ও পিতামহ যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা দুই সহোদর অপর মহেন্দ্রনাথ ভাগলপুরের গবর্ণমেন্ট প্লীডার ছিলেন। যদুনাথ নবদ্বীপস্থ "পাকাটোলে" পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রমে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হয়েন এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। পরে ভুবনমোহণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে তদীয় ১০০ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন ও গবর্ণমেন্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ভূষিত হইয়াছেন। ইনি এক দিকে যেমন সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ তেমনি বিণয়ী, আত্মতত্ত্ব-বিবেক বা বৌদ্ধাধিকার গ্রন্থের টীকা করিয়া মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন।

১২ "মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী॥"
পরাশর ব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥"
—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

১৩ "নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা।"
—জ্যোতিষতত্ত্বে রবি-সংক্রান্তি গণনা।

অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাঙ্কে পূরণ করিবে। তাঁহার কৃত জ্যোতিষতত্ত্ব সঙ্কলনের কাল এইরূপ লিখিত হইল। উক্ত গ্রন্থখানি তাঁহার শেষ বয়সের রচনা বলিয়া গ্রাহ্য করিলে ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব কাল কল্পনা করিতে হয়। অতএব শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণ কালের প্রায় ১৫।২০ বৎসর পরে তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়।

১৪ নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। এক গঙ্গাঘাটে লক্ষলোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ॥

১৫ সদাশয় ইংরাজরাজ এদেশ অধিকার করিয়া যখন আইন কানুন প্রণয়ণ করিতে আরম্ভ করেন তখন হিন্দুগণের আচার ব্যবহার অব্যাহত রাখিতে তাঁহাদেরই দেশ প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের শাসন-বিধি প্রণয়নে যত্নবান হয়েন এবং সেই জন্য লর্ড-হেষ্টিংস্ সাহেব কর্তৃক বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে একাদশ জন শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক এক মহাগ্রন্থ প্রণীত হয়। এই একাদশ জন পণ্ডিতের মধ্যে নবদ্বীপ বাসী রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার ও বীরেশ্বর পঞ্চানন এই দুই জনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র ব্যবহার শাস্ত্রের মধ্যে এরূপ মূল্যবান গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই তখন ইংরাজি ও সংস্কৃত উভয় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব বশতঃ উহা প্রথমে পারসিয়ান ভাষায় অনুদিত হয়, পরে মিঃ হালহেড কর্তৃক ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া Code of Gentoo Law নামে ইংলণ্ডে ছাপা ও প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকে ১১ জন পণ্ডিতের এইরূপ নাম দেওয়া আছে,—

১। বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

২। কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত।	৭। গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত।
৩। রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার।	৮। কৃষ্ণকিশোর তর্কালঙ্কার।
৪। কৃষ্ণজীবন ন্যায়লঙ্কার।	৯। কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ।
৫। বীরেশ্বর পঞ্চানন।	১০। কৃষ্ণকিশোর তর্কালঙ্কার।
৬। কৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম।	১১। সীতারাম ভাট।

ইঁহারা সকলেই গবর্ণমেন্ট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কেবল মাত্র বীরেশ্বর পঞ্চাননের সনন্দ খানি তদীয় বংশধরগণের নিকটেই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

১৬ শ্রীহরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়—১২৫৬ সনে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার শাঁকরাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; এক্ষণে নবদ্বীপে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়া এই খানেই বাস করিতেছেন। ইনি স্বীয় পিতৃদেব হরমোহন চক্রবর্ত্তীর নিকট ব্যাকরণ

পাঠ করিয়া পরে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট অশেষ শাস্ত্র-অধ্যয়ন পূর্ব্বক নবদ্বীপস্থ স্বর্গীয় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট যথাক্রমে স্মৃতি ও ন্যায় পাঠ করিয়া স্বগ্রামে ১৬ বৎসর অধ্যাপনা করেন, পরে মূলাজোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়া নবদ্বীপে গবর্ণমেন্টের স্মৃতির পদ খালী হওয়ায় ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া নবদ্বীপ আগমন করেন এবং তত্রস্থ প্রধান পরম পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের স্থলে বর্ত্তমাণ স্মৃতির প্রাধান্য পদ লাভ করিয়াছেন।

১৭ কবিবর শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন কবিরঞ্জন ১৭৬১ সালে সাধকপ্রবর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিশের পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শৈশব হইতেই কাব্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিকট ইঁহার কাব্য ও অলঙ্কার এবং কবি মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের নিকট সর্ব্ব বিষয় শিক্ষা সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয়। এই সময় রাজপুরের শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার দিনাজপুরের মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ও পাবনার যদুনাথ ন্যায়রত্ন এই তিন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও কবি নদীয়ায় অধ্যয়নার্থ আগমন করেন। তাঁহাদের সাহার্য্যে অজিতনাথের কবিত্ব শক্তি দিন দিন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। দ্ব্যর্থবাচক ও শ্লেষাত্মক কবিতারচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত। তাঁহার কৃত এইরূপ অসংখ্য কবিতা অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। তৎকৃত মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে খণ্ড ব্যাকরণ নাট্য-পরিশিষ্ট গ্রন্থের টীকা, কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পাদিত বিশ্ব-দূত নামক সাপ্তাহিক পত্র উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নিকট সাহিত্য পাঠ করিয়া অসংখ্য ছাত্র গবর্ণমেন্টের নিকট পুরস্কার লাভ করিয়াছেন; ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘ-জীবি করুন নতুবা তাঁহার বিহনে নবদ্বীপের বর্ত্তমান যশঃভাতি নিতান্তই ম্লান হইয়া যাইবে।

১৮ মহারাজ গিরিশচন্দ্রের রাজ্যকাল হইতে মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের সময়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত রামজয়শিরোমণি জ্যোতির্ব্বিৎ সভাপণ্ডিত ছিলেন।

১৯ মৌদ্গল্যবংশে গ্রহভূসুরাণাং, সুধীঃ স আসীৎ কমলাকরাখ্যঃ।
বিবোধকো যঃ খিল বাঙ ময়ানাং ভাস্বান্ যথা পঙ্কজ-কোরকাণাম্॥
—(গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা)

২০ বিদ্যাসাগরসংজ্ঞয়া স্ববিষয়ে খ্যাতিং পরাং প্রাপ্তবান্
যোঽয়ং রাজীবলোচনঃ কৃতধিয়াং সংখ্যাবতামগ্রণীঃ।
যঃ খ্যাতো গণিতাগমেষু সততং বিদ্যার্থিভিঃ সেবিতঃ
তস্যানন্তযশঃ সমস্তবিবুধৈরদ্যাপি সংকীর্ত্ত্যতে॥
—(গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা)

২১ যশোহরাখ্যে রমণীয় ক্ষেত্রে বঙ্গীয়ভাগে সুবিশালদেশে।
লতাবিতানৈঃ পরিশোভমানে আসিন্নিবাসো মহনীয়কীর্ত্তেঃ॥ ১॥
সুবুদ্ধি-সংজ্ঞস্য সুধীবরস্য, কার্ত্তান্তিকস্যাত্র যশোহন্বিতস্য।
চতুঃপলাশীতি ররাজ গ্রামঃ চিত্রাকুমারোর্ম্মি-বিধৌত-পাদঃ॥ ২॥

সংসারাবর্ত্তবেগৈর্ব্যথিতহৃদয়যুক্ ভাবনা-ভাবিতাত্মা
বিত্তানাং লাভকামঃ প্রথিত-জনপদে পুণ্যপূত-প্রদেশে।
দাক্ষিণ্যাদ্দীপ্তনামা বিপুলবিভববান্ শ্রীভবানন্দসঞ্জ্ঞঃ
লেভে স কাশ্যপেয় স্ত্রিভুবনবিদিতং তং হি যোঽভূচ্ছরণ্যঃ ॥ ৩ ॥

—(গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা)

তৃতীয় শ্লোকটি ব্যাকরণাশুদ্ধি-দোশে দূষিত। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকায় লিপিকর-প্রমাদবশতঃ বোধ হয় ঐরূপ লিখিত হইয়াছে। আমরা আর উহার কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না। ঐ কুলপঞ্জিকায় আরও অনেক শ্লোকে ঐতিহাসিক কথা দৃষ্ট হয়।

২২ Rockhill's Life of Buddha. Page 227.

২৩ কথিত আছে এই সিদ্ধপুরুষের নামে বৃহচ্ছ বা বৃহদ্রথ এবং শিষ্যটী সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতামহ নরহরি, ইনি যৌবনে মূর্খ ছিলেন পরে গুরুর কৃপায় মহাপণ্ডিত ও সাধক হয়েন; তদানীন্তন নবদ্বীপের অন্তর্গত চীনেডাঙ্গা নামক স্থানে তাঁহার আবাস ছিল। বৃহচ্ছ্রবার আগ্রহে দেবী জগন্মাতা প্রত্যহ নবদ্বীপে দুইখণ্ড কাল আবির্ভূত হইবেন স্বীকার করেন।

২৪ মৎস্য, মদ্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রা।

২৫ Vide Hunter's Statistical Account Vol, II. Page 156.

২৬ "It is a common remark that science and literature are in a progressive state of decay among the natives of india. From every enquiry which I have been able to make in this interesting subject, that remarko appears to me but too well-founded. The number of the learned is not only diminished but the circle of learning even amongst those who still devote themselves to it, appears to be considerably contracted. The abstract sciences are abandoned, polite lit erature neglected, and on branch of learning cultivated, but what is connected with the peculiar religious doctrines of the people. The ismmediate cousence of this state of things is the disuse and even actual loss of many books, and it is apprehended, that unless Government interpose with fostering dand, the revival of letters may shortly become hopeless from want of books or of persons capable of explaining them". সুতরাং তিনি প্রস্তাব করেন "I would accordingly recommend that in addition to the Coll ge of Beneras (no be subjected, of course, to the reform already noticed) colleges be established at Nadiya and Tirhoot.—Vide LORD MINTO'S

MINUTE, DATED FORT WILLIAM, the 6th March, 1811. as in Rev. J. Long's selection from unpub. Gov. Records, Appendix D—page, 554.

কিরূপ ব্যয়ে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত ও কি ভাবে ইহা চালিত হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিপিবদ্ধ করেন।

2 Pandits at Rs. 100 each	2400 Rs.
12 Pandits at Rs. 60 each	7200 Rs.
	9600 Rs.

Library.

The librarian to be one of the Pandits receiving pensions.

	Rs. 20.240 Rs.
2 Duftaries at Rs. 4	96 Rs.
Paper, ink etc at Rs.	40 Rs.
Purchase of copying books	1000 Rs.
	1,376 Rs.

Annual Prizes.

For the best scholar	800 Rs.
For the next	400 Rs.
For the 3rd	200 Rs.
For the 4th	100 Rs.
For other good scholars an honarary dress to each (consisting of a cloth of little value)	200 Rs.
	1700

Besides a substantial building to be erected.

২৭ Vide Hunter's Statistical Account of Nadiya. P. III.

২৮ এই উপলক্ষে নদীয়ায় পণ্ডিতমণ্ডলী সদাশয় উডবরণ সাহেবকে "ন্যায়নিধি" উপাধি ভূষিত করেন।

২৯ Hedge's Diary Oct. 15th, 1682—"Being Sunday, we dined ashore at Fulia under a great shady tree near Santipur where all our Saltpetre boats are ordered to stop".

এই গ্রন্থ রচনাকালে আমি আমার শ্রদ্ধাস্পদবন্ধু "মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনী" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং বহুভাষাবিৎ ও প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত শ্রীযুত অমূল্যচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয়ের সহিত কৃত্তিবাস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনুসন্ধানের নিমিত্ত ফুলিয়ায় যাইয়া তথাকার কতিপয় অতি বৃদ্ধের নিকট সন্ধান করিয়া জানিতে পারি যে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় যখন রাণাঘাটে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তৎকালে বহু অনুসন্ধানে কৃত্তিবাসের এক দোলমঞ্চ আবিষ্কার করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি সাধারণের অর্থে ক্রয় করিয়াছিলেন; এবং একটী পাকা ইন্দারা খনন করিয়াছিলেন; উহা অর্দ্ধসমাপ্তভাবে এখন পড়িয়া রহিয়াছে। ইহারই কিয়দ্দূরে একজন বৈষ্ণব, যবন হরিদাস ঠাকুরের পাঠ আবিষ্কার পূর্ব্বক একটী কুঠারি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন।

হরিদাসের সমাধি যেখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই উত্তর সীমায় গ্রামবাসীরা কৃত্তিবাসের ভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দোলমঞ্চসম্বন্ধে দেখা যায় যে বহু প্রাচীনেরাও উক্ত স্থানটী কখন কর্ষিত হইতে দেখেন নাই এবং একটী ক্ষুদ্রমৃত্তিকা স্তূপ অদ্যাপি এস্থলে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান কালে (১৯১২ খ্রীঃ) ঐ দোলমঞ্চের ধ্বংশের উপর একটী কোনও স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য রাণাঘাটের মহকুমার বিগত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায় চৌধুরী ও অন্যস্থ কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির চেষ্টায় ও যত্নে "কৃত্তিবাস স্মৃতিভাণ্ডার" নামে একটী সমিতি হইয়াছে, রাণাঘাটের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট, সুপ্রসিদ্ধ নলডাঙ্গা রাজ পরিবারের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব রায় মহাশয়েরও এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন আছে তাই আশা হয় তাঁহাদের যত্নে শীঘ্রই একটী স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ ঐ স্থানে স্থাপিত হইবে।

৩০ জগদানন্দ দাস, প্রেমদাস, ছোট হরিদাস, বল্লভ দাস, বংশীবদন দাস, মাধব দাস, গঙ্গাধর দাস, বৃন্দাবন দাস, রামচন্দ্র দাস গোস্বামী, হরিবল্লভ দাস, মুরারী গুপ্ত, যদুনাথ দাস, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি অসংখ্য বিখ্যাত পদকর্ত্তার জন্মভূমি নদীয়ায়। আবার যাঁহাদের জন্ম নবদ্বীপে নয়, অথচ শ্রীচৈতন্যের প্রেমে বদ্ধ হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন. তাঁহাদের সংখ্যাও অত্যধিক, বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের প্রায় সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত।

৩১ যদিও চুপী গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বটে, কিন্তু উহা নবদ্বীপ গ্রামের নিতান্ত সন্নিহিত হওয়ায় অক্ষয়কুমারের জীবনের উপর নদীয়ার প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৩২ লক্ষণ সেন সম্বৎ যে অদ্যাপি টিরহুটে প্রচলিত আছে, এ বিষয় তিনিই আবিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ H. Beveridge সাহেব 1888 সনের জুলাই মাসের Calcutta Review পত্রে ৭৪ পাতে এইরূপ লিখিয়াছেন।

"It is pleasant to be able to record that the natives of India no longer neglects the study of history. The venerable Dr. Rajendra lal Mitra has devoted a lifetime to historical and Philological inquiries ana it was another Bengali, Babu Raj Krishna Mukherjee who discovered that the Lachman Sen Era is still current in Tirhoot."

নদীয়ায় ধর্ম্মচর্চ্চা

ক্রম বিকাশ

একদিকে বাণীর কৃপায় নদীয়ার নাম যেমন চিরউজ্জ্বল, তেমনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীআগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি দেব প্রকৃতি মহাত্মা গণের নিমিত্ত নদীয়ার খ্যাতি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। সমগ্র নদীয়ায় যত সংখ্যক শ্রীপাঠ বা বিখ্যাত দেবস্থান মন্দির ও মসজিদাদি পরিদৃষ্ট হয় নিম্ন বঙ্গের অন্য কোনও জেলায় সেরূপ নাই; এখানে প্রায় প্রতি পল্লীতেই কোনও না কোনও মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার অনন্যসাধারণ চরিত্রবলে লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বা স্বীয় প্রতিভাবলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও নূতন মত গঠন করিয়া এক নব সম্প্রদায় সৃজন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের এদেশের কোনরূপ প্রামাণিক ইতিহাসাদি না থাকিলেও ইহা স্থির নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে যখন আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়ডঙ্কা নিনাদিত হইয়াছিল তখন নির্জীব বঙ্গদেশ কোন মতেই তাহার হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। পরন্তু মগধ রাজ্যের সন্নিহিত বলিয়া এখানে যে বৌদ্ধধর্ম্ম সুদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষণেও নদীয়ার বক্ষ হইতে উহার চিহ্ন এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন স্থান বর্ত্তমান রাণাঘাটের সন্নিহিত আড়ংঘাটা গ্রামের বাৎসরিক কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম গাজন, বঙ্গের সুবিখ্যাত পল্লী উলার (বীরনগর) চণ্ডীদেবীর পূর্ব্বকালীন পূজা-পদ্ধতি এবং নবদ্বীপ জহ্নু নগরের "গাছ-পূজা" যাহা কবি কঙ্কনে "ব্রাহ্মণী পূজা" বলিয়া উল্লিখিত আছে ও এবম্বিধ আরও বহু স্থানের অজ্ঞাত নামা দেবদেবীর সম্মান ও পূজা প্রণালী মনোযোগ দিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

হুয়েন্ত সাং খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। মুঙ্গীর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত নগর তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ৯৭টী সংঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন, তখন ঐ সংঘারাম সকলে ১১৫০ জন ভিক্ষু বাস করিতেন। দেবমন্দিরের সংখ্যা ছিল ৫৪২। প্রত্যেক ভিক্ষুর বাৎসরিক ব্যয়ভার অন্ততঃ এক শত গৃহস্থকে বহন করিতে হইত; সুতরাং তখন ঐ

সকল স্থানে ১১৫০,০০০ গৃহস্থ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। হুয়েন্তু সাং কেবল ৮টী কি ৯টী নগরের কথা লিখিয়া গিয়াছেন; উহাতেই বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সংখ্যা ১১৫০,০০০; সুতরাং সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমোন্নতির পথে নানা অন্তরায় উপস্থিত হয়। শশাঙ্ক নামে একজন প্রতাপশালী হিন্দু রাজা বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদকল্পে যত্নবান হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্ত নরপতিগণই মগধে রাজত্ব করিতেন। পরে নবম শতাব্দীতে পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। উঁহাদেরই রাজত্ব কালে হিন্দু কুল চূড়ামণি মহারাজা আদিশূর শ্রীহর্ষ-প্রমুখ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন এবং বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন। কিন্তু সহসা তিনি কালমুখে পতিত হওয়ায় তদ্বংশীয়গণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া মগদাধিপতি পাল রাজগণ গৌড়বঙ্গের অধীশ্বর হইয়া উঠেন, এবং নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ সুবর্ণবিহার নামক স্থানে নিম্ন বঙ্গের রাজধানী স্থাপনা করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন সেই কারণে তাঁহাদের রাজধানীর "সুবর্ণবিহার" এই নাম করণ করেন। এখানে অদ্যাপি তাঁহাদের প্রস্তরাদি নির্ম্মিত প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পাল রাজগণের রাজত্ব কালেই নদীয়ায় বহুল পরিমাণে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার কল্পনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ কিছু কাল রাজত্ব করিলে পর সেন বংশীয় হিন্দুরাজগণ পুনরায় মস্তকোত্তলন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দেশ হইতে আবার ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে লাগিল। শৈব ধর্ম্মালম্বী সেন রাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলেই পালবংশীয়গণের প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। দেশমধ্যে তখন হিন্দু ও বৌদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা উপস্থিত হইল। ভগবান শঙ্করাচার্য্য খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই ফলে উহা এতদিনে ক্রমে হীন হইতে হীন বল হইতেছিল এক্ষণে রাজশক্তির সাহায্য পাইয়া শৈবধর্ম্ম বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া পড়িল। এই সেন রাজগণের অন্যতম রাজা সামন্ত সেন বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাবাসের নিমিত্ত বর্ত্তমান নবদ্বীপের অনতিদূরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। সামন্ত সেনের প্রপৌত্র সুবিখ্যাত বল্লাল সেন এই নবদ্বীপ নগরীতেই তাঁহার অন্যতম রাজধানী স্থাপনা করেন। কথিত আছে এই নবদ্বীপের প্রাসাদে থাকিয়াই তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত সামাজিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গালার মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। হিন্দু পারিষদ, হিন্দুমন্ত্রী, হিন্দু কবি, হিন্দু দার্শনিকে রাজসভা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পৌত্তলিক হিন্দুপণ্ডিতগণ স্বধর্ম্মী রাজার শান্তিপূর্ণ কোমল আশ্রয়ে থাকিয়া নূতন নূতন ধর্ম্মমত সৃজনে মনোনিবেশ করিলেন। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সকলে মিলিয়া স্ব স্ব ইষ্ট দেবদেবীর উপাসনায় নিরত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের

মূলোৎপাটনে যত্নবান হইলেন। হিন্দু স্মৃতিকারগণ "নগ্না" (বৌদ্ধদয়া) দর্শনে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন, কাজেই তখন আশ্রয়হীন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিতাড়িত হইতে লাগিল। যে চিন্তাশীলতা দেশ হইতে বৌদ্ধের উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হইয়াছিল তাহাই এক্ষণে আবার বিষ্ণু, শিব ও শক্তি পূজার মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করিল। কেহ বিষ্ণুর পদাশ্রয় গ্রহণ করিল কেহ শিবকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিল কেহ বা শক্তি পূজায় নিরত হইল। শৈব রাজা লক্ষণ সেন শেষ বয়সে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের অমৃতময় "গীতগোবিন্দের" সৃষ্টি হইল। এইখানেই দেশে ভাবী দেশোন্মাদকর বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ নিহিত হইল। এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অচিরেই বৈষ্ণবধর্ম্মরূপী মহাপাদপের সৃজন করিতে পারিত কিন্তু এই সময়ে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজীত হওয়ায় নবাগত মুসলমানগণের অত্যাচারে হিন্দু মাত্রেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান, হিন্দুর শিক্ষা সমস্তই বিজেতা যবন ভূপতির নিকট অনাদৃত হইতে লাগিল; তখন লোকে জাতিধর্ম্ম লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। অপ্রতিহত প্রভাব সম্পন্ন দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণের সম্মুখে শাক্ত প্রভৃতি বৈষ্ণব ও শৈব অনেকটা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল। কেবলমাত্র বীরাচারী তান্ত্রিক গুরুগণ লোককে বামাচারী হইয়া শক্তির আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক অত্যাচারী মুসলমানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করণে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মাচরণের কঠোর বন্ধন শিথিল করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রের দোহাই দিয়া অবাধে দেশে সুরা ও ব্যভীচারের স্রোত প্রবাহিত হইল এবং কিছু দিনেই প্রলোভন পরিশূন্য ম্লানশক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক বাঙ্গালী নবাবিষ্কৃত পন্থায় গা ঢালিয়া দিল। অন্তঃসার শূন্য নরনারী তন্ত্রোক্ত সত্যধর্ম্ম ভুলিয়া বামাচারের কৃষ্ণ আবরণে কুকর্ম্মী ও কদাচারী হইয়া উঠিল। যুগধর্ম্মে জগন্মাতা ভগবতীর জগন্মঙ্গল আরাধনা ভুলিয়া লোকে পিশাচ হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, একত্র পান ভোজন আরম্ভ করিল। পৃথক পরিবারস্থ বিভিন্ন বর্ণাশ্রমী স্ত্রী পুরুষ একত্রে বসিয়া পঞ্চমকারের সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। বীরাচার, পশ্বাচার, ভৈরবীচক্র, পঞ্চতত্ত্ব সাধনায় লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সিদ্ধিলাভ করিতে যাইয়া মানুষ ইন্দ্রিয় সেবার দাস হইয়া পড়িল। লোক তন্ত্রের দোহাই দিয়া হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি নষ্ট করিল। স্ত্রীসংস্রবে লোকে পশ্বাচারী হইয়া উঠিল! অন্য কথা কি পূর্ব্বে যে দেশে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল তথায় জীবহিংসা এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত পরম ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইল। ধর্ম্মের নামে ধরিত্রী বক্ষে সহস্র ধারায় শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইল।

কেবলমাত্র কদর্থকৃত তন্ত্রই যে তাৎকালীন নদীয়ার এবং সমগ্র বঙ্গদেশের এইরূপ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতির জন্য প্রকৃষ্টরূপে দায়ী তাহা নহে তখনকার মুসলমান নরপতিগণের হিন্দুর প্রতি অমানুষিক বর্ব্বরোচিত অত্যাচার, ও মুসলমান সংস্পর্শে দেশবাসীর বিলাস প্রিয়তাও দেশের এই নৈতিক অবনতি সংঘটনে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিল। মুসলমানের অযথাপীড়নে কত অসংখ্যহিন্দুর জাতিনাশ হইয়াছে তাহার

ইয়ত্তা নাই। কেহ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে কেহ বা সংস্পর্যদোষজনিত পাপে চিরদিনের জন্য "পীরালী" নামে অভিহিত হইয়া সমাজের নিম্নস্তরে যাইয়া পড়িয়াছে।

সমাজ ও ধর্ম্মের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন, সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ভক্তিশূন্য জ্ঞান স্পৃহায় মত্ত হইয়া সমগ্র নবদ্বীপকে এক বিরাট পাঠশালায় পরিণত করিয়াছিলেন। অন্যান্য পাঠের মধ্যে তখন নবদ্বীপে ন্যায়ের চর্চ্চাই বিশদরূপে চলিতেছিল, তর্ক বহুল, বিফল গ্রন্থ শুষ্ক ন্যায় দর্শন তখন নদীয়ার অস্থিমজ্জা ও শোণিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে; তখন লোকে প্রমাণ, যুক্তি ও তর্কদ্বারা মীমাংশিত না হইলে কোন কার্য্য করিত না বা কোন বিষয়ই সুসিদ্ধ হইত না। ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্রিয়াকাণ্ড সমগ্র ভুলিয়া কেবল বিদ্যা বিদ্যা করিয়াই তখন নবদ্বীপ উন্মত্ত। এই সার্ব্বজনীন বিদ্যোন্মাদের সম্মুখে তখন পার্থিব ও অপার্থিব সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিল। ধর্ম্মের তো কথাই নাই এমন কি মোহময় সংসারও উপেক্ষিত হইতেছিল। তাহার ফলে সমাজমধ্যে একদেশদর্শিতা, যথেচ্ছচারিতা ও বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিল তখন দেশ হইতে প্রেম-ভক্তিময় ধর্ম্মভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল।

প্রায়শঃ দেখা যায় কোনও একটা বিষয় উন্নতি বা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইলে তখন তাহার পুনরায় পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এইরূপে দেশ আধ্যাত্মিক অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইলে দেশের এই ভক্তিশূন্য শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে নদীয়াবাসী জনকয়েক ভক্ত মহাপুরুষ অতিশয় মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে শান্তিপুর নিবাসী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অগ্রগণ্য। তিনি পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া, কিরূপে এই দুর্দ্দশার বিমোচন হয়, কিসে আশু ধ্বংসের হাত হইতে জগৎকে রক্ষা করা যায়, কিসে এই পাপ মোহের অবসান হয় ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন ভগবানের করুণাকণা ব্যতীত এই দারুণ দুর্গতি দূরীভূত হইবে না, তাই আকুলহৃদয়ে জীবকল্যানার্থ সেই পরদুঃখকাতর মহর্ষী মহাতপে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পূতহৃদয়ের অকপট প্রার্থনা শীঘ্রই পরম পিতার স্বর্গসিংহাসন সন্নিধানে উপনীত হইল। তখন একদিকে উচ্ছৃঙ্খল তান্ত্রিকের তন্ত্রের নামে যথেচ্ছাচার নিবারণ করিতে নবদ্বীপে যেমন শক্তিধর মহাপুরুষ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাব হইল, তেমনি জীবে দয়া, নামে রুচি শিক্ষা দিতে ভক্তাধীন ভগবান ব্যাকুল ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতের মহাকর্ষণে বিচলিত হইয়া স্বয়ং সপরিকরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের ভাগ্যবান পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। পুরন্দর তাঁহার আর এক উপাধি ছিল তাঁহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে। তাঁহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অধ্যয়নার্থ বাণীর প্রিয় নিকেতন নবদ্বীপে আগমন করেন এবং পাঠ সমাপনান্তে নবদ্বীপবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তীর সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা "শান্তমূর্ত্তি" শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের যে পল্লীতে শ্রীহট্টিয়াগণ বাস করিতেন সেই পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন।

শচীর গর্ভে জগন্নাথের পর পর আটটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সকলেই অল্প বয়সে গতাসু হয়েন। শিশু কন্যাগণের শোকে যখন ব্রাহ্মণদম্পতি ম্রিয়মান তখন তাঁহাদের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আদর করিয়া এই রূপবান পুত্রের "বিশ্বরূপ" নাম করণ করেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই পুত্র সর্ব্ব শাস্ত্রাদিতে উত্তমরূপে ব্যুৎপন্ন হয়েন। বিশ্বরূপের ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে শ্রীনিমাই জন্ম পরিগ্রহ করেন।

যে শুভ নিশিতে শ্রীচৈতন্যদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন সেটী সুনির্ম্মল ফাল্গুণী পূর্ণিমা এবং যে মুহূর্ত্তে তিনি ভূমিষ্ট হয়েন তখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, সুতরাং সমগ্র হিন্দুস্থান তখন চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী দান ধ্যানাদি সৎকর্ম্মে রত এবং মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনি ও হরি-ধ্বনিতে তখন সমস্ত নদীয়া মুখরিত। এইরূপ অনন্ত কণ্ঠ নিঃসৃত হরিধ্বনির মধ্যে "সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চগ্রহগণে, ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব শুভক্ষণে," জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপস্থ ভবনে, নিম্বমূলস্থ সূতিকাগৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হয়েন। সূতিকাগারে ডাকিনী, পিশাচ ও উপদেবতার কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে মেয়েরা তাঁহার "নিমাই" নাম রাখেন। পরবর্ত্তী জীবনে অসংখ্য ভক্ত কর্ত্তৃক তিনি সহস্র নামে আখ্যাত হইলেও, সূতিকাগৃহের এই আদরের নাম তাঁহার প্রিয়জনে একদিনও ভুলে নাই। জগন্নাথ অন্নপ্রাশন কালে পুত্রের নাম রাখিলেন "বিশ্বম্ভর," উপনয়ন কালে তাঁহার আর একটি নাম হইল "গৌরহরি"। ভক্তগণ তাঁহার "শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সর্ব্বশেষ নাম হইয়াছিল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"।

শচীদুলাল পিতৃগৃহে শুক্লপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। এই অলৌকিক সুবর্ণলাঞ্ছিত সুউজ্জ্বলবর্ণশালী, সুঠাম গঠন ও মনোহর ভঙ্গিমাশালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অপ্রাকৃত শিশুটী ঠিক অন্যান্য শিশুর ন্যায় ছিল না শিশু ক্রন্দন করিতেছে, কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, সহস্র যত্ন বিফল হইয়া যাইতেছে তখন একবার হরিধ্বনি কর, শিশু অমনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে, মায়ের ক্রোড়ে স্থির হইয়া রহিবে। এইরূপে শিশু নিমাই বাড়িতে লাগিলেন।

তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত শৈশবের দুরন্তপনাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে প্রভু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে, জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন। যে একাগ্রতায় শচীদুলাল শৈশবে চাপল্য ক্রীড়া করিয়াছেন সেই একাগ্রতায় এখন তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় জগন্নাথের সংসারে এক মহা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল। তাঁহার জেষ্ঠ্যপুত্র বিশ্বরূপ এখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। অদ্বৈত সকাশে সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইয়া ও ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, সংসারের অনিত্যতা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় যখন তাঁহার জনকজননী তাঁহার বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন তখন সংসারবিরাগী বিশ্বরূপ একদিন গভীর নিশায় গৃহত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা উপযুক্ত পুত্র বিরহে বিহ্বল হইলেন ও অনুক্ষণ তাঁহার নাম ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কালে তাঁহারা দুর্লভ পুত্ররত্ন বিশ্বম্ভরের মুখচন্দ্র অবলোকনে বিশ্বরূপের শোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। এই সময় হইতেই শ্রীনিমাইয়ের দৌরাত্ম্য ও চাপল্য একেবারে অন্তর্হিত হইল এবং তিনি ধীর শান্ত ভাবে পিতামাতার সেবাশুশ্রূষায় ও পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারাও ক্রমে নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বরূপের বিরহ ব্যথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ মিশ্র এইকালে পুত্রের এইরূপ অনন্য সাধারণ জ্ঞানস্পৃহা দেখিয়া সাহ্লাদে তাঁহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন। শীঘ্রই অলৌকিক মেধা বলে ও অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে তিনি গঙ্গাদাসের টোলের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র নয় বৎসর সুতরাং জগন্নাথ তাঁহার উপনয়ন দিবার আয়োজন করিলেন। এই উপনীত কালে মণ্ডিত কেশ রক্ত বস্ত্র পরিহিত নবীন ব্রহ্মচারীকে যখন পিতা শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াদির পর কর্ণে মন্ত্র দিলেন তখন শিশু নিমাই আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় পতিত হইলেন। সকলে দেখিলেন তখন সেই দেব শরীর হইতে অলৌকিক তেজ বাহির হইতেছে ও অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণাদি অষ্ট সাত্বিক ভাব পুনঃ পুনঃ দেহে সঞ্চারিত হইতেছে এবং অবিরল ধারায় নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বহিয়া পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী নিমাইয়ের এই আবেশ ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং তাঁহার দেহে যে গোপাল বিরাজ করিতেছেন ইহাই সকলের ধারণা হইল তাই তাঁহারা সেইক্ষণ হইতেনিমাইয়ের "গৌরহরি" নামকরণ করিলেন।

নিমাইয়ের একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ভাগ্যবান মিশ্র জগন্নাথ ইহধাম ত্যাগ করিলেন। পিতৃ বিয়োগে বালক নিমাই মহাদুঃখে নিপতিত হইলেন ; কিন্তু দুঃখে পড়িয়াও তাঁহার বিদ্যানুরাগ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই বরং এই সময় হইতে তিনি আরও নিবিষ্টচিত্তে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই অল্প বয়সে ঘরে বসিয়া নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিপ্পনী করিয়াছিলেন। উহা সেই তদানীন্তন নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জন সমাজে এবং পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র বিশিষ্টরূপে আদৃত হইয়াছিল। ব্যাকরণ পাঠ সমাপনান্তে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যায়নের নিমিত্ত তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ

করিলেন। সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাঠী তখন নদীয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, শত শত বিদ্যার্থী তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিতেন। এই সকল ছাত্রগণের মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকার মিথিলার গর্ব্বখর্ব্বকারী রঘুনাথ তখন সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু এই বালক নিমাইয়ের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় তিনিও শীঘ্র মলিন হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে এই রূপবান সুপণ্ডিত সুপাত্রের উপর কুমারী কন্যা-গণের পিতা মাত্রেরই দৃষ্টি পড়িল। শচী দেবীও পুত্রকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে নবদ্বীপ নিবাসী বল্লভ আচার্য্যের সাক্ষাৎ কমলা স্বরূপা কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত পুত্রকে পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করিলেন।

এই সময়ে নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয় নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে স্বয়ং এক চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিলেন। শীঘ্রই এই তরুণ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং অসংখ্য ছাত্র নিত্য নিত্য যোগদান করতঃ তাঁহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল। এইরূপে দিন দিন তাঁহার টোলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে নবদ্বীপের বিদ্বজ্জন সমাজ আলোড়িত করিয়া নবদ্বীপের জ্ঞানগরিমাকাশে দিগ্বীজয়ীরূপী এক ধুমকেতুর আবির্ভাব হইল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী ভারতবর্ষীয় যাবতীয় পণ্ডিত প্রধান স্থান জয় করতঃ বহুপরিবার ও শিষ্য সমভিব্যাহারে নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপের যশোহরণ করিয়া বিদ্যারাজ্যে একচ্ছত্রী হওয়া তাঁহার অভিলাষ। তিনি নবদ্বীপে "অটোপটঙ্কারে" ঘোষণা করিলেন "যদি কোন পণ্ডিত সাহসী হন তবে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন নতুবা সমগ্র নবদ্বীপ আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন।" সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কেশবের সহিত বিচার করিতে হইবে ভাবিয়া নবীন ও প্রবীন সমস্ত অধ্যাপক ভীত হইলেন, বুঝিবা এতদিনে নবদ্বীপের যশোহানি হয়, কিন্তু তরুণ নিমাই সহাস্য আস্যে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিয়া নদীয়ার যশঃ শ্রী অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। দিগ্বিজয়ীও পরাজিত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দণ্ড কমণ্ডলু ও কৌপিন গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রাণার্পণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী বিজয়ের পর হইতেই প্রভু নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়েন।

এই তরুণ অধ্যাপকের অনন্য সাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভামণ্ডিত হাস্যে ও শ্লেষে যখন নবদ্বীপস্থ সমগ্র বিবুদ্ধজন ব্যতিব্যস্ত, যখন ব্যাকরণের ও ন্যায়ের অতলগর্ভে ভক্তির কথা ডুবিয়া যাইতেছিল তখন একদিন এমন একটী ঘটনা সংঘটিত হইল যে নিমাইয়ের জীবনের স্রোত অন্য পথে প্রধাবিত হইল। এই সময়ে একদিন নিমাই যখন সশিষ্যে রাজপথে যাইতেছিলেন তখন মুকুন্দ দত্তও গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। মুকুন্দ চট্টলবাসী একজন বৈদ্য কুমার, নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং কিয়দ্দিন প্রভুর সহপাঠীও ছিলেন। এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্রের কচকচি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি মার্গের পথিক হইয়া পরম হরিভক্তি পরায়ণ হইয়াছিলেন এবং সুগায়ক বিধায় অদ্বৈতের সভায় কীর্ত্তন করিতেন। মুকুন্দ হঠাৎ নিমাইকে রাজপথে দেখিয়া পাছে বহির্মুখ সম্ভাষণ করিতে

হয় এই ভয়ে তটস্থ হইলেন ও অন্যপথে প্রস্থান করিলেন। পরম মেধাবী নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া শিষ্যগণকে কহিলেন "দেখ, দেখ, মুকুন্দ আমাকে অবৈষ্ণব মনে করিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি

"এমন বৈষ্ণব আমি হইব সংসারে।
অজভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥"

এই সময় হইতেই শ্রীনিমাই ধর্ম্মাচরণে মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিলেও তিনি ভক্তির যাজনা একদিনও করেন নাই। এক্ষণে এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহাতে একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে পরম ভাগবত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত প্রভুর মৈত্রি জন্মে এবং দুইজনে সর্ব্বদা ভক্তিশাস্ত্র-পঠন ও ভক্তি কথা প্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু ঈশ্বরপুরী শীঘ্রই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করেন। এখন নিমাইয়ের বয়স মাত্র অনতিক্রান্ত বিংশতি বৎসর। এই অল্প বয়সেই তাঁহার আচার্য্যখ্যাতি দিগদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে দয়ালপ্রভু একবার পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণে ইচ্ছা করেন এবং জননী ও পত্নী শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবীর নিকট বিদায় লইয়া সশিষ্য পূর্ব্ব বঙ্গে যাত্রা করেন, এবং শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া সজ্জন, দুর্জ্জন, আচারী, বিচারী, পতিত, অধম, নীচ কাঙ্গাল যে যেখানে ছিল সকলকে অকাতরে হরিনাম নিধি বিলাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিমাই ঘরে ফিরিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইলেন। পরে যখন শুনিলেন যে তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী তাঁহার বিচ্ছেদ কালের মধ্যে সর্প দংশনে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছেন তখন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন পরে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শোকাকুলা জননীকে প্রবোধ দিলেন। মাতা আপাতঃ দৃশ্যে প্রবুদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু সরলমতি পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার আন্তরিক ভয় পাছে বিশ্বরূপের ন্যায় নিমাইও সংসারে বীতরাগ হয়, বিশেষ পুত্রের এই নবযৌবনে তাহাকে বন্ধনহীন অবস্থায় সংসারে রাখিতে শচীমাতার বড় ভয় হইল তাই অনতিবিলম্বে নিমাইয়ের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন। মাতৃ অনুরক্ত শিশুপ্রকৃতি নিমাইও মাতৃ আদেশে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের সুশীলা কন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণীগ্রহণ করিলেন।

বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর কাল নিমাই নবদ্বীপের টোলে অসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যাদান করতঃ স্থিরভাবে সংসারে থাকিয়া শচীর মনে হর্ষোৎপাদন করিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ তাঁহার একবিংশতি বর্ষ বয়সে এক দিন তিনি পিতৃঋণ পরিশোধার্থ গয়াক্ষেত্রে যাইবার নিমিত্ত শচীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্নেহময়ী শচীদেবী এ বিষয়ে পুত্রকে নিষেধ করিতে পারিলেন না, তাই সঙ্গে নিমাইয়ের মেসো চন্দ্রশেখর ও তাঁহার কতিপয় শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আশ্বিন মাসে বাটী হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে বহুপথ অতিক্রম করিয়া শ্রীধাম গয়া প্রবেশ করিলেন। এই পবিত্র

গয়াক্ষেত্রে তাঁহার সহিত পূর্ব্বপরিচিত ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরীর মিলন হইল। ভক্ত পুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে ভক্তাবতার নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর দেবমূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে অপার্থিব প্রতীয়মান হইল; আর অমনি আকুলকণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সুগভীর, সুপবিত্র, সুমহান, সুমধুর কৃষ্ণপ্রেমসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। পরে শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে আসিলে গয়ালী বিপ্রগণ ভক্তিগদগদকণ্ঠে যখন শ্রীপদের প্রভাব বর্ণনা করিলেন তখন, সেই বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, অজভবপূজিত, যোগীগণ দুর্লভ শ্রীপদ দেখিতে দেখিতে প্রেমাবেশে শ্রীনিমাই একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীপুরীর বক্ষে পতিত হইলেন পরে সঙ্গীগণের যত্নে যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল তখন অজস্র পুলকাশ্রু, গোমুখী নিঃসৃত গঙ্গাম্বুধারানিভ তাঁহার নয়ন বহিয়া বদনে, বদন হইতে বক্ষে, বক্ষ হইতে সহস্র ধারায় ধরায় পতিত হইয়া সেস্থানকে জলময় করিল। উপস্থিত সকলে সেই পবিত্র বারিতে স্নাত হইয়া জীবনে সর্ব্বপ্রথম এরূপ আশ্চর্য্য প্রেমবিকাশ ও অপূর্ব্ব অশ্রুপাত দর্শন করিতে লাগিলেন। যখন কাঁদিতে কাঁদিতে আর্ত্তি কণ্ঠে নিমাই চন্দ্রশেখরাদি সঙ্গীগণকে কহিলেন "তোমরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর আমি সংসারে যাইব না, আমি প্রাণেশের উদ্দেশে মথুরায় চলিলাম, আমার বৃদ্ধা জননীকে তোমরা সান্ত্বনা করিও,"। তখন তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন, পরে বহু-যত্নে অনেক প্রবোধ দিয়া ও একরূপ বল প্রকাশ করিয়াই তাঁহারা এই আবেশময় ভক্তির প্রতিমাটীকে পৌষ মাসের শেষ ভাগে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন।

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সকলে দেখিলেন সেই উদ্ধতের শিরোমণি নিমাইয়ের পূর্ব্ব ভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে গৃহে আসিলেও নিমাই গয়ার সেই সুমধুর স্মৃতি মূহুর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। পরন্তু এই সময়ে তাঁহাতে প্রেমোন্মাদের লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পাইল। এই দিব্য প্রেমোন্মাদের মধ্যে যখন বাহ্য জগৎ তিনি একরূপ বিস্মৃত প্রায় তখন এক দিন তাঁহার অসংখ্য ছাত্র, তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ পাঠ গ্রহণ করিতে আসিল। তিনিও সকলকে পাঠ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন সে সমস্তই হরিপক্ষে হইতে লাগিল, এভাবও আবার তাঁহার অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বকালের জন্য কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাষমান হইলেন। তাঁহার ভাগ্যবান শিষ্যগণও সেই দিন হইতে তাঁহার ভক্তশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইলেন এবং তাঁহাদের লইয়া তিনিও অপূর্ব্ব নাম কীর্ত্তন সৃষ্টি করিলেন। শীঘ্রই এই শুভসংবাদ নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইল আর শ্রীবাস আদি ভক্তগণ আসিয়া একে একে তাঁহার পার্শ্বে মিলিত হইতে লাগিলেন। এই শ্রীবাসের গৃহেই নিমাই হরিসভা স্থাপন করিলেন ও সমস্ত দিবারাত্র হরিগুণ কথন, ও নাম সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রতি দিন নিতাই, অদ্বৈত, হরিদাস, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারী মুকুন্দ, নরহরি, পুরুষোত্তম, পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, দামোদর, গোবিন্দ, দামঘোষ, বক্রেশ্বর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শত শত ভক্ত আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিতে লাগিলেন। তাঁহারা

সকলে যখন প্রেমে মত্ত হইয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাম কীর্ত্তনে রত হইতেন তখন নবদ্বীপস্থ কতকগুলি কুচরিত্র অসূয়া পরায়ণ ব্যক্তি বহির্দ্দেশ হইতে নানাবিধ অত্যাচার ও চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগের তপে বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিল। এই দলের প্রধান ছিল দুই বন্ধু। তাহারা সাধারণতঃ জগাই মাধাই নামে[১] খ্যাত। ইহাদের মত পাতকী তখন সমগ্র নদীয়ায় আর ছিল না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা পাপের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাই দয়াল নিত্যানন্দ ও হরিদাস ইহাদের উদ্ধারার্থ দৃঢ় সংকল্প করিলেন। এক দিন নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ যখন জীবে নাম বিলাইয়া ফিরিতেছিলেন তখন জগাই ও মাধাই আসিয়া সহসা তাহাদের আক্রমণ করিল। মাধাই একটী ভগ্ন কলসীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় এমন দারুণ আঘাত করিল যে তাঁহার মস্তক হইতে অজস্র শোণিতধারা বহিতে লাগিল। নিতাই সে দারুণ আঘাত উপেক্ষা করিয়া প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে মাধাইকে বক্ষে লইতে উদ্যত হইলে মদোন্মত্ত মাধাই আবার তাঁহাকে প্রহার করিতে আসিল। নিত্যানন্দের দেবদুর্লভ চরিত্র বলে পাষাণও বিগলিত হইল। জগাই এতাবৎ মন্ত্রমুগ্ধবৎ মাধাইয়ের কার্য্য দর্শন করিতেছিল এক্ষণে যখন দেখিল সে পুনরায় নিত্যানন্দকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন ক্ষিপ্রগতি আসিয়া বজ্র মুষ্টিতে মাধাইয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে ভৎর্সনা করিল। লোকে আসিয়া যখন প্রভুকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল তখন তিনি লোকশিক্ষার্থ যৎপরোনাস্তি কোপ প্রকাশ করিয়া সেই দুই পাষণ্ডকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে অক্রোধী পরমানন্দ নিত্যানন্দ আসিয়া প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। প্রভুর কৃপায় এই দুই মহাপাতকী ব্রহ্মার দুর্লভ পদ প্রাপ্ত হইল।

জগাই মাধাইয়ের ন্যায় ধনশালী, দুর্দ্দান্ত ও প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্যক্তিদ্বয়ের এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে যদিও অনেকের চিত্ত আলোড়িত হইল তথাপি দুই চারিজন খলস্বভাব ব্যক্তি কিছুতেই শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ নির্ভীকতা ও সম্মান সহ্য করিতে পারিল না; তাহারা তদানীন্তন নদীয়ার মুসলমান কাজীর নিকট যাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কত মতে নালিস বদ্ধ হইল। কাজীও স্বীয় স্বাভাবিক দৈত্য প্রকৃতি বশে চালিত হইয়া নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিল। তখন হরিনামমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের কারণে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রচার করিলেন যে "তিনি অদ্যই কাজী দমনে গমন করিবেন, ভক্ত যে কেহ আছেন, আসিয়া মিলিত হউন।" শ্রীমুখ হইতে এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র বিদ্যুৎগতি এ সংবাদ দিকে দিকে রাষ্ট্র হইল, আর অমনি অপরাহ্ন সময়ে একে একে, দশে দশে, শতে সহস্রে লক্ষ লক্ষ লোক এক এক দীপ ও তদুপযুক্ত তৈলাদি লইয়া প্রভুর বাটী বেষ্টন করিতে লাগিল। কাজী এতাবৎ উদ্বিগ্ন হইলেও বিশেষ ভীত হয়েন নাই এক্ষণে যখন সেই অসংখ্য কণ্ঠের হরিধ্বনি ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল তখন তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন ও পলাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ প্রেমাবিষ্ট ভক্তের চক্ষু হইতে, ঐ উজ্জ্বল আলোকে অল্প সংখ্যক মুসলমান কোথায় পলাইবে? সুতরাং কাজী আর প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকা বৃথা মনে করিয়া

গললগ্নীকৃতবাসে দীনভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের পদে শরণ লইল, তখন অক্রোধী শ্রীগৌরাঙ্গ লৌকিক ক্রোধ অপসারণ করিয়া কাজীকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।[২]

এইরূপে প্রভু কাজী দমন পূর্ব্বক হরিধ্বনি দিয়া তাঁহার অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে আশ্বস্ত করিলেন এবং নবদ্বীপে নাম মহাত্ম্য পূর্ণরূপে স্থাপনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই অপূর্ব্ব ঘটনার পর হইতে গৌরহরির বাহ্যজ্ঞান ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। এখন কখন নামরসে বিভোর থাকেন আবার কখন অবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের পূজার্চ্চনা গ্রহণ করেন। কখন বা নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করেন! শ্রীবাসের মৃত পুত্রের প্রাণদান, সদ্যরোপিত বৃক্ষ হইতে অলৌকিকরূপে ফলোৎপাদন, সদ্য অসাধ্য ব্যাধি বিনাশ, স্পর্শ মাত্রেই অপ্রেমিকের প্রেমলাভ ইত্যাদি কত শত অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপার এই সময় সংঘটিত হইতে থাকে। কিন্তু সেই অলৌকিক প্রেমময় হৃদয়ের অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছাসের নিকট এ সকলের মূল্য কি? এই সময় তাঁহার বয়ক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর মাত্র। এই বয়সে তাঁহার প্রেমবৈকল্য সাতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার দেহ চেষ্টাদিও তিরোহিত হয়, এমন কি দিবারাত্রির প্রভেদ জ্ঞানও একেবারে অন্তহিত হইয়া যায় এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়তা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইল এবং দীন দয়াল প্রভু আসমুদ্র হিমাচল সমগ্রদেশে প্রেম বিলাইতে বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী ও সন্ন্যাসীগণের সান্নিধ্যলাভ করিতে, এবং মূর্খগণের মন হইতে বিদ্বেস ভাব দূর করিতে কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ বাসনা করিলেন এবং ১৪৩১ শক (১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির গভীর নিশায় গোপনে গৃহত্যাগ করতঃ মাঘের দারুণ শীত উপেক্ষা করিয়া সন্তরণে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কাঞ্চন নগরে (কাটোয়ায়) উপস্থিত হইয়া শ্রীকেশব ভারতীর সহিত মিলিত হইলেন। ভারতী কিছুদিন পূর্ব্বে একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন তখন শ্রীনিমাই তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার সংকল্প বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ গদাধর, মুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, ও শ্রীব্রহ্মানন্দ ঠাকুর প্রভুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া কাটোয়ায় প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার এবং সমবেত অসংখ্য জনশ্রেনী কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে এই দারুণ সংকল্প পরিত্যাগের জন্য কত অনুরোধ উপরোধ করিলেন, কিন্তু গৌরের দার্ঢ্য দেখিয়া অবশেষ তাঁহারা সকলেই নিরস্ত হইলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের প্রতি বিধিযোগ্য সমস্ত আয়োজনের ভারার্পণ করিলেন। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে শুভ সংক্রান্তিতে যখন শ্রীগৌরাঙ্গের মস্তক মুণ্ডনের জন্য ক্ষৌরকারকে আহ্বান করা হইল তখন সেই নরসুন্দর, প্রভুর অলৌকিক রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শে সাহসী হইল না। পরে প্রভুর নিকটে আশ্বস্ত হইয়া ও বর পাইয়া সেই শোকাবহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। এইরূপে প্রভু ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করতঃ গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক ভারতীর নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভুর আর এক জগন্মঙ্গল নাম হইল

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। দীক্ষার পর প্রভু প্রেমাবশে আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন ও বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া যদৃচ্ছা গমন করিতে লাগিলেন। পরে কিয়দ্দিবস পথে পথে হরি নাম নিধি বিলাইয়া প্রথমে ফুলিয়ায় হরিদাসের আশ্রমে, পরে শান্তিপুর অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ এমন কি তাঁহার পূর্ব্ব নিন্দুকগণও প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া অতি নিকটেই আসিয়াছেন শুনিয়া, প্রভুকে দেখিতে ফুলিয়া ও শান্তিপুরে আসিয়া মিলিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত শান্তিপুরে এক হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। সেই সংখ্যাতীত ভক্তকণ্ঠের হরিধ্বনিতে তখন শান্তিপুর মুখরিত, কবির কথায়, তখন প্রেমের বন্যায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।"

এই আনন্দ নৃত্যে কএক দিবস অতিবাহিত করিয়া প্রভু, মাতা ও ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নীলাচল চন্দ্রের ইন্দু বদন দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া, পথে সর্ব্ব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করিয়া প্রভু পুরীর পথে অগ্রসর হইলেন। বহু পথ অতিবাহন করিয়া তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী শ্রীপাদ্ নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, ও মুকুন্দ দত্ত এই চারি জনকে লইয়া স্বচ্ছন্দে রেমুণায় উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রেমানন্দে যামিনী যাপন করিয়া তাঁহারা রেমুনা ও কটকের মধ্যবর্ত্তী স্থান যাজপুরে আসিলেন। তথা হইতে শ্রীসাক্ষীগোপাল দর্শনে গমন করিলেন। পরদিন কমলপুরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু ভার্গ নদীতে স্নান দানাদি সমাধা পূর্ব্বক কপোতেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ এই স্থানে প্রভুর সন্ন্যাসের চিন্ ও সম্বল দণ্ড খানিকে ভগ্ন করিয়া নদী জলে ভাসাইয়া দিলেন, তদবধি সেই নদী "দণ্ডভাঙ্গা" নামে খ্যাত হইল। কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আবার চলিলেন। কমলপুর হইতে কিয়দ্দূর যাইতেই পুরীর মন্দিরের চূড়া সকলের নয়নে উদ্ভাসিত হইল, আর সেই এত দিনের অভীষ্ট বস্তু দর্শনে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবাবেশে পুরী প্রবেশ করিয়া প্রভু চকিতের মধ্যে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং লম্ফ দিয়া যেমন শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করিলেন অমনি, প্রেমবিহ্বলিত হইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দৈবযোগে সেই সময় ভুবনবিখ্যাত নদীয়ার গৌরবরবি, বাসুদেব সার্ব্বভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব প্রেমবিকাশ ও অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া অজ্ঞাতসারে প্রভুকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন তাই যত্ন পূর্ব্বক জগন্নাথের পরিকর-গণদ্বারা বহন করাইয়া প্রভুকে নিজ বাস ভবনে লইয়া আসিলেন। সগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য কিছু দিন সার্ব্বভৌমের বাটীতেই অবস্থান করিলেন। নিমাইয়ের মধুর সঙ্গে বেদান্তবাদী শত শত সন্ন্যাসীর গুরু, নদীয়ার পণ্ডিত কুলরবি সার্ব্বভৌমের মন ভক্তিপথে ধাবিত হইল এবং শেষে শ্রীপ্রভুকে বেদান্তমতে শিক্ষা দিতে যাইয়া তিনি স্বয়ংই ভক্তি রসে গলিয়া যান ও প্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শনে স্তব করেন। সেই স্তবাবলী "চৈতন্য শতক" নামে আজিও ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস আনিয়া দিতেছে।

এইরূপে পণ্ডিতকুলশেখর সার্ব্বভৌম বিজীত হইলে ক্রমে বহু সন্ন্যাসী, দণ্ডী, মায়াবাদী পণ্ডিত ও অবিশ্বাসী অনেকেই নির্ব্বিচারে শ্রীগৌরাঙ্গ পদে আত্ম সমর্পণ করেন। এমতে নীলাচলে দুই মাস প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইলে পর প্রভু এক দিন দক্ষিণ অঞ্চলে ভ্রমণে ইচ্ছা প্রকাশ করতঃ ভক্তগণের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া একমাত্র কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ভক্তিমান বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া ১৪৩২ শকের (১৫১৯ খ্রীঃ অঃ) বৈশাখ মাসে দাক্ষিণাত্য উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন৺ পথে অচিন্তনীয় পরমাদ্ভুত, অলৌকিক ঐশীশক্তি প্রকাশ করিয়া প্রভু দেহ চেষ্টাদি বিরহিত হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যখন তিনি কূর্ম্মতীর্থে উপনীত হইলেন, তখন বাসুদেব নামে একজন মহাব্যাধি গ্রস্ত ভক্তিমান ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। দয়ালঠাকুর তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সেই পুতীগন্ধময়, কীড়াসঙ্কুল ক্ষতবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদানে ধন্য করিলেন। ব্রাহ্মণও দেবদুর্লভ শ্রীঅঙ্গের স্পর্শসুখ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ লাভ করতঃ প্রভুর চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন। এইরূপে অবিচারে, পতিত, অধম, দুর্জ্জন, কাঙ্গাল সকলকে সমভাবে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া প্রভু জিয়ড় নৃসিংহাদি তীর্থ দর্শন করিয়া ক্ষীণসলীলা গোদাবরী তীরে উপণীত হইলেন। পরে গোদাবরী পার হইয়া রাজমাহীন্দ্রপুরে গমন করিলেন এবং তথায় রসিকশেখর রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দের মধুর সঙ্গে দশরাত্রি অতিবাহিত করিয়া এবং তাঁহাকে আপনার ভুবনানন্দ মঙ্গলময় রূপ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু যে পথে চলিতে লাগিলেন তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে অমনি অননুভবনীয় ভাবে প্রেমের ঝটিকা বহিতে লাগিল যে কেহ তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন তিনিই প্রেমে মত্ত হইলেন : আবার তাঁহাকে যিনি দর্শনলাভ করিলেন তিনিও প্রেমে মত্ত হইলেন ; আবার তাঁহাকে যিনি দর্শন বা স্পর্শ করিলেন তাঁহারও ঐরূপ অবস্থা হইল। এইরূপে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অল্পকালের মধ্যে হরিনাম প্রচারিত হইল। প্রভু রামানন্দের নিকট বিদায় লইয়া মল্লিকার্জ্জুনীতীর্থ, অহোবল, সিদ্ধিবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমট, বৃদ্ধকাশী ত্রিপদিমল্ল, বেঙ্কটার, পানানরসিংহ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, ত্রিমল্ল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও বহুতর রামায়িৎ, রামানুজ, শিব, বৌদ্ধ, দণ্ডী প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়া ক্রমে কাবেরী তটে উপনীত হইলেন, তথায় অবগাহন করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, এখানে বেঙ্কট ভট্ট নামে একজন ভক্তের গৃহে রহিয়া তিনি চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। অনন্তর ঋষভ পর্ব্বতে পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কামকোষ্টি, দক্ষিণ মথুরা মহেন্দ্র শৈল, সেতুবন্ধ ফল্গুতীর্থ, পয়াপশ্বরা, দ্বৈপায়নী, কোলাপুর, পাণ্ডুতীর্থ মলয় পর্ব্বত প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া মল্লার দেশে উপনীত হয়েন। এখানে ভট্টমারী সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি শ্রীপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে প্রলোভিত করে প্রভু তাহাদের মায়া হইতে তাহার উদ্ধার করেন। ক্রমে মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে নর্ম্মদা তীরে বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তিনি বোম্বাই প্রদেশস্থ সোলাপুরে উপনীত হয়েন এখান হইতে

তিনি দ্বারকা গমন করেন পরে পম্পা সরোবর তাপ্তি নদী ঋষ্যমুখ, দণ্ডকারণ্য পঞ্চবটী ও নাসিকা, ত্র্যম্বক, ব্রহ্মগিরি, কুবাবর্ত্ত প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া রামানন্দের সহিত পুনর্ম্মিলিত হয়েন তথা হইতে পূর্ব্বপথে আলাল নাথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ; এই আলালনাথ হইতে প্রভু সমভিব্যাহারী কৃষ্ণদাসকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। নিত্যানন্দাদি তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া মহাকুতূহলে তথায় আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুও তাঁহাদের প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কীর্ত্তনরঙ্গে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শত শত যোজন পথ, অরণ্য প্রান্তর, গিরী, নদী আদি অতিক্রম করিয়া এবং পথিমধ্যে শৈব, রামাৎ, বৌদ্ধ, এমন কি মুসলমান, পাঠান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী ও ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এক বৎসর আট মাস ষড়বিংশতি দিন পরে (১৫১১ খ্রীঃ ১৪৩৩ শকে) ৩রা মাঘ তারিখে পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনান্তে কাশীমিশ্রের ভবনে রহিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলবাসী অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ পূজাদি গ্রহণ করতঃ তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। এখানেই শ্রীচৈতন্যলীলার অর্দ্ধপাত্র শিখি মাইতি রামানন্দের পিতা ভবানন্দ ও তাঁহার আর চারি পুত্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র এবং দুই পূর্ণপাত্র স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হয়। শ্রীপাদ অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর প্রত্যাগমনের কুশলবার্ত্তা পাইয়া মহাহ্লাদে মহোৎসবে রত হইলেন, পরে তিনি সমাগত ভক্তগণের ঐকান্তিক ঔৎসুক্যে বিচলিত হইয়া শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদেশ লইয়া, মুরারী, হরিদাস প্রভৃতি বহু স্ত্রীপুরুষ ভক্ত সমভিব্যাহারে রথযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য স্মরণ পূর্ব্বক প্রভুমিলনে নীলাচল উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নীলাচলে প্রাণাধিক প্রিয় প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ সংকীর্ত্তনানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ যাত্রার কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐদিন প্রভু প্রত্যুষে স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তবৃন্দ সঙ্গে রথযাত্রা দর্শনে গমন করিলেন। সেই সুসজ্জিত পতাকাদি শোভিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিরাজিত অপূর্ব্ব রথশ্রী দর্শনে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। এইসময়ে উৎকলাধিপতি রাজা প্রতাপ রুদ্র যিনি বিষয়ী বিধায় বহু চেষ্টাতেও এতাবৎ প্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হয়েন নাই দীন বৈষ্ণববেশে তথায় গমন করিয়া বাহ্য জ্ঞান বিরহিত প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে সময়োচিত এক শ্লোক পাঠ করিলে প্রেমের পাগল ঠাকুরটী ভাগবৎ শ্রবণে বাহ্য পাইয়া ও উল্লসিত হইয়া রাজাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ নানা মহোৎসবে রথযাত্রা সমাপ্ত হইলে গৌড়ীয় ভক্তগণ কার্ত্তিক মাহার উত্থান দ্বাদশী পর্য্যন্ত নীলাচলে বাস করিলেন পরে শ্রীপ্রভুর আদেশে ক্রমে সকলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেবল মাত্র গঙ্গাধর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি দশজন প্রভুর নিকট রহিলেন। ক্রমে তিন বৎসর অতিবাহিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণও প্রতিবৎসর প্রভুদর্শনে নীলাচলে আসিতে লাগিলেন। এই তৃতীয় বৎসরে প্রভু যখন ভক্তগণকে বিদায় দিতে উদ্যত হইলেন তখন

তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ করিলেন যে প্রতি বৎসর নীলাচলে না আসিয়া তিনি গৌড়ে রহিয়া আচণ্ডালে নাম বিলাইবেন। প্রভু এইরূপে আরও ২ বৎসর কাল নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণের সম্মতিক্রমে গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন এরূপ স্থির করিয়া বিজয়া দশমীর দিন প্রভাতে প্রভু নীলাচল চন্দ্রের ইন্দুবদন দর্শন করিয়া শুভযাত্রা করিলেন। পরে কটকে আসিয়া সপরিবার প্রতাপ রুদ্রকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কিছুদিনে শ্রীপাট খড়দহের নিকটবর্ত্তী পাণিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের আলয়ে উপনীত হইলেন। এই রাঘব প্রভুর একজন অতি প্রিয়ভক্ত ছিলেন। এখান হইতে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের কুমারহট্টস্থ নূতন ভবনে উপস্থিত হইলেন। কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর গ্রাম) শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান তাই এখানে আসিয়া প্রভু দুর্লভ জ্ঞানে কুমারহট্টের ধুলি রেণু উত্তরীয় অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রধান ভাগ্যবান শ্রীবাসকে কৃতার্থ করিয়া ভক্তগতপ্রাণ প্রভু কাঞ্চনপল্লীর (বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়া) শিবানন্দের ভবনে গমন করিলেন। তথাহইতে উক্ত গ্রামবাসী বাসুদেবের বাটীগমন করিলেন। এই যে প্রভু নীলাচল, হইতে শত শত ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন সে একাকী আসিতেছেন না ; যে অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি হরিনামপ্লাবিত করিয়াছিলেন এই সমগ্র পথেও সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়া চলিতেছেন আর তাঁহার সঙ্গে সংখ্যাতীত জনপ্রবাহ এক মহা আকর্ষনের বলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। শ্রীপ্রভু কাঞ্চনপল্লী ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন আর অমনি অসংখ্য লোক কুলে কুলে তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরূপ অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীঅদ্বৈতের প্রাণনাথ শান্তিপুরে অদ্বৈত মন্দিরে শুভাগমন করিলেন। বহুদিন পরে চিরবাঞ্ছিত হারানিধিকে পাইয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণের যে মহানন্দ জন্মিল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপচন্দ্র, শচীদুলাল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ নদীয়ার সর্ব্বস্ব প্রভু নবদ্বীপের একাংশ বিদ্যানগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। আর কিছুদিন এই চির প্রিয় ভুমিতে শান্তিতে থাকিবার মানসে গোপনে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে উপনীত হইলেন। বাচস্পতিগৃহদ্বারে বৈকুণ্ঠনায়ক অতিথি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে দিশেহারা হইলেন, আর পুলকপুরিত অঙ্গে গোপনে প্রভুর সেবায় রত হইলেন। ক্রমে যখন প্রভুর নবদ্বীপ আগমন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল তখন দলে দলে লোক সকল আসিয়া বাচস্পতির গৃহপ্রাঙ্গণ পূর্ণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া গেল তখন সকলে নিকটবর্ত্তি রাস্তা ও মাঠে সমবেত হইতে লাগিল। ক্রমে যখন তাহাতেও স্থান সংকুলান হইল না, তখন লোকে অপথ, বন, জঙ্গল, বৃক্ষশাখা প্রভৃতিতে স্থান গ্রহণ করিল। এইরূপে বিদ্যানগরে যখন মহাজনতা হইল, তখন লীলাময় প্রভু বাচস্পতির গৃহত্যাগ করিয়া গঙ্গার তটস্থ কুলিয়াগ্রামে মাধবদাসের বাটী যাইয়া উপনীত হইলেন।[৪] এই কুলিয়াতেই পরম ভাগবত দেবানন্দ ঠাকুরের অপরাধ ভঞ্জন হয়। তিনি পূর্ব্বে মায়াবাদী ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিহীন ব্যাখ্যা

করিতেন। প্রভুর নবদ্বীপ বাসকালে দেবানন্দকে তিনি এবিষয়ে উপদেশ দিলেও মহান্ধ দেবানন্দ প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার কথা অবহেলা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভক্ত শিরোমণি বক্রেশ্বরের কৃপায় দেবানন্দ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। দয়াময় প্রভুও তাঁহার সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে আপনার সুশীতল বক্ষে গ্রহণ করিলেন। দেবানন্দ তখন শুদ্ধমতি হইয়াছেন, সুতরাং আপনার সুখাপেক্ষা পরের সুখের প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি সমধিক তাই, প্রভুর এই কথায় সাহস পাইয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে, "যে কেহ এই ক্ষেত্রে আসিয়া অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে প্রভু যেন অবিচারে তাহার অপরাধ ভঞ্জন করেন।" প্রভুও ভক্তিমান দেবানন্দের প্রার্থনায় তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তদবধি কুলিয়া "অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ" বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু কলির জীবের এমনি দুর্ভাগ্য যে এই শ্রীপাটের নিদর্শন নবদ্বীপের সন্নিকটে কোথাও পাওয়া যায় না; বুঝি গঙ্গাদেবী এই লোভময় পবিত্র তীর্থের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া আপনার পবিত্র বক্ষে ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। এই কুলিয়া গ্রামেই শ্রীপ্রভু আত্মজনের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। এইস্থানেই শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন এবং ত্রিলোক পূজ্য স্বামীর স্নেহের শেষ নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার শ্রীপদের কাষ্ঠপাতুকা যোড়াটী প্রাপ্ত হয়েন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীপ্রভুর আদেশ ক্রমে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্থাপিত এই মূর্ত্তি অদ্যাপি নবদ্বীপে বিদ্যমান আছেন। কুলিয়া হইতে মহাপ্রভু গঙ্গার তীরে তীরে রামকেলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই রামকেলী গ্রাম তদানীন্তন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের এক অংশ বিশেষ। পাঠান বংশীয় সৈয়দ হুসেন সাহা তখন এখানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই হুসেন সাহার রাজকীয় সভায় রূপ ও সনাতন নামে দুই ভ্রাতা "দবির খাস ও সাকর মল্লিক" পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দুই ভ্রাতার রাজ সংসারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইঁহারা সতত মুসলমান সহবাসে যাবনিক ভাব প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ বিলক্ষন ভক্তিমান ছিলেন। প্রভু ইঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া গৌড় হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে গমন করিলেন। তথায় কিয়দ্দিবস অতি-বাহিত করিয়া পরিশেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানে বর্ষার চারিমাস অতিবাহিত করিয়া তিনি একদা বলভদ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিশেষে গোপনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ইচ্ছাময় প্রভু লোকচক্ষু হইতে অন্তরালে থাকিবার মানসে বিপথে শ্বাপদ শঙ্কুল দুর্গম অরণ্য মধ্য দিয়া গমন করতঃ অবশেষে কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং তদীয় পুরাতন ভক্ত তপন মিশ্রের ভবনে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিলেন। পরে তদানীন্তন কাশীর জগৎগুরু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, দণ্ডী সন্ন্যাসীর রাজা, দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরের ন্যায় মহামান্য প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত সে যাত্রা সক্ষাৎ না করিয়াই, শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া মথুরাভি মুখে ছুটিলেন এবং শীঘ্রই প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই বৃন্দাবন যাত্রার পথে প্রভু যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই অকাতরে প্রেম বিলাইয়া চলিতেছেন; অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য

দেখিলেন, শ্রীপ্রভূ বাহ্যবিরহিত অবস্থায় ধরাশায়ী রহিয়াছেন। শরীর নিস্পন্দ—নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাসের লক্ষণ মাত্রও অনুভূত হইতেছে না,—হস্তপদাদির সমুদয় গ্রন্থি সিথিল হওয়ায় শরীর অত্যন্ত দীঘল হইয়াছে—কেবল চর্ম্মচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র। প্রভূর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ মহাশোকে হাহাকার করিয়া উঠিলেন—

স্বরূপ গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া। প্রভূর কানে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণ নাম হৃদয়ে পশিল। হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিল॥

অপর এক দিবস আচম্বিতে কৃষ্ণবেণু গান শ্রবন করিয়া ভাবাবেশে শ্রীপ্রভু দক্ষিণ সিংহদ্বারে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ যাইয়া দেখিলেন যে, প্রভূর সেই সুদীর্ঘ শ্রীঅঙ্গ কুষ্মাণ্ডকার ধারণ করিয়াছে; হস্তপদাদি যাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে; তখন সকলে মিলিয়া সেই বরবপু বহন করতঃ গৃহে আনিলেন। আর—

উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ত্তন।
অনেক ক্ষনে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥

অপর এক নিশিতে প্রভুর প্রেমোন্মাদ শাতিশয় বর্দ্ধিত হওয়ায়, চন্দ্ররশ্মী বিভাসিত, চাকচিকাময়, তরঙ্গায়িত-সুনীল পয়োধীবক্ষ দর্শনে হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের জলকেলী স্ফূর্ত্তি হওয়ায় যমুনাভ্রমে তিনি সমুদ্রবক্ষে ঝম্পপ্রদান করেন। এ দিন ভক্তগণ বহু অনুসন্ধানেও যখন প্রভূর কোন সংবাদ পাইলেন না, তখন প্রভূ বুঝি অন্তর্দ্ধান করিলেন এই মনে করিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই সময় স্বরূপ দামোদর একজন ধীবরকে হরিধ্বনি করিয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে দেখিয়া, সন্দিহান হইয়া ঐ ধীবরকে শ্রিপ্রভুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে—

কহ জালিয়া ঐ দিকে দেখিলে একজন। তোমার এই দশা কেন কহত কারণ॥
জালিয়া কহে ইহা এক মনুষ্য না দেখিল। জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে মৃতকে দেখিতে মোর ভয় হইল মনে॥
জাল খশাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হইল। স্পর্শ মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল গদ গদ বাণী মোর উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়। দর্শন মাত্রে মনুষ্যের পশে সেই কায়॥

ভাগ্যবান জালিয়া যখন এইরূপে প্রভুর বর্ণন করিলেন, তখন ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং সকলে দ্রুত সমুদ্রতটে যাইয়া দেখিলেন সেই কমলাসেবিত "পুরট-সুন্দর-দ্যুতি কদম্ব সন্দীপীত" শ্রিঅঙ্গ—

ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ শব কায়। জলে শ্বেত তনু বালু লাগিযাছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম লটকায়। দুর পথ উঠাইয়া আননে না যায়॥

তখন সকলে মিলিয়া প্রভূর সেবায় রত হইলেন। কেহ আর্দ্র কৌপীন দূর করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দিলেন, কেহ শ্রীঅঙ্গের বালুকাকণা ছাড়াইাত লাগিলেন; কেহ কেহ বহির্ব্বাস

পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে সেই শয্যায় শায়িত করিলেন। এবং সকলে মিলিয়া তখন উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

কতক্ষণে প্রভু কানে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল॥

উপর্য্যুপরি প্রভুর এইরূপ প্রেমবিকার ও মহাভাব সমাধি অবলোকন করিয়া ভক্তগণ চিন্তিত হইলেন। সকলের মনে কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিল যে আর বুঝি তাঁহারা তাহাদের প্রেমশৃঙ্খলে প্রভুকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না; কিন্তু এই মর্ম্মগ্রন্থী ছিন্নকারী নিদারুণ কথা মনে হইলেও কেহ মুখে আনিতে পারিলেন না। তাই সকলেই আপনি আপনি মনে বুঝিয়া সতর্কে প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রেমপূর্ণ সযত্ন অনুবন্ধে কোন ফল হইল না, কেন না ইচ্ছাময়, লীলাময় প্রভু যে মহৎকার্য্য সাধন করিতে গোলক ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যের আবিল ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মহাকার্য্য, অর্থাৎ "জীবে দয়া, নামে রুচি" আত্মচরিত্র আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা দেওয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সেই ভক্তাবতার প্রভুর এই অপূর্ব্ব প্রেমময় লীলা অবসান কাল নিকট হইয়া আসিতেছিল।

একদিন ভক্তগণকে লইয়া বৃন্দাবনলীলারস আস্বাদন করিতে করিতে প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া নীরব হইলেন এবং উঠিয়া দ্রুতপদে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। প্রভু দ্রুতগমনে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে মন্দিরদ্বার আপনা হইতে রুদ্ধ হইয়া গেল। বাটীর অভ্যন্তরে ভোগমন্দির প্রভৃতি স্থানে দুই একজন জগন্নাথের সেবক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা, প্রভুকে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গন করিতে দেখিলেন এবং পরক্ষনেই বাহিরে ভক্তগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া দ্রুত আসিয়া দ্বারমোচন করিলেন। ভক্তগণ পথ পাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন কিন্তু কেহই আর প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন সকলে প্রভুর অন্তর্ধান বুঝিতে পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই মহাশোকের বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে শ্রীমন্দির শোকাকুল ভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে এ নিদারুণ সংবাদ ভারতবর্ষীয় যাবতীয় ভক্তগণের নিকট প্রচারিত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে যে মহাশোকানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল তাহা বর্ণনা করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

এইরূপে ১৪৫৫ শকে এই অপূর্ব্ব দেবলীলার অবসান হয়। এই অমিয়ময় চরিত, কণকপুতলী, প্রেমের মূর্ত্তি দেবশিশুটী ১৪০৭ শকে নবদ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃকালে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট কাঞ্চন নগরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, ক্রমিক ছয় বৎসরকাল ভারতের সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটন, পূর্ব্বক, জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন ও ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অপ্রকট হয়েন। এই অলৌকিক, অপূর্ব্ব জীবনে যে সুগভীরপ্রেম, অনন্ত-ভাব-সমাবেশ ও অপূর্ব্ব ভক্তির উচ্ছাস প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা সুবিস্তারে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ

হইয়া পড়ে। আমরা এই স্বল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সেই পুণ্যশ্লোক মহান চরিত্রের আভাষ মাত্র দিতে চেষ্টা পাইয়াছি। যে মধুর হইতে সুমধুর পবিত্র কাহিনী বহুদিন ধরিয়া বর্ণনা করিলে কিছুই বলা হয় না, যাঁহার এক এক দিনের জীবনী কথা লইয়া বিচার ও ভাবনা করিলে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে সেই মহাপুরুষের মহান চরিত্র গাঁথা এই স্বল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। তবে এই মহাপুরুষকে লইয়াই নদীয়া, এবং নদীয়া-কাহিনী বলিতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই প্রেমময় কাহিনী মনে আসে বলিয়া আমার এই হাস্যস্কর উদ্যম।

নদীয়ার বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়

মুসলমান

নদীয়া জেলার মুসলমানদিগের অধিকাংশ দরিদ্র ও কৃষিজীবি হইলেও স্থানে স্থানে দুচারিজন "শরীফ" (ভদ্রলোক) দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকও দেখা যায়। অত্রস্থ মুসলমানগণের মধ্যে অধিকাংশ অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। মুর্খ মুসলমানেরা হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকে; এমন কি অনেকে হিন্দু দেব দেবীর পূজা পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। যাহা বংশগত প্রথা চলিয়া আসিতেছে অনেকে তাহাই ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। নদীয়া জেলায় খ্রীষ্টানগণের অধিকাংশই মুসলমান বংশ সম্ভূত। অত্রস্থ মুসলমানগণকে দেখিলে ঠিক মুসলমান বলিয়া চেনা যায় না কারণ সাধারণতঃ ইঁহারা টুপি ও মুসলমানী পোষাক পরিধান করেন না; এমন কি অনেকে হিন্দু নাম পর্য্যন্ত রাখিয়া থাকেন সামান্য সংখ্যক ভদ্র মুসলমানেরা টুপি আচকান পায়জামা ব্যবহার করেন এবং মস্‌লালী নাম রাখেন। রীতিমত লেখাপড়া শিক্ষা না করাই যে মুসলমান সমাজের অবনতির কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এই জেলাতে আরবী ও পারসী ভাষার যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল, কিন্তু মধ্যে বিদ্যা চর্চ্চা উঠিয়া যাওয়ায় মুসলমান সমাজের ঘোর অধঃপতন ঘটিয়াছে। সম্প্রতি সদাশয় গবর্ণমেন্টের যত্নে এবং ধর্ম্ম প্রচারক মৌলবী ও মুনসী সাহেব দিগের চেষ্টায় সমস্ত জেলার মধ্যে প্রায় দুইশত মাদ্রাসা, মক্তবে স্থাপিত হওয়ায় ইঁহাদিগের মধ্যে কিছু কিছু আরবী পারসী ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েকজন মুসলমান যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ উপাধীও লাভ করিয়াছেন। শান্তিপুরের "জুবিলী মাদ্রাসা" কৃষ্ণনগরের "ইজিকেল মাদ্রাসা" ও গাড়াডোব বাহাদুর পুরের মক্তবে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বহুস্থানে সভাসমিতি আঞ্জুমান স্থাপিত হইতেছে বলিয়া মুসলমান সমাজের ধর্ম্মোন্নতির শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, কারন দেখা যায় যখন যে জাতির ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে তখনই সেই জাতির আভ্যন্তরিণ অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক গাড়াডোব বাহাদুরপুর নিবাসী মৌলবী সেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, কুমার খালি নিবাসী মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদুসরুমি সাহেব প্রভৃতি মৌলবীগণ ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া নদীয়ার মুসলমানদিগকে উৎসাহিত ও উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অত্র জেলায় সিয়া মুসলমান নাই বলিলেই হয়; সুন্নী ও মোহাম্মদী দুইটী দল

আছে। সুন্নী সম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত—হানেফি মালেকি, সাফি, ও হাম্বেলী, কিন্তু নদীয়ায় হানিফির সংখ্যাই অধিক। আশরাফ ও আতরাফ উচ্চনীচ অনুসারে সামাজিক বিভাগ নদীয়ায় আছে। এখানকার মুসলমানগণ প্রায়শঃ নম্রস্বভাব, সামাজিক, বিনয়ী ও ভদ্র। শান্তিপুর, মেহেরপুর, বেতাই, দোগাছী, গাড়াডোব বাহাদুরপুর, ঝাউ-বাড়িয়া, বাগুয়ান, চাকদহ, বামনকুপুরিয়া দহকুলা, কুমারখালির নিকটস্থ এদরাকপুর, কমলাপুর, লাহিনীপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বহু সংখ্যক "শরীফ" বা ভদ্র মুসলমান বাস করেন। শিক্ষিত মুসলমান দিগের মধ্যে সম্প্রতি বাঙ্গলা ভাষায় চর্চ্চা দেখা যাইতেছে। কুষ্টিয়া—লাহিনী পাড়া নিবাসী মীর মোসারফ হোসেন "বিষাদসিন্ধু" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইহার মৃত্যু হইয়াছে, শান্তিপুরের মুনসী মোজাম্মেল হক সাহেব "সাহনামার" বঙ্গানুবাদ এবং মহর্ষি মনস্থর "ফেরদৌসী চরিত" প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গাঁড়াডোব বাহাদুরপুর নিবাসী মৌলবী সেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন সাহেব "মেহের চরিত," শোকালন "ইসলামগ্রহণ," "হজরত ইসাকে," "পেশখবরী" "বাঙ্গলাগজল," "ইসলামী" বক্তৃতা," ইসমালের "সত্যতা," 'খতনামা" "হজরত মোহাম্মদের জীবন চরিত" প্রভৃতি ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক লিখিয়া মুসলমান সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন পোড়াদহ আটীগ্রাম নিবাসী দাদআলী সাহেব "ভাঙ্গাপ্রাণ" ও "আসকে রসুল" প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ছোট চাঁদঘর বড় চাঁদঘর নিবাসী মুনসী আসগর হোসেন মুনসী ফসিহুদ্দিন বাঙ্গলা "দো" ভাষা পুঁথি লিখিয়া নদীয়ার মুসলমান সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। অধুনা অত্র জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত মৌলবী সাহেবগণ প্রধান—বেতাই—মৌলবী সৈয়দ নুরলহক, রহমতপুর—মাওলানা ইস্হাক, ফাজিলনগর—মৌলবী মনিরুদ্দিন, আমবাড়িয়া,—মৌলবী আবদুল করিম, নিয়ামত বাড়ী মওলানা আবদুলহামিদ, গাঁড়াডোব বাহাদুর পুর—মৌলবী সেখ জমিরুদ্দিন, হাতিয়া আবদালপুর—মৌলবী জসিমুদ্দীন, আটীগ্রাম—মৌলবী ইসমাইল, মাজু-মৌলবী নছিরুদ্দিন প্রভৃতি চুয়াডাঙ্গা, ধানখোলা, আস্রাকপুর মিনেপাড়া, গোপালনগর, বেতাই, খোসালপুর, রাণাঘাট পাইকপাড়া, শান্তিপুর, চাকদহ, কাজিপাড়া, কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া, কুমার খালি, ইটাবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে সুন্দর সুন্দর পাকা মসজিদ গুলি প্রধান।

অত্র জেলার মুসলমানেরা নিম্নলিখিত পর্ব্বগুলি প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মহরম, আখের-ই-চাহারসুম্বা, ফাতেহা দোহায় দোহান, শবে বরাত ইদুলফেতের, ইদুজ্জোহা।

মহরম চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাস। ৬১ হিজিরীর ১০ই মহরম শুক্রবার তারিখে

মহরম

হজরত মহাম্মদের দৌহিত্র হজরত আলির স্নেহময় তনয় হজরত ইমাম হোসেন সত্যধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দামেস্কা-ধিপতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ এজিদের কোপানলে পতিত হয়েন, এবং কুকীর শাসনকর্ত্তা ওবায়েদুল্লা এবনেজিয়াদের প্রেরিত সেনানী উমর বিন সাদ কর্ত্তৃক পরিচালিত

সৈনিকবৃন্দের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইউফ্রেটাস্ নদীর তীরবর্ত্তী কারবালা নামক ভীষণ-প্রান্তরে স্বীয় অত্যল্প সংখ্যক সহচর এবং আত্মীয় স্বজনসহ অতীব নৃশংসরূপে হত হইয়াছিলেন। শিমর ও খুলি প্রভৃতির অস্ত্রাঘাতে হোসেনের পবিত্র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান দ্বারা মুসলমানগণ এই শোকাবহ ঘটনার স্মৃতি রক্ষা করিয়া থাকেন। সীয়াগণ এই ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া অভিনয় করিয়া থাকেন।

আখির—ই—চাহার স্বম্বা

চান্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাসের নাম শফর। এই মাসের শেষ বুধবারে মুসলমানেরা এই পর্ব্ব প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কথিত আছে এই দিন মহম্মদ তাঁহার শেষ পীড়া হইতে কথঞ্চিৎ নিরাময় হইয়া স্নান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যাঁহারা এই দিনের গৌরব করেন তাঁহারা একখানি কাগজে কোরাণ হইতে নির্দ্দিষ্ট সাতটী শ্লোক লিখিয়া, ঐ লেখাগুলি জলে ধৌত করিয়া পরম পবিত্র জ্ঞানে ঐ জল পান করেন। এই দিনের প্রাতঃকালে নামাজ পড়িয়া দান খয়রাত করিতে হয়।

ফাতেহা—দোহায—দোহান

চান্দ্র বৎসরের তৃতীয় মাসের নাম রবিউল আউল। এই মাসের ১১ই তারিখে মুসলমান ধর্ম্মের সংস্থাপক মহাপুরুষ মোহাম্মদ আরবের মক্কানগরে, ভাগ্যবান আবদুল্লার ঔরষে, আমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার ৬৩ বৎসর পরে এই দিনে তিনি নশ্বর জগত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুবিমল, সুখশান্তিপূর্ণ, পবিত্র স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। এই উভয় ঘটনা স্মরণার্থে মুসলমানেরা অত্র দিনে মৌলুদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকেন।

শবেবরাত

চান্দ্র বৎসরের অষ্টম মাসের নাম শাবান। শাবান মাসের ১৫ই তারিখের রাত্রি। এই তারিখে মনুষ্য মাত্রেরই রেজক (খাদ্য) বন্টন হয় বলিয়া কথিত আছে। এই রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া নামাজ পাঠ ও দান খযরাত করা একান্ত উচিত।

ইদুল-ফেতর

চান্দ্র বৎসরের নবম মাসের নাম রমজান। এই মাসে সমস্ত দিন মুসলমানেরা "রোজা" রাখিয়া থাকেন। সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত পান ভোজন না করা এবং সমস্ত পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকা উচিত। রমজান মাসের চন্দ্র গত হইয়া নূতন চাঁদ উঠিলেই, তাহার পরদিন এই পর্ব্ব উদযাপিত হইয়া থাকে। সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, নববস্ত্র পরিধান করিয়া ইদ্‌গা বা মসজিদে যাইয়া নামাজ ও খোদবা পড়িয়া থাকেন। এই তারিখে দরিদ্রদিগকে দান করিলে বিশেষ পুণ্য হয়।

ইদুজ্জোহা

জেলহজ্জ মাসের ১০ই তারিখে এইপর্ব্ব সম্পন্ন হয়। বহুকাল পর্ব্বে মহর্ষি ইব্রাহিম ঈশ্বরের আদেশে স্বীয় একমাত্র পুত্র ইসমাইলকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা স্মরণ করাই অত্র পর্ব্বের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দিনে উক্ত ইদের ন্যায় মুসলমানেরা নামাজ ও খোদবা পড়িয়া

থাকেন। নামাজান্তে কুরবানী করিতে হয়। নদীয়া জেলার মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য প্রায়ই ছাগ, মেষ কুর্ব্বানী করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বগুলি ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ দুই একটী পর্ব্ব বিদ্যমান আছে। এই জেলার মুসলমানগণকে এই সকল পর্ব্ব ব্যতীত আরও এক প্রকার পূজা অর্চ্চনার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। সেগুলি সাধারণতঃ ভগবৎ জানিত পীর, ফকির বা গাজীগণের পূজা। প্রায়শঃ কোন একটী বৃক্ষের মূলে এই সকল স্বনামধন্য পীর মহাশয়-গণের আস্তানা দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়া জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই এইরূপ দু একটী আস্তানা বিদ্যমান আছে; কোন কোন স্থানে ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র দরগাও এতদর্থে দেখা যায়। সাধারণতঃ পীর মরিয়ৎ, পীর তরিকৎ, পীর হকিকৎ এবং পীর মরিফৎ এই চারি প্রকারের পীর এইরূপে পূজা পাইয়া থাকেন। হিন্দুগণও নবপ্রসূত গাভীর দুগ্ধ ও বাতাসা প্রভৃতি দ্বারা ইহাদের তুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন। নদীয়া জেলার মুসলমানগণ সাতপীর, পাঁচপীর, পীর বদর প্রভৃতি মহাপুরুষগণেরও পূজা করিয়া থাকেন এবং নদীয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন আস্তানার মধ্যে রাণাঘাটের অদূরবর্ত্তী পাটুলীগ্রামের বড় পীরের আস্তানা; মাটীয়ারীর মল্লিকগসের দরগা এবং পলাশীর অদূরস্থিত মাঙ্গনপাড়া ফরীদতলা গ্রামের ফকীর ফরীদ-সা-সকরগঞ্জএর দরগার সম্মান করিয়া থাকেন। এই দরগার মধ্যেই সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরদমন সমাহিত আছেন।

নদীয়া হিন্দু প্রধান স্থান হইলেও জনসংখ্যা হিসাবে এখানে মুসলমানেরই প্রাধান্য অধিক। ইহার কারণ নিম্ন লিখিতরূপ অনুমান করা যায়। ১ম,—মুসলমানাধিকারে সময়ে সময়ে মুসলমানগণ বল প্রকাশ দ্বারা গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়াছিল। ২য়—হিন্দুর মধ্যে যে সকল হীন জাতীয় ব্যক্তিগণ সমাজের চক্ষে অতি ঘৃণিত ভাবে দৃষ্ট হইত, তাহারা তাৎকালিন দেশের রাজার সহিত সমধর্ম্মী হইয়া কথঞ্চিৎ উন্নত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এখনও যে এতদ্দেশে ভদ্র অপেক্ষা নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে খ্রীষ্টধর্ম্মানুবর্ত্তন করিয়া থাকে তাহার কারণও এই। ৩য়,—ঢাকা ও মুরশিদাবাদের মুসলমান প্রভাব নদীয়া প্রভৃতি স্থানে প্রবল ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

খ্রীষ্টান

এই জেলার খ্রীষ্টান অধিবাসীদের মধ্যে Roman Catholic ও Protestant উভয়বিধ খ্রীষ্টানই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের প্রধান আড্ডা কৃষ্ণনগর, কাপাসডাঙ্গা, রাণাঘাট, মেহেরপুর, বাঙ্গাল ঝি, বোড়গাছি, চাপড়া, সলুয়া, রতনপুর, বল্লভপুর, শিকারপুর, প্রভৃতি স্থানে। ইহাদের অবস্থাও অতি হীন; অধিকাংশ কৃষিকার্য্যের উপরই

জীবিকা নির্ভর করে। কৃষ্ণনগরস্থ ৺ রায় দ্বারিকানাথ দে বাহাদুরের বংশাবলীর ন্যায় সুসভ্য বংশও দু এক ঘর দেখা যায় কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম। খ্রীষ্টান মিসনারি-গণ অত্র জেলায় বহু স্থানে স্বধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে, স্কুল দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল প্রচার দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রভৃতির মধ্যে বিখ্যাত সিভিলিয়ান জে, মনরো (J. Monro) প্রতিষ্ঠীত রাণাঘাটের অদূরস্থিত দয়াবাড়ী নামক দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষ্ণনগরের মিসনারি স্কুল প্রভৃতি লোক হিতকর কার্য্যগুলি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।৫ এই সকল মিসনারি সাহেবদের মধ্যে অনেক সময়ে অনেক উদারচেতা মহাত্মা আগমন করিয়াছেন। বিগত ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীলহাঙ্গামার সময় যে সকল মহানুভব ইংরাজ, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জেতা বিজেতার তারতম্য ভুলিয়া নীলকর-পিড়ীত প্রজাকুলের সাহায্যার্থ নির্ভীক হৃদয়ে স্বজাতীয় অত্যাচারী নীলকরগণের বিপক্ষে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শান্তিপুরের মিসনারী সোসাইটীর Rev. C. Bomwelsch, কৃষ্ণনগর সমিতির Rev. T. H. Blumhardt Rev. F, Schurr প্রভৃতি দেব প্রকৃতি সাহেবগণের নাম ; এবং বিগত ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের নদীয়া দুর্ভিক্ষে Rev, T, G, Lincke ; কাপাস ডাঙ্গার Rev, Schuar প্রমুখ যে সমস্ত পরদুঃখকাতর সাহেবগণ প্রজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া দুর্ভিক্ষের কঠোরতার প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন নদীযার ইতিহাসে সেই সব মহাপুরুষের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম

নদীয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার বা প্রসার কখনই হয় নাই। আদম সুমারীতে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী জন সমষ্টি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী জন সমষ্টির তুলনায় নগণ্য। নদীয়াধিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হইতে দেখা যায়, কিন্তু কলিকাতা হইতে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একজন শূদ্রকে উক্ত সমাজের জন্য আচার্য্য নিয়োগ করিয়া পাঠান হেতুতে মহারাজা বিরক্ত হইয়া রাজবাটী হইতে এই সমাজ উঠাইয়া দেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরে অনেক যুবক এই ধর্ম্মে দিক্ষীত হয়েন, ইহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চাকদহে একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়, এতদ্ব্যতীত নদীয়ার মধ্যে শান্তিপুর, কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে আরও কয়েকটী সমাজ স্থাপিত হয়, কিন্তু বর্ত্তমান কালে কোথাও বা উহার অস্তিত্ব আছে, কোথাও বা কোনও রূপে উহা চলিতেছে। একমাত্র শান্তিপুরের সমাজের কথা কখন কখন শুনা যায় মাত্র। বর্ত্তমানকালে শান্তিপুর,

কুমারখালি ও কৃষ্ণনগরে জনকয়েক উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। শান্তিপুর হইতে উক্ত সমাজের মুখপত্র স্বরূপ যুবক নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির হয়, নদীয়ার ব্রাহ্মগণের মধ্যে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় দ্বয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

রামতনু লাহিড়ী

রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ১৮১৬ খ্রীঃ কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যৌবনে উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ধারাবাহিক সৎ-কর্ম্মমালা দ্বারা ইহাঁর সমুদয় জীবন সমুজ্জ্বল। তাঁহার ন্যায় উদার-চরিত্র, উন্নত হৃদয় ও সৎসাহসী ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না, তিনি কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি ইংরাজ সকলেরই নিকট সবিশেষ মান্য ছিলেন; তিনি বহুদিন কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র বল সম্বন্ধে শত শত গল্প এদেশে প্রচলিত আছে ১৮৯৮ অব্দে ইনি স্বর্গ গমন করেন, কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা এস. কে. লাহিড়ী ইহাঁর পুত্র। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সুবিখ্যাত লেথব্রীজ সাহেব এই মহাত্মার দুইখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

জন্ম ১২৫১, মৃত্যু ১৩০৬ সাল। ইনি শান্তিপুরে অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বর প্রেমিক সাধুপুরুষ বলিয়া ইহাঁর খ্যাতি অসাধারণ, ১২৬৮ সালে ইনি উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও কলিকাতা সমাজের অন্যতম প্রচারক নিযুক্ত হয়েন। ইনিই সঙ্কীর্ত্তনকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার অঙ্গীভূত করেন। ইহাঁর রচিত গীতাবলী ইহাঁর সুকণ্ঠে গীত হইয়া সকলকেই মুগ্ধ করিত। সুবক্তা বলিয়াও তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি ছিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি লিখিয়াও তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ১২৮৯ সালে ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান হয়েন এবং শেষ বয়স প্রেমাকুলিত হৃদয়ে ৺ পুরুষোত্তমধামে যাঁপন করেন। সম্প্রতি ইহাঁর একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

হিন্দু

নদীয়ার হিন্দু অধিবাসিগণ নানা মূলধর্ম্মে ও শাখাধর্ম্মে বিভক্ত, যথা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব এবং কর্ত্তাভজা, বলরামভজা ইত্যাদি। এতন্মধ্যে শ্রীচৈতন্য দেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং কর্ত্তাভজা, বলরামভজা সম্প্রদায় প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তিস্থান এই নদীয়া জেলা। এখানে শাক্ত বা শৈব অপেক্ষা বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক। ব্রাহ্মণগণ প্রায়শঃ শাক্ত অথবা শৈব। এক সময়ে নদীয়ায় এই দুই ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানকালে ক্রিয়ান্বিত তান্ত্রিক বা শৈব দুর্লভ।

সাধারণ হিন্দুগৃহস্থগণ ক্রিয়াকর্ম্মে নদীয়ার গৌরব-রবি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট কৃত "শ্রীহরিভক্তিবিলাসের" মতেরই প্রচলন দেখা যায়। ভেকধারী এবং খাঁটী বৈষ্ণব মতানুশারী ব্যক্তিগণ ব্যতীত নদীয়ার সাধারণ লোকে সাম্প্রদায়িক মতভেদ হইতে দূরে রহিয়া নিম্নলিখিত পর্ব্বগুলি অবশ্য করণীয় মনে করেন। নানা কারণে অধিবাসীগণের অবস্থা হীন হওয়ায় ইচ্ছা থাকিলেও সকলে এখন সচরাচর ক্রিয়াকর্ম্ম, ব্রত, পার্ব্বণাদি করিতে পারেন না তবে কোনও কোনও ক্রিয়াবান্ ভাগ্যমন্ত বংশে এই সমস্ত পর্ব্বগুলিই অনুষ্ঠিত হয়,—নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া পার্ব্বণ এবং ব্রত নিয়মাদি কার্য্য, শালগ্রাম শীলা সেবা, পূজা, ভোগ; শিবপূজা ইত্যাদি সন্ধ্যা আহ্নিক কৃত্য (নিজ নিজ, ইষ্টদেবতার আরাধনা, জপ, পূজা ইত্যাদি); অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণভোজন। গঙ্গাস্নান, তর্পণ যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গাস্নান ও পুরোশ্চারণ, শান্তি স্বস্ত্যয়ণ, তুলশী নিবেদন প্রভৃতি, জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাসন, চূড়াকরণ কর্ণবেধ ইত্যাদি দশবিধ সংস্কার ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ইত্যাদি ভোজন; ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও আদ্যশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া; পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদি, দোলযাত্রা, দশহরা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রিপূজা, কার্ত্তিকপূজা, [illegible], সরস্বতীপূজা, দোলযাত্রা, শিবের গাজন। এতদ্ব্যতীত ব্রতাদি যথা অক্ষয়তৃতীয়া, সংক্রান্তী, সাবিত্রীব্রত, জন্মাষ্টমী, দুর্ব্বাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দ্দশীব্রত, অরণ্যষষ্টীব্রত, একাদশীব্রত, কাত্যায়নী ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য ব্রত, তাল নবমীব্রত, দুর্গানবমী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃত্য, ললিতা সপ্তমী, শিবারাত্রিব্রত, রামনবমীব্রত, সীতা নবমীব্রত, ষট্‌পঞ্চমীব্রত, জলদান ব্রত। বালিকাদিগের আচরণীয় ব্রত পুণ্যপুকুর, যমপুকুর, সাঁজুতি, তুষলা, ইতু বা ঋতু পূজা প্রভৃতি।

পূণ্যমাসে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ, কথকথা ও তদঙ্গভূত ক্রিয়াদি। শ্রীহরিবাসর, শ্রীশ্রীনগর সংকীর্ত্তন এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বাদি এবং "পোষলা" ইত্যাদি গ্রাম্য পর্ব্বাদিতে সাধারণে উৎসবাদি করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম

এই গৌড় মণ্ডলে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণবের মধ্যে একমাত্র মাধ্বাচারী সম্প্রদায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ শ্রীগৌরাঙ্গদেব মাধ্বাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান কালে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এতদঞ্চলে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা শ্রীচৈতন্যদেবেরই মতানুসারী। এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম,—যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কোন মতামত গ্রাহ্য করেন না।

২য়,—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ নিরুক্তমতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন।

৩য়,—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকেই উপাস্য জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।

৪র্থ,—যাঁহারা নামে বৈষ্ণব হইলেও আচার ব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথাবলম্বী।

এতন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণবের সংখ্যা নদীয়ায় নগণ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের সংখ্যা প্রায় সমপরিমাণ এবং চতুর্থ শ্রেণীর সংখ্যা অত্যাধিক। প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধে বক্তব্য কিছুই নাই ; তাঁহারা চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর আচরিত ধর্ম্ম যথাযথ আচরণ করিয়া থাকেন। এই দুয়ের যজন যাজন, আচার ব্যবহার, প্রায় সমস্তই একরূপ ; কেবল প্রভেদ এই কেহ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন কেহ বা শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে উপাসনা করেন। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণের ভরভিত্তি "প্রেম"। শ্রীমন মহাপ্রভু আত্ম চরিত্রে আচরণ করিয়া এই ধর্ম্ম লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কোনও পুস্তকাদি লিখিয়া এই ধর্ম্মের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই ; তবে সময়ে সময়ে তাঁহায় শ্রীমুখ হইতে যে সকল অমৃতময়ি উপদেশমালা বহির্গত হইত তাহাই পার্শ্বদ ভক্ত বৈষ্ণবগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেইগুলি হইতে এই ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ ও অভিপ্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে আবার যে আটটী শ্লোক বৈষ্ণব জগতে শিক্ষাষ্টক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই অষ্ট শ্লোকই এই ধর্ম্মাবলম্বীগণের যথাসর্ব্বস্ব। তিনি এতদ্দারা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের লক্ষণ ও কর্ত্তব্যাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে যে সকল গ্রন্থ বা মত গ্রাহ্য শ্রীচৈতন্য দেবও সেই সকল গ্রন্থ ও মতানুবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তিনি উপনীষদ শ্রুতি ও আর্য্যঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সমূদয়ের গৌনার্থ ত্যাগ করিয়া মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান। শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই ত প্রমান॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য সেই কয়। লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামান্য নাহি হয়॥"

এইরূপে শাস্ত্র সমুদয়ের ভক্ত্যাত্মক মুখ্যার্থ করায় কোনও কোনও স্থলে তাঁহার মত কিছু নূতন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যাহা দেখিতেন, যাহা করিতেন, যাহা বলিতেন সমস্তই ভক্তির দিক হইতে সুতরাং তাঁহার মত কেবলি ভক্তি মাখা, অন্যথা তিনি স্বয়ং কোন নূতন মত উদ্ভাবন করিয়া যান নাই। ইনি প্রমাণ স্বরূপ সর্ব্বদাই শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, অষ্টাদশপুরাণ, ব্রহ্ম সংহিতা প্রভৃতির আবৃত্তি করিতেন। এতদ্ব্যতীত উপনিষদ, শ্রুতি প্রভৃতিরও যথেষ্ট আদর করিতেন। তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান ও সাকার বলিয়া জানিতেন এবং নন্দদুলাল, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং পূর্ণভগবান বলিয়া স্বীকার করিতেন। এই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাকেই তিনি জীবনের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ করিতেন এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তনকেই কলির জীবের একমাত্র গতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

রামানন্দ রায় যে প্রণালীক্রমে অধিকারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই শ্রীচৈতন্যর অনুমোদিত। জ্ঞানশূন্য ভক্তি প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, কান্তভাব এই কয়টীর সাধনার ক্রমোন্নত উপায় আবার শ্রীরাধিকার যে প্রেম অর্থাৎ মহাভাব সমাধি তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সখীভাবে আপনাকে তদ্বৎজ্ঞানে যে উপাসনা ও সেবা তাহাই তৎপ্রাপ্তি পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়। পরচর্চ্চা, পরহিংসা পরস্ত্রীসম্ভাষণ প্রভৃতি একান্ত পরিত্যাজ্য এ সকল অপরাধে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রের নিকট কাহারও মার্জ্জনা ছিল না; আন্যের কথা কি এক দিন তাঁহার প্রিয় পার্শ্বদ ছোট হরিদাস, শিখিমাইতির বৃদ্ধা ভগ্নী মাধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে প্রভু তাঁহার দ্বারবন্ধ করিয়াছিলেন। হরিদাস নবদ্বীপবাসী, বাল্যকাল হইতে প্রভুর অনুগত, এবং তিনি সুকণ্ঠবিধায় প্রভু তাহাকে আপনার কীর্ত্তনীয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ বর্ত্তমান কাল প্রচলিত "খোল" বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার করায় তিনি বৈষ্ণব জগতে বিশেষ মান্যবান হইয়াছিলেন; কিন্তু, শ্রীপ্রভু, হরিদাসের সকল গুণ ভুলিয়া—

"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥"

এই বলিয়া তাহাকে দণ্ড করিলেন। হরিদাসও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রয়াগের ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রীপ্রভু মর্কট বৈরাগ্যের পরম বিদ্বেষী ছিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভু নিরূক্ত এই সমস্ত পন্থারই অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন।

এই তৃতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল উপদেষ্টা নহেন পরন্তু উপাস্য দেবতা। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা বর্ত্তমান কালে অত্যধিক না হইলেও ইঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইঁহাদের মতে শ্রীচৈতন্যদেবই দ্বাপরের অভেদ শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং পূর্ণাবতার। যিনি কৃষ্ণাবতারে বলরাম তিনিই চৈতন্য অবতারে নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত সাক্ষাৎ সদাশিব। তাঁহারা এইরূপে শ্রীচৈতন্য দেবের অন্যান্য পার্শ্বদগণেরও পূর্ব্বজন্মের অর্থাৎ দ্বাপরাদি লীলাকালীন কে কি ছিলেন তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।

কাঁচড়াপাড়া নিবাসী কবিকর্ণপুর পরমানন্দ দাস তাঁহার বিরচিত "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় মথুরা ও গৌড়বাসী ভক্তগণের পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্ববিবরণ নিরূপণ করিয়াছেন তাঁহার মতে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ মহত্তম, নীলাচল বাসীরা মহত্তর এবং দাক্ষিণাত্যবাসী চৈতন্য কৃপাপ্রাপ্ত জনগণ মহান্ত (সংখ্যায় চৌষট্টি) এবং শ্রীচৈতন্য, মহাপ্রভু; অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই দুই প্রভু, নিত্যানন্দের মর্ম্মী সঙ্গীগণ (সংখ্যায় দ্বাদশ—গোপাল এবং তাঁহাদের সম্পর্কে যাঁহারা এই সম্প্রদায় ভুক্ত তাঁহারা উপগোপাল (সংখ্যায় দ্বাদশ)। এখন যেমন গোস্বামী বংশে জন্ম লইলেই তিনি গোস্বামী হইতে পারেন, তখন সেরূপ

ছিল না। "গো" অর্থে ইন্দ্রিয়গণের যিনি স্বামী অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী তিনিই তখন গোস্বামীপদ বাচ্য হইতে পারিতেন, সেই তদানীন্তন অসংখ্য ভক্তিমান বৈষ্ণবের মধ্যেও তখন মাত্র ছয়টী গোস্বামী ছিলেন যথা, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথভট্ট শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথদাস।

এই সম্প্রদায়ীগণের মতে দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণই ভগবানের কূটস্থ রূপ। পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকা লীলাচ্ছলে অনুপম সুখসম্ভোগ করিতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অতুল মাধুর্য্য রসানুভব করিয়া শ্রীরাধিকা যে সুখ ভোগ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ সে রসাস্বাদে হইতে বঞ্চিত হইতেন; তাই তিনি আপনার মাধুর্য্য আপনি অনুভব করিতে একদেহে রাধাকৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েন।* ইহা ব্যতীত প্রেমভক্তি বিকাশ ও হরিনাম প্রচারও অন্যতম উদ্দেশ্য। কলিকালে শ্রীভগবান শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিবেন এই মতের পোষকে তাঁহারা অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের মত পুষ্ট করিয়া থাকেন। সে সকল অখণ্ডনীয় যুক্তির সম্মুখে বৃথা বাকজাল ছিন্ন হইয়া যায়।

ভক্তি ও প্রেম এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বস্ব। তাঁহাদের মতে জীবমাত্রে ঐ প্রেম ভক্তির অনুষ্ঠানের অধিকারী। এই সম্প্রদায় প্রেমের অন্তর্গত শান্ত, দাস্য, সখ্য, মাধুর্য্য ও বাৎসল্য এই পাঁচ প্রকার ভাব স্বীকার করেন। নামসংকীর্ত্তন এই সম্প্রদায়ের প্রধান সাধন, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামনায় উপবাস, নৃত্য গীত ও রিপুসংযমাদি চৌষট্টি প্রকার সাধনেরও ব্যবস্থা আছে। তবে সকল সাধনাতেই ইহারা গুরুর প্রয়োজন স্বীকার করেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদের নিকটেও গুরুর স্থান অতি উচ্চে।

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি ও পূর্ব্বোক্ত ছয় গোস্বামীর পুত্র কলত্রাদি ইহাদের গুরু স্থানীয় এবং সকলেই ইহাদের কাহার না কাহারও পরিবার। তাঁহারা গৃহী বৈষ্ণবগণকে মন্ত্রদান করিয়া থাকেন কখনও বা শিষ্য দের কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করেন' আবার কখনও বা চৈতন্য মন্ত্রও দান করিয়া থাকেন। এই সকল বৈষ্ণবগণ গৃহে থাকিয়া গৃহী শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত পন্থানুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আবার যাঁহারা বৈরাগ্য অবলম্বনে জাতি কুল, মান, পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে "ভেক" লইতে হয়। এ ক্ষেত্রে গোস্বামীগণ শিষ্যকে মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া ডোরকৌপিন বহির্বাস, তিলকমুদ্রা, করঙ্গ বা ঘটী এবং জপমালা ও ত্রিকণ্ঠি গলমালা অর্পণ করিয়া মন্ত্রাদেশ করেন। এক্ষণে তাঁহারা ঐ কার্য্য ভার বৈষ্ণবদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পঞ্চতত্ত্বের ভোগ, ও বৈষ্ণবগণকে মহোৎসব করিয়া ভোজন করাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন নিত্যানন্দ প্রভু এই ভেকাশ্রমের সৃষ্টি করেন।

বর্ত্তমান কাল প্রচলিত রীতি অনুসারে এই ভেকাশ্রমী বৈষ্ণবগণও বিবাহে অধিকারী। এ বিবাহে ছড়িদার বর কন্যা উভয়ের কণ্ঠিবদল করাইয়া দেন এবং স্বল্প দক্ষিণা ও গোস্বামীর' নিমিত্ত ন্যূনসংখ্যা পাঁচসিকা গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির ভোগ ও মহোৎসব হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ী বৈরাগীদের মধ্যে বিধবা

বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে, তবে দ্বিতীয়বার বিবাহের পর স্ত্রীর সীমন্তে সিন্দুর দেওয়ার নিয়ম নাই। গৃহী বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই। এই সকল ভেকদারী বৈষ্ণবগণের মধ্যেই ব্যভিচার কদাচার প্রভৃতি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে ইহাদের অনেককে বৈষ্ণব বলিতেই কুণ্ঠা জন্মে।

যাহারা চৈতন্যদেবকে উপাস্যরূপে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্যান্য দেবতার ন্যায় শ্রীনিমাইয়েরও ধ্যান, মন্ত্র, পূজা প্রণালী ও স্তবাদি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

এই সকল সম্প্রদায় ব্যতীত নেড়ানেড়ী, বাউল প্রভৃতি কতিপয় কদাচারী বৈষ্ণব, সম্প্রদায় এতদঞ্চলে দেখা যায়। তাহাদের আচার ব্যবহার, কর্ম্মকাণ্ড বৈষ্ণবগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং মুখে "জয় চাঁদ গৌর, জয় চাঁদ নিত্যানন্দ বা বীর অবধূত" বলিলেও কখনও কার্য্যে তাঁহাদের উপদেশ মানিয়া চলিতে দেখা যায় না; পরন্তু তাহার ব্যভিচার পদে পদে দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয় চর্চ্চার স্রোত অতি প্রবল এবং সেই কুহকে মজিয়া বহু ইতর জাতিয় লোক এই সকল সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া পড়ে।

হায়! প্রেম ভক্তিমাখা সুনির্ম্মল, জগন্মঙ্গল ধর্ম্মের সেই উচ্চতম আদর্শ হইতে কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন হইয়াছে। ইহা হইতেই দেশের লোকের প্রকৃতি অনেকটা অনুমিত হয়। কি পরিতাপের বিষয়! কিছুদিন পূর্ব্বে বৈষ্ণব বলিলে যে আচারবান ধীর প্রেমিক ভক্তের উজ্জ্বল ছবি মানস নয়নে উদ্ভাসিত হইত এক্ষণে ঠিক তদ্বিপরীত। বৈষ্ণব এখন একটা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। লম্পট, ব্যভিচারী, মর্ক্কট বৈরাগ্যধারী নরনারী এখন অনায়াসে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেছে। হায়! মহাপ্রভু! তোমার স্বহস্ত প্রোথিত মহাদ্রুমের এ অকাল নাশ কেন ঘটাইলে প্রভু? দিলে ত আবার কাড়িয়া লইলে কেন? জানি, আমরা এতই কলুষিত যে তোমার বিমল দয়ার আশা করাও আমাদের ধৃষ্টতা; কিন্তু হে দয়িত হে প্রিয়তম, হে ভুবনৈকনাথ, তোমারই চন্দ্র সূর্য্য কি পাপী ও পুণ্যাত্মাকে সমভাবে কিরণ দেন না? তুমি ত পতিতেরই নাথ, পুণ্যাত্মা ত নিজের পুণ্যে তোমাকে লাভ করে; কিন্তু তুমি ত পাপীতাপীর অনন্যশরণ! তবে নাথ! ইচ্ছাময় তুমি তোমার ইচ্ছা আমরা কি বুঝিব। ঐ দেখ! তোমার অকলঙ্ক ধর্ম্মে,কেমন কলঙ্কমসী মাখাইতে বসিয়াছি শিশ্নোদর পরায়ণ ধর্ম্মধ্বজী এক একজন ব্যভিচারিণী দুই দশটী রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছি। এস নাথ! আর একবার এস—তোমার পবিত্র পদস্পর্শে এই কলুষিত ধরা আবাব পবিত্র হউক।

কর্ত্তাভজা

নদীয়া হইতে যে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তন্মধ্যে কর্ত্তাভজার দল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পরই উল্লেখযোগ্য; কারণ যত সংখ্যক নরনারী এই দলভুক্ত তত লোক এক

বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় না। তবে এ দলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সংখ্যাধিক্য। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা তিন গুণ অধিক এবং সেই কারণেই বোধ হয় ইহাদের মধ্যে ব্যভিচারের স্রোত এত প্রবল। একদিন যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল "মেয়ে হিজরে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা," এখন সেই উচ্চ আদর্শ কিরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও পরস্ত্রীগমন বা তৎচিন্তা পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সম্পূর্ণ বিধি-বিরুদ্ধ, তথাপি বহু সংখ্যক নরনারী সর্ব্বদা একত্র সহবাস করায় এক্ষণে নরসেবা ও নারী-সেবাই এ ধর্ম্মের সর্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও বর্ত্তমানকালে এই সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণের মধ্যে এরূপ অধঃপতন দৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু এই মত প্রবর্ত্তনকালে ইহার প্রবর্ত্তক আউলচাঁদের আদেশ অতি জ্ঞানগর্ভ ও সদুপদেশপূর্ণ। তাঁহার আদেশ এই পরস্ত্রী-গমন, পরদ্রব্যাপহরণ, এবং প্রাণীহত্যা সাধন এই ত্রিবিধ কায়িক কর্ম্ম ও ঐ ত্রিবিধ কর্ম্ম-সাধনের ইচ্ছা, মিথ্যাকথন, কটু ভাষণ, বৃথাভাষ ও প্রলাপভাষ এই চারি প্রকার বাক্‌কর্ম্ম, সর্ব্বসমেত এই দশবিধ কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এই সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্রের মূল সূত্র গুরুসত্য"। কেহ উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে চাহিলে প্রথমতঃ সে ঐ মূলমন্ত্র প্রাপ্ত হয় পরে ইহার প্রতি তাহার বিশ্বাস স্থিরতর হইলে তখন সে "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, যা বলাও তাই বলি যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই, গুরুসত্য বিপদ মিথ্যা"[৭] ইত্যাকার মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। এই সম্পূর্ণ মন্ত্রের নাম ষোলআনা। যাঁহারা মন্ত্র দেন তাঁহাদের আখ্যা "মহাশয়," এবং শিষ্যের আখ্যা "বরাতি," সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি মাত্রের নাম "ভগবজ্জন" এবং সম্প্রদায় বহির্ভূত লোক মাত্রকেই তাঁহারা ঐহিক লোক বলেন। এই সম্প্রদায়ের কাঁচা অবস্থার নাম প্রবর্ত্তক তারপর সাধক, তারপর সিদ্ধ, সর্ব্বশেষ সিদ্ধের সিদ্ধ। এই সম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে সাধারণতঃ কতকগুলি সাঙ্কেতিক বাক্য আছে, যাহা দ্বারা তাঁহারা তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। ইহারা মৃত্যুকে "দেহরক্ষা" বলেন এবং আপনার বাটীকে "বাসা" বলেন অর্থাৎ ঘোষপাড়া সকলের একমাত্র প্রকৃত বাটী এবং তদ্ব্যতীত অন্য আশ্রয় কেবল বাসা মাত্র। ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবে জাতিভেদ প্রথার আটাআটি কিছুমাত্র নাই এবং ইহাদের পরস্পরের অন্নবিচারও কিছুমাত্র নাই তবে বাহিরে সমাজের নিকট ইহাদিগকে সাধারণ হিন্দুর ন্যায় বর্ণাচার ও কুলাচার মানিয়া চলিতে দেখা যায়। যিনি যে বর্ণে জন্মলাভ করিয়াছেন তিনি সেই বর্ণের সমস্ত ব্যবহারই মানিয়া চলেন এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাবুরা যাঁহারা এই ধর্ম্মের ধুরন্ধর, তাঁহাদেরই সাধারণ সদ্গোপের ন্যায় সমস্ত হিন্দু আচার মানিয়া চলিতে হয় এবং বিবাহাদি সমস্ত কার্য্যই হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী স্ববর্ণে হইয়া থাকে, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের এই প্রকার আটপৌরে ও পোষাকীভাবদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ব্যবহার ও পরমার্থ দুইই সমভাবে পালনীয়; ইহার পোষকে ইহাদের মধ্যে একটী বচনও দেখা যায়, "লোকের মধ্যে লোকাচার সদ্গুরুর মধ্যে একাকার" এই ধর্ম্ম সাধারণতঃ সমাজের হীন জাতীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আচরিত হইলেও স্থানে স্থানে দুদশজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও এই মতানুবর্ত্তী দেখা যায়।[৮]

এই দলের উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদঞ্চলে বহুবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। উহাদের মধ্যে কোন আখ্যানটী প্রকৃত, কোনটী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এ সকল অবধারণ করা অতীব দুরূহ ; সুতরাং, যে মতটী বহুজন মান্য তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে।

এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ আউল চাঁদ। তাঁহার সম্প্রদায়ী লোকেরা তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অঙ্গে অপ্রকট হইয়া অলক্ষ্যে সন্ন্যাসীর বেশে আলোরপুর পরগণার খোলাডুবলী উৎপলি গ্রামে বহুকাল যাপন করিয়া পরিশেষে ১৬১৬ শকের ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবারে নদীয়াস্থ উলাগ্রামে মহাদেব বারুইয়ের পানের বরোজে এক অষ্টমবর্ষীয় বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি মায়াবশে এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকটীকে গৃহে লইয়া পালন করিতে থাকেন। তিনি ঐ বালকের নামকরণ করেন পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র প্রায় ২২ বৎসর কাল ঐ মহাদেবের গৃহে থাকিয়া পরে ছলক্রমে তথা হইতে যাইয়া এক গন্ধবণিকের গৃহে দুই বৎসর বাস করেন, পরে সেখান হইতে এক জমিদারের গৃহে কিছুকাল থাকিয়া পরিশেষে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও অন্যান্য বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে "বেজরা" গ্রামে উপনীত হয়েন। এই গ্রামে থাকিয়াই তিনি সর্বপ্রথম জাহির হয়েন এবং হটুঘোষ তাঁহার সর্ব্বপ্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, পরে একে একে আরও ২১ জন ব্যক্তি সর্ব্বসমেত ২২ জন তাঁহার প্রধান শিষ্য ও অনুচর হইয়া উঠেন।* এই ২২ জন শিষ্য সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ বচন প্রচলিত আছে।—

এই সময়ে যেমন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল তেমনি আউলেচাঁদের অদ্ভুত খ্যাতিও বিস্তার হইতে লাগিল এবং তাঁহার ভক্তগণও তাঁহাকে নানারূপ সম্বোধন করিয়া তাঁহার নামের অভিধান বাড়াইতে লাগিলেন। আউলচাঁদের অসংখ্য নামের মধ্যে এই কয়টী প্রধান, যথা, আউলে মহাপ্রভু, ঠাকুর, প্রভু, আউলে ব্রহ্মচারী, কাঙ্গালী প্রভু, গোঁসাই ও কর্ত্তা। এতন্মধ্যে আবার কর্ত্তা নামটীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। "কর্ত্তা" অর্থে ঈশ্বর, যিনি এই জগতের স্রষ্টা, পোষ্টা ও হন্তা সুতরাং কর্ত্তা এবং তাঁহাকে যাহারা ভজনা করে তাহারা কর্ত্তাভজা। এইরূপে বহুদিন বহুলোকের ভক্তিশ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়া এবং চাকদহের নিকটবর্ত্তী "পরারী" নামক স্থানে বহুদিন বাস করিয়া ১৬৯১ শকে "বোয়ালে" নামক গ্রামে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁহার দেহ রক্ষার পর তাঁহার অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে রামশরণ পাল, হটুঘোষ, হরিঘোষ, শ্যামবৈরাগী, কানাইঘোষ, সহস্ররাম ঘোষ, ভীম রজপুত এবং বেচুঘোষ প্রভৃতি ৮ জন প্রধান শিষ্য "বোয়ালে" গ্রামে তাঁহার কন্থার সমাধি দেন পরে চাকদহের তিনক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী পরারী গ্রামে তাঁহার দেহের সমাধি করেন।

আউলচাঁদের ২২ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে এক রামশরণ পাল ব্যতিরেকে অন্য কোনও শিষ্যের নাম বা খ্যাতি তত অধিক নাই। ইহাদের মধ্যে ২।১ জন শিষ্যের বংশ

নদীয়ার এখানে ওখানে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় তবে এক রামশরণ পালের বংশীয়রাই সাধারণতঃ কর্ত্তাভজা বলিয়া খ্যাত।

এই রামশরণ পাল চাকদহের নিকটবর্ত্তী জগদীশপুর গ্রামে সদ্গোপ বংশীয় এক গৃহস্থ ছিলেন। ইহার পিতার নাম নন্দরাম পাল এই নন্দরামের এক ভ্রাতা ছিলেন তাঁহার নাম সভারাম। উহারা একান্নবর্ত্তী ছিলেন। সভারামের বংশাবলী অদ্যাপি জগদীশপুরে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত এই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের কোনরূপ সংস্রব নাই। রামশরণের অল্প বয়সে জগপুর গ্রামের শিশুঘোষের কন্যা গৌরীর সহিত বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে রামশরণের দুইটী কন্যা সন্তান হয় কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কন্যা দুইটীর সহিত তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি গোবিন্দপুরবাসী গোবিন্দ ঘোষের সরস্বতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সরস্বতীই দেহান্তে "সতীমা, শচীমা" বা "কর্ত্তামা" নামে খ্যাতাপন্ন হইয়া উঠেন।

রামশরণের বংশ পরিচয় ও আউলচাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে যে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এতদূর পর্য্যন্ত সকল গুলিতেই একরূপ বর্ণিত হয় কিন্তু ইহার পরে আউলচাঁদের সহিত রামশরণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় বিবরণীগুলি বিভিন্ন মতানুযায়ী। কেহ কেহ বলেন, রামশরণ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পর বিষয় কার্য্যের অনুসন্ধানে নদীয়া জেলার মুরতীপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন পরে তথাকার জমীদার বেনাপুরের খাঁ রাজাদিগের বংশোদ্ভব রায়রায়ান দেওয়ান পদ্মলোচন বাহাদুরের জমিদারীতে নায়েবের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন এবং এইখানেই তাঁহার সহিত আউলচাঁদের সাক্ষাৎ হয়। আউল-চাঁদ স্বভাব বিনীত রামশরণের আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কমণ্ডলুস্থিত জলে মৃত্যুশয্যাশায়িনী রামশরণের স্ত্রীকে ব্যাধি মুক্ত করিলে, রামশরণ তাঁহার চরণে শরণ লয়েন। আবার কেহ কেহ বলেন ছেয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় রামশরণ পাল সুখসাগরের বাজারে চাউল খরিদ করিতে যাইয়া সেখানে আউলচাঁদের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং পরে তিনি তাঁহাকে আপন বাটীতে আনয়ন করেন। আবার কেহ বলেন, একদিন কৃষী রামশরণ গোচারণে যাইলে একজন তেজস্বী সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট দুগ্ধ যাচ্ঞা করেন। রামশরণ ভক্তি গদ গদ চিত্তে এই সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা পূর্ব্বক দুগ্ধপান করিতে দেন। সন্ন্যাসী যখন দুগ্ধপান পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এমন সময় একজন ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া রামশরণকে তাঁহার পীড়িতা স্ত্রীর মুমূর্ষ সংবাদ জ্ঞাপন করে। দয়াবান সন্ন্যাসী রামশরণের পরিচর্য্যায় পূর্ব্বেই বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহার এই শোকসংবাদে দুঃখিত হইয়া তাহার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, এবং রামশরণকে নিকটস্থ পুষ্করণী হইতে ত্বরায় একলোটা জল আনয়ন করিতে বলেন। রামশরণ জল আনিলে সন্ন্যাসী ঐ জল মন্ত্রপূত করিয়া মুমূর্ষর সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে অনুজ্ঞা করেন। রামশরণের মনের আবেগে ও অতীব উৎকণ্ঠায় তাহার হস্ত হইতে ঐ পাত্র স্খলিত হইয়া এক দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলে পতিত হয়। সন্ন্যাসী তদ্দর্শনে কর্দ্দম হস্তে যাইয়া রোগিণীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দেন; তাহাতেই রামশরণের স্ত্রী একেবারে নিরাময় হইয়া উঠেন। রামশরণ

সন্ন্যাসীর ঐরূপ অলৌকিক, অমানুষী ক্ষমতা দৃষ্টে তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন এবং পরে ঐ মহাপুরুষের কৃপায় স্বয়ং ঐরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের সৃজন করেন এই সময় হইতেই নদীয়ার মুরতীপুর গ্রামের ঘোষপল্লী বা ঘোষপাড়া বঙ্গের মধ্যে সুবিখ্যাত হইয়া উঠে।

এই সময়ে রামশরণের স্ত্রী সরস্বতীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, ঐ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং রামশরণের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ পুত্রের নাম রামদুলাল। রামদুলালের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিল। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত, পারস্য প্রভৃতি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বুদ্ধিও অতি প্রখর ছিল, তিনি সাম্প্রদায়িক সামান্য ব্যক্তিগণের বোধ সুলভার্থ সরল বাঙ্গালায় বহুশত গীত ও শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গীতের ভাব ও ভাষা আপাতঃ দৃশ্যে সরল বোধ হইলেও বহু গীতের অনেকাংশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। ঐ গীতগুলি হইতে সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে জানা যায়। ইহাদের মধ্যে কোন কোনও গীত হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী, আবার কতকগুলি মুসলমানদিগের সুফী সম্প্রদায় সিদ্ধ। ঐ অসংখ্য গীতের মধ্যে অধিকাংশই এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ রচিত গীতাবলী সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে।

রামদুলালের চারি পক্ষের স্ত্রীর গর্ভের ৫টী পুত্র সন্তান হয়। ১মা স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণবিহারী, ইনি নিঃসন্তান। মধ্যমার গর্ভে রাধামোহন ও মথুরামোহন এই দুই ভ্রাতাও নিঃসন্তান। তৃতীয়ার গর্ভে ঈশ্বরচন্দ্র পাল এবং ৪র্থার গর্ভে ইন্দ্রচন্দ্র পাল জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রামদুলাল বর্ত্তমানেই প্রথম ও দ্বিতীয়ের ৺ প্রাপ্তি হয়। রামদুলাল ৪৮ বৎসর বয়ক্রমে বাঙ্গালা ১২৩৯ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণীর দিবস শরীর রক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সরস্বতী ঠাকুরাণী জীবিত বিধায় তিনি সাম্প্রদায়িক "কর্ত্তামা" বা "শচীমা" (সতীমা) নামে আখ্যাত হইয়া সম্প্রদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকেন। তিনি পরলোক হইলে তাঁহার সময়ে সাম্প্রদায়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পরে ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাহার দেবী পক্ষে প্রতিপদের দিন তাঁহার ৺প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার চতুর্থ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল গদীর মালিক হইয়া সম্প্রদায়ের কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাহার ফলে এমন কি তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য রাজকীয় কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহার সম্প্রদায়ী লোকের চক্ষে কিছুমাত্র হীন হইতে হয় নাই। তাহারা ইহাকে কর্ত্তার লীলারূপে গ্রহণ করিয়া সেই জেলখানাতেই দধি দুগ্ধ, মিষ্টান্নাদি প্রভৃতি ভারে ভারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই কর্ত্তার অনুকরণে নানাবিধ দোষ সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয় এবং কর্ত্তাভজা দলের নৈতিক অধোগতি আরব্ধ হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের ভ্রাতা ইন্দ্রচন্দ্র তাঁহারাই সংসার ভুক্ত ছিলেন কিন্তু ইন্দ্রচন্দ্রের দ্বারা এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন কার্য্যই হইত না তবে তাঁহাকে সকলেই সমচক্ষে দেখিত, ঈশ্বর চন্দ্রের দুই পুত্র ধরণীধর পাল ও বীরচাঁদ

পাল ইন্দ্রচন্দ্রের তিন পুত্র, পূর্ণচন্দ্র, রসিকলাল ও সত্যচরণ। ইন্দ্র পাল লোকান্তরিত হইলে ঈশ্বর চন্দ্রের অসম্মতিতে রসিক ও সত্যচরণ পৃথক গদী স্থাপন করেন। যাত্রীগণের মধ্যে কেহ ঈশ্বর পালের গদীতে, কেহবা নূতন গদীতে খাজানা করিত। ঈশ্বর পালের জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধরণী তাহার বর্ত্তমান হরিদাস পাল নামক পুত্র রাখিয়া লোকন্তরিত হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্র বীরচাঁদ বিকৃত মস্তিক বিধায় স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র, দুই পৌত্রকে লইয়া গদীতে বসিতেন। তাহার লোকান্তরে এই দুই পৌত্রই গদীর অধিকারী হয়েন। এক্ষণে উপস্থিত বীর চাঁদের পুত্র শৈলেশ্বর পালের মৃত্যুর প৲ হইতে একা হরিদাসই গদীতে বসিয়া থাকেন।

রসিকলাল পাল তাঁহার এক মাত্র পুত্র সুরেন্দ্র নাথকে রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে সত্যচরণ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের সহিত একযোগে গদীতে বসিতেন কয়েকবৎসর হইতে সত্য চরণ তাহার পুত্র শ্রীগোপালকৃষ্ণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে সাবেক গদী দিয়া স্বয়ং স্বাধীনভাবে আর একটী গদী স্থাপনা করিয়াছেন। হায়! কালের ক্রীড়ায় গদীর সংখ্যা এবং সাম্প্রদায়িক লোকের সংখ্যা অন্যান্য বাহ্যিক বহুবিষয়ের উন্নতি হইলেও সেই পূর্ব্বের সাত্বিক ভাব, সেই ভক্তি ও প্রেম, সেই সত্যনিষ্ঠা ও সই শ্রী ও সৌষ্ঠব এবং প্রতি শুক্রবারে সেই পবিত্র মজলিস আর নাই—আছে কেবল অর্থের জন্য বাহাড়ম্বর —ধর্ম্মের কুহক রোগমুক্ত করিবার ক্ষমতার বৃথা ভান; আর আছে সেই নিৰ্জ্জীব সমাজ ঘর—যেখানে সতীমা সমাহিত এবং প্রাণহীন ঠাকুর ঘর—যথায়, রামশরণের খড়ম, আউলিয়া চাঁদের আশাবাড়ী ও কন্থা এবং রামদুলালে কয়েকখানি পবিত্র অস্থি বিদ্যমান এবং শ্রীযুক্তের স্থান। ভক্ত আজও ঐ ছিন্নকন্থা ও প্রাণহীন ঠাকুর বাড়ীতে কতই আনন্দে তাহার অভীষ্ঠ দেবকে প্রত্যক্ষ করে কিন্তু কালবশে সেরূপ ভক্ত আর কয়জন দৃষ্ট হয়!

ঘোষ পাড়ায় এক্ষণে নিম্নলিখিত কয়টী কার্য্য বিশেষ সমৃদ্ধি সহকারে সমাহিত হইয়া থাকে—

১। দোলযাত্রা—প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় হইয়া থাকে। ২। রথযাত্রা —উহা প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় হইয়া থাকে। ৩। রামশরণ পালের মহোৎসব —উহা আষাঢ় মাসের রথযাত্রার পর চতুর্দ্দশী তিথিতে সমাহিত হইয়া থাকে। ৪। শচীমার মহোৎসব—ইহা প্রতিবৎসর মহালয়ার পরদিন প্রতিপদে সমাহিত হয়। ৫। কোজাগর লক্ষ্মী পূজা। ৬। রামদুলাল পালের মহোৎসব—স্থূলতঃ ইহাই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে যে সকল গুহ্যসাধন প্রথাদি প্রচলিত আছে সেগুলি প্রকাশ করা সাম্প্রদায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনায় পরিত্যাক্ত হইল।

সাহেবধনী

নদীয়া জেলার দোগাছিয়া গ্রামের দুঃখীরাম পাল ও বাগাড়ে নিবাসী রঘু নাথ দাস প্রভৃতি কয়েক জন হিন্দু ও একজন মুসলমান, সাহেবধনী নামে এক উদাসিনের নিকট মন্ত্রোপদেশ পাইয়া এই ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করে ইহা কর্ত্তা ভজারই শাখা বিশেষ। ইহাদের উপসনার স্থানের নাম আসন। ঐ আসন একখানি চৌকি বিশেষ। প্রতি বৃহস্পতিবারে এই আসন সন্নিধানে সকলে সমবেত হইয়া সাধনা করে। উহাদের দলে হিন্দু মুসলমান সকল জাতিয়েরই প্রবেশ অধিকার আছে। দুঃখীরাম পালের পুত্র চরণ পাল এ সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান ঐ স্থানেও ঘোষপাড়ার ন্যায় বহু রোগী তাপী নিরাময় হইবার আশায় সমাগত হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে বহু অর্থ সংগৃহীত হয় এবং ঐ অর্থে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপে ইহাদের একটি মহোৎসব হইয়া থাকে ধর্ম্মের জন্য না হউক ব্যাধি বিদূরিত করিতে নীচ জাতীয়গণের মধ্যে এ সম্প্রদায়ের প্রসার বেশ আছে, কিন্তু ইহাদের সাম্প্রদায়িক লোক সংখ্যা দিন দিন যেরূপ হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে আর কিছু দিনে ইহাদের নিদর্শন থাকিবে কি না সন্দেহ হয়।

আউল সম্প্রদায়

আউল সম্প্রদায় কর্ত্তাভজারই একটি শাখা মাত্র। ইহাদের অপর নাম সহজ কর্ত্তাভজা। প্রকৃতি লইয়া সাধন করা ইহাদের উপাসনার একটি অঙ্গ। এক একজন আউলের সহিত অনেকগুলি করিয়া প্রকৃতি থাকে ইহাদের কেহ বা কুলবতী কেহ কুলপাংশুলা। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আদৌ নাই। সকল জাতির প্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গে পানভোজন করে তাহাতে জাতি বিচার করে না। ইহাদের মন নিতান্ত উদার এমন কি একজনের প্রকৃতি অন্যের নিকট যাইলেও ইহারা কখন ঈর্ষা করে না। ইহাদের মধ্যে নানা প্রকার গুহ্য সাধনা প্রচলিত আছে। সাধারণের পক্ষে সেগুলি নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ। এ সম্প্রদায়ী লোকের সংখ্যাও দিন দিন হ্রাস হইতেছে।

বাউল সম্প্রদায়

এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থান নদীয়া জেলা। হরিগুরু, বনচারি সেবা কমলিনী ও অখিলচাঁদ এই চারিজন ফকিরকে ইহারা আপনাদের মত প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকেন। ইহারা শাক্ত বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় হইতেই মত গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্প্রদায় গঠন

করেন। ইহাদের মধ্যে এই নরদেহে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থই বিদ্যমান আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, গোলক, বৈকুণ্ঠ ও বৃন্দাবন সমস্তই এই দেহ মধ্যে। এক কথায় তাঁহাদের মত "যাহা নাই ভাণ্ডে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"। এই কারণে তাঁহাদের মত দেহতত্ত্ব বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মাভাবে মানবহৃদয়ে বিদ্যমান আছেন, সুতরাং নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া তাহাদের তত্ত্ব পাইবার নিমিত্ত অন্যত্র গমনের প্রয়োজন নাই। স্ব স্ব দেহস্থিত এই পরম দেবতার প্রতি প্রেমানুষ্ঠানই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন। তাহারা বলেন যে প্রকৃতি পুরুষের পরস্পরের প্রেমেতেই ঐ প্রেম পরিপুষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং প্রকৃতি সাধনাই ইহাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। ঐ সাধন প্রকারণ অতীব গুহ্য এবং সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের জানিবার উপায় নাই, কারণ, এবিষয়ে ইহারা নিতান্ত সাবধান। ইহারা আপনাদের সাধন প্রণালী কাহাকেও প্রকাশ করে না এবং এবিষয়ে কারণ জিজ্ঞাস্য হইলে বলিয়া থাকেন,—

"আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা।
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান॥"

তবে এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে কামরিপুর চরিতার্থতা সাধনপূর্ব্বক চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা এই সাধনার উদ্দেশ্য। ইহাদের মতে যখন ঐ প্রেম পরিপুষ্ট হয় তখন স্ত্রী পুরুষ উভয়ে আত্ম বিস্মৃত হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলামাত্র অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। ঐ সাধনার একাঙ্গীভূত চারি চন্দ্র ভেদ নামে একটি প্রক্রিয়া আছে। উহা প্রকাশ করা সাধারণের রুচি বিরুদ্ধ হইবে মনে করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনা করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল না।

ইহাদের অন্তরের ভাব যাহাই হউক, বাহ্যিক বেশভুষা ও আচারাদি বিশেষ লোকাচার বিরুদ্ধ নহে। ইহাদের বেশ পরিধানে ডোর কৌপিন ও বহির্ব্বাস, গাত্রে খেল্কা পিরাণ বা আলখাল্লা, যাহা সাধারণতঃ নানারূপ বস্ত্রে প্রস্তুত। স্কন্ধে ঝুলি, হস্তে বক্র যষ্ঠী ও কিস্তী যাহা দরিয়ার নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের নাসাগ্রে তিলক ও গলদেশে মালা, যাহা কাঁচ, প্রবাল, পদ্মবীজ প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। ইহারা ক্ষৌরকর্ম্ম করে না; এবং কেশ ও শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ লোম যত্নে রক্ষা করে এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটি ঝুঁটি বাঁধিয়া রাখে। অনেকে আবার পায়ে ঝাঁঝ ও হস্তে গোপীযন্ত্র লইয়া দেহতত্ত্ব ও নায়িকা সাধন প্রভৃতি বিষয়ক গীত গাহিয়া বেড়ান। এই সকল গীতের ভাব ও ভাষা সাদাসিধা হইলেও বহুতর সাম্প্রদায়িক সাঙ্কেতিক কথা সন্নিবেশিত থাকায় সাধারণের পক্ষে ইহাদের যথার্থ অর্থ পরিগ্রহ করা সুকঠিন।

নায়িকা সিদ্ধি, রাগময়ীকণা, ব্রজ উপাসনাতত্ত্ব, প্রভৃতি বঙ্গভাষায় লিখিত কয়েকখানি সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রগ্রন্থে ইহাদের সাধন প্রণালী প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচিত আছে। এতদ্ব্যতীত, কর্ত্তাভজাদের ন্যায় ইহাদেরও বহু গীত, কবিতা ও বচন প্রচলিত আছে।

সহজে সম্প্রদায়

সহজে সম্প্রদায় বাউলেরই সম্প্রদায় ভেদ মাত্র তবে, ইহাদের আচার অনুষ্ঠানের সহিত বাউলদিগের আচার ব্যবহার কোনও কোনও স্থলে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারের। এই সহজে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থল নদীয়া, আজিও নবদ্বীপে সহজে পাড়া বলিয়া একটি স্বতন্ত্র পল্লী বিদ্যমান রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ যোগাবলম্বনের সহিত ইহারা প্রকৃতি সাধন করিয়া থাকে। গুরু শ্রীকৃষ্ণ বা জগৎপতি এবং শিষ্যা রাধিকা এই ভাবের তন্ময়তা আনিয়া সাধনা করাই সহজ সাধন। এক গুরুর অনেক শিষ্যা ও এক শিষ্যায় অনেক গুরু হইতে পারে; যথা—

"গুরু করব শত শত মন্ত্র করব সার
মনের আঁধার যে ঘুচাবে দায় দিব তার॥"

ইহাদের সাধনের পঞ্চ অঙ্গ যথা—নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম ও রস। ইহার মধ্যে প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়ই সর্ব্বপ্রধান।

বলরাম ভজা

নদীয়া, পাবনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে যে একদল হীনজাতীয় লোক অধুনা আপনাদিগকে বলরাম ভজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে তাহাদেরও উৎপত্তি স্থান এই নদীয়া জেলার মেহেরপুর গ্রাম। ইহারা অধিকাংশই বৈষ্ণবদিগের ন্যায় ভিক্ষোপজীবি। ইহাদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীন উভয়বিধ লোকই দৃষ্ট হয়। উদাসীনেরা বিবাহ করে না, গৃহস্থেরা আপনাপন কুলাচারানুযায়ী বিবাহাদি করিয়া থাকে তবে জাতিভেদের বাঁধাবাঁধি ইহাদের মধ্যেও অতি শিথীল। ইহাদের সাম্প্রদায়িক কোনও গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না এবং গুরুরও কোনও বাঁধাবাধি নাই। এই মত প্রবর্ত্তক বলরামের কতিপয় আদেশ মাত্র মান্য করিয়া ইহারা চলিয়া থাকে।

প্রবর্ত্তক বলরাম হাড়ী কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ায় এক হাড়ীর গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। বলরাম বাল্যাবধি সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে সে স্থানীয় জমিদার পদ্মলোচন মল্লিক বাবুর বাটীতে চৌকিদারি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। এই সময়ে মল্লিক বাবুদের গৃহ বিগ্রহ আনন্দবিহারী দেবের কতকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় বাবুরা বলরামকে চোর সন্দেহে কিছু শাসন করেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া মনের আবেগে বলরাম উদাসীন হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মানুযায়ী যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হয় এবং স্বধাম প্রসিদ্ধ উপাসক সম্প্রদায় গঠন

করেন। বলরামের শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া মনে করিত এবং বলরামও তাহাদিগকে আভাষে ইহাই বুঝাইতেন। তিনি বলিতেন যে আমি আপন শরীর হইতে এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছি। লোকে আমাকে নীচে হাড়ী বলিয়া জানে, কিন্তু আমি সাধারণ হাড়ী নহি আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি তাই আমি হাড়ী। বলরাম বিশেষ বাকচতুর ছিলেন। এ সম্বন্ধে নানারূপ বচন এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। আশ্বিন মাসের অপর পক্ষে একদিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দেখিলেন যে দলে দলে ব্রাহ্মণগণ পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশে জলদান করিতেছেন। বলরামও তাহাদের ভঙ্গীর অনুকরণে অঞ্জলি পুরিয়া জল লইয়া নদীকূলে সেচন করিতে বসিলেন। তাহার এবম্বিধ কার্য্যে কৌতুহলী হইয়া একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তদ্রূপ করণের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, বলরাম উত্তর করিলেন, "যে আমি ধান্যের ক্ষেত্রে জল দিতেছি," তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন যে "তুই কি পাগল হইয়াছিস্ ? এখানে ধান্যের ক্ষেত কোথা ?" তখন বলরাম উত্তর করিলেন, "আপনারা যে পিতৃপুরুষকে জল দিতেছেন তাঁহারাই বা এখানে কোথায় ? যদি নদীর জল নদীতে দিলে তাঁহাদের নিকট যাইয়া পৌঁছে তবে এখানে জল সেচন করিলে কেন তাহা ধান্যের ক্ষেতে না যাইবে ?"

দোলাদি উৎসবে বলরাম স্বয়ং বিগ্রহ সাজিয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিত। প্রায় ৬৫ বৎসরকাল এইরূপ জীবনাতিবাহিত করিয়া ১২৫৭ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ তাঁহার বর্ত্তমান আশ্রমের দক্ষিণে ৯।১০ রশি ব্যবধানে ভৈরব তটে বলরাম ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যু স্থানে এক মঠ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সম্প্রতিব লরামের সাম্প্রদায়িক একটী শিষ্য নদীর অপর কূলে একটী নূতন আশ্রম স্থাপন করিয়াছে। পক্ষান্তরে আর কতকগুলি শিষ্য বলরামের এরূপ আদেশ নাই বলিয়া বলরামের মৃত্যুস্থানের ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি কোনও গৌরব করে না। এইরূপে বলরাম ভজা সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

বলরামের শিষ্যাবলীর মধ্যে অনেকেই বলরামের ন্যায় উদারস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে ইহাদের সকলেই অশিক্ষিত ও হীন জাতিয়; ইহারা জাতিভেদ প্রথার গৌরব করে না। সকলের অন্নই সকলে খাইয়া থাকে। ইহারা পীড়িত হইলে প্রায়ই ঔষধাদি সেবন করে না, বিশ্বাস বলরামের নামেই পীড়া দূর হইবে। এ সম্প্রদায়ীগণের মধ্যে যাহারা ভিক্ষোপজীবি তাহারা গৃহস্থর বাটী উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা না পাইলে এক কথাতেই চলিয়া যায়, দ্বিরুক্তি করে না। ভিক্ষায় ও কি দুঃখে কি সুখে তাহাদের একমাত্র উক্তি "জয় বলরাম"। কেহ বা আবার "হাড় হাড্ডি বলরামও" বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি ব্যতিত নদীয়ায় হজরৎ, গোবরা, পাগল-নাথ ও খুসী বিশ্বাস প্রভৃতি কতিপয় মুসলমান এক একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া আপনাদের মত প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছে। আর শান্তিপুরের দর্পনারায়ণ নামে একটী চর্ম্মকারও আপনার এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সংখ্যা অতি

বিরল বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখা হইল না।

এতদ্ব্যতীত নদীয়ায় নাগা, অবধূত, কিশোরীভজনী, গোবরাই, চূড়াধারী, তিলকদাসী, রাধাবল্লভী, গৌরবাদী, হরিবোলা, সখীভাবক, ন্যাড়া, দরবেশ প্রভৃতি কতিপয় বিভিন্ন সম্প্রদায়িক লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আড়ংঘাটার এক নাগাদিগের মঠ ব্যতীত নদীয়ার মধ্যে এই সকল সম্প্রদায়ীগণের কোন আড্ডা বা মঠ নাই, এবং ইহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বিধায় বৈষ্ণব সমাজে তাহাদের প্রতিপত্তি ও কিছুমাত্র নাই।

নদীয়ার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মেলা

ভারতবর্ষীয়েরা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অন্য সকল জাতি অপেক্ষা ধর্ম্মঅনুপ্রাণিত। উহাদের প্রতি কার্য্য ধর্ম্মস্মৃতি বিজড়িত। ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুগণ আবার সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মশীল। তাঁহাদের আহার বিহার, আনন্দ, উৎসব সকলই ধর্ম্মমাখা। তাই যেখানে এতটুকু ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বা ধার্ম্মিকের স্মৃতিমাখা সেখানেই গুণগ্রাহী আর্য্য সন্তান পুরুষানুক্রমে ভক্তিতে বিভোর হইয়া সদা কালবদ্ধ, তাই ভারতে এত তীর্থ, গ্রামে গ্রামে এত মেলার সৃষ্টি।

নদীয়া চিরদিনই পূতস্থান। কত মহাত্মা, মহাপ্রাণ এখানে উদ্ভূত হইয়া কালে এখানেই লয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের না হউক, অনেকের স্মৃতি আজিও মেলাকারে সুরক্ষিত। আজিও দলে দলে হিন্দুসন্তানগণ এই সকল স্থানে সমবেত হইয়া মহোৎসবে রত হয়েন এবং আপনার জন্ম সকল মনে করেন।

নদীয়ার প্রায় সকল গ্রামেই বৎসরের কোনও না কোনও সময়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। এ সকলে সাধারণতঃ স্থানীয় ব্যক্তিগণই আনন্দোৎসবে রত হয়েন; তবে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বহুজন সমাবেশ হইয়া থাকে এবং বহু প্রাচীন কাল হইতে এই সকল মেলা চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। এই সকল মেলাগুলি একদিকে যেমন ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট তেমনি অপরদিকে ইহাদের সহিত দেশের অন্তর্বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সংস্রব দেখা যায়।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

গঙ্গা জালাঙ্গীর পবিত্র সঙ্গম স্থলে অবস্থিত, ইহা বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বস্বধন শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব স্থান। কালবশে শ্রীপ্রভুর জন্মভূমি গঙ্গাগর্ভে, মতান্তরে নবদ্বীপের পরপার "মায়াপুরে"। প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীধাম নবদ্বীপে এবং শ্রী৺মায়াপুরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে প্রতিবৎসর মাঘী শুক্লৈকাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ দিন ধরিয়া ধূলোট নামে আর একটী মহতী মেলা নবদ্বীপে হইয়া থাকে, এতদুপলক্ষে নানা দিক দেশ হইতে প্রায় দশ সহস্র বৈষ্ণবের আগমন হয়; নৃত্যগীত ও মহোৎসবে নবদ্বীপ এই দ্বাদশ দিন আত্মাহারা হইয়া যায়। এই সময়ে বঙ্গের প্রায় সমুদয় বিখ্যাত কীর্ত্তন সম্প্রদায় একত্রে মিলিত হয়েন। হুগলীর ৺মাধবচন্দ্র দত্ত (কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মাধব বাবু বাজার যাঁহার) মহাশয়ের উদ্যোগে ও অর্থে, প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম এই উৎসবটি সৃষ্ট হয়।

পট্ পূর্ণিমা (কার্ত্তিকী পূর্ণিমা) নদীয়ার আর একটী উল্লেখযোগ্য মেলা। সুবৃহৎ এবং সু উচ্চ অথচ সুগঠিত মৃণ্ময়ী দেবী কালীকার মূর্ত্তি ভীতি ও ভক্তি উদ্দীপক।

এই উপলক্ষে দুই দিন মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা স্থান বলিয়া যেমন বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীবৃন্দাবন তুল্য মান্য, তেমনি আবার ইহা শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণের কাহারও কাহারও জন্মস্থান বা আবাস ভূমি বলিয়া বৈষ্ণবগণ সকাশে শ্রীপাট বলিয়াও খ্যাত। এই নবদ্বীপ ব্যতীত আধুনিক নদীয়া জেলার মধ্যে আরও কতিপয় গ্রাম ঐরূপ শ্রীপাট বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট মান্য। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার ভেদ তেমনি তাঁহার শ্রীচৈতন্য লীলার পার্শ্বদ গোপাল, উপগোপল এবং মোহান্তগণ ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলারই অভেদ সঙ্গী। তাঁহাদের মতানুযায়ী নদীয়াবাসী মহাপুরুষগণের নাম ও শ্রীপাট স্থান এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়।[১০]

শান্তিপুর

রাণাঘাট কৃষ্ণনগর লাইট রেলের উপর। ইহা অদ্বৈতপ্রভুর বংশধরগণের প্রিয় আবাস ভূমি। এখানকার কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাসমেলা সমগ্র ভারতে সুবিখ্যাত, এমন কি সুদূর মণিপুর হইতেও এখানে শত শত ভক্তের সমাবেশ হইয়া থাকে। মেলা তিন দিবস স্থায়ী, এই তিন দিন নৃত্য গীত-মহোৎসবে শান্তিপর মুখরিত হইয়া উঠে। শেষ দিন গোস্বামী প্রভুগণ বিগ্রহাদি স্বর্ণ খচিত রৌপ্যমণ্ডিত হাওদা সকলে সুসজ্জিত করিয়া বাদ্যোদ্দাম সমভিব্যাহারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয়েন। এই উপলক্ষে ৩০ হইতে ৫০ সহস্র লোক সমাবেশ হয়, এবং বহু সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

উলা বা বীরনগর

রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ রেল লাইনের উপর। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় মা চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে তিন দিবস স্থায়ী মেলা হইয়া থাকে, এবং এই কালে উলার উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় বিশেষ সমৃদ্ধির সহিত দুইখানি বারোয়ারী পূজা হয়। উত্তর পাড়ায় বিন্দুবাসিনী ও দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির পূজা হয়। পূর্ব্বকালের এমন কি ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত সাহিত্য সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই মেলার কয়দিন উলার গৃহস্থ মাত্রেই সমাগত বিদেশীয়গণের সেবায় রত হইতেন এবং যে কেহ এইরূপে অতিথী অভ্যাগতের সমাদর না করিত সেই গ্রামের প্রধান কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত হইত।[১১] পূর্ব্বে উলার কৌতুকী ব্রাহ্মণগণ সমগ্র বাঙ্গলা হইতে ভিক্ষা সাধিয়া মায়ের পূজায় সমারোহ ব্যাপার করিতেন।

এই উপলক্ষে অনেক কৌতুক কাহিনী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে কথিত আছে উলার মায়ের সেবক কোনও ব্রাহ্মণ কোনও এক কৃপন ধনীর নিকট মায়ের পূজার কারণ চাঁদা ভিক্ষা করিতে গমন করেন। বাবুটী বয়সে প্রবীণ, স্থূল কলেবর, এক চক্ষু হীন, নিজের বুদ্ধিবলে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াও অসম্ভব কৃপণ ছিলেন বাবুটী ব্রাহ্মণের পৌনঃপুনিক কাতর প্রার্থনায় উত্তেজিত হইয়া যখন বলিলেন "দেখ ঠাকুর বার বার কেন আর ও প্রসঙ্গ আনিতেছে; আমার নিকট কিছু প্রত্যাশা করিও না কারণ দেখিতেই তো পাইতেছ যে বাজে খরচ আমার আদৌ নাই ওটা আমার কুষ্ঠীতেই লিখে না," তখন ব্রাহ্মণ অনন্যগতি হইয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন "মহাশয় যাহা আদেশ করিতেছেন তাহা

সত্য, কিন্তু বাজে খরচ যে আপনার আদৌ নাই তাহাতো বোধ হইতেছে না, দেখিতেছি আপনার একটী চক্ষু নাই, যেটী আছে সেটীও ক্ষীণ শক্তি, সেইটীর জন্যই পরকলা ব্যবহার করিয়া থাকেন ; বাজে খরচ যদি নাই তবে যে চক্ষুটী একেবারে দৃষ্টিশক্তিহীন সেটিতে পরকলা কেন ?" বাবু নিরুত্তর, ব্রাহ্মণ সফল মনোরম হইয়া বিলক্ষণ দক্ষিণার সহিত বিদায় পাইলেন।

আর একবার হেষ্টিংসের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কার্য্যোপলক্ষে ভাগিরথী দিয়া গমনকালে শান্তিপুরের ঘাটে কিয়দ্দিবসের জন্য অবস্থান করেন। উলার ব্রাহ্মণ মায়ের সেবকগণ এই সংবাদ পাইয়া কৌশলে দেওয়ানের নিকট হইতে বিলক্ষণ কিছু মায়ের পূজার পার্ব্বনী আদায় করিবার মানসে সদলে শান্তিপুরের ঘাটে দেওয়ানের বজরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের সকলের তখন মল্লবেশ হস্তে এক এক গাছি রজ্জু, এই বেশে বজরার সম্মুখে আসিয়া তাহারা সমস্বরে "বেটা সিংহ কোথায় ? বেটা সিংহ কোথায়" ? রবে এক মহা কোলাহল উত্থিত করিলেন। সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণগণের এইরূপ সদম্ভ আহ্বানে সচকিতে বজরা হইতে বাহির হইলে, মায়ের প্রধান পাণ্ডা রজ্জু হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "বেটা সিংহ, মহামায়ের সিংহের পায়ে ব্যথা হইয়াছে, কাল রাত্রিতে তাই দয়াময়ি আমাদের প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে মায়ের সিংহের স্থানে তোমায় লইয়া যাইতে হইবে ; এবার মায়ের ইচ্ছা তোমার স্কন্ধে চাপিয়া আসেন, তাই আমরা রজ্জু হস্তে তোমাকে লইতে আসিয়াছি, এখন মায়ের আসিবার ভার তোমার উপর" ; ভক্তি গদগদ চিত্তে সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণগণের কৌতুকাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইলেন এবং সে বার মায়ের পূজার সমগ্র ব্যয়ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিতে স্বীকার হইলেন।

এখন দেশের লোকেরও ভক্তির আর সে প্রবলা শক্তি নাই, উলায় মা চণ্ডীরও আর সে সমৃদ্ধিশালী পূজা নাই, মেলা হয় লোক যায়, তামাসা দেখে, কিন্তু হায় ! সভক্তি মায়ের পূজা কয়জনে করে।

ঘোষপাড়া

ই, বি, এস, রেলের কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের নিকট। ইহা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া অন্যূন দুই ক্রোশ উত্তর পশ্চিমমুখে যাইতে হয়। সম্বৎসরে এখানে যতগুলি পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোলপর্ব্বই সবিশেষ প্রসিদ্ধ ও এই উপলক্ষে রেল, ষ্টীমার ও নৌকাযোগে বহু সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং বহু সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

ত্রিহট্ট, (তেওট বা তেহাটা)

মেহেরপুর সবডিভিসনের অধীন। পৌষ সংক্রান্তিতে তিন দিবস ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে, ইহা কৃষ্ণরায়ের মেলা নামে খ্যাত। এই কৃষ্ণরায়জী নদীয়ারাজের বিগ্রহ। কৃষ্ণরায়জী বিগ্রহের বাম পার্শ্বে শ্রীমতি রাধিকা মূর্ত্তি নাই কৃষ্ণরায়জী একক। কথিত আছে কোনও সময়ে ঠাকুরাণীর গাত্র হইতে যবন জাতীয় চোরে অলঙ্কার অপহরণ করিলে পূজারিরা তাঁহাকে মন্দির সন্নিহিত দীর্ঘিকায় বিসর্জ্জন দেন, তদবধি ঠাকুরের অদৃষ্টে আর দেবী মিলে নাই।

এই মেলায় প্রায় ৩।৪ সহস্র লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই মেলার পর দিবস এতদঞ্চলের যাবতীয় গৃহস্ত তাহাদের গৃহজাত উৎকৃষ্ট সর্ব্ববিধ ফল কৃষ্ণরায়জীকে উপহার দেয়। সেই সকল উৎকৃষ্ট ফল রাশি দেখিয়া ইহাকে কৃষী প্রদর্শনী বলিয়া মনে হয়।

মাটিয়ারী

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় এখানে প্রায় পক্ষকাল ব্যাপী একমেলা বসিয়া থাকে। নদীয়া জেলার মুসলমানগণের যতগুলি দরগা বা পীরের আস্তানা আছে তন্মধ্যে এইটী সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার পীর "মল্লিক গস্" নামে খ্যাত। "মল্লিকগস্" উপাধি বিশেষ, "মলি-অল গস" হইতে ইহার উৎপত্তি। গস্ শব্দে ফকির বুঝায়, মলি-অল অর্থে বাদসা অর্থাৎ ফকীরের বাদসা। এই আস্তানাটী কত দিনের প্রাচীন তাহা স্থির নিশ্চয়ে বলা যায় না, তবে কিম্বদন্তী এইরূপ যে যখন কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার এই মাটীয়ারীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপনা করেন তখন উক্ত পীর ও তদীয় ভ্রাতা করিম দুইটি শিষ্য (একজন রজক অপর নাপিত) সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করেন। স্থানীয় মুসলমানগণ করিমের বিবাহ প্রস্তাব করিলে করিম তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া এখান হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোবিন্দপুরে গমন করেন ও তথায় তিনি জাহির হয়েন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সেইখানেই তাঁহার কবর হয়। দুই ভ্রাতাই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, যাহাকে যাহা বলিতেন তাহাই সিদ্ধ হইত। মল্লিকগসের পার্শ্বে তাঁহার শিষ্য দুটীরও কবর হয়। এই পীরের কৃষ্ণনগরের রাজাদের দত্ত অনেক পীরোত্তর ছিল কিন্তু এখন উহা কতক জমীদারের খাস দখলে কতক সেবাইতগণের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। মেলার প্রথম তিন দিন ৮।১০ সহস্র লোক সমবেত হয়। এই মেলায় মুসলমানগণের টুপী, হাতা, বেড়ী, কড়া প্রভৃতি লোহার সামগ্রী, কাটকাটরা ও মনোহারী দ্রব্য ইত্যাদি বিক্রীত হয়।

সুন্দরপুর

ইহা করিমপুর থানার অধীন। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে পক্ষব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে এতদুপলক্ষে প্রায় দশ সহস্র ব্যক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। এখানকার শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজী তাঁহারি উদ্দেশে তুলসী বিহার মেলা হইয়া থাকে।

গোস্বামী দুর্গাপুর

আলমডাঙ্গা রেল ষ্টেসন হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ মুখে দুই ক্রোশ ব্যবধানে এই গ্রামটী সংস্থাপিত। প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পক্ষব্যাপী এক মেলা হইয়া থাকে এবং অন্যূনদশ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। এখানকার শ্রীবিগ্রহ রাধারমণ জীউ। কথিত আছে যে শকাব্দ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান গোস্বামী দুর্গাপুর যে স্থানে অবস্থিত তথায় নিবিড় বন ছিল। এক পরম রূপবান সিদ্ধ সন্ন্যাসী সেই বনে বাস করিতেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে গোস্বামী বলিত। একদিন কতকগুলি দস্যু কোন স্থান লুণ্ঠন পূর্ব্বক এই বন মধ্য দিয়া প্রত্যাগমন কালে পিপাসার্ত্ত হইলে এই গোস্বামী যোগবলে আপনার ক্ষুদ্র কমণ্ডলু হইতে তাহাদের সকলকে জলদানে পরিতুষ্ট করিলে দস্যুগণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে তাহাদের লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্য হইতে এই রাধারমণ জীউ বিগ্রহ তাঁহাকে অর্পণ করে। যোগীও তদবধি সাদরে এই শ্রীবিগ্রহের

সেবা চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিছুদিন পরে এই গোস্বামীদুর্গাপুরের প্রায় ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত জয়দিয়া বাসী রাজা রায় মুকুট রায় মৃগয়ার্থ এই বনে আগমন করেন এবং এই নবীন গোস্বামীর অপরূপ রূপ ও অলৌকিক যোগবল প্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় একমাত্র দুহিতা দুর্গাবতী দেবীকে তদীয় করে সমর্পণ করেন এবং বন কাটাইয়া নগর স্থাপনপূর্ব্বক ইহার "গোস্বামী দুর্গাপুর" নামকরণ করেন। পরে রায় মুকুটের পুত্র রাজা শ্রীকৃষ্ণ রায় ১৫৯৬ শকে রাধারমন দেবের নিমিত্ত ইষ্টক নির্ম্মিত একটী শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। শ্রীমন্দিরটির অনেকাংশ যদিও এক্ষণে মৃত্তিকাপ্রোথিত হইয়া গিয়াছে ও উহা ক্রমেই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে তথাপি মনোযোগ সহকারে ইহার ইষ্টকের উপর খোদিত কারুকার্য্য দেখিলে মোহিত হইতে হয়। মন্দিরটি পূর্ব্বদ্বারী এবং উহার দক্ষিণ পার্শ্বে এই সংস্কৃত কবিতাটি খোদিত আছে—

"কালাঙ্ক বণেন্দু মিতে শকাব্দে
জ্যৈষ্ঠে শুভে মাসি সুনির্ম্মলাশয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণ রায়ঃ শুভ সৌধমন্দিরা।
শ্রীযুক্ত রাধারমণায় সন্দদৌ॥"

আড়ংঘাটা

ই, বি, এস, রেলের উপর। প্রতি বৎসর সমগ্র জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যাপি এখানকার শ্রীবিগ্রহ যুগলকিশোর দেবের এক মেলা বসিয়া থাকে। এই যুগলকিশোর দেব বহুকাল হইতে এই স্থানে প্রতিষ্ঠীত আছেন। প্রবাদ গঙ্গারাম দাস নামে একজন হিন্দুস্থানী মহান্ত শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে কিশোর মূর্ত্তি লইয়া প্রথমে নদীয়া সমুদ্র গড়ে আসিয়া এক সেবা প্রকাশ করেন পরে বর্গীর হাঙ্গামা কালে নিঃশঙ্ক হইবার মানসে আড়ংঘাটার তাঁহার দেশস্থ রামপ্রসাদ পাঁড়ে নামক এক ব্যক্তির নিকট উঠিয়া আসেন, ঐ রামপ্রসাদ পাঁড়ের গোপীনাথ নামে এক বিগ্রহ ছিলেন অদ্যাপি যুগল কিশোর দেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে ঐ সেবা চলিত আছে। বৃহদাকার মূর্ত্তি এক দিন একক ছিলেন প্রবাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্তিকাগর্ভে এক রাধিকা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলে এই কিশোরের সহিত কিশোরীর মিলন করেন এবং তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত ১২৫ বিঘা লাখরাজ ভূমি দান করেন ও তাঁহাদের যুগল কিশোর আখ্যা প্রদান করেন। শুনা যায় বর্ত্তমান মন্দিরটী ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। গঙ্গার পর যশোদানন্দন পরে চরণ দাস তৎপরে হরিদাস পরে শুবারাম দাস তৎপরে রঘুনাথ দাস মহন্তর গদী প্রাপ্ত হয়েন। ঠাকুরের গৃহপ্রাঙ্গনস্থিত ধান্য গোলা হইতে রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার "কৃষ্ণপান্তীর" প্রথম সৌভাগ্য স্থচিত হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে বহু নাগা সন্ন্যাসীর বাস ছিল। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এখানকার তদানীন্তন মোহান্ত কর্ত্তৃক এই বর্ত্তমান মেলাটি স্থাপিত হয়। প্রবাদ যে জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলরূপ দর্শন করিলে স্ত্রীলোকের আর বৈধব্যসম্ভাটিত হয় না, তাই এই এক মাস ধরিয়া অন্যূন অর্দ্ধ লক্ষ স্ত্রী পুরুষ এই স্থানে আসিয়া দেবদর্শন করিয়া থাকেন।

কাঁচড়াপাড়া রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এখানে

প্রতিবৎসর অগ্রাহয়ণী কৃষ্ণৈকাদশী তিথি হইতে দিবসত্রয় মেলা ও উৎসব হইয়া থাকে।

কুলিয়া

এতদুপলক্ষে প্রায় ৮।১০ সহস্র স্ত্রীপুরুষ সমবেত হয়। কথিত আছে প্রায় ৭৬ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে এক উদাসীন বৈষ্ণব বাস করিতেন, তিনি এখানে নিতাই চৈতন্য ও অন্যান্য বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া পরম ভক্তি সহকারে পূজার্চ্চনা করিতেন, এই সময়ে খড়দহের এক গোস্বামী এখানে শিষ্য গৃহে আসিয়া এই উদাসীনের ক্রিয়াকর্ম্ম দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতির উদয় হইলে তিনিও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এখানে রহিয়া যজন যাজন করিতে থাকেন এবং ঐ উদাসীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া বিগ্রহাদির যথানিয়ম সেবা চালাইতে থাকেন। পরে তাঁহারও পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার দৌহিত্রেরা আসিয়া তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার করেন। এই সময়ে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের খুল্লতাত বংশীয় রামকুমার রায় মহাশয় সুখসাগর, পলতা, কুলিয়া প্রভৃতি গ্রাম সকলের জমীদার ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে তৃতীয় মাধবচাঁদ রায় মহাশয় সুবিখ্যাত জর্জ্জ ব্যারেটো সাহেবের সুখসাগর কন্‌সারণ নামক নীলের কুঠী জন্ লার্লিটা সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার ... চালাইতেছিলেন সুতরাং এতদঞ্চলে তখন তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল। এই মাধবচাঁদের সহিত বলাগড়ের অচ্যুতানন্দ গোস্বামীর বিশেষ সদ্ভাব ছিল তাই অচ্যুতানন্দের অনুরোধ ক্রমে বন্ধুতার খাতিরে মাধবচাঁদ তাঁহার লাঠিয়াল দিয়া উদীয়মান কুলিয়ার পাঠটী খড়দহের গোস্বামীগণের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া অচ্যুতানন্দকে দেওয়াই দিলেন। এই অচ্যুতানন্দ ও তদ্বংশীয়গণের যত্নে কুলিয়ার পাঠের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে পরে কলিকাতা মলঙ্গা বৌবাজারে কিষণ দয়াল ধর মন্দিরাদি করিয়া দেওয়ায় এখন ইহা বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে।

নদীয়ায় এই কয়েকটী সুবিখ্যাত মেলা ব্যতীত প্রতিবৎসর মাঘীপূর্ণিমায় চাকদহে, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে চাকদহের সন্নিকটবর্ত্তী শলাকির বিলে; কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে আন্দুলিয়া কায়েত পাড়ায়,[১২] নৃসিংহ দেপাড়া ও নবদ্বীপে পাঁচুঠাকুরের নিত্য মেলা, ভীম একাদশীতে শিবনিবাসের হরিসভার মেলা, অগ্রহায়ণের শুক্ল চতুর্থীতে কৃষ্ণনগর দোগাছিয়ার মূলার মহোৎসব যাহাতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমস্তকের একটী পাগড়ী প্রদর্শিত হয়, পৌষী শুক্লতৃতীয়ায় যশোড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের মহোৎসব, মাঘীপূর্ণিমায় পাটুলীর মেলা; ভোমরার মেলা, মেহেরপুরের মধ্যে মুরটীয়ার জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রার মেলা ও শ্রীরামনবমীর মেলা, আমঝুপি গ্রামে রাসযাত্রার মেলা, রাণাঘাটে প্রতিবৎসর রাসপূর্ণিমার পরের অষ্টমীতে এবং মাঘীপূর্ণিমার পরের সপ্তমীতে যথাক্রমে অন্নপূর্ণা ও মহিষমর্দ্দিনী বিরাট মেলা দুইটী, চৈত্র শুক্ল একাদশী হইতে ৩ দিন কৃষ্ণনগর রাজবাটীর বারদোল মেলা, মেহেরপুর চাঁদবিল্ব গ্রামে মাসব্যাপি রাস যাত্রার মেলা; নাকাশীপাড়া, সদরএর ব্রাহ্মণীতলার মেলা; নবদ্বীপে দশহারার মেলা কুষ্টিয়া ভোমরার রামনবমীর মেলা ও খালিসকুণ্ডি গ্রামের চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণার মেলা; বীরহীর মদন গোপালের দোলপূর্ণিমার মেলা; মেহেরপুর চাঁদঘরের মেলা; চাপড়া সদরের ধর্ম্ম পূজার মেলা;

চাকদহে মাঘী পূর্ণিমার মেলা ; আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় মেলা নদীয়ায় হইয়া থাকে।

এই সকল মেলা ব্যতীত নদীয়ার প্রতিবৎসর গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থানে বহু দূরদেশ হইতে জনসমাগম হইয়া থাকে। গঙ্গা হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থ ; শাস্ত্রে বলে "সর্ব্বতীর্থময়ি গঙ্গা" গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ যাহা প্রত্যেক হিন্দু তাহার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভুলিয়া একবাক্যে পবিত্রতম তীর্থ বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। নদীয়া সেই গঙ্গাময়ি মহাতীর্থ, পবিত্র গঙ্গা মৃত্তিকা হইতে সমদ্ভূত। এখানে বহু দূরদেশ হইতে এমন কি সুদূর মণিপুর হইতেও হিন্দুগণ কলুষনাশিণী গঙ্গাসলিলে নিজ নিজ পাপ স্খালনের নিমিত্ত সমবেত হন। প্রথমতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমি গঙ্গাজালাঙ্গী সঙ্গমেই অধিক সংখ্যক লোক সমাবেশ হইয়া থাকে। তৎপরে শান্তিপুর, পূর্ব্বে ঠিক শান্তিপুরের নিম্ন দিয়াই গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন এক্ষণে গঙ্গা ও শান্তিপুরের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ চড়া পড়িয়াছে। এখানেও গঙ্গাস্নানে ও অদ্বৈত বংশজ গোস্বামী প্রভুগণের বাসভবন বলিয়া গুরুপাঠ দর্শনে বহুলোক সমাবেশ হয়। তন্নিম্নে চাকদহ বা চক্রতীর্থে এখানেও যশোহর খুলনা প্রভৃতি স্থান হইতে গঙ্গাস্নানার্থ বহুজন সমাগম হইয়া থাকে, তবে গঙ্গা এখন চাকদহ হইতে সরিয়া যাইতেছেন বলিয়া যাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

---

১ এই দুই মহাপুরুষের বংশাবলী নদীয়ায় বহুদিন বিরাজ করিতেছেন ; এতন্মধ্যে মাধাইএর বংশ ২০ হইতে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বংশ হইয়াছে এখন একমাত্র জগাইএর বংশ এখানে রহিয়াছে, ইঁহারা "ছ্যাককল্লাবাড়ী" উপাধিতে প্রসিদ্ধ, কৌতুকের কথা যে ইঁহারা বংশানুক্রমে শাক্ত পরিবার।

২ এই কাজীর সমাধি আজ পর্য্যন্ত (বর্ত্তমান) মায়াপুর গ্রামের অদূরে উত্তর পূর্ব্ব কোণে বিদ্যমান রহিয়াছে একটী সুবৃহৎ গোলোক চাঁপার বৃক্ষ ঐ সমাধির উপর জন্মিয়া সুশীতল ছায়া দানে কবরটীকে শীতল রাখিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে এই কাজীর নাম ছিল "মৌলানা-সিরাজ-উদ্দিন" কথিত আছে ইনি নদীয়ায় কাজী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে **Dr. Hunter's Statisitcal Account of Bengal Vol. I. p. p. 367 (24 parganas)** এ এইরূপ লিখিত আছে :—**"To Bira belongs the little town of Mayapur near the Burdwan boundery where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajuddin, who is said to have been the teacher of Husain saha King of Bengal (I494—I522, A. D.)"**

৩ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে নানারূপ দেখা যায়, কিন্তু মূলতঃ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথ সমস্ত গ্রন্থেই একরূপ নির্দ্দেশ আছে। আমরা এখানে 'চরিতামৃতের' অনুসরণ করিলাম।

৪ শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীনরহরি দাসের নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি, বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রেমদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্ত্তাগণের বিরচিত পদসমূহ ও অন্যান্য বহু প্রামাণিক গ্রন্থরাজি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে কুলিয়া গ্রামে পতিতপাবনাবতার শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ প্রভু অধ্যাপক চাপাল গোপালকে "শ্রীবাস অপরাধ" হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, যে স্থানে শ্রীপ্রভু ভাগবতবেত্তা মায়াবাদী পণ্ডিত দেবানন্দের ভক্তাপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক বর দিয়াছিলেন এবং যে স্থানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোনও পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন সেই যোগীজন দুর্লভ মহাতীর্থ কুলীয়া তদানীন্তন নবদ্বীপের সন্নিহিত একটী পল্লী বিশেষ ছিল এবং উহা তাৎকালীন গঙ্গার পশ্চিম কূলে (এখন যেখানে নবদ্বীপ অবস্থিত প্রায় সেই স্থানে) অবস্থিত ছিল, সেই পরম পবিত্রতা ভূমির সম্বন্ধে শ্রীনরহরি দাস "নবদ্বীপ মণ্ডল" বর্ণনাকালে ইহাকে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের গঙ্গার পশ্চিম দ্বীপরূপে উল্লেখ করিয়া ইহার এইরূপ ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন যথা,—

"কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দ ধাম॥
প্রভু প্রিয় ভক্ত কোলদ্বীপে। পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোল রূপে।
কোল দ্বীপ নাম এইমতে। অত্যন্ত মধুর কথা আছয়ে ইহাতে॥

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে সুবিখ্যাত কবিকর্ণপুর মহাশয় কুলিয়া সম্বন্ধ এইরূপ লিখিয়া ছিলেন যে উৎকালাধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু কুলিয়ায় আছেন শুনিয়া কুলিয়া কোথায় তাহা সার্ব্বভৌমকে পুছিলে তিনি বলিলেন—যথা কবি কর্ণপুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের পুরুষোত্তম মিশ্র ওরফে প্রেমদাস কৃত বঙ্গানুবাদ নাটকেঃ—

"সার্ব্বভৌম বলে রাজা নবদ্বীপ পারে।
কুলিয়া নামেতে গ্রাম গঙ্গার ওধারে॥"

পুনশ্চ ঐ—"নবদ্বীপ পারে সে কুলিয়া নামে গ্রাম।
শ্রীমাধব দাস তথা আছে ভাগ্যবান॥"

পুনশ্চ ঐ—"সপ্তদিন এইমতে কুলিয়া নগরে।
ভাসাইলা সর্ব্বলোক আনন্দ সাগরে॥
প্রাতঃকালে চলিলেন গঙ্গা তটে তটে
স্বর্গে মর্ত্ত্যে হরিধ্বনি কলরব উঠে।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কুলিয়ারে গঙ্গার উপর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

"তবে নিত্যানন্দ সর্ব্বপার্ষদের সঙ্গে। প্রতি গ্রামে ভ্রমে কীর্ত্তনের রঙ্গে॥

থানা ঘোতা বড় গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপারে কভু যায়েন কুলিয়া॥"

পুনশ্চ ঐ অন্ত্য খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে,—

"কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসীমণি। সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ার। শুনিমাত্র সর্ব্বলোক মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতি গ্রামেতে যত গহন আছিল। তার কোটী কোটী গুণ সকল পূরিল॥"

* * *

"ক্ষণেক আইল" মহাশয় বাচস্পতি। তিনি নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥
কতক্ষণে মাত্র বাচস্পতি একেশ্বর। ডাকি আনিলেন প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দরে প্রসাদ। গোপাল বিপ্রের ক্ষমা প্রবাস অপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে। অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥

এ বর্ণনা পাঠে কুলিয়ায় অবস্থান সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা হয় না, বিশেষতঃ কবিরাজ গোস্বামী বহুস্থলেই শ্রীবৃন্দাবনদাসের বিস্তারিতরূপে বর্ণিত বিষয় গুলি সংক্ষেপে লিখিয়া সারিয়াছেন যথা,—

"শান্তিপুর পুন কৈল দশদিন বাস। বিস্তারি কহিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
অতএব ইহা তার না কৈল বিস্তার। পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে বিস্তার॥"

এক্ষেত্রে তাঁহার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা আশা করা যায় না তিনি চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে লিখিয়াছেন যে শ্রীপ্রভু পানীহাটী হইতে কুমারহট্টে শ্রীবাসকে দর্শন দিয়া কাঞ্চন পল্লীতে শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করতঃ বাচস্পতি গৃহে উপনীত হইলেন ও তথা হইতে কুলিয়ায় গেলেন। এই বাচস্পতির গৃহ কুলিয়ার নিতান্ত সন্নিহিত না হইলে চৈতন্য ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের অনুযায়ী তিনি কদাপি "ক্ষণেকের" মধ্যে কুলিয়ায় শ্রীপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেন না। এখন দেখিতে হইবে এই বাচস্পতির গৃহ কোথায় ছিল,

চৈতন্যভাগবতে—

"সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।"

পুনশ্চ ঐ মধ্যখণ্ডে ২১ অধ্যায়—

"হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥
একদিবস প্রভু করে নগর ভ্রমণ। চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাহার জাঙ্গালে গেল প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেই খানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ।"

উহা হইতে জানা যাইতেছে যে মহেশ্বর বিশারদ, সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস নবদ্বীপেরই এক অংশে ছিল, আবার তাঁহার নিবাস নবদ্বীপের যে অংশে ছিল কুলিয়া তাহারই সন্নিকটবর্ত্তী ছিল তাই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র "ক্ষণেকের" মধ্যে বিশারদ মহাশয় প্রভুর নিকট যাইতে পারিয়াছিলেন।

আবার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায়,—

"গাঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশে গিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। নবদ্বীপ আইলা প্রভু এই তার মর্ম্ম॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেল নবদ্বীপ। বারকোনা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥"

উহা হইতে কুলিয়া যে তদানীন্তন নবদ্বীপেরই অংশ বিশেষ তাহাই প্রমাণ হইতেছে।

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে কুলিয়া যে নবদ্বীপের পর পারে অবস্থিত তাহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে,—

"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিত বাট্যা মভ্যাষযৌ। ততো অদ্বৈত বাটীমভ্যেত্য হরিদাসে নাভিবন্দিত স্তথৈব তরণীবর্ত্তনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া নাম গ্রামে মাধবদাস বাট্যা মুর্ত্তিণবান।"

বিখ্যাত পদকর্ত্তা প্রেমদাস বংশীবদন ঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

"নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে, কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান। তথায় আনন্দধাম শ্রীছকড়ি নাম মহাতেজা কুলীন সন্তান।"

এই সকল এবং অন্যান্য বহু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া স্থির নিশ্চয়ে বলা যায় যে কুলিয়া গ্রাম তদানীন্তন নবদ্বীপের অব্যবহিত পরপারে গঙ্গার তীরে বর্ত্তমান নবদ্বীপের দক্ষিণাংশে সংস্থাপিত ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বেও ঐস্থান "কোলের গঞ্জ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

৫ Christians number 8,091, of whom 7,912 are natives. The Church of England possesses 5,836 adherents and the Roman Catholic Church 2,172. The Church missionary society commenced work in 1831 and had 13 centres presided over by native clergy or catechtsts and Superintended by 6 or 7 Europens. The Roman catholic misson was established in 1855 & Krishnagar is now the head quarters of the diocese of central Bengal. In 1977 there was a schism among the adherents of the church Missionary Society and a member of them went over to the church of Rome. The church of England Zenana Misson works at Krishnagar and at Ratanpur and a Medical Misson at Ranaghat—imp Gazeteer. (New Edition) vol xviii page 276.

চর্চ্চ অফ ইংলণ্ডের প্রচারকগণের কৃত খ্রীষ্টানের সংখ্যা নদীয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এমন কি বঙ্গের অন্য যে কোনও জেলার অপেক্ষা অধিক। এই সমিতির প্রচারকগণই নদীয়ায় সর্ব্বপ্রথম (১৮১১ খ্রীঃ) প্রচার উদ্দেশে আগমন করেন; প্রায় ইহার সম সময়েই "লণ্ডন মিশিনারি সোসাইটীর" মিঃ হিল, ওয়ারডেন, ট্রইন প্রমুখ পাদরীগণ শান্তিপুরে

আড্ডা স্থাপন করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ডিয়ার কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপে দুইটী প্রচার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৮ অব্দে কৃষ্ণনগর, ভবরপাড়া, আনন্দাবাস ও সলুয়া প্রভৃতি স্থানে ৫৬০ জন ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪০ অব্দে কাপাসডাঙ্গা চাপড়া এবং রতনপুরে প্রচার আড্ডা স্থাপন করা হয় এবং সোলোতে একটী গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ১৮৪১ খ্রীঃতে চাপড়া ও কৃষ্ণনগরের গির্জ্জা নির্ম্মাণ কার্য্য আরব্ধ হয়। ক্যাপ্টেন স্মিথ নামে একজন সাহেব গির্জ্জার নক্সা প্রস্তুত করেন। ১৮৪৩ অব্দে এই দুইটী গির্জ্জার কার্য্য সমাধা হয়। এই বৎসর খ্রীষ্টান সমাজভুক্ত লোকের সংখ্যা হয় ৩,৯০২। ১৮৫০ অব্দে চাপড়া স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৬৪ অব্দে সোলোতে স্থাপিত নর্ম্মাল স্কুল যাহা প্রথমে কাপাসডাঙ্গা পরে শান্তিপুরে স্থানান্তরিত হয় তাহা স্থায়ীরূপে কৃষ্ণনগরে স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ অব্দে নদীয়াবাসী সমস্ত খ্রীষ্টানগণের নেটিভ চার্চ্চ কাউন্সিল নামে একটী সমাজসমিতি গঠিত হইয়াছে। ১৯০৬ অব্দে রাণাঘাট মেডিক্যাল মিসন স্থাপিত হইয়াছে।

৬ শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ। —ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

৭ এই মন্ত্রের পাঠান্তরেও দৃষ্ট হয়। যথা—কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার তুমি আমার তোমার সুখে চলি ফিরি তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি দোহাই মহাপ্রভু।

Mr. Ward, Asiatic Research এর vol. II এ এই মন্ত্রটীর এইরূপ ইংরাজি তর্জ্জমা প্রদান করিয়াছেন,—"Oh sinless Lord? Oh great Lord at thy pleasure I go and retnrn, not a moment and without Thee, I am even with Thee, save Oh great Lord.

Few respectable Hindoos have joined the Karthabhajas, yet they are spreading, but chiefly among the lower orders, onc of their pretences is to substitute an actual vision of the Goddess of every individual instead of a material image, each one is allowed to retain the duty he has been most accustomed to houonr; a secret and darkned appartment is choosen and the initiated are made to see their own God, ie, they are turned first to a strong light and then to a darkness, where fancy conjnres up the image. Their chief principle

is "that by devotion, God will give them eyes and then of him, and through that sight Salvation."

*   *   *   *

Ishar Chandra Pal "the present head of the sect, lives in the style of Rajah, his grandfather was a Guala or Keeper of cows. Drs. Marshman and Carry visited Ramdullal his father in 1802, they found a Ratha near his house which was handsome, stately, exceeding that of many Rajahs" he was "no less plump than Bacchus and about 20 years of age," he argued with them, defending the doctrine of panthism. Some of their secret rites are of the most disgustingly licentious description.—Vide Foot note page 407. Cal. Review Vol. VI 1846.

৯ ১। হটু ঘোষ, ২। লক্ষ্মীকান্ত, ৩। নয়ন, ৪। বেচুঘোষ, ৫। নিত্যানন্দ দাস, ৬। কৃষ্ণদাস, ৭। নিধিরাম দাস, ৮। শিশুরাম, ৯। হরিঘোষ, ১০। মেলারাম দাস, ১১। শ্যাম কাঁসারি, ১২। শঙ্কর, ১৩। কানাই ঘোষ, ১৪। রামশরণ পাল, ১৫। আনন্দ পাল, ১৬। নিতাই ঘোষ, ১৭। মনোহরদাস, ১৮। ভীম রজপুত, ১৯। কিনু, ২০। বিষ্ণুদাস, ২১। গোবিন্দ, ২২। পাঁচুরুইদাস

১০ নদীয়াবাসী সংখ্যাতীত শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের মধ্যে কতিপয় প্রধানের পাট মাত্র এখানে লিপিবদ্ধ হইল ; দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সকল শ্রীপাটের অধিকাংশই অতি হীন অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেবার বন্দবস্তও অধিকাংশ স্থলে অতি শোচনীয়। আবার কোনও কোনও পাট স্থান একেবারেই লোপ পাইয়াছে, আবার কোথাও নূতন পাট বসিয়াছে। যেমন সুখসাগর ভাঙ্গিয়া সুখসাগরের পাট চাঁদুড়ে উঠিয়া আসিয়াছে, তেমনি নূতন কুলিয়ার পাট স্থাপিত হইয়াছে। পাট গুলির প্রতি বৈষ্ণবসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নতুবা আর কিছু দিনে এগুলির লোপ অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বলীলায়	গৌরলীলায়	পাট
মধুমঙ্গল	শ্রীধর (খোলা বেচা)	নবদ্বীপ।
গন্ধর্ব্ব গোপাল	মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত	নবদ্বীপ।
নারদ	শ্রীবাস	নবদ্বীপ।
হনুমান	মুরারী গুপ্ত	নবদ্বীপ।
অঙ্গদ	পুরন্দর পণ্ডিত	নবদ্বীপ।
সুগ্রীব	গোবিন্দানন্দ	নবদ্বীপ।
বশিষ্ঠ	গঙ্গাদাস পণ্ডিত	„ (বিদ্যানগর)।
বিভীষণ	রামচন্দ্রপুরী	নবদ্বীপ।
ব্রহ্মা	গোপীনাথাচার্য্য	নবদ্বীপ।

শঙ্খনিধি	আচার্য্যরত্ন	নবদ্বীপ।
বিশ্বামিত্র	বনমালী	নবদ্বীপ।
ভদ্রা	শঙ্কর পণ্ডিত	„ (পাহাড়পুর)।
বিশাখা	স্বরূপ দামোদর	নবদ্বীপ।
মধুরেক্ষণা	বলভদ্র ভট্টাচার্য্য	নবদ্বীপ।
মধুরা	বিদ্যাবাচস্পতি	„ (কাঁউগাছি)।
কামমঞ্জরী	নন্দন ব্রহ্মচারী	নবদ্বীপ।
কলভাষিণী	বাণীনাথ পণ্ডিত	„ (গাদিগাছা)।
সুকেশী	মকরধ্বজ	„ (বড়গাছি)।
কলাপিনী	জগদানন্দ পণ্ডিত	নবদ্বীপ।
সুধীরা	মাধবাচার্য্য	নবদ্বীপ।
নান্দীমুখী	সারঙ্গ ঠাকুর	„ (মাউগাছি)।
সদাশিব	অদ্বৈতাচার্য্য	শান্তিপুর।
সুরঙ্গিণী	শ্রীহর্ষ	
গোপালিকা	গোপালাচার্য্য	শান্তিপুর।
বীরা	শিবানন্দ সেন	কাঁচড়াপাড়া।
গোপালী	কর্ণপুর	কাঁচড়াপাড়া।
চিত্রাঙ্গদী	শ্রীনাথ পণ্ডিত	কাঁচড়াপাড়া।
গুণচণ্ডী	পরমানন্দ সেন	কাঁচড়াপাড়া।
স্তোককৃষ্ণ	ঠাকুর পুরুষোত্তম	সুখসাগর।
	জগদীশ পণ্ডিত	যশোড়া।
ভাগুড়ী	দেবানন্দ পণ্ডিত	কুলিয়া।
	প্রভৃতি।	

১১ The headman of the town (Ula) has passed a by-law that any man who on this occasion refuses to entertain guests shall be considered infamous and shall be excluded from society.—Article "The banks of Bhagirathi" in Cal Review Vol VI 1846.

অনেকের মতে উলার এই দেবী বৌদ্ধ পূজার রূপান্তর মাত্র, তাঁহাদের অন্যান্য যুক্তির মধ্যে হাড়ীদ্বারা দেবীর প্রথম পূজা ও শুকর বলীদান প্রভৃতি প্রবাদগুলি অন্যতম।

বিরহীগ্রামেও এক অতি প্রাচীন চণ্ডীদেবী আছেন তাঁহার নাম হইতে ডিহি চণ্ডীর নাম হইয়াছে। ইনি কতদিনের প্রাচীন তাহা বলা যায় না, তবে দেখা যায় যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই চণ্ডীদেবীর বহু জমী লইয়া বিরহীর মদন গোপাল বিগ্রহের নামে ছাড়পত্র দেন। এই মদন গোপাল সম্বন্ধে এতদঞ্চলে বহু অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে।

১২ এই মেলা ধর্ম্মগাজন নামে বিখ্যাত, ইহার মন্ত্রাদি ও পূজাপ্রণালী দৃষ্টে ইহাকে বৌদ্ধ পূজার রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। ইহার পূজা অদ্যাপী হাড়ীইতে করিয়া থাকে। আন্দুলিয়ার বর্ত্তমান বারইয়ারি তলার সন্নিকটে যে বহু প্রাচীন "বাস-দেবের" মূর্ত্তিনামে এক প্রস্তর মূর্ত্তির পূজা হয় তাহাও বৌদ্ধযুগের শেষ নিদর্শন অনুমিত হয়। প্রাচীন মূর্ত্তিটী প্রায় ২৪।২৫ বৎসর পূর্ব্বে দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় এই বর্ত্তমান মূর্ত্তিটী দে গাঁ হইতে লইয়া আসিয়া এখানে স্থাপিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে মূর্ত্তিটী ছিল সেটী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। বর্ত্তমান মূর্ত্তিটী হিন্দুদেবতার মূর্ত্তি।

নদীয়ার সামাজিক বিবরণ

ক্রমিক পরিবর্ত্তন

মহারাজ অশোকের সময় হইতে বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তীকালে নানাকারণে ইহা বিকৃত হইয়া "নষ্টজ্ঞান" আখ্যায় অভিহিত হয়। এই সময়ে দেশের সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে জাতি মধ্যে উচ্চ নীচভেদ একবারে তিরোহিত হয়, এবং বেদপুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমধিক অবনতি দৃষ্ট হয়। হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তি গৌড়েশ্বর মহারাজ আদিশূর, দেশকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে ৯৯৯ শকে অগ্রবর্ত্তী হয়েন, এবং কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামিয় পাঁচজন বেদজ্ঞব্রাহ্মণ আনিয়া এদেশের নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজগোত্রজ, ভট্টনারায়ণ-শাণ্ডিল্য, দক্ষকাশ্যপ, বেদগর্ভ-শাবর্ণ এবং ছান্দড়-বাৎস গোত্রজ। এই পঞ্চব্রাহ্মণের যে কয়জন অনুচর আসিয়াছিলেন তাঁহারাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ। ইঁহাদেরই বংশাবলী পরে "রাঢ়ীয়" ও "বারেন্দ্র" নামে অভিহিত হয়েন। মহারাজ আদিশূর ও পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দ এই সকল ব্রাহ্মণগণকে বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। আদিশূরবংশীয় রাজগণের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া পালবংশীয়েরা প্রবল হইয়া উঠেন, কিন্তু কিছুদিনের পরেই সেন রাজগণ এদেশ পুনরাধিকার করেন। এই সেনবংশীয় নরপতি সুবিখ্যাত বল্লালসেন নবদ্বীপে রীতিমত রাজধানী স্থাপন করেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশাবলী বহুবিস্তৃত হইয়া পড়ায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই আচার ব্যবহার কলুষিত হইয়া পড়ে, সুতরাং এই সময়ে বিশৃঙ্খল সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়, সে কারণ বল্লালসেন পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধির জন্য "কৌলিন্য মর্য্যাদা" সৃষ্টি করের, এবং আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ, দান, এই নয়টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কুলীন আখ্যা প্রদান করেন। আদি পঞ্চব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বর্দ্ধমান বংশাবলী এইসময়ে বাঙ্গলার বিভিন্নস্থানে বিস্তীর্ণ হওয়ায় তাহাদের সমষ্টি গ্রহণ করিয়া মোট ৫৬ গ্রামে বাস করিতে দেখা যায়। এই সকল গ্রামের নাম হইতে বিভিন্ন গাঁইয়ের (গ্রামীন) সৃষ্টি হয় এবং বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক কায়স্থ সমাজে পর্য্যায় নির্দিষ্ট হইয়া সমপর্য্যায়ে বিবাহাদি নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়।

মহারাজ আদিশূর, বল্লালসেন লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গালী রাজার অধীনে

দেশে, সংস্কৃত কাব্যাদি, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানাশাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং তৎসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। বল্লালের পূর্ব্ব হইতেও নবদ্বীপ "সমাজ স্থান" বলিয়া বিখ্যাত থাকিলেও বল্লালের সময় হইতেই উহা হিন্দু সমাজের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে।

বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি হিন্দুনরপতিগণ যখন নবদ্বীপে থাকিয়া গৌড়রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখনকার শাসন প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা করিতে হইলে জনশ্রুতি, তাম্রশাসনোল্লিখিত রাজকর্ম্মচারীগণের সংখ্যা ও পদবিজ্ঞাপক উপাধি এবং প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। এই সকল উপাদান হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখা যায় যে দেশ সুশাশিত ছিল। অশেষ রাজরাজন্যক পদ হইতে দেশে তখন সামন্তপ্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া বোধ হয়, যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন "মহাসন্ধি-বিগ্রহিক" তাঁহার উপর ছিলেন "মহাসেনাপতি"; যুদ্ধ ভাণ্ডারের অধ্যক্ষের নাম ছিল "রাণভাণ্ডাগারাধিকরণ," এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্র শাসনে যে সকল রাজকর্ম্মচারীর নাম উল্লিখিত আছে তাহাতে জানা যায় যে সে সময়ে রাজ্যের প্রধান বিচারপতির নাম ছিল "মহাক্ষপটলিক" ও "সহাধর্ম্মাধ্যক্ষ", "ফৌজদারী" বিভাগের কার্য্যপরিদর্শকের নাম ছিল "বৃহদুপরিক" ও "দণ্ডনায়ক"। করসংগ্রাহক কর্ম্মচারীকে "মহাভোগিক" ও বন বিভাগের কর্ম্মচারীকে "মহাপীলুপতি" বলিত, কেহ কেহ মহাভোগিক ও মহাপীলুপতি শব্দের গজ রক্ষক অর্থ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্তঃপুর রক্ষীগণকে "অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক"। বৃহৎ মন্দির সমূহের অধ্যক্ষকে মহাপ্রতিহার"। শান্তি রক্ষাকর্ত্তাকে "দণ্ডপাশিক" নগর রক্ষককে "বৈশাল্যাধিষ্ঠানধিক" বলিত। এতদ্ব্যতীত "মহাগণস্ক" "চৌরদ্ধণিক" "দৌস্সাধিক" প্রভৃতি পদধারী বহুতর রাজকর্ম্মচারী রাজ্য শাসনে সহায়তা করিতেন। রাজাও এই সকল উপযুক্ত কর্ম্মচারীর সহায়তায় প্রজাসাধারণের মনস্তুষ্টি করিয়া সনাতন হিন্দু প্রথানুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেন এবং যে কোনও কার্য্য করিতে হইলে "তৎপ্রতি সাধারণের সহানুভূতি ও অনুমোদন লাভাশায় লিখিতেন—"মতমস্তভবতাম্"।

রাজোচিত দানানাদি কর্ম্মেও তাঁহাদের বিশেষ মতি ছিল। ব্রাহ্মণকে "ব্রহ্মোত্তর" দান করিতে হইলে তাম্রপট্টে উহা খোদিত হইত। এযাবৎ সেন নরপতিগণের অনেকগুলি এইরূপ "তাম্র শাসন লিপি" নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে লক্ষ্মণসেনদেবের চারিখানি। দুইখানি পূর্ব্বাবিষ্কৃত; দুইখানি নবাবিষ্কৃত; ইহাদের একখানি পাবনার অন্তর্গত মাধাই নগরে পাওয়া যায় ও সর্ব্বশেষের খানি এই নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী অনুলিয়া গ্রামের সীতানাথ ঘোষ কিছু দিন পূর্ব্বে ভূমি খননোপলক্ষে প্রাপ্ত হয়েন,[১] ফলকখানি বহুকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় নিতান্ত বিবর্ণ ও স্থানে স্থানে কালিমালিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার আয়তন ১৩।০×১২·০ ইঞ্চি, শিরোভাগে একটি দশভুজ সমন্বিত দেবীমূর্ত্তি কীলকযোগে ফলকের সহিত দৃঢ়বদ্ধ। প্রথম পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৮ পংক্তি পরিমিত সংস্কৃতে রচিত পদ্যগদ্যময় ভাষায়

বল্লালসেনের পুত্র মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমবৈষ্ণব, পরম ভট্টারক শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব কর্ত্তৃক বিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার হইতে স্বকীয় রাজ্যাব্দের তৃতীয় বর্ষীয় নবম ভাদ্র দিবসে যজুর্ব্বেদান্তর্গত কাণ্বশাখাধ্যায়ী কৌশিক গোত্রীয় বিশ্বামিত্র বন্ধুল কৌশিক প্রবরের রঘুদেব শর্ম্মা নামক কোনও ব্রাহ্মণকে যে ভূমিদান করা হয় ইহাতে তদ্বিবরণ খোদিত আছে। এই তাম্রপট্টে কীলক যোগে যে অংশ মূল কীলকের সহিত সংযুক্ত তাহা সেন রাজবংশের প্রচলিত রাজমুদ্রা বলিয়াই অনুমিত হয় ইহা খোদিত নহে ছাঁচে ঢালাই করা বলিয়াই বোধ হয়।

১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গৌড়ে মুসলমান প্রভাব কালের আরম্ভ, এই সময় হইতে মহাপ্রভুর সময় পর্যান্ত মুসলমানগণের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে হিন্দুর সমাজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া আইসে ও এই সময় হইতেই বহু হিন্দু নিদারুণ অত্যাচারে, অনিচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে।[২] ক্বচিৎ কেহ রমণীর রূপ-মোহে বা অর্থলোভে স্বইচ্ছায় উক্ত ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের, পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ রীতি নীতি, আচার ব্যবহার বহু স্থলেই হিন্দুদের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়।

এই সময়ের লিখিত কাব্যাদিতে তৎকাল প্রচলিত রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের অনেক আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে দেশের লোককে ডিঙ্গা সাজাইয়া বহুবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া বিদেশে যাইতে দেখা যায়। ব্যবসাদিতে বট, বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যক কড়ি দ্বারা বিনিময় প্রথায় প্রচলন ছিল। "পুরুষ" নামে এক প্রকার ভূম্যাদি মাপিবার মাপ প্রচলিত ছিল।

এই সময়ে জ্যোতিষে লোকের অকৃত্রিম বিশ্বাস দেখা যায়। এমন কি হাঁচি টিক্‌টিকী, কাকপ্রভৃতির শব্দানুযায়ী শুভাশুভ নির্দ্দিষ্ট হইত। লক্ষ্মণ সেনের জ্যোতিষের প্রতি এরূপ অন্ধ বিশ্বাসই বঙ্গদেশের সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া কথিত।

তাৎকালীক উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদির মধ্যে পাটের পাছরা[৩] প্রভৃতি পট্টবস্ত্রের সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। তখন স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার অধিকাংশ স্থলেই রৌপ্য নির্ম্মিত হইত এবং "মদনকড়ি", "নীলমণিকাচ," "মল্লতাড়ল," "ঘণ্টি" এবং পদে পিত্তলের "খারু" প্রভৃতি অলঙ্কারই রূপসীগণের বিশেষ আদরের ছিল; পুরুষেও কর্ণে তুল এবং প্রকোষ্ঠে বলয় ব্যবহার করিতেন।

রাজা ও ধনশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যার সম্মান করিতেন এবং অবসর পাইলে গীত বাদ্যে আমোদ করিতেন।

ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল মুসলমানগণের সংস্পর্শে ও শিক্ষায় দেশ ততই বিলাসিতার প্লাবনে মগ্ন হইতে লাগিল। বহুবিবাহ এই সময়ে দেশ মধ্যে বাহুল্যরূপে প্রচারিত হয়, দেশে খাদ্যাখাদ্যের বিচারে লোকের আস্থা কমিয়া যায় এমন কি কোন কোন নীতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ মদ্যপান ও গোমাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে থাকে।[৪] এই বিলাসিতা স্রোতে দেশ হইতে নিত্য সত্য প্রেমভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইয়া যায়। চৈতন্য ভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবনদাস এই সময়ের নদীয়ার একটী প্রাঞ্জল বর্ণনা লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন :—

কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিবাহে। এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥
যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যমপাশে বান্ধিয়া মরে ॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দোষ বহি কার না করে বাখন ॥
যে বা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানি। তা সবার মুখেও নাহি হরিধ্বনি ॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরিকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥
গীত ভাগবত যে জনাতে পড়ায়। ভক্তির বাহান নাই তাহার জিহ্বায় ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যাবস্থার রসে। কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কারবাসে ॥
বাসলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥

যখন নদীয়ার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন যুগবতার শ্রীচৈতন্যদেবজন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রচারিত সুমধুর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেমভক্তির প্লাবনে জাতীয় জীবনের সঞ্চিত কলুষরাশি বহুল পরিমাণে ধৌত হইয়া যায়।

এই সময়ে স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কর্ণপুট, কুণ্ডল, বলয়, শঙ্খ, কঙ্কণ প্রভৃতি সে কালের সৌখিন অলঙ্কার। তাঁহারা এই সকল অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া "লোটন খেপায় কেশ বিন্যাস করিয়া "মেঘডুম্বর কাপড়" ও চারু কারুকার্য্যেখচিত কাচুলি পরিধান করিয়া পুষ্পমালা কণ্ঠে দিয়া হস্তে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া রাত্রিতে স্বামী সম্ভাষনে গমন করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ উৎসবকালে "ক্ষুঞা" নামক বস্ত্র আদরের সহিত পরিধান করিত।

তখন গৃহে গৃহে নবপঞ্জিকা বিরাজ করিত না। গণ্যাচার্য্যগণ পাঞ্জিকা শুনাইতেন এবং শুভ কার্য্যের দিনস্থির করিতেন। অগ্রদানীগণ নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তখন বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা ছিল না অথবা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া লোক লৌকিকতা করিতে হইত না। পাঁচটি হরিতকী দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেই চলিত।

সে সময় দেশের লোকের ঘরে খাদ্যের অভাব ছিল না। তাঁহারা আহার কালীন চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি সমস্ত রসগুলি আস্বাদ করিতেন। নিম্নের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তদানীন্তন মধ্যাহ্নিক আহার্য্যের একটা আভাস পাওয়া যাইবে। যথা চরিতামৃতে :—

"দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত শুক্ত ঝোল। মরিচের ঝাল, ছানা, বড়া ঘোল ॥
দুগ্ধ তুম্বী দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, বেশারী লাফরা। মোচাঘন্ট মোচাভাজা, বিবিধ শাকরা ॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ির ব্যাঞ্জন অপার। ফুল বড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার ॥

নবনিম্ব পত্রসহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকি। ফুল বড়ী পটলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি॥
ভ্রষ্টমান মুদ্গ সূপ অমৃত নিন্দয়। মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গবড়া মানবড়া কলাবড়া মিষ্ট। ক্ষিরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট॥
কাজি বড়া দুগ্ধচিতা দুগ্ধ লকলকি। আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃত সিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাহা ধরি॥
সরলা মথিত দধি সন্দেশ অপার। গৌড় প্রদেশে যত ভক্ষের প্রকার॥

এই সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহের আমূল পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সংশোধন দ্বারা তাহাদের কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া দেন। কেবল বিধবাগণের পালনীয় নিয়ম সম্বন্ধে সমাজে ব্যাভিচারাদি দমনের ব্যবস্থা প্রচলন করেন। স্মার্ত্ত, বিধবা রমণীর সহমৃতা হইবার প্রথার উচ্চ মহিমা কীর্ত্তন করিলে লুপ্তপ্রায় এই রীতি দেশমধ্যে পুনঃ প্রচলিত হয়।

এই সময়ে নদীয়ায় বিদ্যা চর্চ্চার একটা স্রোত বহিতে থাকে। কেবলমাত্র যে উচ্চ বর্ণের মধ্যে এইরূপে বিদ্যার প্রসার ছিল, তাহা নহে, নিম্ন শ্রেণীর শূদ্রাদির মধ্যেও উহার সম্যক আলোচনা হইতে ছিল। এমন কি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও দুই একজন বিদুষী রমণীর নাম পাওয়া যায়।

এই সময়ে নদীয়ার ভাস্কর বিদ্যার সম্যক উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবদেবীর সুন্দর মূর্ত্তি গঠনে সুনিপুণ কারিকরের অভাব ছিল না এবং বস্ত্রবয়ন শিল্পে নদীয়া ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছিল। পরবর্ত্তীকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এই সকল চারু-কলা সম্যক পুষ্ট হইয়াছিল।

এই সময়ে নদীয়ার যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল এবং সমসাময়িক কবিগণ যেরূপে নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তখনকার নবদ্বীপ এখনকার কলিকাতার অপেক্ষা শোভা সমৃদ্ধিতে ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কবি জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে তদানীন্তন নদীয়ার বাটী, ঘর, হাট, বাজার প্রভৃতির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

নানা চিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী নানা জাতি বৈসে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেহারা নানা বর্ণে বৃক্ষলতা॥
জয় জয় ধন্য নদীয়া নগরী অলকানন্দার কুলে।
কমলা ভবানী ক্রীড়া করে তথি বিরাজিত বকুল মালে॥
প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চঞ্চল পতাকা উড়ে।
পূর্ব্বে যেন ছিল অযোধ্যা নগরী বিজুরী ছটাক পড়ে॥
নাট পাঠশালা দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।
মাঠ মণ্ডপ সুযন্ত্রিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরোপন॥
প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতি গলি নৃত্যগীত—আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদ পাঠ॥

পুনশ্চ—গোধূলী সময়ে মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খধ্বনি প্রতি ঘরে।

শ্বেত চামর ময়ূর পাখা হাতে চন্দ্রাতপ শোভা করে ॥
ইষ্টক রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গন সুসজ্জিত গৃহদ্বারে।
হিঙ্গুল হরিতাল কাঁচা ঢাল চৌখণ্ডী চৌকাট সালে ॥
সালে রসাল বিশালক স্তম্ভ রাজি চন্দ্রার্ক তিলকে।
ময়ূর শুক সারস পারাবত সিংহ হংস চক্রবাকে ॥
ঘাট পাট সিংহাসন আসন চৌখড়ি ময়ূর পাখা।
বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা ॥

পুনশ্চঃ—নদীয়ার হাটে কি কি দ্রব্য বিকাইত তাহার তালিকা এইরূপ,

ডাবর বাটা গুবাক সংপুট দর্পন রস বাটিকা।
তাম্রহাণ্ডি রস পিত্তল কলস বারানসীর ত্রিপদিকা ॥
শঙ্খ বাটা বাটী সর্ব্বাঙ্গ থাল রসময় রসখুরী।
তিরোহুত গাড়ু তাম্র মুখার মণ্ডল শীতল পিত্তল ঝারি ॥
পাষাণ ভাজন অতি সুগঠন খড়িকা রঙ্গি কাপড়া।
উড়িয়া গৌড়িয়া চিরুণী বিচিত্র সাপুড়া ॥
টাড় পাঠ্যা কড়ি হিরণ্য মাদলী কেয়ূর কমল রত্ন নুপুরে।
হেমকিয়া পাতা বিক্রম মুকুতা কাশ্মীর দেশের খুরে ॥
তবক স্বর পানবাটা কাঞ্চিদেশের বিচিত্র বেলি।
পাটনেত ভোট সকলতে কম্বল শ্রীরাম খানি জমকা ॥
ভোট্ট দেশের ইন্দ্রনীলমণি লক্ষ্মীবিলাস তারকা।
লেখিতে না পারি যত দাসদাসী প্রেমের মন্দিরে খাটে ॥
যে যে দ্রব্য সব ভুবন দুর্লভ বিকায় নদীয়া হাটে।

পূর্ব্বোক্ত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে নদীয়ার বাটী, ঘর, দ্বার, দেউল দেহারা, হাট বাজার সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানা যায়, সে তথ্য আমাদের গৌরবের তথ্য, কেননা চুর্ণে বিলেপিত সেই সব "দেউল দেহারা" প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস তাহাতে "চঞ্চল পতাকা" সেই "নৃত্যগীত—আনন্দিত" "প্রতিঘর" "ইষ্টক রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গন সুসজ্জিত গৃহদ্বার" প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের গৌরবব্যঞ্জক। নদীয়ার হাটে যে সকল "ভুবনদুর্লভ" দ্রব্য বিকাইত তাহাও ত্রিহুট, উৎকল, কাশী, কাঞ্চি কাশ্মীর, ভোট দেশ প্রভৃতি বহুদূর দূরান্তর হইতে আনীত। ইহাই সেই তদানীন্তন পথ ঘাট রেল ষ্টীমার বিহীন কালের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও ক্রেতার আধিক্য না থাকিলে আর এ সকল দ্রব্য সংগৃহীত হয় নাই।

এইকালেই দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীনগণের মধ্যে নূতন করিয়া মেলবন্ধন করিয়াছিলেন। দেবীবরের পূর্ব্বেই কুলীনগণের মধ্যে দোষ সংস্পর্শ হইয়াছিল। তিনি এক এক প্রকার দোষাশ্রিত কুলীনকে এক এক দলে রাখিলেন, এইরূপে দোষ মিলাইয়া শ্রেণীবিভাগ করা হইল বলিয়া ইহা "দোষ—মেলন বা "মেল"নামে খ্যাত হইল। এই

মেলের সমষ্টী হইয়াছিল ৩৬ ছত্রিশ, ইহাকে ছত্রিশের দাগও বলে; ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, সর্ব্বানন্দ, সুরাই, আচার্য্য শেখরী, পণ্ডিত রত্নী, বাঙ্গাল পাশ, গোপালঘটকী, ছায়া নরেন্দ্রী, বিজয় পণ্ডিতী, চান্দাই, মাধাই, বিদ্যাধরী, পারয়াল, শ্রীরঙ্গভাট্টি, মালাধর খান কাকুস্থী, হরি মজুমদারী, শ্রীমন্তখানী, প্রমোদিনী, দশরথ ঘটকী, শুভরাজখানী, নড়িয়া, রায়, চট্টরাঘবী, দোহাটা ছয়ী, ভৈরব ঘটকী, আচম্বিতা, ধরাধরী, রাঘব ঘোষালী, শুঙ্গ সর্ব্বানন্দী শতানন্দখানী, চন্দ্রপতী, বালী। এই সকল গুলির মধ্যে ফুলিয়া ও আচম্বিতা মেল বর্ত্তমান নদীয়া জেলার মধ্যে পড়ে। ফুলিয়া শান্তিপুরের নিকট এবং "আচম্বিতা" চাকদহের পূর্ব্বকালীন সজ্ঞান্তর বিশেষ। কবি কীর্ত্তিবাসের পূর্ব্ব পুরুষ মুখুটী বংশোদ্ভব গঙ্গানন্দ হইতে ফুলিয়া মেল সৃষ্ট হয়। যথা "মেল প্রকাশে—

"ফুলিয়া সরস কুল মেলের প্রধান। গঙ্গানন্দন ভট্টাচার্য্য সূর্য্যের সমান॥
হিরণ্য উদয় মধ্যে মাধাই নন্দন। গঙ্গানন্দ কুলে কৃতী ঘোষে সর্ব্বজন॥

"ফুলিয়া"র সরস কুল বলিয়া খ্যাতি থাকিলেও এই কালে তাহাতে দোষাঘাত হয় এবং ঐ দোষ ক্রমে নানা শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয় যথা "দোষ চন্দ্র প্রকাশে"

কাশীশ্বর-সুত হরিহর ফুলিয়ার মুখটী। ভাল বিভাছিল তার জুনিদ খাঁর বেটী॥
বিধির বিধান ছিল পঙ্গা মরে রণ্ডে। ধরিল ছাড়িল ধরা আনচানের পিণ্ডে॥
চতুর্ভুজ ভাঙ্গে আর্ত্তি শ্রীগোপালে। নীলকণ্ঠ ধেঁাদা বাদ লেগে গেল গলে॥
এই দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ি জন্মেজয়। তদবধি ফুলিয়া মেল হইল নিশ্চয়॥
কাজীর বেটা জাফর আলী নবাই বান্দারে। নন্দা বন্দা সুতা ঘরে আফিঙ্গ বিহারে॥
পান দোষে নারায়ণ দাসে এতেক ফুলিয়া যায়। বীরভূমের বসন্ত ফুটিল কাব্যগায়॥

আচম্বিতা মেলরে দোষ সম্বন্ধে "দোষাবলীতে" এইরূপ লিখিত আছে ;--

আচম্বিতা হইল মেল নানা দোষ পাইয়া। গোবিন্দ সুত বিদ্যাধর গুড়ে করে বিয়া॥
চক্রপাণি মুখে মেল হল আচম্বিত। গৌতম ঘটক পালটী নাহি হিতাহিত॥

এইরূপে হিন্দুর শীর্ষ সমাজে নানা দোষ প্রবিষ্ট হওয়ায় সমাজে ক্রমেই বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশ যদিও মুসলমানগণের অধীন ছিল তথাপি বহু ভূস্বামী স্বাধীনভাবে নিজাধিকার শাসন করিতেন। এই সকল ভূস্বামীগণ ভূঞা নামেও খ্যাত হইতেন। ইঁহারা দেবদ্বিজে ভক্তিমান ছিলেন ও সর্ব্বদা দান নিরত ও শাস্ত্রচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। দেশে, এই সময়ে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীগণের মধ্যে সর্ব্বদাই কোন্দল হইত। মুসলমানীভাব ও ভাষা তখন নদীয়ায় বদ্ধমূল হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিদ্যার পূর্ব্বগৌরব অপেক্ষাকৃত মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকে গ্রাম অপেক্ষা সহরে তখন আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং দেবভাষা অপেক্ষা পারশীতে "জবান দুরস্ত" করিতে শিখিয়াছে। এই সময়ে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দর অত্যন্ত সুলভ ছিল। মুসলমান অধিকারে সমাজ ক্রমে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় তাহার পুনঃ সংস্কার করিতে চেষ্টা পান। তিনি স্বয়ং, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ ও কুশদ্বীপ এই

চারি সমাজের সমাজপতি ছিলেন এবং লোকের জাতিদান ও জাতি গ্রহণ করিতে তুলারূপে শক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

মুসলমান অধিকারের ফলে সমাজে, তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনাপরতা প্রবেশ করিয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে তাঁহার পিতৃব্যের অধিকার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও এ বিষয়ে অপটু ছিলেন না— তাঁহার পুত্র শম্ভুচন্দ্র একবার তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার মৃত্যু রটনা করিতে পরান্মুখ হয়েন নাই। এই সময়েই রাজা রাজবল্লভ তাঁহার বিধবা কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে উহা ব্যর্থ করেন।

রাজসভায় তখন ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাপেক্ষা বিদ্যাসুন্দরের আদর অধিক ছিল এবং সাধারণ লোকেরও রামায়ণ বা চণ্ডীর গান অপেক্ষা "খেঁউড়" আসক্তি দেখা যাইত।

এই সময়ে দেশে স্থপতিবিদ্যার সবিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্ম্মিত বহু অট্টালিকা ও কারুকার্য্য খচিত দেবমন্দির সে সকলের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জনসাধারণ তখন অট্টালিকায় বাস করিত না, ইট গড়িতে হইলে তখন রাজদ্বারে অনুমতি লইতে হইত।

নদীয়ার কুম্ভকারগণ মৃত্তিকার পুত্তলিকা গঠনে এই সময়ে সবিশেষ উন্নতি লাভ করে এবং শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ ধূতি এই সময়ে জগদ্বিখ্যাত হয়। অপর দিকে উৎকৃষ্ট ঢাল তরোয়ালাদি, উৎকৃষ্ট খাঁড়া এমন কি কামনাদি প্রস্তুত করিতেও নদীয়ার কর্ম্মকারগণ সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে নদীয়ার প্রস্তুত একটি কামান মুরসিদাবাদ নবাবের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে থাকিয়া অদ্যাপি এই বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।[৬]

কামান গাত্রে যে কর্ম্মকার ইহা প্রস্তুত করিয়াছে, যিনি কু দিয়া হরপ লিখিয়াছেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার আদেশে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে এই তিন জনের নামই ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। কি সূত্রে এই কামানটী মুরসিদাবাদের নবাব গৃহে স্থান পাইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে বলা না যাইলেও ইহা নবাব আলিবর্দ্দিকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপহার বা এমনি কিছু একটা অনুমান করা যাইতে পারে।

এই সময়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই পরিচ্ছদে মুসলমানী ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। পুরুষে বাটীতে সর্ব্বদা ধুতী ও গামোছা (দোপাট্টী) ব্যবহার করিলেও, কোনও উৎসবে বা রাজদরবারে যাইতে হইলেই "আবা" "কাবা" "চোগা" "জোব্বা" প্রভৃতিতে দেহযষ্টী আবৃত করিলেন। "চাপকান" "মচকান" "চূড়ীদার পায়জামা" পায়ে "লক্কাদার জুতা" সৌখীনতার পরিচয় দিত। এই সময়ে হিন্দুমাত্রেই কর্ণবেধ করিতেন সুতরাং কানে একটা আভরণ অন্ততঃ দুটী সোনার গুজি সকলেই ব্যবহার করিতেন। ধনীলোক অঙ্গুলে আঙটী, গলায় হার, কোমরে গোট, বাহুতে নবরত্ন বাজু, পাগরীতে শিরপেচ কলসা এবং কেহ কেহ মণিবন্ধে বালাও ব্যবহার করিতেন। অলঙ্কার হীন দেহ কেহই রাখিতেন না অন্ততঃ কোমরে একটা ঘুনসী তাহাতে একটা চাবী সবাই পরিতেন। আটপৌরে বাবুয়ানা পোষাকে গায়ে মেরজাই মাথায় কামরাঙ্গা টুপী, পরিধানে ধুতী ও

স্কন্ধে উত্তরীয় পদে পাদুকা ব্যবহৃত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে ধুতী উত্তরীয় বা শীতকালে ঐ উত্তরীয়ের উপর কম্বল বনাৎ বা শাল ও পদে খড়ম ব্যবহার করিতেন।

দেহের পারিপাট্যে বিশেষ যত্ন সকলের দেখা যাইত। শরীর সুস্থ থাকিবে বলিয়া "ঋতু-হরিতকীর" ব্যবহার ভদ্র সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে শরীরও থাকিত ভাল। আয়ের অধিকাংশ এখনকার মতন ডাক্তারের ঘরে উঠিত না। জ্বরাধিকারে সাধারণতঃ লঙ্ঘনই ব্যবস্থা ছিল তাহাতে উপসম না হইলে টোটকা বা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হইত, সর্ব্বশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈদ্য ডাকা হইত। এ সময়ে মুসলমান অনুকরণে কেহ বা "হাকিমীর" আশ্রয়ও লইতেন।

সৌখীন সম্প্রদায়ের ভিতর আতর, গোলাপ ফুলেল এর ব্যবহার খুবই চলিয়াছিল। তবে সাধারণতঃ কুঙ্কুম, কস্তুরী, জাফরানই বিশেষ প্রচলিত ছিল দরিদ্রে শুধু চন্দন মাখিত। কেহ কেহ চন্দনের সহিত মৃগনাভী, বা মুচুকুন্দ কি চম্পক কি কোয়ার রেণু মিশাইয়া, তাহাই কাঁচা হলুদ, কাবাব চিনি খাড়ি মসুরী ব কেলেজিরে সর বা নবনীতের সহিত বাটিয়া দেহের পরিমার্জ্জনা করিতেন। মোট কথা দে. র পারিপাট্য এই সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তাহাতে মুসলমানী প্রথা আসিয়া যোগ দিয়াছিল।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেও মুসলমানগণের অনুকরণে নানাপ্রকার রৌপ্য ও সুবর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে আরম্ভ করেন। অলঙ্কারে হীরা মুক্তা ব্যবহারের প্রথা এই সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তপুরবাসীনীরা সক করিয়া পেশোয়াজ ইত্যাদি পরিতেন। নদীয়ার কোনও কোনও স্থানের স্ত্রীলোকগণের খোপার পারিপাট্যও এসময় প্রচলিত হয় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে যথা,—

"উলার মেয়ে কুল কুচটী। নদের মেয়ের খোপা ॥
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়। গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥"

অর্থাৎ উলার মেয়ে কুলের বড়াই করে, নদের মেয়ে বড় বাবু, শান্তিপুরের মেয়ে কলহ পটু ও গুপ্তিপাড়ার মেয়ে বাচাল।

উলা নিবাসী "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" প্রণেতা প্রায় সমসাময়িক কবি গঙ্গাদাস তদানীন্তন স্ত্রীলোকগণের ব্যবহার্য্য অলঙ্কারের এইরূপ তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

"ঢেড়ি, চাঁপি, মাকড়ি, কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পড়ে হীরার কমল নহে তুল ॥
নাসিকাতে নথ কার মুক্তা চুণী ভাল। লবঙ্গ বেশরে কার মুখ করে আল ॥
কিবা গজ মুক্তা কারও নাসিকায় ঝোলে। দোলে সে অপূর্ব্বভাবে হাসির হিল্লোলে ॥
কুন্দ কলিকার মত কার দন্তপাতি। দাড়িম্বের বীচ মুক্তা কার দন্ত ভাতি ॥
মুখ শোভা করে কার মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি ॥
পড়িল গলায় কেহ তেনরী সোণার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার ॥
ধুকধুকী জড়াও পদক পরে সুখে। সোনার কঙ্কন কার শঙ্খের সম্মুখে ॥
পতির আয়ত চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরান বাঁধান লোহা সকলের হাতে ॥

পাতামল পাসুলি আঙট বিছা পায়। গুজরীপঞ্চম আর শোভা কিবা তার ॥"

উৎসবকালে বা রাজদরবারে কি কোনও সম্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে যাইতে হইলে মস্তকে একটা যে কোনও রকমের উষ্ণীষ সকলেই ব্যবহার করিতেন এ প্রথার অবশেষে এখনও ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্মে উষ্ণীষের স্থলে মাথায় একখানা 'গামোছা" বন্ধন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতীয়গণের মধ্যে ক্বচিত দু একজন ক্ষৌরকার পরামাণিকের মধ্যে মাথায় পাগড়ি বন্ধন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমাণিকগণের তখন সমাজের উচ্চ নীচ সকলেরই সহিত বিশেষ মেশামিশি থাকায় তাহাদের মধ্যে এই প্রথা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহারা তখন প্রকৃতই নরসুন্দর নামের অধিকারী ছিল, তাহাদের কার্য্যও যথেষ্ট ছিল। লোমশ স্থান কামাইয়া লোমনাশ করিতে আবার লোমহীন স্থানে লোমোৎপাদনে তাহাদের বহু সময় ব্যয়িত হইত। মাথার চুলের তদ্বির ব্রাহ্মণেতর জাতীয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণগণ প্রায়শঃ মাথায় ঝুটি রাখিতেন, সে ঝুটীর বড় বড় কৃষ্ণ কেশদাম নানা ঢঙ্গে পৃষ্ঠের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত লতাইয়া পড়িত প্রতি একাদশীতে সে ঝটির কেয়ারী হইত, সাজিমাটি, আমলা ও তেঁতুল দিয়া তাহার পরিষ্কার সাধন করা হইত। অধ্যাপকমণ্ডলী ও পুরোহিত মহাশয়েরা ও বৈদ্যগণ ভ্রূর উপর হইতে এক বিঘৎ পরিমাণ স্থান কামাইয়া ফেলিতেন। ইহাদের মধ্যে ওষ্ঠলোম বা গুম্ফ রাখাও নিন্দনীয় ছিল তবে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণে দাড়ী রাখিতেন। 'টিকির' প্রচলন হিন্দুগণের মধ্যে বিশিষ্টরূপই ছিল। ব্রাহ্মণ মাত্রেই শিখা রাখিতেন এবং বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাক প্রভৃতি জল চল্ সকল জাতিতেই শিখা রাখার প্রথা ছিল। শূদ্রের মাথায় শিখা ও গলায় মালা (কণ্ঠি) না থাকিলে ব্রাহ্মণে তাহার জলগ্রহণ করিতেন না। ব্রাহ্মণেতর জাতীয়ের মধ্যে শিখা রাখার প্রচলন এত অধিক থাকিলেও তাহাদের কেশের, গোঁফের ও ভ্রূর বাহার খুব ছিল। বাবরী কাটা চুল প্রায় সকলেই রাখিত এখন যেমন মস্তকের সম্মুখের চুল বড় রাখিয়া পশ্চাৎদিকের চুল ছোট করিয়া কাটা ঢং হইয়াছে, তখন এমন ছিল না বরং তদ্বিপরিত প্রথা ছিল অর্থাৎ তখন মাথার সম্মুখের কেশ ছোট করিয়া পিছনে ক্রমশঃ বড় রাখা হইত কেহ কেহ আবার ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর খানিকটা কামাইয়া রাখিতেন ও স্নানাদির পর তাহাতে চন্দন তিলবাটা ও গোলাপ দিতেন। দাড়ি ও গোফের তোয়াজ তদ্বিরও কম হইত না মুখের দুই পার্শ্বে গালপাট্টা বা বড় জুলফী শোভা পাইত তবে বৃদ্ধেরা সকলেই প্রায় কেশ শ্মশ্রুহীন মুখ করিতেন। টানা ভ্রূ তখনকার সখের ঢং ছিল, ছাটিয়া কাটিয়া বা ভ্রূহীন স্থানে ক্ষুর দিয়া কামাইয়া ভ্রূ গজাইয়া তুলিয়া টানা ভ্রূ গড়া হইত।

এই সময়ে ডন, কুস্তি, লাঠিখেলা, সড়কী, বল্লম, রায়বাঁশ, তলোয়ারখেলা প্রভৃতির ভদ্রাভদ্র সকলের মধ্যেই অত্যন্ত প্রচলিত ছিল, দেশের দস্যুভীতিই এ সকলের সমধিক প্রচলনের কারণ। দস্যুর ভয়ে লোকের সংস্থান থাকিলেও কেহ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত না, পাকাবাটি প্রায়ই ছিল না যাঁহাদের ছিল তাঁহারাও দস্যুভীতির জন্য বড় দুয়ার জানালা রাখিতেন না, দ্বিতলে যাহাদের বাসের ঘর থাকিত তাঁহারা সিঁড়ির মুখে চাপা

দুয়ার রাখিতেন আর সে দুয়ারের তক্তাও ডুমুরের কাঠে নির্ম্মিত হইত, কেন না ডুমুরের কাঠে সহজে কুঠারের দাগ বসে না। গৃহস্থে কলসীর মধ্যে টাকা ও অলঙ্কার রাখিয়া মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিতেন বা চৌকীতে বাক্স নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর রাত্রিতে শয্যা পাতিয়া শয়ন করিতেন। এইরূপ তক্তাপোষের বাক্সের নাম ছিল "ইস্‌কাত্তর" ও ঐ তক্তাপোষের নাম ছিল "মাইপোষ"। বড় বড় জমীদারের ঘরে জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যাদি বেশীর ভাগ রাত্রিকালেই সমাহিত হইত, কেন না তাহা হইলে লোকজন সকলেই সজাগ থাকিত সুতরাং দস্যুভয়ও অল্প থাকিত। যেমন দস্যুভয় ছিল তেমনি দেশের লোকেও শক্তিশালী ও শস্ত্রপাণি ছিল সুতরাং লোকে বিশেষ অক্ষম বা ভীরু ছিল না। একদিকে ডন কুস্তীগীরিতে সকলে যেমন পটু ছিলেন অপরদিকে পথ চলিতে, দৌড়াইতে, সন্তরণে গঙ্গাপার হইতেও সকলে বিশেষ মজবুত ছিলেন। এখানকার মত পদে পদে রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, মোটরগাড়ী বা ঘোড়ারগাড়ী কি বাইসিকেলের অস্তিত্বও ছিল না আবার ম্যালেরিয়া পীড়িত হইয়া এমন অক্ষমও তখনকার কেহ ছিলেন না সুতরাং একদমে ১০।২০ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করাও তখন আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। তখন যানের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল গো-যান, অশ্ব এবং জমীদারগণ হাতিও পুষিতেন। পাল্কীর চলনও বেশ ছিল। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ পাল্কীতে বা ডুলিতে চড়িতেন। বাণিজ্যাদি নদীবক্ষে নৌকাযোগেই সম্পন্ন হইত; অল্পসল্প দ্রব্যাদি বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া লইয়া যাওয়া হইত। শ্রীহরিদাস (যবন) ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত হরিরলুটের প্রসার এই সময়ে নদীয়ায় খুব অধিক হইয়াছিল। যবনের অনুকরণে সত্যনারায়ণের সত্যপীর আখ্যায় সিরনীর প্রচলনও এই কালের মধ্যে হয়। জাঁকজমকের সহিত বারইয়ারী পূজার সৃষ্টিও এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে কৃষ্ণনগরের স্বনাম-'খ্যাত' মল্লিকগণ কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজা স্বয়ং পূজার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। বারইয়ারী তলার উৎসব মণ্ডপ দেবদারু পাতায় কদলী বৃক্ষে পূর্ণকুম্ভে ও "রচনার" ফলে সুসজ্জিত হইত কাঁদি সমেত রম্ভা, কাঁদি সমেত ডাব, শাখা সহিত বাতাবীলেবু ও অন্য ফল পূজাগৃহে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত উহারই নাম "রচনা" চণ্ডীমণ্ডপ নানারূপে বিচিত্র "আলিপণায়" চিত্রিত করা হইত। রাত্রে সর্ষপ ও রেঢ়ীর তৈলের তরবেতর আলোক দেওয়া হইত।

এইকালে মেয়েরা বালিকা বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ ব্রতাদি গ্রহণ করিতেন। সুদূর পল্লীতে এখনও ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। তীর্থ যাত্রা এখনকার মত সুলভ ছিল না সুতরাং সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকদের প্রায়ই তীর্থ দর্শনাদি ঘটিত না। পুরুষেও পদব্রজে বা নৌকাযানে বহু কষ্টে ও বহু দিনে উহা সমাধা করিতেন, কিন্তু তাহাই কয়জনের ভাগ্যে ঘটিত বা একজনে কয়টী তীর্থই বা দেখিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথাই তখন সমাজে প্রচলিত ছিল, এখনকার "ভাই, ভাই, ঠাঁই, ঠাঁই" তখন ছিল না। বংশে একজন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি জন্মিলে তাহার রোজগারে ২০ জন বসিয়া খাইত।

যাহার যেমন উপার্জ্জন তিনি তেমনি ক্রিয়া কর্ম্মাদিতে ব্যয় করিতেন। যাহা

হউক কিছু কীর্ত্তি রাখিয়া মরিতে পারিলেই তখন সকলে সার্থক জন্ম মনে করিতেন। শালগ্রাম শিলা বা কোনও বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্রেই গৃহে স্থাপনা করিতেন। অতিথি অভ্যাগতদের সম্মান ও আদর যত্ন সকলেই করিতেন।

লোকে সাধারণতঃ অল্পে সন্তুষ্ট ছিল সুতরাং অধিক উপার্জ্জনের জন্য বিদেশ গমন প্রায় কেহই করিতেন না। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান থাকিলেই ভরা পেটে সকলে হাসি তামাসা করিয়া বেড়াইতেন। বিকালে বসিয়া তাস, দাবা পাসা সকলেই খেলিতেন। ছেলেরাও কপাটী, ছাঁই, ছুঁই, ডাণ্ডাগুলি বাতাবন্দী, চাকলুটী খেলিত। জলে পানকৌড়ী খুবই আমোদের ছিল সে সব খেলা এখনকার ছেলেরা খেলিতে পারেও না, জানেও না।

ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাবান গৃহী মাত্রেই অরুণোদয়ের পূর্ব্বে উঠিতেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা অনেকের মধ্যে প্রাতঃস্নানের প্রথা এ সময় প্রচলিত ছিল। বাটীর মেয়েদের রাত্রি থাকিতেই উঠিতে হইত। নিতান্ত বড় মানুষের বাটী না হইলে শৌচাগার প্রায় কোন বাটীতে ছিল না, সুতরাং গাত্রোত্থান করিয়াই ঝারি, গাড়ু বা অন্য কোন জলপাত্র হাতে লইয়া ময়দানের দিকে বা পুষ্করিণীর পাড়ে যাইতে হইত। পরে নিমের বা কাচার দাঁতনের সাহায্যে দন্তধাবন করিয়া স্নানের আয়োজন হইত, স্নানের পর সন্ধ্যা তর্পণ শেষ করিয়া সকলে বাটী ফিরিতেন, বাটীতে গৃহ দেবতা থাকিলে এইবার তাঁহার পূজা করিতে হইত; পূজা সারিয়া এক কাঠা ছোলা চাউল ভাজা চিবাইয়া যে যাহার বিষয় কর্ম্মে রত হইতেন, প্রায়শঃ লোকে চাষবাসের তদ্বিরে মন দিতেন, মাঠ হইতে দেড় প্রহরের সময় গৃহে ফিরিয়া সরবৎ পান করিতেন পরে গৃহ কর্ম্মে মন দিতেন। বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পরে আহার হইত; সে আহার এখনকার হিসাবে "রাক্ষসের আহার"। আহারের পর আড়াই দণ্ড নিদ্রা, অপরাহ্ণে আবার সেই কৃষিকার্য্যের বা অন্য কার্য্যের আলোচনা সারিয়া সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া আমোদ উৎসবে সকলে রত হইতেন। তখন সকল পল্লীতেই সকল জাতীর মধ্যে কতকগুলি করিয়া একত্র সমবেত হইবার স্থান বা আড্ডা থাকিত এই আড্ডাই তখনকার সমাজ শাসন করিত। গ্রামস্থ বিভিন্ন আড্ডার মধ্যে কলহ ও দলাদলী খুবই চলিত সুতরাং সমাজেও দলাদলী খুব ছিল। সন্ধ্যার সময় সকলেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আড্ডায় মিলিত হইয়া নানাবিধ বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ করিতেন। ক্বচিৎ কোথাও নেশা ভাঙ্গও চলিত মদের চলন খুবই কম ছিল, তামাক সিদ্ধি ও গাঁজারই তখন রাজ্য ছিল। সঙ্গীতের চর্চ্চা তখন খুবই হইত। বীণা তম্বুরা, বেহালা ও সেতারের আদর খুব ছিল। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে খেয়াল টপ্পা কীর্ত্তন, পাঁচালী কবি ইত্যাদির আলোচনা চলিত এবং ইতর জাতীয়দিগের মধ্যে মনসার ভাসান ও বেহুলার গানের চলন ছিল। রাত্রি দেড় প্রহরের পর প্রায়ই সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেন এবং কিছু জলযোগ করিয়া শয়ন করিতেন। সকালে লোকে প্রায়ই একাহারী ছিল, সেই একাহার এখনকার দশজনের আহার। এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে লোকে যথার্থই ভোজন বিলাসী ছিল। অলঙ্কার, ভাব ও ভাষায় যেমন মুসলমানী

ভাব প্রবেশ করিতেছিল, তেমনি আহার্য্য তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও যাবনিক আহার্য্যের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই, কথিত আছে স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভোজন-বিলাসীগণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার নিমিত্ত প্রত্যহ নানাবিধ সুস্বাদু চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি প্রস্তুত হইত, তিনি তাহা হইতে যথেচ্ছা গ্রহণ করিতেন। "হৈয়ঙ্গবীন" অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের গাভী প্রত্যূষে দোহন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নবনীভাগ গ্রহণ করিয় সদ্য যে ঘৃত প্রস্তুত হয় তিনি প্রত্যহ তাহাই ব্যবহার করিতেন। অন্নদামঙ্গল হইতে আমরা এই সময়ের একটী লোভনীয় রসনা আদ্রকর আহার্য্য তালিকা সংগ্রহ করিতেছি।

"হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক শড শডি ঘন্ট ভাজা নানামত শাক।
ডালি রাঁধে ঘনতর ছোলা অডহরে। মুগ মাষ বরবটি বাটুলা মটরে।
বড়াবড়ি কলা মূলা নারিকেল ভাজা। দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘন্ট তাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে বুড়া। তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে। আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা ঝোল সীকপোড়া ঝুড়ী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল মলই। কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোনা খড়কীর ঝোল ভাজা সার চিঙ্গড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কণ্ঠ রাঁধি বাঁধে কই কাতলার মুড়া। তিত দিয়া পচা মাছে রাঁধিলেক গুঁড়া।
আম্র দিয়া শোল মাছ ঝোল চড়চড়ী। আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তেল শাক। মাছের ডিমের বড়া ঘৃতে দেয় ডাক।
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা।
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত। ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম। গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা। কালিয়া কোলমা বাগা সেকটী সমসা॥
অন্য মাংশ শীক ভাজা কাবাব করিয়া। বান্ধিলেন মুড়া আগে মশলা পুরিয়া।
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা। মৎস্য মূলা বড়াবড়ী চিনি আদি দিলা॥
আম আমসত্ব আর আমসী আচার। চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মাদার।
অম্বল রাঁধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিয়া পিযূষী পুরি পুলী। চুষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী॥
কলা বড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজা পুলী। সুধারুটী মুচমুচী লুচী কতগুলি॥
পিঠা হইল পরে পরমান্ন আরম্ভিল। চালু চিনা ভুরা রাজবড়া চালু দিলা।
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর। বিষ্ণুভোগে রান্ধিলা রাঁধুনী লক্ষ্মী যার॥

ভূত, পিশাচ, ডাইন প্রভৃতির উপদ্রব ও ওঝা বা রোঝা দ্বারা তাহার নিরাময় প্রথা, শৃগাল কুকুর ও সর্প প্রভৃতির বিষ চিকিৎসায় মন্ত্রৌষধির ব্যবস্থা, নানাবিধ তুকতাক দ্বারা ব্যাধি সারান ও অনাবৃষ্টি নিবারণে মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রথা এই সময়ে সমধিক প্রচলিত হয়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরেই ইংরাজরাজ এদেশ অধিকার করেন। ইঁহাদের সুশাসনে নদীয়ায় পশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশের লোকের কূপমণ্ডূকত্ব অপবাদ ঘুচিয়া গিয়াছে, বিদেশে অর্থোপার্জ্জনে সকলেরই স্পৃহা বাড়িয়াছে, চোর ডাকাতের উপদ্রব রহিত দেশের সুখশান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, রাজদ্বারে বিচার সহজলভ্য হওয়ায় অত্যাচারীর অত্যাচার লোপ পাইয়াছে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, শিল্প, ভাষা প্রভৃতির উন্নতির দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতীয়গণের সভ্যতার অক্ষম অনুকরণ করিতে যাইয়া সমাজ না প্রাচ্য না প্রতীচ্য এক নবরূপ ধারণ করিতেছে। প্রাচীন সমাজ বিহিত যে যার জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সকলেই আত্মোন্নতির উপায় দেখিতেছে।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রথার সহিত আধুনিক নর নারীর জীবনী তুলনা করিলে পুরুষের আচার ব্যবহার, রীতি নীতির যেমন সম্যক্ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, স্ত্রীলোকের জীবনে তত অধিক পরিবর্ত্তন বিদৃষ্ট হয় না; অন্তঃপুরে কেবল অবরোধ প্রথার কঠোরতা রেলওয়ের প্রচলন, বিদেশ গমন, ইত্যাদি নানা কারণে কথঞ্চিত হ্রাস হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রমহিলাগণকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া ট্রেণে তুলিতে ও ট্রেণ হইতে নামাইতে প্রতি ষ্টেসনে পর্দ্দা ও পাল্কীর প্রাচুর্য্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হইত। আর এখন মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোকেরা বিনা পর্দ্দা বা পাল্কী অনায়াসে যত্র তত্র গমনাগমন করিতেছেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে, এখন সমগ্র নদীয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে বৎসরে বহু সংখ্যক বালিকা লেখাপড়া শিখিতেছে কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে এমন কি বর্ত্তমানকাল হইতে ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষা করা সমাজের চক্ষুতে নিতান্ত দূষণীয় ছিল। কচিৎ কোন বিধবা রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন। অধুনা বালিকা শিক্ষার বিস্তারের সহিত শৈশব বিবাহ একেবারে উঠিয়া না যাইলেও বিলক্ষণ কমিয়া গিয়াছে। পুরুষের বহু বিবাহ প্রথা একরূপ লুপ্ত প্রায়। এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে স্ত্রীলোকের মধ্যে মৃতপতির সহমরণ বা স্বামীর বিদেশে মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুমরণ প্রথার প্রসার বিলক্ষণ ছিল, এমন কি দেশে ইংরাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইলেও প্রথমে প্রথমে বঙ্গের প্রতি গ্রামেই প্রতি মাসে দু চারিজন রমণী এই নৃশংস প্রথার সম্মুখে বলীপ্রদত্ত হইতেন, যাঁহারা মৃতপতির সহ বা অনুমরণ না করিতেন তাঁহারা আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া সংসারে একরূপ জীবন্মৃত হইয়া রহিতেন। মনু প্রবর্ত্তিত এই প্রথার প্রসার কমিয়া আসিলে বর্ত্তমান যুগের মনু, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমাজের বক্ষে যে ভয়ঙ্করী চিতা বহ্নি জালিয়া দিয়াছিলেন তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাকে গ্রাস করিয়া পরে খ্রীষ্টীয় ১৮২৯ অব্দে ইংরাজ শাসনকর্ত্তা মহামনা লর্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।[১] এই সকল ঘটনার অনেকগুলি, ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে নদীয়ার মধ্যে শান্তিপুর, চাকদহ, নবদ্বীপ প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ স্থান গুলিতেই ইহার শোচনীয় অভিনয়

বেশী হইত।

যে দিন কোথাও সতী দাহ হইত সে দিন দিকদিগন্তর হইতে দলে দলে নারী পুরুষ আসিয়া সেই শোচনীয় ঘটনা স্থলকে যেন এক পবিত্র তীর্থে পরিণত করিত। স্ত্রীলোকেরা একবারে সেই "সতীমা"র পদধূলী লইতে পাইলে, সেই সতী হস্ত দত্ত সিন্দুর একটুক্ পাইলে, বা সেই সতীর পরিহিত বস্ত্রের একটুক্ ছিন্নাংশ পাইলে নিজেদের সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতেন। সতী প্রথমে এই জন সমুদ্র মধ্য হইতে বাহির হইয়া জাহ্নবীর পূতসলিলে নিজে স্নান করিয়া পুত্রাদির সাহায্যে মৃত স্বামীকে স্নান করাইয়া সজ্জিত চিতায় স্বামীকে তুলিয়া দিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া সিন্দুরে আরক্ত সীমন্ত হইয়া যথা সাধ্য দান ধ্যান করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি ও গভীর বাদ্যোদ্যমের মধ্যে সূর্য্যার্ঘ দিয়া চিতা প্রদক্ষিণান্তর চিতারোহণ করিতেন পরে ইহজীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা স্বামীর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বামীনারায়ণের ধ্যানে তন্ময় হইতেন, প্রায়শঃ হাসিতে হাসিতে স্বামীর পদ হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহারা পুড়িয়া মরিতেন, ক্বচিৎ কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হইত, চিতা ত্যাগ করিয়া কেহ কেহ বা অন্যত্র পলাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তখন তাহাদের সে চেষ্টা বিফল হইত। সমগ্র নদীয়ায় এ যাবৎ কত সহস্র সহস্র সতীদাহ সমাহিত হইয়াছে তাহার ধারাবাহিক বিবরণ পাইবার কোনও উপায় নাই। তবে ব্রিটীশ শাসনাধিকার কালের মধ্যে খৃঃ ১৮১৬ হইতে খৃঃ ১৮২৯ পর্য্যন্ত অনেকগুলি ঘটনা ইংরাজ দপ্তরে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে দেখা যায় যে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৫৬ জন ১৮১৭ ৮৮ জন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮০ জন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৪৭ জন স্ত্রীলোক এক নদীয়া জেলাতে প্রকাশ্যভাবে "সতীদাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ৫৬ জনের মধ্যে এক শান্তিপুরের সংখ্যাই ছিল ২০ জন। এই সকল সতীর বিবরণ ইংরাজী বহুপুস্তকে দেখা যায়[৯] এই সকল স্থান এই সময়ে যে কেবল মাত্র সতীদাহের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এমন নহে। নির্ম্মম ভাবে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে এবং গঙ্গা বক্ষে পুত্র কন্যা বিসর্জ্জন ;[১০] বৃদ্ধ জরাতুর ব্যক্তিকে তীরস্থ করিবার জন্যও ইহাদের খ্যাতি কম ছিল না ; পূর্ব্ব ও উত্তর অঞ্চলের বহু দূর দেশ হইতেও এই সকল স্থানে মৃত অথবা মৃতকল্প ব্যক্তিগণের গঙ্গা সমর্পনের নিমিত্ত আনয়ন করা হইত।[১১] মৃত্যু আসিয়া প্রায়শঃ এই সকল অন্তিম শয্যাশায়ী নর নারীর ভব যন্ত্রণা দূর করিয়া দিত ; কিন্তু এত কষ্ট সহিয়াও যাহাদের প্রাণ বাঁচিত তাঁহারাও আর দেশে ফিরিতেন না এই চাকদাহ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে ভাগীরথী তীরে বাস করিয়া সদা শমনের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিতেন ; শুনা যায় শান্তিপুরের লোক সংখ্যার বৃদ্ধি নাকি এইরূপ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত নর নারী লইয়া হইয়াছিল[১২] এই প্রথাও অধুনা লুপ্ত প্রায়। এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগেই ইংরাজগণ এ দেশ অধিকার করেন, কোম্পানির রাজত্ব হইলেও দেশ হইতে তখনও পূর্ব্বকার নরবলি প্রথা প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই তখনও এমনকি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোপনে ও প্রকাশ্যে নরবলি চলিতেছিল দেখা যায়।[১৩] ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ও "তপ্তমুক্তি" বা অত্যুষ্ণ ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা দোষী বা নির্দ্দোষী অবধারণ করার প্রথা দৃষ্ট হয়।[১৪] এই সময়ে সামাজিক শাসন পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইলেও

দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। হিন্দুর পক্ষে যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহার বা যাহা সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইত তাহার যথোচিত শাস্তি বিধান এ কালেও চলিত এই কালে কৃষ্ণনগরে কোনও ব্রাহ্মণ সন্তানকে কোনও দুরাচার বলপূর্ব্বক গোমাংস ভক্ষণ করাইলে তদানীন্তন বাঙ্গলার সর্ব্বময় কর্ত্তা পলাশী বিজয়ী লর্ড ক্লাইব সাহেবের আন্তরিক যত্নেও কোনও ব্রাহ্মণ উহাকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান না দেওয়ায় উক্ত হতভাগ্য ব্রাহ্মণ শোক দুঃখে হতাশে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[১৫] এই কালের সামাজিক শাসনের আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রবর্ত্তিত নদীয়ার দশঠাকুরী প্রথা। গ্রামের দশজন প্রধান একত্রিত হইয়া যাবতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী সামাজিক[১৬] ও পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন ইংরাজ বিচার কর্ত্তারাও তখন প্রায় ইহাদের রায়ই বাহাল রাখিতেন। অন্যান্য শাস্তির মধ্যে সমাজে হুঁকা বন্ধ, ধোপা নাপিত বন্ধ সূতিকাগারে ধাত্রী নিষেধ ইত্যাদি কঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল। সমাজ হইতে এই সকল সামাজিক কঠোর শাস্তি এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। আহার, বিহার, লোক-লৌকিকতাদি সামাজিক সর্ব্ববিষয়ে যেরূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের প্রতি লোকের যেরূপ মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুদিনে সামাজিক কোনও বিষয়েই প্রাচীনভাবের লেশ মাত্র রহিবে না বলিয়া অনুমান হয় ধনী দরিদ্র, ইতর, ভদ্র নির্ব্বিশেষে উন্নত শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় সকলেরই আচার ব্যবহার রীতি নীতি পূর্ব্বের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। শুধু এ দেশ বলিয়া নহে অধুনা পৃথিবীর সমগ্র জাতির সকল সমাজেই এই বিরাট সামাজিক পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়াছে; সমাজের ন্যায় ধর্ম্মেও নবভাব দেখা দিয়াছে।

অসন বসনেও রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এমন কি সেদিনও যেখানে "ফলাহারে" চিড়া, দধি, দুগ্ধ, বাতাসা, চিনি, রম্ভা ও সন্দেশ সাদরে চলিত, অথবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিতে হইলে লুচী, চিনি আয়োজন করিতে হইত। এখন সেখানে ছাপ্পান্ন ব্যঞ্জন ও শত রকম না হইলে ভদ্রোচিত "ফলাহার"ই হয় না।

পূর্ব্বে যেখানে সামান্য মূল্যের কাপড়ে ও মিষ্টান্নে "তত্ত্ব" করা চলিত, এখন উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি সহজ প্রাপ্য হওয়ায় সেখানে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক "তত্ত্ব" করিলেও যেন মনের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। এই বিলাসিতার ভাব হইতে দরিদ্রেরও পরিত্রাণ নাই। এবম্বিধ ব্যাসনাসক্তি দেশের লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতাই প্রকাশ করে।

পূর্ব্বে যে বিবাহে সমগ্র ব্যাপারে মোট একশত মুদ্রা ব্যয় হইত, এখন সেই টাকায় স্থান বিশেষে হয়তো একটা গাত্র হরিদ্রার "তত্ত্ব" হইয়া উঠে না। বিবাহে পণ-গ্রহণ প্রথার প্রসারও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দেশে ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহার ফলে ভূত, পিশাচ, ডাইন সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার কমিয়া আসিতেছে, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ; প্রভৃতিও কমিয়া গিয়াছে। রাজার নিকট জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে গুণীর আদর থাকায় উচ্চতর শিক্ষার দিকে সকলেরই মন আকৃষ্ট হইতেছে।

লৌহবর্ত্ম ও সংবাদ পত্রাদির সমাধিক প্রচলন হওয়ায় লোকের আলস্য ও সর্ব্ববিষয়ে ঔদাসীন্য ভাব কমিয়া গিয়াছে ; বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিচয় ও সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছে, তীর্থাদি দর্শন সহজ সাধ্য হওয়ায় লোকের ধর্ম্মার্জ্জনের পথ সুগম হইয়াছে। নবদ্বীপের পট পূর্ণিমা, শান্তিপুরের রাস ঘোষ পাড়ার মেলা বা মাটিয়ারীর মেলা সকলই সহজগম্য হইয়াছে।

লোকের আত্মোন্নতির দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় সমাজে স্বাতন্ত্র্যের প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং একজনের উপার্জ্জনে দশজনে বসিয়া খাওয়া উঠিয়া যাইতেছে। কর্ম্মী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে কলহ ও দলাদলীভাব কমিয়া গিয়াছে, বিশেষ ম্যালেরিয়াদিতে লোকের স্বাস্থ্যহানী হওয়ায় বৃথা কলহে বড় কাহারও প্রবৃত্তি দেখা যায় না। নীতি ও রুচির প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে ভাষাও তদনুযায়ী উৎকৃষ্টতর ভাব ধারণ করিয়াছে।

স্থূলতঃ ইহাই আজ পর্য্যন্ত নদীয়ার সামাজিক বিবরণ। নদীয়ার শাসন বিভাগের বাৎসরিক বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে স্বতই মনে হইবে যে নদীয়াবাসীগণ অন্যান্য জেলার লোকের তুলনায় অতি নিরীহ স্বভাবের ব্যক্তি ; নির্ম্মম খুন; ভীষণ ডাকাতি, বিষম দাগাবাজী বা জাল প্রতারণা প্রভৃতি নিজ নদীয়াবাসীগণ কর্ত্তৃক অতি অল্পমাত্রায় সমাহিত হয়। গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারিগণ ইহাকে শান্তজেলা নামে অভিহিত করেন। এখানকার অধিবাসীগণের প্রকৃতি সাধারণতঃ মধুর ; ইহারা বিনয়ী, নম্রস্বভাব, বচনপটু, সুরসিক, অভিমানী, অলস, অল্পে সন্তুষ্ট, শান্তিপ্রিয় ও রোগ প্রবন।

---

১ এই তাম্র ফলকখানি বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয় তিনি পণ্ডিতবর রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধার করিয়া তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক চিত্র নামীয় ত্রৈমাসিক পত্রের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় উহা প্রকাশ ও উহার বিষয় আলোচনা করেন সম্প্রতি এই তাম্র শাসন খানি কলিকাতা সাহিত্য পরিষদ গৃহে রক্ষিত হইয়াছে।

২ এই অত্যাচার সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্রের রাজায় না দেয় কর। ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর।।
আসি সেই দুর্গা মণ্ডপে বাসা কৈল। অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধিল।।"

অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ

অপর—

"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা ছিড়ে, ফেলে থুথু দেয় মুখে।।"

বিজয় গুপ্ত।

৩ "রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটেরপাছরা।" কীর্ত্তিবাস

৪ "ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য, গোমাংস ভক্ষণ ডাকাচুরি পরগৃহ দাহ সর্ব্বক্ষণ।"
চৈতন্য ভাগবত। মধ্য খণ্ড।।

৫ ফুলা পঞ্চাননের কারিকায় দেবীবর ঘটককে চৈতন্য দেবের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করা আছে এবং তাঁহার দ্বারা ছত্রিশ ভাগে কুল ভাগের কথাও লিখিত আছে ;—

"চৈয়ে ছোঁড়া দুষ্ট বড় নিমে তার নাম। রঘো বেটা মোটা বুদ্ধি ঘটে করে থাম।।
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ। মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ।।
তিনজনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ। ন্যায়, স্মৃতি, ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ।।
কানার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত। প্রাচীন স্মৃতির-মত নদ্দা হতে গত।।
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়। মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়।।
এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধুম। বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম।।
এই কালে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে। নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে।।
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ। সেই হতে কুলে আছে ছত্রিশে দাগ।।

৬ Vide note by pandit Haraprasad Sastri C. I. E. in the proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1893. Page 24.—26. :—

"Mr. Beveridge found in the armoury of the Nawab of Murshidabad a brass gun of native manufacture. It is mounted on a carrige and stands in armoury on the ground floor of the palace. It is some 3 feet in length and is of small bore 4 or 6 pounds. It has floral decration. The head and the mouth are in tne shape of a demon or a monoster's head with long pointed ears a human face and a crocodile's jaws. There is an inscription on it in raised Bengali letters in a shield on the upper part of the gun and about the middle.

The inscription runs as follows :—

जय
कालिका
य ओं तत् सत्

श्रीयुक्त कृष्ण्ण	श्रीयुक्त
चन्द्र राय	रूपराम
महाराजा	चट्टोपाध्याय
महाशय	मुद्राङ्कित
धीराज	

किशोरदास कर्म्मकार

৭ In short two women on an average calculation were to be destroyed every day in the year.

Speaking roundly more than 500 women were allowed to imolate themselves every year between 1814 & 1826, while the Brtish government patronized the show. vide W. H. Carrey's The good old age of Honble John Cmpany.

Lord William Bentinck carried a regulation in council on December 4.—1829, by which all who abetted Suttee were declared guilty of 'culpable homicibe."—Vide Iamperial Gazetter of India (New Edition) The Indian Empire Vol II. page 498.

৮ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত রামনাথ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে উলা নিবাসী-মুক্তারাম নামক জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার তেরো জন সাধ্বী স্ত্রী তাহার সহমৃতা হয়েন। যখন চিতাগ্নি প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল তখন তথায় তাঁহার আর দুইটী স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের একজন সহমৃতা হইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু যখন স্বর্গ্যার্ঘা দিবার মন্ত্র পাঠ হইতেছে তখন তাঁহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল, সুতরাং তিনি তথা হইতে পলাইতে উদ্যত হইলে মুক্তারামের এক পুত্র ঐ বিমাতাকে ধরিয়া প্রজ্জলিত পিতৃচিতানলে নিক্ষেপ করিলেন অপর স্ত্রীটী তথায় দাঁড়াইয়া ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন উক্ত পুত্রটী তাহাকেও চিতার আগুনে ঠেলিয়া দিলেন।

৯ স্থানাভাবে দু একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে—

A Kulin Chnadra Banbopadhya was killed here 30 years ago, he was married to 100 wives and was murderd by the brother of one of them on account of his profllgate conduct towards his sister. 8 of his wives performed Suttee oh his funeral pyre.

In 1799 at Bagnapara 37 widows were burnt with their husbands, the fire was burning 3 days ; on the first day 3 were burnt, on the second 15 and on the third day 19 ; the deceased had over 100 wives.—Vide Calcutta Review Vol VI or XI & XII page 398—448.

১০ In 1813 two women cast their children into the river, but the fathers took them out again and paid a certain sum of money to the Bramhins from their ransom. People from Dacca and Jessore used to throw their children to the Ganges here (Nadiya).—Calcutta Review Vol VI page 421—29

Chogdah as well as Bansberia and Gangasagar were formerly noted for human srcrifices by drowning the aged, and children were

thrown into ahe river ; In November 1801 some pilots saw 11 persons at sagar throw themselves to sharks and that month, 29 persons were devoured by them. It is still a famous place (A. D. 1846) for burning the dead and for bathing. Corpses are brought there from all parts of the country, often from great distances when they become putrid ere they reach Chogdah the persons carrying the corpse are not allowed to enter a house, must pay double ferry fare, and must take fire with them as no one will give it. মৃতের সৎকারীগণের পক্ষে এ নিয়ম নদীয়ায় এখনও প্রচলিত আছে। Travanier mentions seeing corpses bronght to Chogdah from a place 20 days distance all rotton and smelling dreadfuly.

১১ Chogdah has been notorious for ghat murders, there are various persons now living there, who have been taken to the river to die, but have recovered & are outcastes.—Vide Calcutta Review vol VI page 411.

১২ When a patient thus situated, happens to recover, he considers that he has, as it was, acquired a new life, and thenceforth all his former relations and friends are treated as strangers ; he never returns to the dwelling in which he had fromerly resided, but wanders down the ganges, until he arrives at Santipore near Calcutta, where he settles himself ; and it is a curions fact, that the whole population of Santipore is composed of such persons —Honigberger.

১৩ Human sacrifices were also freqent even as late as 1832, a Hindu at Kaligat (near Santipore) sent for a Musalman barber to shave him he asked him afterwards to hold a goat while he cut off its head as an offering to Kali, the barber did so, but the Hindu cut off the barber's head and offered it to Kali, he was sentenced by the Nizamut to be hung. A few years ago a number of Bramhins assembeld at Santipore and began to drink and carouse after it. one proposed a sacrifice to Kali, they assented, but having nothing to sacrifice one cried out where is the goat, on which another more drunken than the rest exclaimed, I will be the goat and at once placed himself on his knees, one of the company then cut off his head

with the sacrifical knife when they woke the next morning from their drunken fit they found the man with his head off, they had the corpse taken to the ghat burned and reported the man died of Cholera.—Vide the Banks of the Bhagirathi. Vol. VI. Calcutta Review No. XI and XII.

১৪ In 1807 the Tapta Mukti or ordeal by hot clarified butter was tried before 7000 spectators on a youug woman accused by her husband of adultery.—Vol. VI. Calcutta Review No. XI and XII.

১৫ A meeting of Bramhans was held in 1760 at Krishnagar before Clive and Verelst, who wished to have a Bramhan restored to his caste, which he had lost by being compelled to swallow a drop of Cow's soup, the Bramhans declared it was impossible to restore him * * * and the man died soon after of broken heart.—Vide Cal Review Vol VI page 421—27.

১৬ In 1835 a Dharmashova was established called that of the Ten Thakurs, they punished offenders by excluding them from caste, by sending them when they transgressed the Regulations to the Magistrate of Krisnagar, or by prohibiting midwives attending their wives in confinement.—Cal Review Vol VI page 421—57.

নদীয়ার কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক স্থান

বর্ত্তমান নদীয়া জেলা ৫টী মহকুমায় বিভক্ত; যথা, কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টীয়া। এতন্মধ্যে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট, এ দুই মহকুমার অধীনেই নদীয়ার যাবতীয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক স্থানগুলি বিদ্যমান। বিশেষ, রাণাঘাট মহকুমার এলেকায় যত সংখ্যক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, নদীয়ার আর কোন মহকুমায় তাহা নাই। রাণাঘাট, আড়ংঘাট, শান্তিপুর বাবলা বা বাউগাছী, উলা (বীরনগর) মামজোয়ান, চাকদহ, জশড়া, হরধাম, আনন্দধাম, সুখসাগর, জাগুলী, শ্রীনগর, আন্তলিয়া, দেগাঁ, কুলিয়া, বয়রা, ব্রহ্মশাসন হরিপুর, বাগআঁচড়া, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, (অধুনা ২৪ পরগণা জেলাভুক্ত) মুরতীপুর-ঘোষপাড়া, আড়ংঘাটা প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রামগুলি রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্ভূক্ত। কৃষ্ণনগর সদরের অধীনে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রাম বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে অগ্রদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলী, চুপী, বাগোয়ান, মীরা, নবদ্বীপ, বেলপুকুর, ধর্ম্মদা, দেবগ্রাম, হাঁসখালি, শিবনিবাস, ভাজনঘাট, পলাশী, মুড়াগাছা, শ্রীবন, মাটিয়ারি, কালিগঞ্জ, মহৎপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, দোগাছিয়া প্রভৃতি গ্রাম প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য। মেহেরপুর গ্রামখানি নিজে প্রাচীন হইলেও ইহার এলাকধীনে প্রাচীন উল্লেখযোগ্য স্থান বিরল। তবে উহার মধ্যে পিরোজপুর জমসেরপুর শীকারপুর, ঘোড়াদহ, আবরপুর বহরমপুর, মুরুটিয়া, কাদিপুর, দোগাছি, কাথালী, গাঁড়াডোব, বাহাদুরপুর, আমঝুপী, গাংনী, তেঁতুলবেড়িয়া, করমদী, বামনদী, নন্দনপুর, নারায়নপুর, বেতাই, চিলাখালি, শ্যামনগর, পলাসীপাড়া, দরিয়াপুর, বাগুয়ান, কোলা, ধান্যখোলা, বড়চাঁদঘর, সাহেব নগর, সুন্দলপুর, বোয়ালিয়া, হোগলাবেড়িয়া, প্রভৃতি গ্রাম গুলি উল্লেখযোগ্য।

চুয়াডাঙ্গা আধুনিক স্থান এবং ইহার অধীনেও উল্লেখযোগ্য স্থানের সংখ্যা অতি কম তবে ইহারই মধ্যে নাটুদা, মুন্সীগঞ্জ, জহরপুর, কুতুবপুর, সিন্দিরিয়া, খাঁড়াগোদা, বেগমপুর, জীবননগর, আন্দুলবেড়ে, ফতেপুর লোকনাথপুর, কুড়লগাছি, কৃষ্ণপুর, কড়চাডাঙ্গা, অনন্তপুর, ওসমানপুর, কুমুরী, আলমডাঙ্গা, কাপাসডাঙ্গা, দামুরহুদা, জয়রামপুর, ডুমুরদিয়া, প্রভৃতি গ্রামের নাম উল্লেখ করা যায় মাত্র। কুষ্টীয়া সমগ্র জেলার মধ্যে লোকসংখ্যা ও বিস্তৃতি হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানও বৃহৎ মহকুমা হইলেও ইহার অধীনে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রাম নাই বলিলেই হয় তবে গোঁসাইদুর্গাপুর, পাটকাবারী, ধরমপুর, হালসা, জুনাদ, পোড়াদ, মথুরাপুর, ভালুকা, চাপড়া, হাজিপুর, জগতী কুমারখালি প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের নাম উল্লেখ করা যায় মাত্র। উল্লিখিত স্থানগুলির মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে লিখিত হইল।

কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগরের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিবৃত্ত দিয়া আমরা কৃষ্ণনগরের ইতিহাস সম্পন্ন করিতেছি।

নদীয়া রাজবংশ

নদীয়ার রাজাগণ আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের নেতা অন্যতম ভট্ট নারায়ণের বংশজ। ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জ প্রদেশের ক্ষিতীশ নামক রাজার পুত্র। ভট্টনারায়ণের পুত্র নিপু হইতে অধঃস্তন একাদশ পুরুষে মহাত্মা কামদেব জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বশুদ্ধ ইহাদের বিষয় ভোগদখল ৩২২ বৎসর। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মভীরু, নিষ্ঠাবান এবং বিদ্বান্ ছিলেন। কামদেবের চারি পুত্র তন্মধ্যে জেষ্ঠ্য বিশ্বনাথ পিতৃগদী প্রাপ্ত হইয়া ১৪শ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী যাত্রা করেন এবং স্বকীয় অসাধারণ বিদ্যাবত্তাগুণে মহামান্য দিল্লীদরবার হইতে রাজোপাধি এবং পৈত্রিক অধিকার ব্যতিত নির্দ্দিষ্ট কর ধার্য্যে আরও অনেক গুলি গ্রাম খেলায়েৎ পান। বিশ্বনাথ সর্ব্ববিষয়ে নিজের বিস্তীর্ণ সম্পত্তির উন্নতি করিয়া যান। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পরগণা কাঁদি ও অন্যান্য ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন।

তাঁহার পরেই উল্লেখযোগ্য রাজা কাশীনাথ। ইনি অসাধারণ বীর ও সাতিশয় বুদ্ধিমান হইলেও চক্রান্তে পড়িয়া অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন এবং পরিশেষে ঘাতকের হস্তে প্রাণদান করেন।

এই বিপত্তিকালে তাঁহার অনাথিনী গর্ভবতী স্ত্রী বাগোয়ান পরগণার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বাটিতে যাইয়া লুক্কায়িত থাকেন। শীঘ্রই তাঁহার একটী সুকুমার ভূমিষ্ঠ হয়েন। এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র। হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তিনি রামচন্দ্রকেই তাঁহার ক্ষুদ্র জমিদারী পাটকাবারি ও বাগোয়ান প্রভৃতির অধিকারী করিয়া যান। রামচন্দ্রের দুর্গাদাস জগদীশ, হরিবল্লভ এবং সুবুদ্ধি নামে চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

এই দুর্গাদাসই পরে "মহারাজ ভাবনন্দ মজুমদার" নামে অভিহিত হয়েন। দুর্গাদাস বাল্যকাল হইতেই চতুর ছিলেন এবং আপনার বুদ্ধিকৌশলে, হুগলীর ফৌজদারের সাহায্যে ঢাকার নবাবকে সন্তুষ্ট করিয়া হুগলীর কাননও পদ লাভ করেন। উত্তরকালে কিরূপে ভাবনন্দ, বঙ্গের শেষ স্বাধীন বাঙ্গালী ভূপতি প্রতাপের খুল্লতাত পুত্র কচু রায় ও চাঁচরা রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহাতাপ রাম রায়ের সাহায্যে প্রতাপের রাজধানী প্রবেশের গুপ্ত পথ দেখাইয়া, ও রসদাদি দিয়া তদানীন্তন দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহকে নদীয়া সমুদ্রগড়ে সসৈন্য পার হইবার সহায়তা করিয়া প্রতাপের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, বঙ্গের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

মানসিংহের সহায়তারূপ সৎকার্য্যের জন্য তদানীন্তন সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ফারমান দ্বারা ভাবানন্দকে তাঁহার পিতামহ কাশীনাথের সুবিস্তীর্ণ জমীদারী ও নদীয়া, মহৎপুর, লেপা, সুলতানপুর, প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন। মজুমদার এই সময়ে তাঁহার বিস্তীর্ণ জমীদারীর সুচারুরূপে শাসন করিবার জন্য বাগোয়ান ব্যতীত মাটিয়ারীতে আর একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। কালের প্রভাবে এই মাটিয়ারী এখন বনাকীর্ণ। প্রসাদের ধ্বংশাবশিষ্ট ইষ্টক গুলিও ই, বি, রেলের খোয়ায় পরিণত হইয়াছে। কেবলমাত্র একটি মন্দির স্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ভবানন্দের তিন পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। এই তিন জনের মধ্যে গোপাল নিতান্ত পিতৃ অনুগত, বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ বিধায় ভবানন্দ অপর পুত্রদ্বয়ের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া করিয়া গোপালকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়া যান। এ কারণে জেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ, পিতার সহিত কলহ করিয়া মাটিয়ারীর শ্রীনারায়ণ মল্লিক নামক এক বিশ্বস্ত কার্য্যদক্ষ বহুভাষাবিৎ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে দিল্লী গমন করতঃ তথায় আপনার বুদ্ধিবলে ও উক্ত কর্ম্মচারীর লিপি কুশলতায় বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া পরগণা উখ্ড়া ও কুশদহের উপর চিরস্থায়ী দখলের ফারমান প্রাপ্ত হন এবং বাদসাহ-দত্ত সম্মান প্রাপ্তে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার কনিষ্ঠ গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। রাজা গোপালও বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকাদি কয়েক পরগণার জমিদারি প্রাপ্ত হন। তিনি নরেন্দ্র, রামেশ্বর, ও রাঘব নামে তিন পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই তিন জনের মধ্যে কনিষ্ঠ রাঘব সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মদক্ষ বিধায় পিতৃ নির্দেশানুযায়ী পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি অতি সুশীল ও ধার্ম্মিক নরপতি বলিয়া খ্যাত। তিনি তাঁহার পিতামহ স্থাপিত মাটিয়ারি প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া রেউই নামক স্থানে রাজধানি স্থাপনা করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে পরিখা বেষ্টিত করেন। ঐ পরিখা সাধারণতঃ "সহর পানার গড়" নামে খ্যাত। সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ মানসে শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মধ্যস্থলে বিংশতি সহস্র মুদ্রাব্যয়ে এক সুদীর্ঘ দীঘিকা খনন করাইয়া তত্পরিস্থিত গ্রামের দীর্ঘীকা নগর বা "দীগনগর" নাম করণ করেন। এই দীঘিটী দৈর্ঘ্যে ১৪৫২ হস্ত ও প্রস্থে ৪২০ হস্ত পরিমিত। দিন দিন নিকটস্থ প্রান্তর ধৌত হইয়া রাশি রাশি মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনাদি পড়িয়া ইহা ক্রমেই অপরিসর হইয়া পড়িতেছে। রাজা রাঘব এই জলাশয় খনন করিয়া ইহার পূর্ব্বতটে এক বৃহৎ ঘাট ও তদুপরি এক রম্য অট্টালিকা নির্ম্মান করিয়াছিলেন এবং উহার অনতিদূরে দুইটী মন্দির নির্ম্মান করিয়া রাঘবেশ্বর নামে শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[১] অট্টালিকা ও ঘাট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে. মন্দির দুইটীর মধ্যে একটী ভগ্ন ও আর একটী কোন রূপে বজায় আছে। রাজা রাঘব এই দিঘী ও মন্দির অতি সমৃদ্ধির সহিত উৎসর্গ করেন। রাজা রাঘব "মর্দ্দানা নামক গ্রামে আর একটি আবাসবাটী

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার সন্নিহিত বিল, তড়াগাদিতে অজস্র ফুল্লারবিন্দের শোভায় আকৃষ্ট হইয়া ইহার শ্রীনগর নাম করণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীনগর এখন বনাকীর্ণ; ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপে ইহা জনশূন্য এখানে প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে ও একটী মন্দির স্বীয় ললাটে রাঘবের নামবহন করিয়া কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে।

রাজা রাঘবের দুই পুত্র—রুদ্র ও প্রতাপ নারায়ণ। প্রতাপ পিতার অবাধ্য বিধায় রাঘব সম্রাটের অনুমতিক্রমে রুদ্রকে বিষয়ের অধিকাংশ অর্পণ করেন। ইনিও তাঁহার পিতার ন্যায় লোক হিতার্থে বহু জলাশয় খনন রাজবর্ত্ম প্রস্তুত প্রভৃতি অশেষ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। দিল্লীশ্বর আলমগীর তাঁহার এই সকল সৎকীর্ত্তি গাথা শ্রবণ করিয়া ১৬৭৬ অব্দে (১০৮৭ হিজারুতে) এক ফারমান দ্বারা গয়েশপুর, হোসেনপুর খাড়ি, জুড়ি প্রভৃতি কয়েকটী বিস্তীর্ণ পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রাসাদের উপরিভাগে দিল্লীশ্বরের প্রাসাদের অনুকারণে কাঙ্গরা নির্ম্মাণের অধিকার দেন। ইনি নবদ্বীপে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একটী শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন এবং তাঁহার পিতার স্থাপিত রাজধানী রেউইয়ের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যার্থে কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন। ইঁহার সহিত জাহাঙ্গীরার তাৎকালীক স্ববেদারের প্রথমে তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না, পরে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হইলে রাজা রুদ্র রায় জাহাঙ্গীরা হইতে এক সুনিপুণ পূর্ত্তকার্য্যক্ষম স্থপতিকে আনয়ন করিয়া কৃষ্ণনগরে তাহার সহায়তায় নিজ কাছারি, কেল্লা, ও পূজার বাটী, নাচঘর, চক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার নির্ম্মিত নাচঘর এবং পিলখানা, চক ও নহবতখানা, অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুরের সুপ্রশস্ত রাজ বর্ত্মটিও রাজা রুদ্রের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কথিত আছে তাঁহার প্রাসাদ পাদচারিণী অঞ্জনা নদী তখন স্রোতস্বতী ছিল। এই নদীবিহারি কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ইহার স্রোতঃবেগ রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

রাজা রুদ্রের দুইরাণী—জ্যেষ্ঠার গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন ও কনিষ্ঠার গর্ভে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। রুদ্র তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনায় তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ্য রামচন্দ্র হুগলীর ফৌজদার ও ঢাকার নবাবের সহায়তায় পৈতৃক জমিদারী অধিকার করেন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রামজীবন শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহাকে অধিকার চ্যুত করেন কিন্তু তিনি শীঘ্রই আবার জ্যেষ্ঠ্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মধ্যম রাম জীবন আবার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের কৌশলে তিনি ঢাকার নবাব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। রাজা রুদ্র যেমন কির্ত্তীমান ছিলেন তেমনি এতদঞ্চলে বিদ্যার উন্নতি-সাধন মানসে অধ্যাপক মণ্ডলীকে বহু নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যান এবং নবদ্বীপের বিদেশী ছাত্রগণের ব্যয়ের নিমিত্ত বহু টাকার ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

রাজা রামকৃষ্ণের সহিত তাৎকালীক নবাব মুরসিদকুলী খাঁর সাতিশয় অসদ্ভাব

দাঁড়াইয়াছিল তাই তিনি কৌশলে রামকৃষ্ণকে ঢাকার বৈকুণ্ঠ বন্দী করেন। কারাগারের দারুণ ক্লেশে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামজীবন কারামুক্ত হইয়া নদীয়া রাজ্য পুনরাধিকার করেন। তিনি কবি ছিলেন; তাঁহার শেষ জীবন নাটক রচনায় ও নাট্য ক্রীড়ায় অতিবাহিত হয়।

তাঁহার তিন রাণী—প্রথমার গর্ভে রাজারাম ও কৃষ্ণরাম, দ্বিতীয়ার গর্ভে রঘুরাম ও তৃতীয়ার গর্ভে রামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। রঘুরাম সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন এ কারণে রামজীবন মৃত্যুকালে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান। রঘুরাম হৃদয়বান ও যুদ্ধকুশলী ছিলেন। তিনি বীর কাটির যুদ্ধে সুবেদার জাফর খাঁর সেনাপতি লহরীমলকে বিশেষ সাহায্য করেন। রঘুরামের যৌবনের প্রারম্ভে ১৬৩২ শকে (১৭১০ খৃষ্টাব্দে) এক মহা তেজস্বী রূপবান কুমার জন্মগ্রহণ করেন। এই কুমারই নদীয়া রাজবংশের সুবিখ্যাত মহারাজা বাজপেয়ী কৃষ্ণচন্দ্র।

রাজা রঘুরামের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে পিতৃ গদীতে আরোহণ করেন। কথিত আছে রঘুরাম তাঁহাকে আপন উত্তরাধিকারী না করিয়া নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু পিতার পরলোক হইলে কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র তাম্রকুট অনুরাগী দীর্ঘসূত্রী পিতৃব্যকে কৌশলে পথিমধ্যে তাম্রকুট সেবনে নিরত রাখিয়া স্বয়ং যাইয়া তৎপূর্ব্বে নবাব দরবারে উপস্থিত হয়েন এবং আপনার নামে জমীদারীর ফারমান লইয়া বাহিরে আসিলে রামগোপালের চৈতন্যোদয় হয় তখন ব্যস্ত হইয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে বিদায় দেন।

কৃষ্ণচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সংস্কৃত ও পারস্য প্রভৃতি ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার পদের উপযুক্ত নানা বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কালীদাস সিদ্ধান্ত নামক এক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র, কালোয়াৎ বিশ্রাম খাঁর নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র এবং মুজাফার হুসেনের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই মুজাফার হুসেন নবাব মুর্সিদকুলী খাঁর ভাগিনেয়। কোন কারণে ক্রোধ করিয়া তিনি মুরসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় আগমন করেন। রাজা প্রচুর পরিমাণে মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া পরম সমাদরে তাঁহার নিকটে রাখেন।

রাজা স্বয়ং যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি অতিশয় গুণের আদর করিতেন এ কারণে তাঁহার সভায় সর্ব্বদা প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সমাগম হইত। তিনি সজ্জন সহবাসে ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ অবকাশকাল অতিবাহিত করিতেন। ইহাঁর সভা প্রাচীন ভারত-বর্ষাধিপতি বিক্রমাদিত্যের তুল্য ছিল। রাজা বিক্রমের সভায়, খপনক, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ, শঙ্কুক, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালীদাস, বরাহমিহির ও বররুচি প্রভৃতি নবরত্নের যেমন সমাবেশ ছিল ইহাঁর সভাও তদ্রূপ নবদ্বীপের ন্যায়বিৎ হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রামরুদ্র বিদ্যানিধি, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন ষড়দর্শন বেত্তা শিবরাম

বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়লঙ্কার কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরের রামমোহন গোস্বামী প্রমুখ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ ও গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও হালিসহরবাসী রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি সুকবিগণ এবং মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপালভাঁড় ও হাস্যার্ণব প্রভৃতি অসাধারণ হাস্য রসিক ও উপস্থিত বক্তা প্রভৃতির অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সমুজ্জল ছিল। ইহাদের মধ্যে বাণেশ্বর, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, গোপালভাঁড়, মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় ও রামরুদ্র বিদ্যানিধি রাজার নিত্য সহচর ছিলেন।

ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি ভুরসুট পরগণায় পাণ্ডুয়া বসন্তপুর গ্রামের সান্নিধ্য নরেন্দ্রপুরের বদান্য জমিদার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের পুত্র। ইঁহাদের বংশের উপাধি মুখোপাধ্যায়। লক্ষ্মী শ্রী থাকায় রায় বা রাজা নামে অভিহিত হইতেন। ভারত বাল্যকাল হইতে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ইনি সংক্ষিপ্তসার নামক জটিল ব্যাকরণ গ্রন্থ আয়ত্ব করেন। মুসলমান ভাবভাষা প্লাবিত তদানীন্তন বাঙ্গলায় সংস্কৃত অপেক্ষা ফারসীর আদর অধিক ছিল সুতরাং ভারতের সংস্কৃতানুরাগ তাঁহার পিতা ও অন্য আত্মীয়ের নিকট বিরাগের কারণ হইয়া উঠে সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি ফারসী অধ্যয়নে মন দেন এবং অল্পদিনেই উহাতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা তাঁহার পিতার জমিদারী বর্দ্ধমান সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ায় তিনি গাজীপুর যাইয়া কষ্টে অধ্যয়ন করিতে থাকেন; পরে ইনি তদানীন্তন চন্দননগরের ফরাসী গবর্ণমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রনারায়ণই ১১৫৯ সালে তাঁহাকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্গ ভাষার সবিশেষ উন্নতি করিয়া যান এবং কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমত্যানুসারে সুবিখ্যাত অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে "রায় গুণাকর" এই সম্মানজনক উপাধীতে ভূষিত করেন ও মূলাযোড় গ্রামে বাৎসরিক ৬০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইজারা দিয়া তথায় তাঁহাকে বাস করাইয়াছিলেন। এই সময়ে বর্গীর উৎপীড়নে উৎপীড়ত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্রের মাতা সপুত্র মূলাযোড়ের পূর্ব্বদক্ষিণ কাউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং নবদ্বীপাধিপতির নিকট আপনার কর্ম্মচারী কামদেব নাগের নামে মুলযোড পত্তনী লয়েন। এই নাগ, কর্ত্তা হইয়া গ্রামবাসীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ভারত তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও স্বয়ং নাগের দংশনে পীড়িত হইয়া অষ্ট শ্লোকাত্মক নাগাষ্টক নামে এক অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমীপে প্রেরণ করেন। উহা পাঠে রাজা অনতিবিলম্বে নাগের বিষদন্তভগ্ন করিয়া দেন। ভারত ১৬৩৪ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন।

বঙ্গ কবিকুলরবি ভারতচন্দ্র

নরসুন্দর বংশীয় ছিলেন কেহ কেহ ইহাঁকে কায়স্থও বলিয়া থাকেন। তাঁহার

গোপালভাড় — নিবাস শান্তিপুরে ছিল। তাঁহার ন্যায় হাস্য রসিক আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। গোপালের সরস বাকচাতুর্য্য বাঙ্গলায় কে না অবগত আছেন।

মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় — নিবাস উলা। রসিক বিধায় রাজা তাঁহাকে বৈবাহিক সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। গোপালের ন্যায় ইঁহারও বহু সরস বাক্য এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে।

ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভ স্বীয় বালবিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দিবার পক্ষে বহু পণ্ডিতের মত প্রাপ্ত হইয়া নদীয়া সমাজের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ব্যবস্থা সংগ্রহের নিমিত্ত কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করেন ও কতিপয় পণ্ডিতকে রাজসভায় প্রেরণ করান। সুকৌশলী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বহু বিষয়ে রাজবল্লভের মুখাপেক্ষী ছিলেন সুতরাং স্বয়ং প্রকাশ্যে পণ্ডিতগণকে মত দিতে অনুরোধ ও এমন কি শাসন বাক্য প্রয়োগ করিলেও গোপনে তাঁহাদের অমত প্রকাশে দার্ঢ্য দেখাইতে উপদেশ দিয়া রাজবল্লভকে হতাশ করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে একটী কৌতুকাবহ প্রবাদ আছে। কথিত আছে যে রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণের নিকট রাজবাটী হইতে যে সিধা প্রেরিত হয় উহার সহিত একটি মহিষ শাবক প্রেরণ করা হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত মহিষশাবক দর্শনে কুপিত হইয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলে রাজকর্ম্মচারীরা নিবেদন করেন যে যখন কোন কোন শাস্ত্রে মহিষমাংস ভক্ষণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তখন উহা গ্রহণে কি আপত্ত্য থাকিতে পারে? রাজবল্লভের পণ্ডিতগণ উত্তর করেন, "হাঁ যদিও কোন কোন শাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু একেশে মহিষ মাংস ভোজনের ব্যবহার নাই সুতরাং ইহা অভক্ষ্য।" সুশিক্ষিত রাজকর্ম্মচারীগণ তখন সাহ্লাদে বলিলেন "যখন শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিয়াও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া ইহা অভক্ষ্য বলিতেছেন তখন অপ্রচলিত দেশাচার বিরুদ্ধ বিধবা বিবাহে আপনারা কিরূপে মত প্রকাশ করিলেন।" কথিত আছে রাজবল্লভের পণ্ডিতগণ এই বাক্যে নিরুত্তর হইয়া ও পরে রাজ সভাস্থ পণ্ডিতগণের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া নিজেদের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত করিলেও তিনি শিবনিবাস, কৃষ্ণপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, চুর্ণিতীরবর্ত্তী হরধাম, নবদ্বীপের নিকটে গঙ্গাবাস ও যাত্রাপুর প্রভৃতি বহুতর স্থান স্থাপনা পূর্ব্বক প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া অনেক সময়ে সপরিবারে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন মুরসিদাবাদের নবাবের উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে তিনি এইরূপে নানা স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি স্বীয় পিতা ও পিতামহের ও আপনার বাকী পড়া রাজস্ব ও নজরানার দায়ে নবাব আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক একবার মুরসিদাবাদে বন্দী হইয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ জীবনে বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয় এবং তাঁহারই অনুকম্পায় ও পরামর্শে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইলে ইংরাজগণ এদেশ অধিকার করেন। লর্ড ক্লাইব

তাঁহার কৃত উপকারের স্মৃতি নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে দিল্লী হইতে রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধী ও পলাশীক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্বাদশটী কামান উপহার দেন।

রাজার দুই রাজ্ঞী ছিলেন। প্রথমার সহিত পিতা বর্ত্তমানে বিবাহ হয় এবং স্বয়ং রাজা হইয়া রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণ করেন। এই ছোট রাণীর বিবাহ সম্বন্ধে একটী মনোরম আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। রাণাঘাটের এক মাইল উত্তর পূর্ব্বে নৌকাড়ী বলিয়া একখানি বহু প্রাচীন গ্রাম বিদ্যমান আছে। উহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া "বাচকোর খাল" নামে একটী চুর্ণী নদীর শাখা আছে। পূর্ব্বে ঐ খাল একটী বেগবতী নদী ছিল। একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই নদী দিয়া তাঁহার শ্রীনগরস্থ প্রাসাদে গমনকালে নৌকাড়ীর ঘাটে এক অনিন্দ্য সুন্দরী অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যার পিতাকে আহ্বান করিয়া কন্যাটির পাণিপ্রার্থী হইলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু কিশোরকুণীকে কন্যাদান করিলে সমাজে আমাকে হীন হইতে হইবে।" যাহা হউক পরিশেষে ব্রাহ্মণের সে আপত্তি রহিল না। রাজা সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে লইয়া যাইলেন এবং নিশিথে বাসরগৃহে নব প্রণয়ণীকে রজত পর্য্যাঙ্কে শয়ন করাইয়া রাজা কহিলেন "দেখ আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি রূপার খাটে শয়ন করিলে"। তেজস্বিনী রাজমহিষি উত্তর করিলেন "আর একটু উত্তরে যাইলে, সোনার খাটে শয়ন করিতে পরিতাম।" ইহার তাৎপর্য্য এই আমার পিতা পরম কুলীন হইয়া যখন কিশোরকুণী মহারাজকে কন্যা দিলেন তখন আর একটু হীনতা স্বীকার করিয়া মুকসুদাবাদে নবাবের সহিত বিবাহ দিলে স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন করিতে পাইতাম। মহারাজ স্ত্রীর এই তেজগর্ভ স্পষ্ট উত্তর শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহীষীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র[২] মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র, ও ঈশানচন্দ্র এবং তেজস্বিনী ছোট রাণীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র রূপে গুণে ও চরিত্রবলে সাক্ষাৎ শিবতুল্যই ছিলেন এবং কনিষ্ঠ শম্ভুচন্দ্র মাতার ন্যায় তেজস্বী ছিলেন এবং তাঁহার স্বভাবও নিতান্ত উদ্ধত ছিল। যৎকালে তাঁহার পিতা ও জেষ্ঠ্য ভ্রাতা নবাব মীরকাশিম কর্ত্তৃক মুঙ্গেরে কারাবদ্ধ হয়েন সে সময়ে শম্ভুচন্দ্র তাঁহাদের নিধন নিশ্চয় জানিয়া পৈত্রিক জমীদারি ও ধনাগার অধিকার করেন এবং যখন মুঙ্গের কারাগারস্থ অপরাপর বন্দীগণের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় তখন তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু ঘোষণা করিয়া দিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত পিতৃগদীতে অধিরূঢ় হয়েন। কিন্তু যখন সপুত্র মহারাজা সুস্থ শরীরে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মুরসিদাবাদে থাকিয়া শম্ভুচন্দ্রের ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলেন তখন শম্ভুচন্দ্র নিতান্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া কতরূপ ত্রুটী স্বীকার করিয়া পিতা ও ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিলেন।

যাহা হউক সে যাত্রা গোলযোগ মিটিয়া যাইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেখিলেন যে যখন তাঁহার জীবদ্দশাতেই শম্ভুচন্দ্র এরূপ ব্যবহার করিতেছেন না জানি তাঁহার প্রাণান্তে

তিনি ভ্রাতাদের সহিত আরও কি কুব্যহার করিবেন। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১১৮৬ সালে তাৎকালিক গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংশ বাহাদুরের নিকট আবেদন পূর্ব্বক তাঁহার একজন সদস্য ও একজন মুন্সীকে রাজবাটীতে লইয়া যাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে বঙ্গভাষায় এক দানপত্র ও পারস্য ভাষায় এক তফবীজ্ নামা লেখাইয়া তাহাতে ঐ সভাসদ সাহেবের ও মুন্সীর সাক্ষর ও মোহর করিয়া লয়েন। এতদ্বারা তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে দান করিয়া অন্যান্য পুত্রগণের খরচাদির নিমিত্ত সালিআনা মোট ৪০০০০ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই দানপত্র লেখা হইলে শম্ভুচন্দ্র স্বীয় স্বাভাবিক চতুরতার সাহায্যে হেষ্টিংশের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে স্বীয় পক্ষভুক্ত করিয়া আপনার নামে পূর্ব্বেই মহামান্য কোম্পানি বাহাদূরের নিকট হইতে জমিদারের সনন্দ বাহির করিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠান:—পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ"। যাহা হউক মহারাজ সে যাত্রা তাঁহার সুচতুর দেওয়ান কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের দ্বারা মহামান্য হেষ্টিংসের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন পূর্ব্বক শিবচন্দ্রের নামেই জমীদারীর সনন্দ ও মহারাজাধিরাজ উপাধীর এক ফারমান বাহির করিয়া লন। এই ঘটনার অব্যাহিত পরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সস্ত্রীক কুমার শিবচন্দ্রকে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এইরূপ পুত্রের স্কন্ধে রাজ্যের দুর্ব্বহ ভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ মহারাজা গঙ্গাবাসের নিমিত্ত নবদ্বীপের ক্রোশৈক পূর্ব্বস্থিত অলকানন্দা তীরে এক সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ স্থানকে গঙ্গাবাস নাম দিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই গঙ্গাবাসের সমস্ত প্রাসাদ ও অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে কেবল হরিহরের মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।[৩] কালের স্রোতে খড়িয়া হইতে উদ্ভূত অলকানন্দের গর্ভ মৃত্তিকা পূর্ণ হইয়াছে। এই পবিত্র অলকানন্দা তীরে ১১৮৯ সনের ২২শে আষাঢ় (১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে) সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী নানা বিপদ ধীরভাবে সহ্য করিয়া অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ ৭৩ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা শিবচন্দ্র ইংরাজের নব প্রবর্ত্তিত মেয়াদী বন্দোবস্তানুসারে জমিদারী অধিকার করেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ এইরূপে ভগ্ন মনোরথ হইয়া শিবনিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করেন। মহারাজাধিরাজ শিবচন্দ্র অধিকাংশ সময় শিবনিবাসে এবং কখন কখন কৃষ্ণনগরেও বাস করিতে থাকেন। তিনি পিতা অপেক্ষাও শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কেবল যথা সময়ে রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়াতেই কুবেজপুর পরগণা নিলাম হইয়া যায়। কথিত আছে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণে আপনাকে অশক্ত বিবেচনা করিয়া আপনাকে পাপগ্রস্থ মনে করেন এবং ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রোগাক্রান্ত হইয়া এক দান পত্রদ্বারা সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে অর্পণ করিয়া ঐ অব্দে ৬০ বয়সে লোকান্তর

গমন করেন।

পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র অতি বিলাসী ছিলেন। ইনি ১১৯৭ সন হইতে ১২০৬ সন পর্য্যন্ত ১০ বৎসর মেয়াদে নদীয়া জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। প্রথম বৎসরে ৮৪৬০২ টাকা ও পরবর্ষাবধি বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়া ১২০৬ অব্দ পর্য্যন্ত ৮৫১৫১২ টাকা জমা অবধারণে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ ঐ বন্দোবস্তই চিরস্থায়ীরূপে গণ্য হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর বাহাদুরের সদস্য ও মুন্সীর সমক্ষে যে দানপত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য পুত্রদের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান; রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় প্রথমে "দশসালা" পরে "চিরস্থায়ী" বন্দোবস্ত সৃষ্ট হইলে কৃষ্ণচন্দ্র যে সকল পুত্রের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান তাঁহাদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র পৈত্রিক জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্য উপযুক্ত ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করেন। মকর্দ্দমায় ঈশ্বরচন্দ্র জয়লাভ করিলেও মকর্দ্দমার খরচ কুলাইতে বহু অর্থ ব্যয় হওয়ায় এবং যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারায় তাঁহার জমিদারী সকল নিলামে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই সময়ে নদীয়া রাজ বংশের অধিক অবনতি সংঘটিত হয় এবং পরাক্রান্ত ইংরাজের শাসনে সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমতারও হ্রাস হইয়া যায়।

মহারাজা ঈশ্বরচন্দ্র একপুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে লোকান্তর হন। গিরীশচন্দ্র ষোড়শবর্ষ বয়ক্রম কালে পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন। নাবালক বিধায় তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়। পরে সাবালক হইয়া তিনি পিতার ন্যায় অযথা ব্যয়ে ঋণগ্রস্থ হন। তিনি কৃষ্ণনগরে দুইটী ছোট বড় মন্দির প্রস্তুত করাইয়া বড় মন্দিরে "আনন্দময়ী" নামে এক কালী প্রতিমা ও ছোট মন্দিরে আনন্দময় নামে এক শিব স্থাপনা করেন। তিনি নবদ্বীপের ভাগিরথী তীরস্থ ভূগর্ভে এক গোপালমূর্ত্তি অবস্থান করিতেছেন স্বপ্নে অবগত হইয়া সমারোহে ঐ বিগ্রহ উত্তোলন করিয়া নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বাকীদায়ে তাঁহার বিষয়ের অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া যায়।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী

গিরীশ চন্দ্রের সভায় ইনি একজন হাস্য রসিক কবি ছিলেন। রাজা তাঁহাকে আদর করিয়া রসসাগর বলিয়া ডাকিতেন। ১১৯৮ সালে নদীয়ান্তর্গত বাড়েবাঁকা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণনগরে বিবাহ করিয়া ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে জামাতৃভবনে তনুত্যাগ করেন। ইনি একজন অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন। বিশেষতঃ উপস্থিতমতে পদ্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গিরীশচন্দ্রের দুই স্ত্রী। কিন্তু একের গর্ভেও সন্তান হয় নাই। নদীয়ার প্রাচীন বংশ সাক্ষাৎ শোনিত সম্বন্ধে নদীয়ার তক্তে এই খানেই শেষ। ১২৪৮ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন বশতঃ ৫৫ বৎসরবয়সে রাজা গিরীশচন্দ্র

মানবলীলা সংবরণ করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র শ্রীশচন্দ্র ১৮৪২ খৃঃ দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ক্রমে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। এই রাজা পাশ্চাত্য মতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনি নিজ ব্যয়ে কৃষ্ণনগরে ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের নিমিত্ত অনেক পরিমাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। রাজা শিবচন্দ্রের রাজা শ্রীশচন্দ্রই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজা উপাধী ভূষিত হন।

ইঁহার পুত্রের নাম সতীশচন্দ্র। ইনিও পিতার ন্যায় পাশ্চাত্য বিদ্যা পারদর্শী ছিলেন। বিষয়াধিকারী হইবার অব্যাবহিত পরেই ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে পৈত্রিক উপাধী ও খেলায়েৎ প্রাপ্ত হন। ইনি ইহার পিতামহ গিরীশচন্দ্রের ন্যায় আয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন এবং অতিশয় ভ্রমণ প্রিয় ছিলেন। ইনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মুসৌরি পাহাড়ে ৩৩ বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন।

মহারাজা লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠা রাণী ভুবনেশ্বরী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধীকারিণী হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ৫ জানুয়ারি উহা কোর্ট অবওয়ার্ডে অর্পণ করেন এবং ১৮৮১ খৃঃ ২৪ নবেম্বর মহারাজা ক্ষিতীশ চন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই রাজা ১২৭৫ সনের ৩০ বৈশাখ জন্ম গ্রহণ করেন ২রা ভাদ্র ১৩১৭ পরলোক গমন করেন। ইনি রূপে গুণে প্রকৃতই নদীয়া সিংহাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিলেন। ইহার যত্নে নদীয়ার রাজশ্রী সর্ব্ব বিষয়েই সমুজ্জ্বল হইয়াছিল; ইহার এক পুত্র তাঁহার নাম ক্ষৌণিশচন্দ্র রায় জন্ম ২০ অক্টোবর ১৮৯০ পিতার ন্যায় ইনিও এক জন সাহিত্যানুরাগী সজ্জনসেবী সুধী বলিয়া খ্যাত। তাঁহার মধুর চরিত্রে ও অমায়িক ব্যবহারে গবর্মেণ্ট কর্তৃক মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রাজবংশ নদীয়ার ইতিহাসে প্রধান বর্ণনীয় ও উল্লেখযোগ্য সামগ্রী। নদীয়ার বিদ্যা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব অতি বিশাল ও বিস্তীর্ণ। নদীয়া রাজবংশের ন্যায় ব্রহ্মোত্তর বা পীরোত্তর বা মহাত্রাণ প্রভৃতি অপরিমেয় দান অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীয়ার যে ব্রাহ্মণের রাজদণ্ড ব্রহ্মত্তোর নাই নদীয়ায় তিনি ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন না। নদীয়ার রাজবংশ ভারতে মুসলমান রাজত্ব ধ্বংশের ও ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতের মূল এবং এই রাজবংশ লইয়াই নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস গঠিত।

এই রাজবংশ ব্যতীত কৃষ্ণনগরের রাজ দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বংশ, ৺রামতনু লাহিড়ীর বংশ, রায় বাহাদুর ৺যদুনাথ ও তদীয় ভ্রাতাগণের বংশ, মল্লিক বংশ, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ৺মনমোহন ঘোষের বংশ, ৺দ্বারিকানাথ দে বাহাদুরের বংশ, ৺রামগোপাল চেতলাঙ্গীর বংশ প্রভৃতি বংশাবলী উল্লেখযোগ্য।

এখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাজপ্রসাদ ও তৎসংলগ্ন "চক", স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, কৃষ্ণনগর কলেজ আদালত গৃহাদি, দেবী আনন্দ-ময়ীর মন্দির, লাইব্রেরি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এখানকার উৎপন্ন উল্লেখ যোগ্য সামগ্রীর মধ্যে কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর স্বনামখ্যাত

"মাটীর পুতুল" খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে "সরপুরিয়া," "সরভাজা," প্রভৃতি প্রসিদ্ধ

হরধাম

(নদীয়ার রাজবংশ—হরধাম শাখা)

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে তাঁহার কয়েকটী রাজধানী স্থাপন করিয়া গ্রামপত্তন করেন; হরধাম এইরূপে তাঁহারই স্থাপিত একটী গণ্ডগ্রাম। পূর্ব্বে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী থাকিলেও এক্ষণে ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের সাক্ষাৎ শোণিত সম্পর্কীয় বংশাবলী একমাত্র এখানেই অতি হীন অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

নদীয়া রাজবংশের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দুই মহিষী ছিলেন। বড় রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র এবং অন্নপূর্ণা নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমা রাজ্ঞীর কন্যা অন্নপূর্ণার বংশীয় দিগের মধ্যে কেহ কেহ শিবনিবাসে, কেহ কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন। ছোট রাণীর গর্ভে কেবলমাত্র শম্ভুচন্দ্র নামে এক পুত্র এবং বিশ্বেশ্বরী, উমেশ্বরী, দুর্গেশ্বরী নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই তিন জনের মধ্যে দুর্গেশ্বরীর সন্তানেরা হরধামে বাস করিতেছেন, সুপ্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের আদিস্থান ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী কুলীন প্রধান শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী দুর্গেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে শশিভূষণ, চন্দ্রভূষণ ও বিধুভূষণ নামে শ্রীগোপালের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যম পুত্র চন্দ্রভূষণের তারাবিলাশ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বক্ষমতায় অনেক বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তারাবিলাসের বৈদ্যনাথ নামে এক পুত্র এবং এক কন্যা ছিলেন। তারাবিলাসের পুত্র রায় মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকন্যাগণসহ এক্ষণে হরধামে বাস করিতেছেন। উমেশ্বরী নিঃসন্তান এবং বিশ্বেশ্বরীর বংশ ধ্বংস পাইয়াছে।

রাজকুমার দিগের মধ্যে শিবচন্দ্র যেমন শান্তস্বভাব ও পিতৃভক্ত, শম্ভুচন্দ্র তেমনই উদ্ধত ও পিতার অবাধ্য ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন করিলে শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি পুত্রেরা পিতার অসদৃশ বন্টনে বিরক্ত হইয়া শিবনিবাস পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বাস করে। জালাঙ্গীর মোহানার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে মাথাভাঙ্গা নদী নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া চূর্ণী নামে চুয়াডাঙ্গা রামনগর, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি ও রাণাঘাট পূর্ব্ব পারে রাখিয়া ভাগীরথির সহিত মিলিত হইয়াছে। যে স্থানে উভয়ের মিলন হইয়াছে সেই স্থানকে বর্ত্তমান "পেট কাটার" মহনা কহে। পূর্ব্বোক্ত রাণাঘাট মহকুমার দুইক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব চূর্ণী নদীর উভয় পারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হরধাম ও আনন্দ ধাম নামে দুইটী গ্রাম পত্তন করেন।

হরধামের বাটী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নির্ম্মাণ করান এবং তাঁহার মৃত্যুর পর শম্ভুচন্দ্র আসিয়া এখানে বাস করেন। এই বাটী অতিশয় বৃহৎ ও পরম সুদৃশ্য ছিল। এখনও তাহার কতকংশ এবং দেবালয়, মন্দির পূজার, বাটী, ঘড়িখানা প্রভৃতির কতক কতক অংশ বর্ত্তমান, কিন্তু তাহাও সংস্কারাভাবে দিন দিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছে। রাজপ্রসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর লতাগুল্ম দেহবিস্তার করিতেছে। চতুস্তল পরিমিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ, যাহা এক সময়ে রাজ-পরিবারের আনন্দ কোলাহলে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ জীর্ণ, পতনোন্মুখ কয়েকটী গৃহ সৌভাগ্যের নীরব সাক্ষী স্বরূপ ধ্বংসাবশেষ ইষ্টকস্তূপের মধ্যে দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে।

প্রবাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন শম্ভুচন্দ্র হরধামে আসিয়া বাস করেন, সে সময়ে হরধামে লোকসংখ্যা অতি অল্প ছিল। একারণ শম্ভুচন্দ্র হরধামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে চেষ্টিত হন। তিনি নানাস্থান হইতে রাজ-কুটুম্বদিগকে আনাইয়া হরধামে বাস করান এবং রাজসংসারের আবশ্যকীয় কর্ম্মচারিবর্গেরও গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময়ে রাজজ্যোতিষী সৃষ্টিধর আচার্য্য মহাশয়কে "সুতার গাছি" নামক স্থান হইতে (সন ১২০৭ সাল) আনাইয়া ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ নিষ্কর ভূমি দান করাইয়া হরধামে বাস করান। জ্যোতিষী আচার্য্য মহাশয় যেমন জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই অসাধারণ বলিষ্ঠ ও সাহসী বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইঁহার দর্পনারায়ণ, নিমচাঁদ ও প্রেমচাঁদ নামে তিন পুত্র ও কয়েকটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দর্পনারায়ণ প্রায় পিতার অনুরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন। অপর দুই ভ্রাতার মধ্যে মধ্যম নিমচাঁদ জ্যেষ্ঠের অনুরূপ সুপণ্ডিত না হইলেও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। বাঙ্গালা ১২৮৪ সালে সপ্ততিতমাধিক বর্ষ বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। এক্ষণে তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র শ্রীরজনীকান্ত আচার্য্য হরধামে বাস করিতেছেন। ইনি নানা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের লেখক এবং গ্রন্থকার।

রাজকুমার শম্ভুচন্দ্রের ছয় পুত্র যথা—বিষ্ণুচন্দ্র, পৃথিচন্দ্র, আনন্দচন্দ্র, বিজয়চন্দ্র, নীলচন্দ্র ও বৈকুণ্ঠচন্দ্র। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তন্মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র নিঃসন্তান, পৃথিচন্দ্রের গঙ্গেশচন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনিও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন আনন্দচন্দ্রের মহামায়া নামে একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রাজকুমারী মহামায়া বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে সোমশেখর মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া হরধামেই বাস করেন। মহামায়ার সন্তানেরা এখন হরধামেই বাস করিতেছেন। বিজয়চন্দ্রের অদ্বৈতচন্দ্র, শ্যামচন্দ্র, দামোদরচন্দ্র, শ্রীধরচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র, এই পাঁচজনের মধ্যে শ্যামচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র নিঃসন্তান। কেবল অদ্বৈতচন্দ্রের দৌহিত্র বংশ এবং দামোদরচন্দ্র ও শ্রীধরচন্দ্রের পৌত্রেরা হরধামে বাস করিতেছেন। হরধামের রাজবাটীর সংলগ্ন মন্দিরে যে 'চিণ্ময়ী' নামে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাহা নীলচন্দ্রের পত্নী রাণী রাধামণি দেবীর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মন্দিরে গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে

তাঁহারা সেবকগণের শোচনীয় অবস্থা দর্শনেই বোধ হয় অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। গ্রামধিষ্ঠাত্রী চিণ্ময়ী দেবীর নিত্য সেবার জন্য রাজদত্ত ভূমি সম্পত্তি আছে, তাহার আয় হইতেই দেবসেবা চলিয়া থাকে। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী 'সুখসাগর' নামক স্থানে যে উগ্রচণ্ডী নাম্নী কালিমূর্ত্তি বিরাজিতা ছিলেন, তাহাও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। সুখসাগর গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হওয়ায় বিগ্রহ মূর্ত্তি হরধামে আনীত হইয়া চিণ্ময়ী দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরেই রক্ষিত হইয়াছেন।

মধ্যম ঠাকুর শম্ভুচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র নীলচন্দ্রের, হরিশ্চন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন, তাহার জননীই রাধামনি দেবী 'চিণ্ময়ী' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজসম্পত্তি দেবসেবায় অর্পণ করেন। বিজয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অদ্বৈত্যচন্দ্রের পুত্র গোপালচন্দ্র। ইঁহার শিবচন্দ্র নামে এক পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। পুত্রটী অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। কন্যা দুইটী জীবিতা আছে। গোপালচন্দ্র প্রৌঢ়াবস্থায় নশ্বর দেহত্যাগ করেন। সুপ্রসিদ্ধ নাটককার ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার "সুরধনী কাব্যে" ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম,
যথায় বিরাজে এক রাজা গুণগ্রাম,
রক্তগন্ধ ফোঁটা ভালে উজ্জ্বল শরীর,
তাঁর শিরে বহে কৃষ্ণচন্দ্রের রুধির।"

বাস্তবিক যতদূর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে গোপালচন্দ্রের রক্তচন্দন চর্চ্চিত প্রশস্ত ললাট সমন্বিত সুবিশাল দেহ ও ধীর সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের মনে ভক্তির সঞ্চার হইত, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র হরধামেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকৃত বংশধরগণ বিরাজ করিতেছেন, যাঁহাদের দেহে কৃষ্ণচন্দ্রের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া গৌরব করিতে পারেন। নচেৎ জয়হরিচন্দ্রের[৪] পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দধামের[৫] এবং গঙ্গেশচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে শিবনিবাসের[৬] রাজবংশ পুত্রাদিক্রমে লোপ পাইয়াছে, দৌহিত্র বংশ চলিতেছে। কৃষ্ণনগরেও মহারাজ গিরীশচন্দ্রের পর হইতে পোষ্যপুত্র গৃহীত হইয়াছেন, কেবল একমাত্র হরধামেই প্রকৃত বংশধরগণ বর্ত্তমান।

বিজয়চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র দামোদরচন্দ্রের দুই পুত্র দেবেন্দ্রচন্দ্র, নরেন্দ্রচন্দ্র। নরেন্দ্রচন্দ্র অল্পবয়সেই দেহত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কাশীধামে অতিবাহিত করিয়া বাঙ্গালা ১৩০০ সালে সুখসাগরে জাহ্নবীতীরে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র বিশ্বেশ্বরচন্দ্র বর্ত্তমান, চতুর্থ শ্রীধরচন্দ্রের গিরিধরচন্দ্র ও গঙ্গাধরচন্দ্র নামে দুই পুত্র ও কন্যা ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গিরিধরচন্দ্র ও কন্যাটী বহুদিন লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ গঙ্গাধরচন্দ্র জীবনের শেষাবস্থায় মস্তিষ্কের বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া ১৩০৬ সালে গঙ্গালাভ করিয়াছেন এক্ষণে গিরিধর চন্দ্রের মধ্যম পুত্র মহেন্দ্রচন্দ্র ও গঙ্গাধরচন্দ্রের কেদারচন্দ্র ও জিতেন্দ্রচন্দ্র নামে দুই পুত্র হরধামে বিরাজ করিতেছেন।

কালের ক্রীড়ায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজবংশ এক্ষণে ধ্বংশ প্রায় এবং নিতান্ত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রামও ম্যালিরিয়াদি নানা কারণে ক্রমেই জনহীন হওয়ায় দিন দিন শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। হরধামের বর্ত্তমান অবস্থাপন্নব্যক্তিগণের মধ্যে হরধামের বাবুদিগের নাম উল্লেখ যোগ্য ইহাঁরা পশ্চিম দেশীয় আহিরী গোপ-সন্তান পূর্ব্বে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ রাজ সংসারে চাকরী করিতেন এবং তখন হইতেই ইহাঁদের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়। এই বংশের বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ রায় একজন বিনয়ী মহাশয় ব্যক্তি।

শিব নিবাস

শিবনিবাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নসরত খাঁ নামক একজন দুর্দ্দান্ত দস্যুকে তাঁহার রাজ্য মধ্য উৎপাৎ করিতে দেখিয়া চূর্ণীনদীর পূর্ব্বকূলে এক গভীর অরণ্যে তাহার আড্ডার সন্ধান পাইয়া তাহাকে শাসনার্থ উপযুক্ত সজ্জায় আসিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করেন। দস্যু দমন করিয়া তিনি একরাত্রি তথায় বাস করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যখন নদীকূলে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন তখন একটী রোহিৎমৎস্য জল হইতে লাফাইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হয়। আন্দুলীয়া নিবাসী কৃপাময় রায় নামক জনৈক রাজজ্ঞাতী এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ এস্থান অতি রমণীয়, রাজভোগ্য সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়া আপনার নজররূপে উপস্থিত হইল। এখানে বাস করিলে আপনি সুখী হইবেন!" রাজাও তখন বর্গীর উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার্থ এইরূপ একটী নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে এই স্থানটী সকলে মনোনীত করিলে তিনি উক্ত স্থানটীকে কঙ্কনাকারে নদীবেষ্টিত করিয়া স্বীয় দেওয়ান রঘুনন্দনের মতানুযায়ী একসুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন ও আপনার বাসভবন ও দুইটী সুবৃহৎ শিবমন্দির স্থাপন করিয়া দুইটী দুর্জ্জয় শিবলিঙ্গ ও অপর মন্দিরে রামসীতা স্থাপনা করিলেন এবং শিবের নামে গ্রামের শিবনিবাস নামকরণ করিলেন।? এই কঙ্কনাবেষ্টিত শিবনিবাসেই তিনি মহা সমারোহে অগ্নিহোত্র বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এরূপ সমৃদ্ধ যজ্ঞ কলিতে এই শেষ। এতদুপলক্ষে কাশী, কাঞ্চী প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী আখ্যা প্রদান করেন। কালের ক্রীড়ায় এই শিবনিবাস এখন বনাকীর্ণ হইয়া ব্যাঘ্র শার্দ্দুলাদির নিবাসরূপে পরিনত হইয়াছে। প্রাসাদ ধ্বংশপ্রাপ্ত এবং মন্দির কয়েকটীও সংস্কারভাবে দিন দিন হতশ্রী হইতেছে৮ এখনও পর্য্যালোচনা করিলে এই মন্দিরত্রয়ের ভিত্তিগাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে,—

প্রথম শিবমন্দিরে (১৬৭৬ শক বা ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত, লিঙ্গমূর্ত্তি ৯ ফুট উচ্চ)—

যো জাতঃ খলু ভারতে স্বরতরুজৈ ষ্টাদিসী শাংশকে
সেনানীমুখ বাজিরাজ বিলসৎ সংখ্যাবতী দম্পুরে।
কৃত্বা মন্দিরমিন্দুচুম্বিশিখরং ভূপাল চূড়ামণিঃ
পৌত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতিঃ শম্ভুং সমস্থাপয়ৎ ॥

দ্বিতীয় শিবমন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত, লিঙ্গমূর্ত্তি ৭॥ ফুট উচ্চ)—

যঃ সাক্ষাৎকৃতশৈব মূর্ত্তি বসুধে শাংসকে সম্ভবাৎ সংখ্যাতঃ
ক্ষিতিদেব রাজপদভাক্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভুঃ।
তস্য ক্ষৌণিপতে দ্বিতীয় মহিষী মুগুেব লক্ষ্মীস্বয়ম
প্রাসাদ প্রবরে প্রাসাদ সম্মুখং শম্ভুং সমস্থাপয়ৎ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত, লিঙ্গমূর্ত্তি ৪ ফুট উচ্চ),—

দেব শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র ক্ষিতিপতি তিলকো ব্রহ্ম রাজর্ষি বংশে
যোহসৌ ভূকল্পশাখী শ্রুতি বসুবসুধে শাংশকে তুল্য সংখ্যে।
প্রেয়স্যাস্তন্মহিষ্যাঃ পরমকৃতিকৃতে জানকী লক্ষণাভ্যাং
প্রাসাদে প্রাদুরাসীৎ ত্রিজগদাধিপতি শ্রীযুত রামচন্দ্রঃ ॥

এই শিবনিবাসের রাজবংশের যখন এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়া আসিতেছিল, তখন এখানে তিলিকুলে রাণাঘাটের কৃষ্ণপান্তীর ভাগিনেয় স্বরূপ সরকার চৌধুরী মহাশয় (যাঁহারা নাম হইতে নদীয়ার স্বরূপ গঞ্জের নাম হইয়াছে) ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া বিপুল জমীদারি ক্রয় করিতেছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি নদীয়া রাজগণের নিকট হইতে শিবনিবাস ক্রয় করেন। শিবনিবাস স্বরূপের পুত্র বৃন্দাবন সরকার চৌধুরীর সময়ে আবার কিছু জমজমাট হইয়া উঠিয়াছিল। বৃন্দাবন অতিশয় ক্রিয়াবান চতুর ও প্রাজ্ঞ ছিলেন, তিনি নীল-বিদ্রোহের সময়ে প্রজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া বহু ইউরোপীয় নীলকরকে আত্মশক্তিতে দমনে রাখিয়াছিলেন। নীলকরেরা তাঁহার নামে কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহার মৃত্যুর পরেই তাঁহার বংশের সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে।

শান্তিপুর

শান্তিপুর কতদিনের পুরাতন গ্রাম নিশ্চিতরূপে বলা না যাইলেও ইহা যে ন্যূনাধিক আটশত বৎসর হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বর্ত্তমান কালের কিঞ্চিন্ন্যূন ৫৫০ পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুর জনপূর্ণ একটী গণনীয় স্থান ছিল। এই কালে শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্শ্বদ স্বনামখ্যাত শ্রীঅদ্বৈতের প্রপিতামহ নরসিংহ মিশ্রই এই শান্তিপুর গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ

করেন যথা লঘুভারতে :—

"শূন্য সপ্ত বেদ বেদ মিতব্দে বিগতে কলেঃ।
দোষাঘাতে কুলীনানাং বিবাদোহ ভবন্মহান্।
তৎ প্রাক্ শান্তিপুরে হ্যাসীন্নরসিংহ দ্বিজোত্তমঃ।"

অর্থাৎ যে সময়ে দোষাঘাতে কুলীনদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে দ্বিজোত্তম নরসিংহ শান্তিপুরে আগমন করেন। ১২৯১ শকের কিছু পূর্ব্বে। এই নরসিংহ কে ছিলেন তাহা লঘু ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে যথা—

"নরসিংহোপি গৌড়স্য কার্য্যাকারক পালিতঃ।"

নরসিংহ গৌড় বাদসাহের কার্য্যকারক ছিলেন। টোগলক্ বংশীয় গিয়াসুদ্দিনের পৌত্র তৎকালে গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হয়েন, সুতরাং শান্তিপুরের অস্তিত্ব সার্দ্ধ পঞ্চাশত বৎসরেরও উপর স্বীকার করিতে হয়। আর এক কথা মহম্মদ বক্তিয়ার ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ অধিকার করেন। প্রবাদ আছে তিনি এই শান্তিপুর ও বয়ড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপাভিমুখে গমন করেন। এই ঘাট আজিও "বক্তারের ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং তখনও অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক সাত শত বৎসর পূর্ব্বেও এই স্থানে যে বর্ত্তমান ছিল তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

শুনা যায় বহুপূর্ব্বে এই সকল স্থান গঙ্গার গর্ভবর্ত্তী ছিল; এখনও উহাদের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে গঙ্গাগর্ভ মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া শান্তিপুর, ফুলিয়া, বেলগড়ে প্রভৃতি স্থান, অর্থাৎ উলা ও অম্বিকা কালনার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমুদয় উদ্ভূত হইয়াছে; এখনও বন্যা বা বর্ষাদি কারণে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইলেই এই সকল স্থানের অধিকাংশই জলমগ্ন হয় বিশেষতঃ রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর গমনাগমনের যে "ফেরীফাণ্ড রোড" নামক রাস্তা আছে তাহার উপর দিয়া যাইবার সময় উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হইবে যে এই উভয় পার্শ্বস্থ স্থান সমুদয় একটী প্রাচীন বিশাল নদীর খাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রবল বন্যার সময়ে অদ্যাপিও এই খাতে গঙ্গার প্রবাহ দেখা যায়।

শান্তিপুর গ্রাম যে বহুকালপূর্ব্বে জলমগ্ন ভূখণ্ড ছিল তাহার বহু চিহ্ন ও নিদর্শন সময় সময় পাওয়া যায়। কূপাদি খননকালে এখানে একবিংশতি হস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নিম্নদেশ হইতে নৌকাদির ভগ্নাবশেষ বা হাইল এবং শালকাষ্ঠ ইত্যাদি নদীবক্ষের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। রামনগর পাড়ার একটী কূপের তলদেশের এক পার্শ্বে একখানি চৌকর কাষ্ঠ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বহু পূর্ব্বে শান্তিপুরের উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ এই তিনদিকে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। উত্তরে বাবলা গ্রামের প্রান্তে ও পূর্ব্বে ঘোড়লিয়া হইতে বাবলা পর্য্যন্ত গঙ্গার খাত এখনও বর্ত্তমান। বর্ষাকালে এই খাত গঙ্গার জলে পূর্ণ হয়। দক্ষিণে গঙ্গা এখনও বহমান, তবে ইহার গতি ও অবস্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জেমস্ রেনেল কর্ত্তৃক শতাধিক বর্ষপূর্ব্বে অঙ্কিত নদীয়ার মানচিত্রে গঙ্গা হইতে শান্তিপুর বহুদূরে দেখান আছে; মধ্যে কিছুকাল

গঙ্গা গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া বহতা ছিল, এক্ষণে পুনরায় দূরে সরিয়া যাইতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বর্ত্তমান শান্তিপুরের দুইক্রোশ উত্তরে "নিঝরের" সন্নিকটবর্ত্তী বাবলা নামক স্থানে পূর্ব্বে শান্ত নামে একজন বেদাচার্য্য বাস করিতেন। তাঁহার চলিত নাম শান্তমুনি ; এই শান্তমুনির নাম হইতেই শান্তিপুর নামের উৎপত্তি ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে শান্তমুনি হইতে শান্তিপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কেননা "শান্তিপুর" নামটী শান্তমুনির পূর্ব্ব হইতেও প্রচলিত দেখা যায়। শান্তমুনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সমসাময়িক। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিকট যে সময়ে বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তখন অদ্বৈতের বয়স অনধিক দ্বাদশ বৎসর বলিয়া কথিত, সুতরাং শান্তমুনির বয়স পঞ্চাশ বা ষাটি বৎসর ভিন্ন আর কতই হইতে পারে ? ষাটি বৎসর হইলেও তিনি শ্রীঅদ্বৈত অপেক্ষা আটচল্লিশ বৎসরের বড়। অদ্বৈত তাঁহার পিতার আশীবৎসর বয়ঃক্রম কালে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার পিতা শান্তমুনির জন্মগ্রহণের বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅদ্বৈতের প্রপিতামহ গৌড় বাদশাহের কার্য্যোপলক্ষে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন, তিনি শান্তমুনির জন্মগ্রহণ করিবার কতবৎসর পূর্ব্বের লোক হইবেন ? প্রায় একশত বৎসরের ; তখনও শান্তিপুর গননীয় স্থান, এবং "শান্তিপুর" নাম দূর দূরান্তর বিশ্রুত।

আবার কেহ বলেন যে পূর্ব্বে এই স্থানে হিন্দুরা তাহাদের মৃতকল্প পিতামাতাকে সজ্ঞানে তীরস্থ করিয়া লইয়া আসিত। যাহারা এখানে আসিয়া রোগমুক্ত হইত তাহারা পুনরায় সংসারে যাইলে পাছে সংসারে কোনরূপ অমঙ্গল প্রবেশ করে এই ভয়ে তাহারা আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া, সংসারের সুখ দুঃখ হইতে নিরপেক্ষভাবে এখানে জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিতে অতিবাহিত করিতেন বলিয়া, এবং এইরূপ সংসারবিরাগী, শান্তি অভিলাষী লোক লইয়া গ্রাম গঠিত হওয়ায় এই স্থান শান্তিপুর নামে খ্যাত হয়।

শান্তিপুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত ভেদ হইলেও ইহা সামান্য পল্লী হইতে এক্ষণে নদীয়ার মধ্যে জনসংখ্যা ও বিস্তৃতির পরিমাণে সর্ব্বপ্রধান নগর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা এক্ষণে ৩৮ মৌজায় বিভক্ত। এক এক মৌজার মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন পল্লী সন্নিবিষ্ট। পল্লীর সংখ্যা অনেক ; গোস্বামী পল্লীই তিনটী (বড় গোস্বামী পল্লী, মদনগোপাল গোস্বামী পল্লী ; ও হাটখোলা গোস্বামী পল্লী)। রামনগর প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী অতি বিস্তৃত। বিস্তৃত বেড় পল্লীতে কেবল মুসলমানের বাস। তিলি পল্লীর মধ্যে অধিকাংশ লোকই তিলি। বেজ পল্লী নামক যে পল্লী আছে তথায় কতকগুলি বৈদ্যের বসতি। কাশ্যপ পল্লীর মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণের বাস। দত্ত পল্লীর মধ্যে অনেক গুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোক বাস করেন। শান্তিপুরের কোন কোন পল্লীর নাম বড় অদ্ভুত রকমের, যেমন ডাবরে বা ডাবরিয়া পাড়া। এই পাড়াটী ক্ষুদ্র। পূর্ব্বকালে এখানে ডাবরে উপাধি খ্যাত কতকগুলি অবস্থাপন্ন তন্তুবায়ের বসতি ছিল তাহারা

অত্যন্ত শক্তিশালী ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। এক্ষণে এই পল্লীতে উক্ত উপাধিধারী কতিপয় হীনবস্থার তন্তুবায় বিদ্যমান।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে শ্রীঅদ্বৈতের বাসভূমি বলিয়া শান্তিপুরের খ্যাতি দেশময় পরিব্যাপ্ত হয়। এই কালে দেখা যায় একজন কাজী এখানে থাকিয়া গৌড়ের হুসেন সাহের নামে এই স্থান শাসন করিতেন; পরে মহামতি আকবর বাদসাহের সময় এই শান্তিপুর গ্রাম ইহার পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী সুতরাগড় নিবাসী কোনও খুন্দকার বাদশাহ প্রদত্ত এক ছাড় পত্র দ্বারা খেলায়ত প্রাপ্ত হয়েন। বাদসাহ আকবর প্রদত্ত এই পাঞ্জা অদ্যাপি খুন্দকার বংশধরগণের নিকট বর্ত্তমান আছে; তাহাতে দেখা যায় "দক্ষিণে গঙ্গানদী, উত্তরে নির্ঝর, পূর্ব্বে সুরুগড় (বর্ত্তমান সাড়াগড়) ও পশ্চিমে গোর্কেয়া এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী স্থান তোমাকে দেওয়া গেল।" পরে কিরূপে এই স্থানটি খুন্দকার-গণের অধিকারচ্যুত হইয়া নদীয়াধিপতি গণের অধীন হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না।

নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব কালে এই স্থান বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বলিয়া পরিচিত ছিল। "কলিকাতা অন্ধকূপের" প্রধান নায়ক হলওয়েল সাহেবকে "অন্ধকূপ" হইতে মুক্ত করিয়া নবাবের সৈন্যগণ যখন তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া যায় তখন তাঁহাকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় দ্বিপ্রহরের দারুণ রৌদ্রে নগ্নপদে হাঁটাইয়া এই শান্তিপুরের কোন জমিদারের নিকট লইয়া যায়। এই অজ্ঞাতনামা জমিদার সেই অবস্থায় উক্ত সাহেবকে একখানি অনাবৃত জেলে ডিঙ্গিতে উঠাইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন।[১০]

১৮২৮ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক কমারসিয়াল রেসিডেন্সী এই শান্তিপুরে স্থাপিত ছিল। ১,৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সূক্ষ্মবস্ত্র প্রতি বৎসর এখান হইতে বিলাতে রপ্তানী হইত। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এখানে গভর্ণমেন্ট অনুমোদিত এক সুবৃহৎ মদের ভাঁটি স্থাপিত হয়। লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে এই রেসিডেন্সীর নিমিত্ত এক মর্ম্মর খচিত প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রেসিডেন্সির এই প্রাসাদ মাত্র দুই হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এই রেসিডেন্সিতে বাৎসরিক ৪২,৩৫১ টাকা বেতনে একজন রেসিডেন্ট বাস করিতেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রায়গড়ের কারখানায় ৫০০ লোকের অন্ন সংস্থান হইত। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব ওয়েলেসলী ২ দিন এই রেসিডেন্সীতে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। এই রেসিডেন্সী হইতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ১৪০০ টন চিনি বিলাতে রপ্তানী হইয়াছিল। মার্জ্জরি বুক সাহেব এই রেসিডেন্সীর শেষ রেসিডেন্ট।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাধরপুর, রাণীঘাট, নাদঘাট হেঁড়োর খাল প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি সাহেবী নীলকুঠী ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে "মে," নামে এক সাহেব নদীয়া রিভারের সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিলেন। তিনি শান্তিপুরের নিম্নবাহিনী গঙ্গা হইতে নবগঙ্গার উপরিস্থিত মগরা নামক স্থান পর্য্যন্ত একটী খাল কাটিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎকালে শান্তিপুরের ও তন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গাবক্ষে

অতিশয় দস্যুভীতি ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলে এবং নদীবক্ষে জলপুলিশের বন্দবস্ত হইলে এই উপদ্রব প্রশমিত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হিল, ওয়ায়ডেন, ও ট্রইন নামে তিনজন লণ্ডন মিসনারি সোসাইটীর সাহেব এইখানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করেন। তাঁহারা তদানীন্তন শান্তিপুরের অধিবাসীগণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এখানকার অধিবাসীগণ সরলচিত্ত ও তাহারা সাধারণ বঙ্গবাসী অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত এই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।" তাঁহারা তাৎকালিন শান্তিপুরের জনসংখ্যা ৫০,০০০ ও গৃহের সংখ্যা ২০,০০০ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গৃহের অধিকাংশই প্রাচীন ও ইষ্টক নির্ম্মিত বলিয়াও উল্লিখিত আছে।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার লর্ড বিশপ সাহেবও এখানকার ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে গোস্বামী, দর্জ্জি ও তাঁতির জন্য বিখ্যাত বলিয়াছেন। তিনি শান্তিপুর হইতে দুই মাইল দূরে একটী বৃহৎ চিনির কারখানার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই কারখানায় সেই সময়ে প্রত্যহ ৫০০ মণ চিনি পরিষ্কৃত হইত এবং ৭০০ জন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল লিখিয়াছেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটীর সংস্কারের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট হইতে ২০,০০০ টাকা প্রদত্ত হয়।

পূর্ব্বে এইস্থানে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চা খুবই ছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ সাহেব এখানে, ৩০ ত্রিশখানি টোল দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এখানে সুরার প্রচলন ও তন্ত্রের নামে ব্যভিচারাদি খুবই ছিল ও সতীদাহও বৎসরে কম হইত না। আরও লিখিয়াছেন যে "কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে একজন ৭৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষ আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পুড়িয়া মরিবার অনুমতি চায়, তাহার অছিলা এই যে জীবন তাহার নিকট নিতান্তই ভারবহ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অর্থ দিতে চাহিলেও সে গ্রহণে অস্বীকার করে এবং সেই রজনীতেই পুড়িয়া মরে।"

বিশপ সাহেব ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় দেখিয়াছিলেন। কলিকাতার, বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে পর এই বিদ্যালয়টি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এক্ষণে এখানে মিউনিসিপাল স্কুল, ওরিএন্টাল একাডমি ও নদীয়া মহারাজার হাইস্কুল নামে তিনটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। ইহা ভিন্ন এখানে দুইটি মধ্যইংরাজী, ষোলটী নিম্নপ্রাথমিক ও চারটী নৈশ বিদ্যালয় ও পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। বালিকা বিদ্যালয় কয়েকটির মধ্যে রামনগর বাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয়টি প্রধান।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু মতিলাল মৈত্রের শান্তিপুরে কাব্য প্রকাশ যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনা করেন। বাবু হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের কোকিলদূত কাব্য সেই প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ সান্যাল মহাশয়ের যত্ন ও উৎসাহে আর একটি মুদ্রা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছু দিনের জন্য ভারত ভূমি নামে একখানি

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, মুদ্গর নামে হাস্যরসাত্মক মাসিক পত্র ও বহুরূপী নামক একখানি বঙ্গকাব্য এই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। শ্যামাচরণ বাবুই ঐ তিনিখানির লেখক। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর ব্রহ্মসমাজ হইতে রঙ্গভূমি নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে বিহারী লাল গোস্বামী মহাশয় একাদশখণ্ড সরোজিনী নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৩০৫ সালে শান্তিপুর ব্রহ্মসমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক এবং তাহার সভ্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক কর্তৃক সেবা নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। উহা প্রায় এক বৎসর চলিয়া ছিল শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক বিগত ৩ বৎসর হইতে যুবক নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক কর্তৃক উহা সম্পাদিত হয়।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ জানুয়ারী শান্তিপুরে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। এই মিউনিসিপালিটীর মধ্যে ২০ মাইল পাকারাস্তা ও ৮০ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে ইহার পরিমাণ ফল চারিবর্গ ক্রোশ।

শান্তিপুরে রাঢ়ী বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন বৈদিকের সংখ্যা অতি অল্প। ছয় জন আচার্য্য রাঢ়ি ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আদি পুরুষ; চারি জন রাঢ়ী আচার্য্য হইতে বল্লভী, চৈতল সর্ব্বানন্দী ও নপাড়ীগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দুইজন বারেন্দ্র আচার্য্য হইতে গোস্বামী ও কাশ্যপগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য বারেন্দ্রগণ ইঁহাদের দৌহিত্র :

এখানকার ব্রাহ্মণ সমূহের মধ্যে গোস্বামি বংশ১১ রায়বংশ, চট্টোপাধ্যায় বংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ, ভট্টাচার্য্য বংশ, বহুদিন হইতে প্রধান। কিছুকাল হইতে মুখোপাধ্যায় মৈত্রের বংশও প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামী বংশে কিছুদিন পূর্ব্বে গোরাচাঁদ গোস্বামী, মদন গোপাল গোস্বামী ও নিলমণি গোস্বামী মধুসূদন গোস্বামী ও অদ্বৈত চরণ গোস্বামী ও স্বনাম খ্যাত বিজয়গোপাল গোস্বামী, ৺রাধিকানাথ গোস্বামী পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। পণ্ডিত-৺শ্রীরাম গোস্বামী তাঁহার সময়ের ভাগবতের প্রধান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বহু-পূর্ব্বে রামমোহন গোস্বামী নামে "গোস্বামী ভট্টাচার্য্য" উপাধি খ্যাত জনৈক মহা পণ্ডিত এই মহাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িয়া গোস্বামী বংশে প্রথম পণ্ডিত মাধব চন্দ্র গোস্বামী শেষ পণ্ডিত হরিনারায়ণ গোস্বামী ও রাম গোপাল গোস্বামী ইঁহারা ষড় দর্শনের পণ্ডিত; ইঁহাদের চতুষ্পাঠী ছিল। রায় বংশে উমেশ চন্দ্র রায় (মতি বাবু), চট্টোপাধ্যায় বংশে বর্ত্তমান সময়ে অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সিবিলিয়ানও চারু চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এঞ্জিনিয়ার রামগোপাল বেদান্ত প্রভৃতির মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বহু পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য বংশে চন্দ্রশেখর বাচস্পতি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে রামনাথ তর্করত্ন এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিত। আশানন্দ মুখোপাধ্যায় একজন বীরপুরুষ ছিলেন। ইঁহার দেহে অসুর লাঞ্ছিত বল ছিল বলিয়া খ্যাত আছে। ইনি

একদা অস্ত্রের অভাবে নিকটস্থ একটি ঢেঁকি লইয়া একদল দস্যুকে পরাস্ত করেন বলিয়া ইহাঁর তদবধি ঢেঁকি উপাধি হয়। তন্তুবায়কুলে খাঁ চৌধুরী বংশে রামগোপাল খাঁ চৌধুরী প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ১৬৪৮ শকে প্রসিদ্ধ শ্যামচাঁদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরগাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ দেখা যায়—

"শ্রীমতঃ শ্যাম-চন্দ্র মন্দিরং পূর্ণ-ভাসরত।
বস্থ বেদর্ত্তু শুভ্রাংশু।
সংখ্যয়া গণিতে শকে॥"

এই উপলক্ষে তিনি বিপুল বায়ে দেশ দেশান্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন এবং লক্ষ মুদ্রা নজর দিয়া তদানীন্তন নদীয়াধিপতিকেও সেই সভার শীর্ষ দেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে মাত্র দুইটি বিধবা এই বংশের শেষ চিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। তন্তুবায়কুলে প্রামাণিক বংশও উল্লেখ যোগ্য। তিলিকুলে দুইটি প্রামাণিক বংশ ও ভবানীবংশ প্রধান বলিয়া পরিগণিত কোকিল দূত প্রণেতা ৺হরিমোহন প্রামাণিক ও তৎপুত্র সুবিখ্যাত যশোদানন্দন প্রামাণিক বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। ৺বিনোদ লাল প্রামাণিক গ্রাম্য কবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানাদির মধ্যে জলেশ্বর মন্দির, রাজা রামকৃষ্ণের মাতার ১৭৪০ অব্দে স্থাপিত গোকুল চাঁদের মন্দির, শ্রীঅদ্বৈতের পাট, তোপখানা পাড়ার প্রাচীন মসজিদ যাহা বাদসাহ আরঙ্গজীবের সময় ১১১৫ হিজরীতে ইয়র মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ও রিভার টমসন হল, বন্ধুসভা, স্কন্দকারদের দাতব্য চিকিৎসালয়, গড়ের নব প্রতিষ্ঠিত মানিক দাসের দাতব্য চিকিৎসালয়, গোস্বামীদের নাটমন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির, নেঝোরের খাদ, মিউনিসিপাল আপিষ ও স্কুল গৃহাদি উল্লেখ যোগ্য। উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর মধ্যে, এখানকার জগদ্বিখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র, পিতল কাঁসার সামগ্রী এবং আহার্য্য দ্রব্যাদির মধ্যে, খৈচুর ও নিখুতি বিশেষ প্রসিদ্ধ এতদ্ব্যতীত গড়ে গুড় ও দেশী চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

শান্তিপুরের সন্নিকটবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে ফুলে, বেলগড়ে, গড়, হরিনদী, ব্রহ্মসাশন, হরিপুর, বাগআঁচড়া, মদদই-শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য।

হরিনদী শ্রীচৈতন্য ভগবতে এই গ্রামখানির উল্লেখ আছে; সুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে, প্রাচীন হরিনদী গঙ্গাগর্ভে যাওয়ায় হরিনদীর অধিবাসীগণ হরিনদী ত্যাগ করতঃ হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে উঠিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে যে গ্রামখানি হরিনদী বলিয়া পরিচিত তাহা প্রাচীন হরিনদীর ভাতশালা নামক এক ক্ষুদ্র অংশ। গঙ্গার পার্শ্বে বিস্তৃত চরে যেখানে সাহেবডাঙ্গা, নৃসিংহপুর, বাবলাবন প্রভৃতি গ্রাম বিদ্যমান তাহাই প্রাচীন হরিনদী।

বাগ আচড়া

শ্রীশ্রীবাগদেবী-মাতার স্থান বলিয়া বাগআঁচড়ার খ্যাতি ও পরিচয়। রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক সাধক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধক রঘুনন্দন এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া লোকে এই স্থানটীকে সিদ্ধাশ্রম বলিয়া থাকে। কথিত আছে রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধ মহাত্মার অভিশাপে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় সবংশে নির্ব্বংশ হয়েন। এই চাঁদরায়কে কেহ রুদ্রের দেওয়ান কেহবা বারভুঁইয়ার অন্যতম শ্রীপুরের চাঁদরায় মনে করেন, কিন্তু অন্নদামঙ্গলে ইঁহাকে "প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়"—বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

চাঁদরায় কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি রুদ্রের নির্দ্দেশ ক্রমে নিজ গ্রামের সন্নিকটে ব্রহ্মসাশন গ্রামখানি স্থাপিত করেন। তিনি যে পুর্ণেন্দু চুম্বি শিখর অত্যুচ্চ শিবমন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশেষ এই গ্রামে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্ষুদ্র একটী চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের চারিদিকে চারিটী ভগ্নপ্রায় মন্দির। উত্তর দিকের মন্দিরটী অপর তিনটী অপেক্ষা কিছু ভাল অবস্থায় আছে, কিন্তু চূড়া বা আবরণ কিছুই নাই; কেবল চতুর্দ্দিকে ভিত্তি দণ্ডায়মান। সম্মুখের ভিত্তিতে ইষ্টকে খোদিত নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি; মন্দিরের শীর্ষদেশে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দ্বারের উপর ইষ্টকে খোদিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে।

"শিবঃ।

শাকে বারমতঙ্গবাণ হরিণাঙ্কে নাঙ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশু সুধা সুধাকর কর ক্ষীরোদনীরোপমং।
তস্মৈ সৌধমিদামুদা সুজলদানিলীনলোলধ্বজং
তৎ পাদেরিত ধীর ধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায়ো দদৌ॥"

অর্থাৎ,—অবিরত নিশ্চল বুদ্ধি শ্রীচাঁদরায় ১৫৮৭ শকে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ণচন্দ্রের কিরণ ও ক্ষীরোদ জলতুল্য এবং নিবিড় মেঘ সংলগ্ন চঞ্চল ধ্বজযুক্ত এই মন্দির সেই শিবপদে অর্পণ করিয়াছেন।

বয়রা

এই গ্রামখানি পূর্ব্বে সমৃদ্ধি শালী থাকিলেও এক্ষণে দিন দিন হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে। এখানকার পাল বাবুরা এক সময়ে নদীয়ার অন্যতম অর্থশালী জমিদার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। রামসিংহের সময়ে ইঁহাদের ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে আরম্ভ হয় এই সময়ে ভদ্রেশ্বর, শান্তিপুর, কলিকাতা, পাটনা, দারভাঙ্গা, বাজিতপুর, সমস্তিপুর, প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের মোকাম স্থাপিত হয়। রাম নৃসিংহের পাঁচ পুত্র উমেশ, মধু, বিলাশ, কালী এবং মদন মোহন। ইঁহারাই পালের সহিত "চৌধুরী" শব্দ গ্রহণ করেন। প্রাগুক্ত রাম নৃসিংহের স্মরণার্থে বয়রা হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত প্রায় তিন ক্রোশ বিস্তৃত একটী সেতু সমেত রাস্তা তদীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয় অদ্যাপি উহা নৃসিংহজাঙ্গাল নামে অভিহিত হয়, উহার কতকাংশ শান্তিপুর মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক গৃহিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ উমেশচন্দ্রের বংশাবলীই এক্ষণে তাঁহাদের

বংশের নাম সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র একখানি আদর্শ ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান স্থাপন মানসে একশত আটঘর নিষ্ঠাবন ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মনোনীত করিয়া তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী ভূসম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক চাঁদ রায়ের সাহায্যে এই গ্রামখানি স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণের সুপ্রতিষ্ঠা হেতু গ্রামখানি ব্রহ্মশাসন নামে অভিহিত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্রের সময়ে অত্রস্থ চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি নামে একজন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ৺জগদ্ধাত্রী মাতার মূর্ত্তি প্রচার ও তন্ত্র হইতে পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। তৎপরে নদীয়ার রাজবংশের চেষ্টায় এই পূজা সাধারণে প্রচারিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে চন্দ্রচূড়ের বংশে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিবদাস, তারাদাস ও যুগলদাস নামে তিন কৃতাবিদ্য প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ ব্রহ্মশাসন, কেহবা কালনায় বাস করিতেছেন। সম্প্রতি ব্রহ্মশাসনে ৺জগদ্ধাত্রীর মাতার নামে চন্দ্রচূড়ের স্মৃতি রক্ষার্থ একটি আশ্রম-বাটি নির্ম্মাণের কল্পনা হইতেছে।

ব্রহ্মশাসন

উলা বা বীরনগর

নদীয়া জেলার অন্তর্গত উখড়া পরগণার উলা একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এই গ্রাম জেলার সদর ষ্টেসন নিজ কৃষ্ণনগর হইতে ন্যূনাধিক পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এবং ইহা সবডিভিসান রাণাঘাট হইতে কিঞ্চিদধিক দুই ক্রোশ উত্তরে চূর্ণী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। সহর কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব একান্ন মাইল, পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের মুরসিবাদ লাইনের রাণাঘাট ষ্টেসনের অব্যবহিত পরেই বীরনগর বলিয়া যে ষ্টেসন সংস্থাপিত হইয়াছে উহাই উলার নামান্তর মাত্র। প্রবাদ আছে যে উলুবনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ চরের আবাদ হইয়া গ্রামের পত্তন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম উলা হইয়াছিল। কেহ কেহ পারশী "আউল" অর্থাৎ জ্ঞানী শব্দ হইতে ইহার নাম উলা হইয়াছে বলিয়া থাকেন। এই উলা অতীব প্রাচীন স্থান। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতেও উলার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে ভাগিরথী গঙ্গা এই উলার পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান উলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়া ডাকাতের খাল ও বারমাসে খাল বলিয়া যে অতি প্রাচীন এক গভীর নদীর খাতরূপ নিম্ন জলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে অনুমান করেন উহাই সেই বহুপূর্ব্ব অন্তর্হিত গঙ্গার গর্ভখাত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি ১৪৬৬ শকে স্বপ্রণীত চণ্ডীগ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে যে সময়ে শ্রীমন্ত সদাগর পিতৃ উদ্দেশে সিংহল যাইতে ছিলেন তৎকালে তিনি এই উলার নীচে নিজ জাহাজ নঙ্গর করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে প্রসিদ্ধ উলাইচণ্ডীদেবীর পূজা করিয়া-

ছিলেন।

উলার অপর নাম বীরনগর; কথিত আছে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে অত্রস্থ মুখোপাধ্যায় জমীদার বাবুদের পূর্ব্ব পুরুষ মহাদেব মুখোপাধ্যায় বাটিতে সশস্ত্র একদল দস্যু আসিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলে বাবুদিগের তাৎকালীন গ্রাম্য প্রতিবেশীবর্গ সমবেত হইয়া বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ দস্যুদলের অধিকাংশ দুর্বৃত্তদিগকে হত ও আহত করিয়া ১৮জন ডাকাতকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এই যুদ্ধে ৯জন গ্রামবাসীও বিশেষরূপে আহত হন। তদানীন্তন কলিকাতা কোর্ট অফ্ সারকিটের তৃতীয় জজের বিচারে এই সকল দুর্ব্বৃত্তগণের চিরনির্ব্বাসন দণ্ড হইয়াছিল এবং এই কার্য্যে গ্রামবাসীগণের সাহসের ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ ঐ আদালতের অভিপ্রায়ানুসারে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক গ্রামের নাম উলা হইতে বীরনগর করা হয়।[১২]

তদবধি সরকারি যাবতীয় ব্যাপারে এবং মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে উলা, বীরনগর নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ এই কালেই শান্তিপুরেও দস্যুভিতী হইলে তত্রস্থ অধিবাসীগণ নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে সাহেব তাঁহাদিগের কাপুরুষোচিত ভয় দেখিয়া শান্তিপুরের গাধানগর নাম প্রদান করেন। ইহার উত্তর দিকে বারাসাত, খিসমা প্রভৃতি গ্রাম পূর্ব্ব ও দক্ষিনে বহু পূর্ব্বে প্রবাহিতা ভাগীরথীর সেই অস্পৃষ্ট গর্ভখাত এবং পশ্চিম দিক দিয়া এক্ষণে রাণাঘাট মুরসিদাবাদ নামক রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। এই গ্রামের পরিমাণ ফল দুই বর্গ, মাইল লোক সংখ্যায় পূর্ব্বকালে এই গ্রাম নদীয়া জেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল, তৎকালে ইহাতে প্রায় ৫০ হাজার লোকের বসতি ছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহার লোকসংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের অধিক নহে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বহুদিন ব্যাপী ম্যোলেরিয়া জ্বরের প্রভাবেই ক্রমশঃ গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

এখানে টোলধারি বহুতর গণ্যমান্য পণ্ডিত ছিলেন তন্মধ্যে চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন কৃষ্ণরাম ন্যায় পঞ্চানন, সদাশিব তর্কলঙ্কার, শিবশিব তর্করত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে একদা উলার কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বাটী হইতে স্থানান্তর যাইলে ঐ সময়ে জনৈক ছাত্র একজনকে পরবর্ত্তী একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা পত্র দিয়া বিদায় করেন কিন্তু ঐ পরবর্ত্তি একাদশী যে শুক্র পক্ষে তাহা তাঁহার উদ্বোধ হয় নাই পরন্তু ব্যবস্থা পত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর করিতে গিয়া ভ্রমবশতঃ "শ্রীকৃষ্ণ-রাম সর্ম্মা" এইরূপ দন্ত সকারযুক্ত "শর্ম্মা" পদের ব্যবহার করিয়া ফেলেন। ঘটনাক্রমে ব্যবস্থাপত্র খানি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি নিতান্ত বিস্মিত ও আচার্য্যান্বিত হইয়া উলার কৃষ্ণ রামের নিকট উহার সংশোধন বা সমর্থনের জন্য পুনরায় পাঠাইয়া দেন ও ঐরূপ ব্যবস্থা ও লিখন বৈচিত্রের যথোচিত উত্তর প্রদানের নিমিত্ত তাঁহাকে রাজধানীতে স্বয় উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিয় পাঠান। তখন মহাতেজস্বী তার্কিক প্রবর কৃষ্ণরাম স্বীয় ছাত্রকৃত তথাবিধ অসঙ্গত বর্ণাশুদ্ধি ও অদ্ভুত ব্যবস্থার সমর্থনে কৃতসংকল্প হইয়া পত্র খানিতে "পুনঃ কৃষ্ণরাম শর্ম্মা" এইরূপ দ্বিতীয় স্বাক্ষর করিয়া

রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বকীয় ব্যবস্থাদির পরিপোষণার্থ বিচার করিবার দিনস্থির করিয়া দিয়া মহারাজের গোচরার্থ নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। মহারাজও পরম কৌতুকি হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে অন্যান্য বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে রাজধানীতে উপস্থিত হইবার অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন। কথিত আছে পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণরাম নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সমাগত সুধী মণ্ডলীর সহিত একাদিক্রমে সপ্তাহ পর্য্যান্ত বিচারপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলকে কূট তর্কে পরাস্ত করিয়া তথা কথিত স্বকীয় ব্যবস্থা ও লিখনের সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং মহারাজাও তদীয় এই অদ্ভুত বিচার ক্ষমতার পরিতুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে একটী পতকা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ পতকায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামাঙ্কিত নিম্নলিখিত কবিতাংশ লিখিত ছিল।

যথা,—"উলায়াং কৃষ্ণরামস্য পতাকেনং বিরাজতে" ইত্যাদি।

রামকৃষ্ণ স্বীয় বাটীতে অতি উচ্চস্থানে ঐ পতাকা স্থাপন করিয়া স্বকীয় গৌরবচিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভবানিচরণ ন্যায়ভূষণ, মুকুন্দমোহন ন্যায়রত্ন, গঙ্গাভক্তি-রঙ্গিনী প্রণেতা কবিবর দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের রাজসভা হাস্য রসিক সুবিখ্যাত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই উলাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই উলা গ্রাম আজ একেবারেই পণ্ডিত শূন্য হইয়াছে। পুরুষের তো কথাই নাই তখন এখানকার স্ত্রীলোকেরাও বিদুষী ছিলেন সারণ সিদ্ধান্তের দুইটি কন্যা বিশেষরূপে সংস্কৃতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন[১৩] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে যে কয়টী সমাজ সবিশেষ সম্মানিত এবং সমাদৃত ছিল এই উলা সমাজ তন্মধ্য অন্যতম বলিয়া গণ্য। তৎকালে ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের ন্যূনাধিক পঁচিশ শত ঘর রাঢ়ীর শ্রেণীর অতি সম্ভ্রান্ত কুলীন সন্তান এই উলাতে বাস করিতেন। তাঁহাদের অধিকাংশই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সবিশেষ সম্মানিত এবং সমাদৃত ছিলেন। কথিত আছে মহারাজ প্রায় প্রতি বর্ষেই এই স্থানে সমাগত হইয়া স্বীয় দীর্ঘিকাস্থ জলটুঙ্গিতে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবানকে পদ্মপুষ্প প্রদান করিতেন এবং তদুপলক্ষে সমাজস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া পরম সমাদর প্রদর্শন করিতেন। ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের এত অধিক সংখ্যক স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীন তৎকালে আর কুত্রাপি দেখা যাইত না। ইহাদের সকলেই সম্ভ্রান্ত এবং অধিকাংশই সবিশেষ অবস্থাপন্ন তন্মধ্যে চট্টোপাধ্যায় বংশ, ফুলিয়ার মুখোপাধ্যায় পাড়ার কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় বংশ সমধিক বিখ্যাত ও কৌলিন্য গৌরবে গরীয়ান ছিলেন।

ব্রাহ্মণ বংশে উলার ফুলিয়া কুলোদ্ভব সুপ্রসিদ্ধ বামন দাস মুখোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ। তদীয় পিতামহ মুখুজ্জে কুলোদ্ভব মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই উলা গ্রামের মাঝের পাড়ায় এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে একদা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ বিড়ম্বনায় একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া একটি মাত্র আধুলি সম্বল লইয়া তিনি বাটী হইতে বহির্গত হয়েন এবং বহু কষ্টে গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে করিতে অনেক দিনে রংপুরে গিয়া উপস্থিত হয়েন। তথায় কোন নীল কুঠিয়াল সাহেব তাঁহার দুরাবস্থার পরিচয়ে কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে আপন কুঠিতে জনৈক

মুখোপাধ্যায় বংশ

কর্ম্মচারি নিযুক্ত করেন ক্রমে মহাদেব স্বীয় অদম্য উৎসাহ অপরিসীম অধ্যবসায় অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং জমিদারী প্রভৃতি খরিদ করেন; রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পাল চৌধুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা কৃষ্ণপান্তি মহোদয় তাঁহার জমীদারী ক্রয়ে মুক্তহস্তে সহায়তা করিয়া ছিলেন। ক্রমে মহাদেব ফরিদপুর, ঢাকা, মৈমনসিং, রংপুর প্রভৃতি জেলার জমিদারী খরিদ করিয়া একজন প্রসিদ্ধ জমিদার হইয়া উঠেন। এই সময়ে তাঁহার জমিদারীর আয় প্রচুর হইয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং অতি সুধার্ম্মিক নিষ্ঠবান হিন্দু ছিলেন সুতরাং ঐরূপ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া দান ধ্যান ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তদনুসারে বাটীতে স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা প্রভৃতি যাবতীয় বার্ষিক ক্রিয়াকলাপের সংস্থাপন করিলেন, ১২৮১ সালে বামনদাস স্বর্গলাভ করেন।

রাধানাথ মুখোপাধ্যায় নামে মহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপর এক সহোদর ছিলেন মহাদেব স্বেচ্ছাক্রমে ইহাকে স্বোপার্জ্জিত জমিদারীর কিয়দংশ পৃথক করিয়া দিয়া যান; এই রাধানাথই উলার খ্যাতনামা জমিদার শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ। শম্ভুনাথ পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যথারীতি হিন্দুআচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন বামন দাসের মধ্যম ভ্রাতা গৌরি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এই বংশে উপস্থিত শ্রীগিরীন্দ্র নাথ, হরেন্দ্র নাথ, মণীন্দ্র নাথ, আশুতোষ, নগেন্দ্র নাথ, নীলমণি বাবু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে বহু কায়স্থের বাস ছিল তাঁহাদের অধিকাংশই ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত কুলীনবংশ সম্ভুত এবং বিদ্যা, বিত্ত, বৈভব সম্পন্ন ভদ্র সন্তান; তাঁহাদের ক্রিয়া কর্ম্ম আচার ব্যবহার মন্দ ছিল না।

মিত্র কুলোদ্ভব প্রাচীন প্রসিদ্ধ মুস্তফী মহাশয়েরাই উলার আদি সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমীদার। কথিত আছে এই বংশীয় কোন কৃতী পুরুষ রামেশ্বর মিত্র, নবাব মুরশীর কুলীর সময়ে নবাব সরকারে কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরূঢ় হইয়া "মুস্তফী" খেতাব গ্রহণপূর্ব্বক বহু ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া চাকরী পরিত্যাগপূর্ব্বক বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, ক্রমে স্বদেশে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পরিণামে প্রসিদ্ধ জমিদার রূপে পরিণত হন। এই রামেশ্বরের দশ পুত্রের মধ্যে রঘুনন্দন, অনন্তরাম, শিবরাম এবং মুকুন্দরাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে আবার রঘুনন্দন ও অনন্তরাম ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক হইয়া যথাক্রমে হুগলী জেলার শ্রীপুর ও সুকড়িয়া গ্রামে বাস করেন, অন্যান্য ভ্রাতার বংশাবলী উলাতেই বাস করিতেছেন। নানা কারণে এক্ষণে ইহাদের অবস্থা হানী ঘটিয়াছে।

মুস্তফী বংশ

নবশায়ক সম্প্রদায় মধ্যে উলার তিলি বংশোদ্ভব খাঁ বাবুরাই সমধিক প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে এই বংশের আদি পুরুষ মুর্শিদাবাদে মুদির দোকান করিতেন

খাঁ বংশ

ক্রমে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক নবাব সরকারের মুদি হইয়া উঠেন এবং স্নপারির কারবারে প্রবৃত্ত হয়েন এই স্নপারির কারবারই ইহাদের অভ্যুদয়ের হেতু। অদ্যাপিও কলিকাতায় বড়বাজার এবং নিম্ন বঙ্গের আরও অনেকানেক স্থানেই ইহাঁদিগের স্নপারির আড়ত বিদ্যমান আছে এবং বর্ষে বর্ষে ঐ সকল আড়ত হইতে বিস্তর টাকা লাভ হইয়া থাকে। একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বার্ষিক খাজনার জন্য নবাব সরকারে আবদ্ধ হয়েন সেই সময়ে উক্ত মুদী মহারাজের সেবা শুশ্রুসা ও সাহায্য করায় মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে কিছু দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন কিন্তু তিনি তৎকালে উহা না লইয়া আবশ্যক মতে লইবেন এই আবেদন করিলে মহারাজ তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন পরে ঐ বংশীয় নীলাম্বর কুণ্ডু আপন মাতৃদায় উপস্থিত হইলে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে মহারাজের নিকট সেই প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারের পালন জন্য প্রার্থনা জানাইয়া কহিলেন "মহারাজ আমি এই প্রার্থনা করি যে এখন হইতে আপনকার সমগ্র উলা সমাজ আমার বাটীতে পদার্পণ" করুন. তদনুসারে মহারাজ উহাদিগকে খাঁ এই উপাধি দানপূর্ব্বক উলা সমাজ পাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তদবধি আজ পর্যান্ত উহারা সেই রাজ প্রদত্ত খাঁ উপাধিতে সম্মানিত ও উলার সমাজের গ্রহণীয় বলিয়া চলিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগের অবস্থা খুব ভাল। এই বংশীয় রাজকৃষ্ণ খাঁ ও সর্ব্বচন্দ্র খাঁ বিশেষ ধন প্রতিপত্তির অধিপতি হইয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের বর্ত্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে বাবু জগন্নাথ খাঁ, আশুতোষ খাঁ, সুরেন্দ্র নাথ খাঁ, সুজন খাঁ, যতীন্দ্র নাথ খাঁ প্রভৃতি বাবুদের নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য বংশের মধ্যে মিত্র বংশও উল্লেখযোগ্য এই বংশের বর্ত্তমান কালে ৺চন্দ্রকুমার মিত্রের পুত্র বঙ্গভাষায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য, নরসিংহ, কলিনা, পার্ব্বতি প্রভৃতি লেখক শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র বি, এল মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভাষায় অন্যতম প্রাচীন লেখক শ্রীচন্দ্রশেখর বসুও উলাবাসী।

উলার লোক সাধারণতঃ হাস্যরসিক, এবং খামখেয়ালী সে কারণে এতদ অঞ্চলে উলানিবাসীগণ "উলুই পাগল" নামে খ্যাত, এসম্বন্ধে এ প্রদেশে একটী প্রবচনও প্রচলিত আছে যথা "উলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর ও হালিসহরে তেঁদর"[১৪] উলার লোক এক দিকে যেমন হাস্যরসিক ছিলেন তেমনি অপর দিকে ভোজন বিলাসীও খুব ছিলেন; মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, ঈশে পাগলা প্রভৃতির নাম যেমন রসিক বলিয়া খ্যাতি তেমনি অনেকের 'খোরাকে" বলিয়া খ্যাতি ছিল, এদলের প্রধান ছিলেন রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় ইনি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে আহার করিতেন এ কারণে তাঁহার খ্যাতি ছিল "মুনকে রোঘো"। তিনি আপনার এই অসাধারণ গুণে বহু রাজা ও জমীদারের প্রিয় ছিলেন, এবং তাঁহাদের দত্ত মাসহারাতেই তাঁহার সংসার চলিত।

উলার মধ্য দিয়া যে প্রসস্ত রাজবর্ত্মটী কৃষ্ণনগর অভিমুখে গিয়াছে তাহা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে উলার মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের উদ্যোগে সাধারণের অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল।[১৫]

উলায় প্রস্তুত সামগ্রীর মধ্যে উলার বাসনের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধি থাকিলেও এখন তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে উলার মুণ্ডি, মনোহরা, বীরখণ্ডী ও সুয়াতেলা সন্দেশ আজিও প্রসিদ্ধ। আজ যে কোনও দেবী প্রতিমা সাজাইতে দেশ দেশান্তরে যে "ডাকের-সাজের" প্রচলন হইয়াছে তাহার প্রথম আবিষ্কার এই উলাগ্রামেই হইয়াছিল। প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে উলার সন্নিকটবর্ত্তি পালিত পাড়া নামক স্থানে কানাইলাল আচার্য্য ও নীলমনি আচার্য্য নামে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম এইরূপ সমাজের সৃষ্টি করেন; উলার মহামারীতে বিপর্য্যস্ত হইয়া তদীয় বংশধরগণ শান্তিপুরের সন্নিধ্য হরিপুরে উঠিয়া আসেন তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি এখানে থাকিয়া প্রাচীন রীত্যানুসারে কাশিমবাজার রাজবাটী প্রভৃতি বহুস্থানে ডাকের সাজ সরবরাহ করিয়া থাকেন।

উলা কিছুকাল চৌকী হাঁসখালির অধীন হইয়াছিল এবং হাঁসখালীর মুনস্ফী আদালত এই উলাতেই হইত, মহামারীর সময়েই উহা উলা হইতে রাণাঘাটে স্থানান্তরিত হয়, কিছুদিন রানাঘাটে ঐ আদালত থাকিয়া শান্তিপুরে উঠিয়া আসিয়াছে।

উলার নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির মধ্যে পাহাড়পুর, খিসমা, মামজোয়ান, আড়বন্দী বাদকুল্লা প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখ যোগ্য।

পাহাড়পুরের, মুখোপাধ্যায় বংশ প্রসিদ্ধ। ৺কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এই বংশের উপায়ক্ষম ক্রিয়াবান পুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তৎপুত্র ৺বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় M. A. B. L. একজন সাহিত্যোৎসাহী বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তল্লিখিত National Life নামক কবিতাটী অতুলনীয়। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার একজন; পিতার ন্যায় সদাশয় ও উদ্যোগী পুরুষ।

পাহাড়পুর

বৈদ্য প্রধান গ্রাম এতদঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় ও তদপুত্র ৺তারিণীচরণ ও ৺শ্রীচরণ রায় ধন্বন্তরী কল্প সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাত, ৺তারিণীচরণের পুত্র ৺নীলমাধব রায়ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে কলিকাতায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ পুর

অত্রস্থ সিংহবংশ বিখ্যাত, রায় বাহাদুর ৺গোকুলচন্দ্র সিংহ এই বংশের। নবাবী আমলে নদীয়ার একটী প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ সরকার এই স্থানে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন।

খিসমা

গ্রামখানি নদীয়ার একখানি প্রাচীন গ্রাম। নবদ্বিপাধিপতি রাজা রাঘব রায় ১০৬৭ শকের ১১ই ফাল্গুন এক সনন্দ পত্র দ্বারা অত্র গ্রামস্থিত এক হাজার বিঘা জমি সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিম্নতর পঞ্চম পুরুষ পরম পণ্ডিত গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্যকে ব্রহ্মোত্তর দান করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের অত্রস্থ বংশধরগণের মধ্যে বারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

আড়বন্দী

রাণাঘাট

রাণাঘাট নদীয়া জেলার একটী প্রাচীন গ্রাম না হইলেও, ইহা অনেকের নিকট সুপরিচিত। উত্তরে জিয়ানগর, মধ্যে রাণাঘাট ও দক্ষিণে নাসড়া এই তিনখানি গ্রাম লইয়া বর্ত্তমান রাণাঘাট গঠিত। কোন প্রাচীন পুস্তকে বা মানচিত্রে এই স্থানের নাম দৃষ্ট হয় না। জেমস্ রেনলসের ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাঙ্গালার মানচিত্রে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে এই স্থানের নাম দেওয়া আছে। সম্ভবতঃ ইহারি কিছুকাল পূর্ব্বে রাণাঘাট গ্রামে পরিণত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্যরূপ সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় মানচিত্রে স্থান প্রাপ্ত হয়। যখন মানচিত্রে, রাণাঘাট এইরূপ ক্ষুদ্রাকারে মুদ্রিত তখন কৃষ্ণনগর, পলাশী, অগ্রদ্বীপ, শিবনিবাস, নদীয়া শান্তিপুর, শ্রীনগর প্রভৃতি স্থান সমূহ বৃহৎ অক্ষরে বিশদভাবে মুদ্রিত। এই মানচিত্রে কৃষ্ণনগর ও শিবনিবাস উচ্চ মন্দির দ্বারা ও পলাসী আম্রকুঞ্জ দ্বারা চিহ্নিত এবং অগ্রদ্বীপ ও নদীয়া কৃষ্ণনগরের পারে অর্থাৎ গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, দেখান হইয়াছে।

অনেকে বলেন ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা রঘুরামের রাজত্বকালে এই স্থানে রণা নামে একজন বিখ্যাত দস্যুর ঘাটী বা আড্ডা ছিল তাই রাণাঘাটী হইতে রাণাঘাট নামের উৎপত্তি হইয়াছে। রাণাঘাটের অবস্থান বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা পূর্ব্বে যে একটী নদীবেষ্টিত দস্যুবাসোপযোগী স্থান ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হয় কারণ এই স্থানটী পূর্ব্বে প্রায় চতুর্দ্দিকে নদীবেষ্টিত ছিল। উত্তরে বাচকো নদী ও দক্ষিণ ও পূর্ব্বের কিয়দংশ হাঙ্গর নামা নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখন এই দুইটী নদী খাদ মাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও পূর্ব্বে ইহারা খরস্রোতা নদী ছিল; পশ্চিমে চূর্ণী আজিও বহতা। শুনা যায়, দস্যু রণার কালী-প্রতিমা অধুনা রাণাঘাটের মধ্যস্থল-বর্ত্তিণী সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী গ্রাম্যপ্রতিমা।

অনেকের মতে রাণাঘাটের নাম পূর্ব্বে যাহাই থাকুক, ইহা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই তাঁহার কনিষ্ঠা রাণীর নামেই রাণীঘাট নামে অভিহিত হয়। রাজা রঘুরামের রাজত্বকালে রাণাঘাটের উৎপত্তি কল্পনা করিলেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ বয়সে ইহা রাণাঘাটবাসী কৃষ্ণপান্তির জন্য খ্যাতিপন্ন হয়।

কৃষ্ণপান্তী ১১৫৬ সালে রাণাঘাটে এক দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পালচৌধুরী বংশ

তাঁহার পিতা সহস্ররাম পান্তী কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র; প্রথম কৃষ্ণ চন্দ্র, দ্বিতীয় শম্ভূ চন্দ্র ও তৃতীয় নিধিরাম। কৃষ্ণ ও শম্ভূ বাল্যকাল হইতে বিশেষ চতুর ছিলেন ও নিধিরাম মহাব্যাধিগ্রস্থ বিধায় সর্ব্বকার্য্যেই অপটু ছিলেন। কথিত আছে সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে কেবল মাত্র একটী আধুলী সম্বল করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন এবং

আপনার অধ্যবসায় বলে, লক্ষ্মীর কৃপায় বহুবিত্ত উপার্জ্জন করতঃ বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ ধনীপদবাচ্য হয়েন। এই ব্যবসায়ের আয় হইতে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র এই সময়ে জমীদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন, সাঁতোর পরগণা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম জমিদারী। এই সময়ে নদীয়ারাজ শিবচন্দ্র, কৃষ্ণ পান্তীকে চৌধুরী উপাধী দিয়া সম্মানিত করেন এবং ইহার অব্যবহিত কালপরে যখন মারকুইস হেষ্টিংশ সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনে সফরে বাহির হইয়া রাণাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং কৃষ্ণ পান্তীর অগণিত অশ্ব বাজী, প্রাসাদোপম সৌধশ্রেণী, বিরাট ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি দিতে অগ্রসর হয়েন; তখন কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা গুণে, বিনয়ের সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং নদীয়াধিপতি দত্ত "চৌধুরী" উপাধী তিনি ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের অনুমোদিত করিয়া লয়েন। মার্ক্‌ইস হেষ্টিংস তাঁহার এইরূপ সরল ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত আশাসোটা ব্যবহারে অনুমতি দেন।

কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয় তাঁহার জীবনে যে সমস্ত দানাদি ও সৎকার্য্য করিয়াছেন তাহার মধ্যে মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে লক্ষ মন চাউল দান, উলার (বীরনগর) মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের জমিদারী ক্রয়ে মুক্তহস্তে সাহায্য, মহাপ্রভুর পুষ্করিণী প্রভৃতি কতিপয় সুবৃহৎ পুষ্করণী খনন, রাণাঘাট হইতে জগপুরে গঙ্গাস্নানে যাইবার সুদীর্ঘ পথ প্রভৃতি কার্য্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণ, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার প্ররোচনায়, মৃত্যুর পূর্ব্বে, তাঁহার যাবতীয় বিষয় এইরূপ বণ্টন করিয়া যান;—তিনি ও তাঁহার মধ্যম শম্ভুচন্দ্র সমগ্র বিষয় তুলারূপে, এবং মহা ব্যাধিগ্রস্ত কার্য্যাক্ষম কনিষ্ঠ নিধিরাম, মাত্র দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি, ও নগদ ৪ লক্ষ টাকা। এই অসদৃশ ভাগই কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর পালচৌধুরী এষ্টেটের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। নিধিরামের পুত্র বৈদ্যনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রাগুক্ত অসদৃশ বণ্টন আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সুপ্রীম কোর্টে যে সর্ব্বধ্বংশী মকদ্দমা উত্থাপিত করেন এবং যাহা ১৮২১খ্রীঃ হইতে ১৮৫০খ্রীঃ মধ্যে চারিবার বিপুল অর্থব্যয়ে বিলাতে প্রিভিকাউন্সীলে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরিত হয়, তাহাতেই পালচৌধুরী ষ্টেটের অবস্থা হীন হইয়া পড়ে, এবং মকর্দ্দমার খরচ কুলাইতে পালচৌধুরীদিগের সোনার জমীদারী সাঁতোর বিক্রয় হইয়া যায়।

এই দুর্দ্দিনে পালচৌধুরী এষ্টেট রক্ষা করিতে, শম্ভুর বংশে পরম মেধাবী জয়গোপাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষয়ের সুচারু বন্দোবস্ত করিতে না করিতে নিদারুণ কাল তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লয়। মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ১২৫৬ সালে একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, অত্রস্থ মল্লিক বংশীয় কালীকুমার, মহেন্দ্রকুমার ও রাজেন্দ্রকুমার মল্লিক মহাশয়ত্রয় তাঁহার তিন দৌহিত্র। জয়গোপাল মৃত্যুর পর তদীয় উপযুক্ত সহোদর পালচৌধুরীগণের পরিত্রাতা শ্রীগোপাল তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া, পালচৌধুরী ষ্টেট পুনঃ সংস্কারে ও পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। শ্রীগোপাল, স্বীয়

অলৌকিক রূপে ও গুণে কি দেশীয় কি ইউরোপীয় সকলেরই নিকট বিশেষ সম্মানিত হয়েন। এদিকে তিনি যেমন নিজের বংশের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তেমনি আবার সাধারণের হিতকর কার্য্যেও তাহার সবিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত। রাণাঘাটের মিউনিসিপালীটি, রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর কলেজগৃহ নির্ম্মাণে মুক্তহস্তে সাহায্য, তাঁহার উদার ও মহৎ হৃদয়ের সাক্ষ্য দিতেছে। ১২৭৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশের গৌরব, প্রাতঃস্মরণীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হয়েন এবং আপনার উদার মহৎ হৃদয় ও দেব চরিত্রগুণে জনসাধারণের প্রীতিভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হয়েন। রাণাঘাট মহকুমাবাসী জনসাধারণ ও তাঁহার মর্য্যাদাপন্ন বন্ধু বান্ধবগণ তাঁহার সন ১৩০২ সালে মৃত্যুর পর একটি সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া Surendra Memorial Hall নামে উহা তাঁহার স্মৃতিতে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অকপট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সুরেন্দ্রনাথের সাধের জমিদারী পঞ্চায়ৎ গৃহে কলিকাতায় এবং রাণাঘাট স্কুলে যথাক্রমে তাঁহার তৈলচিত্র ও মর্ম্মর স্মারকলিপি স্থাপিত হইয়াছে।

উপরোক্ত মহানুভব ব্যক্তিগণ ব্যতীত পালচৌধুরী বংশে যে সকল মাহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শম্ভুর পৌত্র বাবু জয়চাঁদ পালচৌধুরী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রজাহিতৈষী বঙ্গেশ্বর গ্রাণ্ট মহোদয় নীল কমিসনে ইঁহারাই সাক্ষ্যের প্রতি বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন, কথিত আছে ইঁহার ন্যায় উন্নতহৃদয় "বাবু" তদানীন্তন কালে সমগ্র বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। ইহার সুনামের সহিত পরম অত্যাচারী জমিদার বলিয়াও অখ্যাতি ছিল। তখন এতাদঞ্চলে লোকে অপরকে গালি দিতে হইলে, "তোকে জয়চাঁদে পাক" বলিয়া গালি দিত।

এই বংশে কৃষ্ণ চন্দ্রের পুত্র বাবু ঈশ্বর চন্দ্রের পৌত্র দ্বারিকানাথ ও প্রপৌত্র মন্মথ নাথের নাম ও উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ পালচৌধুরী মামলার ঈশ্বরচন্দ্রই প্রধান উদ্যোগী। নিধিরামের পুত্র বৈদ্যনাথকে দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রই সর্ব্বধ্বংশী মকর্দ্দমার সূত্রপাত করিয়া যান, ইহাই রাণাঘাটে "বৈদ্যনাথী হাঙ্গামা" বলিয়া খ্যাত। ইঁহার কীর্ত্তির মধ্যে কয়েক বৎসর ধরিয়া লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বাৎসরিক রথযাত্রা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে এই উপলক্ষে ৺পুরুষোত্তমের রথের লোক সমাগম হ্রাস হইয়া এই স্থানের রথে সেই মত লোক সমাবেশ হইয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র কেশবচন্দ্র ও তৎপুত্র হেমচন্দ্র ও বিশ্বেশ্বর পাল চৌধুরীর নামও উল্লেখযোগ্য, বিশ্বেশ্বর একজন তান্ত্রিক শক্তিসাধক বলিয়া বিখ্যাত এ বংশের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে কৃষ্ণের বংশে বাবু ব্রজনাথ ও বাবু সর্ব্বেশ্বর ও হাইকোর্টের উকিল বাবু তারকেশ্বর পালচৌধুরী এবং শম্ভুর বংশে বাবু নগেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র, যতীশচন্দ্র ও হরেন্দ্রনাথ, হেকচন্দ্র ও সাধু বিপ্রেন্দ্র নাথ পালচৌধুরী নাম উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার বংশের ও রাণাঘাটের বর্ত্তমান পরিচয় স্থল। তিনি সম্প্রতি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন রাণাঘাটবাসীগণের নিকট মান্য

তেমনি গবর্মেন্টেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অসাধারণ। ইহার পুত্র অমরেন্দ্রনাথও একজন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। যোগেশচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে নিত্য শত শত রোগীকে ঔষধ দিয়া রাণাঘাট সবডিভিসনবাসী ব্যক্তিগণের নিকট পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছেন। সতীশচন্দ্র হাইকোর্টের একজন এটর্ণি, হরেন্দ্রনাথ রাণাঘাটের একজন জনপ্রিয় জমীদার।

এই সুপ্রসিদ্ধ পাল চৌধুরীগণের আশ্রয়ে থাকিয়া কত যে গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে উদাহরণের স্থলে কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চতুষ্পাঠীধারীগণের মধ্যে জয়রাম পঞ্চানন, দেব চূড়ামণি, রামকমল শিরোমণি, মধুসূদন ন্যায়রত্ন, পরাণচন্দ্র তর্ক সিদ্ধান্ত, ঈশানচন্দ্র তর্করত্ন, তিলক তর্কালঙ্কার, প্রভৃতি ; বৈদ্যগণের মধ্যে হরচন্দ্র সেন, দয়ালচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র রায়, তারিণীচরণ রায়, গিরীশ চন্দ্র রায়, যোগীন্দ্র চন্দ্র সেন ; গায়ক ও বাদক শ্রেণীর মধ্যে লালা কুন্দন, যদুনাথ ভট্ট, ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ খাঁ, গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেতারী বামাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ; হাস্যরসিক ও কবি ছাতু রায়, শত্রুঘ্ন কুণ্ডু ওরফে স্থতামেটে, কবি জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ও কবি কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে কাশী মাষ্টার (যিনি বাবু জয়গোপাল পালচৌধুরী লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে যে যাত্রাদল গঠন করিয়াছিলেন তাহার জন্য "মধুমালতী" নামে সুন্দর পালা রচনা করিয়াছিলেন) এবং সিদ্ধপুরুষ বিশে পাগলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দে চৌধুরী বংশ

একদিকে পালচৌধুরী বংশ লইয়াই যেমন রাণাঘাট অপরদিকে তেমনি দে চৌধুরী বংশের নামোল্লেখ না করিলে রাণাঘাটের ইতিহাস অসমাপ্ত রহিয়া যায়, কেন না পালচৌধুরী ও দে চৌধুরী লইয়াই রাণাঘাটের ইতিহাস গঠিত। যে সময়ে কৃষ্ণপান্তী ব্যবসা দ্বারা উন্নতিলাভ করেন, তাহারই সমকালে দে-চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ রামসুখ দে-চৌধুরী মহাশয়ও ব্যবসায় দ্বারা নিজের আর্থিক উন্নতিসাধন করেন। বর্ত্তমান কালে রাণাঘাটের বড়বাজারে যেখানে ৺মদনমোহন বিগ্রহের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত কথিত আছে সেই স্থানেই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম দোকান স্থাপিত ছিল, পরে ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত মালদহ, হাটখোলা প্রভৃতি অঞ্চলে গদী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বিস্তীর্ণভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই মালদহের গদী হইতেই তাঁহাদের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং ক্রমে সেই আয় হইতে জমীদারি ক্রয় করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব বসতবাটী নদীকূলে স্থাপিত ছিল, পরে নদীর ভাঙ্গনে বাটী ভগ্ন হইলে এবং আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইলে তাঁহারা ১১৯৮ সালে তাঁহাদের বর্ত্তমান আবাস বাটী নির্ম্মাণ করেন।

এই বংশের স্থাপয়িতা রামসুখ যে কেবল মেধাবান শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তাহা নহে ; তিনি সাতিশয় ধর্ম্মশীল ছিলেন। ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণতুল্য ছিল। তিনি যে "বার মাসে তের পার্ব্বণ" ও অতিথি সেবারূপ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি তাহা সাধ্যমত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। বৎসরে অন্যূন

৬০০০ হাজার লোক অজিও তাঁহাদের দ্বারে অন্নের জন্য উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদের ভক্তি শ্রদ্ধাদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া প্রীত হয়।

এই অতিথিসেবী বংশে রামসুখ ও যে সকল উপযুক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের গৌরব উজ্জ্বলতর করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দাতারাম, লক্ষ্মীকান্ত, বৈকুণ্ঠনাথ প্রমুখ রামসুখের ছয় পুত্র ব্যতীত শ্রীনাথ, রাধাময়, রামলাল দেচৌধুরী মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীনাথ, সত্যনিষ্ঠ্য ও ধার্ম্মিক ছিলেন; রাধাময়, ক্রিয়াশীল ও পণ্ডিতানুরাগী ছিলেন; তাঁহার প্রণীত মুদ্রিত "নবোপাখ্যান" নামক সমাজিক নক্সায় তাঁহার নাম জাগরুক রহিয়াছে।

বাবু রামলাল ক্রিয়াবান ও সাতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। ইনি একদিকে যেমন বিনয়ী নম্রস্বভাব এবং বিজ্ঞ তেমনি অপর দিকে সজ্জন সেবী, সুধী ও আদর্শ জমীদার বলিয়া খ্যাত। তৎকালে "বাবু" বলিলে রাণাঘাটে তাঁহাকেই বুঝাইত। তিনি ১২৭৪ সালে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে একমাত্র দুহিতা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। অত্রস্থ মল্লিক বংশীয় শ্রীকুমুদ নাথ ও নৃপেন্দ্র নাথ মল্লিক ভ্রাতাদ্বয় তাঁহার দুই দৌহিত্র।

বর্ত্তমান কালে এই বংশের উল্লেখযোগ্য বংশধর বাবু পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র আপনাদের বিমল চরিত্র গুণে সকলের প্রিয়, বাবু পূর্ণচন্দ্র রাণাঘাটের যাবতীয় সাধারণ লোক হিতকর কার্য্যের একজন প্রধান উদ্যোগী। ইনি একদিকে যেমন বিনয়ী, তেমনি অপর দিকে সাহিত্যানুরাগী সুধী বলিয়া পরিচিত।

এই বংশ নদীয়ার অন্যতম প্রাচীনতম ও সম্ভ্রান্ত বংশ, ইহাদের আদি নিবাস মাটিয়ারী—যথায় নদীয়া রাজবংশের সংস্থাপক ভবানন্দ মজুমদার, বাদসাহ আকবর প্রদত্ত ফারমানে নদীয়া রাজত্ব খেলায়েৎ প্রাপ্ত হইয়া বাগোয়ান হইতে আসিয়া আপনার রাজধানী স্থাপনা করেন। সর্ব্বধ্বংশী কালের প্রভাবে এই মাটিয়ারী এখন বনাকীর্ণ। ভবানন্দ মজুমদার কর্ত্তৃক এই মাটিয়ারীতে রাজধানী স্থাপনের পূর্ব্বেও মল্লিকগণ এখানে বেশ মান সম্ভ্রমের সহিত বাস করিয়া আসিতেছিলেন এবং অর্থবল অপেক্ষা বিদ্যাবলে তাঁহারা জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। "মল্লিক," এই বংশের বর্ত্তমান উপাধি হইলেও, "পাল" ইঁহাদের আদি খ্যাতি। অদ্যাপি বিবাহাদি বৈদিক কার্য্য কালে নামের শেষে "পাল দাসস্য" খ্যাতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই বংশের গৌরবশালী বংশধর শ্রীনারায়ণ, আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে মহামান্য দিল্লী দরবার হইতে মল্লিক এই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তদবধি এই বংশীয়েরা বাদশাহ দত্ত এই সম্মানকে গৌরবাত্মক মনে করিয়া আপনাদের উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ভবানন্দ মজুমদারের তিন পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। এই তিন জনের মধ্যে মধ্যম গোপাল নিতান্ত পিতৃ অনুগত, বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ বিধায় ভবানন্দ অপর পুত্রদ্বয়ের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া গোপালকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়া যান। একারণে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ পিতার সহিত বিবাদ করিয়া এক বিশ্বস্ত, কার্য্যদক্ষ, বহু ভাষাবিৎ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে

মল্লিক বংশ

দিল্লী গমন করেন ও তথায় আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে ও উক্ত কর্ম্মচারীর লিপি কুশলতায় বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া পরগণা উখড়া প্রভৃতির উপর চিরস্থায়ী দখলের ফারমান লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত রাজকর্ম্মচারীর লিপি কুশলতার পুরস্কার স্বরূপ বাদসাহ তাঁহাকে "মল্লিক" বা "সুলেখক" আখ্যা প্রদান করেন। বাদসাহ দত্ত সম্মান ও ভূম্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি কনিষ্ঠ গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাঘব পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া মাটীয়ারী হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন; এই রেউই বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হইলেও কার্য্যদক্ষ বিধায় রাজা গোপাল নারায়ণকে রাজকার্য্য হইতে অবসর দেন নাই, এই সময় হইতেই নদীয়া-রাজবংশের সহিত মল্লিক বংশের একটী যেন স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তী কালে মাটীয়ারী হইতে কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে রাজাগণের সহিত মল্লিকগণও তাঁহাদের বাসস্থান উঠাইয়া রেউইতে আসিয়া নূতন বসতবাটী নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে মল্লিকগণের আত্মীয় স্বজন ও অনুগত জন এত অধিক ছিল যে রেউইয়ের যে পল্লীতে আসিয়া তাঁহারা শত শত রম্য সৌধশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন তাহা "মল্লিক পল্লী" বলিয়াই খ্যাত হইয়া উঠিল। রেউই কৃষ্ণনগর নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রাচীন কৃষ্ণনগরের বহু কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক বংশীয়গণও কালের ক্রীড়ায় কতক ধ্বংশ কতক স্থানান্তরিত হইয়া কত দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় আদি পুরুষগণের স্থাপিত মল্লিক পল্লী, তাঁহাদের পরিত্যক্ত সুবিস্তীর্ণ মল্লিক পুষ্করিণী প্রভৃতি কৃষ্ণনগরে আজিও তাঁহাদের স্মৃতি সম্যক্ জাগরূক রাখিয়াছে। মল্লিকগণ কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলে নদীয়াধিপতি রাজা রাঘব, মল্লিকবংশের প্রতি তাঁহার বংশের স্বভাবগত ভালবাসা ও করুণা প্রদর্শন করিবার জন্য বংশানুক্রমিক এই বংশীয়গণকে তাঁহার প্রধান করদাতৃরূপে অঙ্গীকার করিয়া লয়েন এবং প্রতিবৎসর শুভ পুণ্যাহর দিনে এই বংশীয়গণের নিকটেই রাজ্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম কর গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। এই বংশীয়গণ বংশপরম্পরায় তাঁহাদের ভূস্বামী দত্ত এই সম্মান বহুদিন যাবত ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম সাধিত হইয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত রাজসংসারের সহিত এই বংশীয়গণের বিশিষ্ট সদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে কাহাকেও পরিচিত হইতে হইলে এই বংশীয়গণের শুভদৃষ্টি ব্যতীত সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিত না। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার সহিত মল্লিকবংশের নাম বিজড়িত দেখা যায়। সেটী মল্লিকদিগের বারোইয়ারী পূজা। কথিত আছে এরূপ সমারোহে বারোইয়ারী পূজা বঙ্গদেশে আর কখনও হয় নাই। স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই কার্য্যের অধ্যক্ষ হইতেন। এই বারোইয়ারী মণ্ডপে মাতা দশভূজার সম্মুখে প্রতিবৎসর লক্ষ বলি প্রদান করা হইত।

এই সময়েই এই বংশীয় কতিপয় উদ্যমশীল যুবক ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ স্থান হইতে বহু মুদ্রার সূক্ষ্ম মসলিন সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ব্যবসায়ে উন্নতি হইলে, তাঁহারা ঢাকা, এনাতগঞ্জ, কলিকাতা ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি কাপড়ের আড়ত খুলিয়া দেন এবং রাণাঘাটে একটী নীলকুঠী স্থাপনা করেন। এই সময়ে বস্ত্র ব্যবসায়ে তাঁহাদের এতই উন্নতি হইয়াছিল যে কথিত আছে তাঁহাদের বাটির সামান্য দাসদাসী পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ঢাকাই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিত। এই সকল আড়তের মধ্যে শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগরের সান্নিধ্য বলিয়া রাণাঘাটের আড়তেই তাঁহারা অধিক ভরাভর করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের লোকান্তর হইলে এই বংশীয় পরম ভাগবত হরেকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় কৃষ্ণনগরের বাস পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে রাণাঘাটে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। রাণাঘাটের সিদ্ধেশ্বরী তলায় সুবৃহৎ বাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা যেরূপ সমৃদ্ধির সহিত বারোমাসে তের পার্ব্বণের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন তাহা রাণাঘাটে আজিও প্রবাদের ন্যায় আছে। রাণাঘাটে পালচৌধুরীগণের প্রাদুর্ভাবও এই সময়ে। কৃষ্ণপান্তী আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়, সরল হৃদয় ও উন্নত চরিত্রবলে যে কুবেরতুল্য ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় বংশের কেহ কেহ বিষয়মদে মত্ত হইয়া উহার অপব্যবহার আরম্ভ করেন। এবং ধনমদে মত্ত হইয়া দারুণ পরশ্রীকাতর হইয়া উঠেন এবং মল্লিকদের সহিত সর্ব্বদা নানামতে কলহের সূত্রানুসন্ধান করিতে থাকেন। একে তখন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতির সূত্রপাত হওয়ায় মল্লিকবংশীয়গণ ব্যবসায় লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তাহাতে পালচৌধুরীদিগের এই অমানুষিক বিদ্বেষে উত্ত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়া ১২৫০ সালে তাঁহাদের বিপদসম্পদের সহায় শ্রীধরকে লইয়া তাঁহারা রাণাঘাট ত্যাগ করেন।

রাণাঘাট হইতে পতিতপাবন মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার ৭ ভাই সপরিবারে কলিকাতায় তাঁহাদের প্রিয় সুহৃদ নবীনকৃষ্ণ সিংহের নিকট গমন করেন এবং তথায় তাঁহার সাহায্যে বংশবাটীতে নীলের কুঠী চালাইয়া লক্ষ্মীর কৃপালাভ করেন। তাঁহার সমস্ত জীবন উদ্যোগী পুরুষোচিত গুণাবলীতে সমুজ্জ্বল। ১২৫৩ সালে নীলের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তিনি কলিকাতায় মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতায় ও রাণাঘাটের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও তিলি সমাজ আহ্বান করিয়া তিনি তাঁহাদের যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এই উপলক্ষে তাঁহারই ভবনে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার কায়স্থ বাবুদের দুই প্রধান সমাজের (সিংহবাবুদের ও শোভাবাজার রাজাবাবুদের) সমন্বয় হয়। ১২৫৪ সালে তাঁহাদের নব সৌভাগ্যের উদয় হইলে রাণাঘাটের পালচৌধুরীবাবুগণ আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক বহু যত্নে তাঁহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া পুনরায় রাণাঘাটে আনয়ন করেন তদবধি ইঁহারা রাণাঘাটে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই বংশের আধুনিক বংশধরগণের মধ্যে স্বর্গীয় কালীকুমার মল্লিক মহাশয়ের ও সুপ্রবীণ শ্রীরাখাল দাস মল্লিক মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাবু কালীকুমার রাণাঘাটের যাবতীয় সাধারণ হিতকরী কার্য্যের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একমাত্র ইনিই রাণাঘাটে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়া যত দিন "Self Government" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ততদিন হইতে একাদিক্রমে অত্রস্থ অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক মিউনিসিপ্যাল কমিসানার নির্ব্বাচিত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া কি রাজা কি প্রজা সকলেরই প্রিয়সাধনে রত ছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রতি তাঁহার স্বগ্রামবাসী জনসাধারণের প্রীতি নিদর্শনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মনে হয়। তিনি যেমন বন্ধুবৎসল তেমনি সহৃদয় দরিদ্রবন্ধু বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। ১৩ই আষাঢ় ১৩১৮ সালে ৫২ বৎসর বয়সে ইনি স্বর্গ গমন করেন।[১৩]

ইঁহার দুই পুত্র, শ্রীকুমুদনাথ ও শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মল্লিক। কুমুদনাথের শ্রীশচীন্দ্রনাথ ও নৃপেন্দ্রের শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নামে দুইটী নবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কালীকুমারের ভ্রাতুস্পুত্র ভুজেন্দ্রনাথ ও তৎপুত্র রমেন্দ্র নাথ।

তিলিকুলে-অন্যান্য প্রাচীন বংশের মধ্যে ৺জগন্নাথ প্রামাণিকের বংশাবলী ও নন্দীবংশ উল্লেখযোগ্য। এই বংশের বর্ত্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে ৺মতিলাল প্রামাণিকের উপযুক্ত গুণী পুত্র বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্র ও সতীশ্চন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কায়স্থগণের মধ্যে রাণাঘাট নামভাগে আদিম অধিবাসী ঘোষবংশ উল্লেখযোগ্য বর্ত্তমান কালের মধ্যে দত্ত বংশের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

কায়স্থ কুলের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্রাজিলের সৈন্যাধ্যক্ষ স্বনামপ্রসিদ্ধ কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাণাঘাটে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নিবাস নদীয়া কৃষ্ণগঞ্জের অনতিদূর নাথপুর। সুরেশচন্দ্র ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য তিনি এই সময়ে পিতৃ পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত অর্থকষ্টে পতিত হয়েন, পরে ১৭ বৎসর বয়সে জাহাজের খালাসীরূপে বিলাতে গমন করেন। সেখানে যাইয়া তিনি নানারূপ কষ্টসাধ্য কার্য্যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়া একদল ভ্রমণকারী সার্কাস দলের সহিত নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া ব্রাজীলে উপনীত হয়েন। তথায় কোন এক ভীষক দুহিতা তাঁহার প্রেমে পতিত হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলে তিনি তদবধি ব্রাজিলেই রহিয়া যান, এবং স্বীয় পত্নীর ইচ্ছানুযায়ী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজের কৃতীত্বে ও অসীমসাহসীকতায় সৈনিক বিভাগের নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লেফট্‌ন্যান্ট পদে উন্নীত হয়েন। পরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাজিলের রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় সুরেশচন্দ্র সাধারণ তন্ত্র দলে যোগদান করিলে তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। এই সময়ে দেশে পূর্ণবিপ্লব উপস্থিত হইলে যে সকল সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতেই অনন্য সাধারণ সাহসীকতা ও বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিয়া তিনি কর্ণেল পদে উন্নীত হয়েন এবং এইরূপে তিনি জগতের ইতিহাসে আপনার নাম চিরবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর ৪৫ বৎসর বয়সে পুত্রকলত্রাদি রাখিয়া তিনি ব্রাজিলে পরলোক গমন করেন।

রাণাঘাটের আধুনিক দৃশ্যাবলী ও সভাসমিতির মধ্যে ৺সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা ৺নিস্তারিণী দেবীর মন্দির, পালচৌধুরী বাবুদিগের বৃহৎ প্রাসাদ, রেলওয়ে ষ্টেসন, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মেমোরিয়াল হল ও পাবলিক লাইব্রেরী[১৭], মিত্রসভা, দেচৌধুরী বাবুদের অতিথিসেবালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পিতলের ছবিযুক্ত বৈঠকাদি, এবং এখনকার কুম্ভকারগণের নির্ম্মিত মাটীর সামগ্রী, কুশাসন, পাটী ও খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পানতুয়া ও সন্দেশ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চাকদহ

চাকদহ বর্ত্তমান ই, বি, এস রেলের একটি ষ্টেসন। কলিকাতা হইতে ৩৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানটি বহুকালের প্রাচীন। প্রবাদ ভগীরথ যখন স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন তখন এখানে তাঁহার রথের চক্র প্রোথিত হইয়া যায় তাই এখানকার নাম হয় চক্রদহ, অপভ্রংশে এক্ষণে চাকদহ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম মনসাপোতাকেও পৌরাণিক যুগের সময় উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে চাকদহ, মনসাপোতা, জশোড়া প্রভৃতি স্থানগুলির সম্মিলিত নাম প্রদ্যুম্ন নগর। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, নিম্নবঙ্গের তদানীন্তন অধিপতি সম্বরাসুরকে বধপূর্ব্বক এখানে পাতিত করেন এবং নিজ নামে এই স্থানের নাম রক্ষা করেন। তৎপূর্ব্বে ইহার নাম ছিল ঋক্ষবন্ত নগর। এই প্রবাদের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য থাকুক আর নাই থাকুক এখনও এখানে একটী দীর্ঘিকা প্রদ্যুম্ন হ্রদ নামে খ্যাত এবং জমিদারগণের প্রাচীন কাগজদিতেও উহার প্রদ্যুম্ননগর নামের পরিচয় পাওয়া যায়। চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও স্মার্ত্ত প্রধান রঘুনন্দন তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে "মুক্ত বেণী" প্রয়াগের স্থান নির্দ্দেশ কালেও ইহাকে প্রদ্যুম্ননগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"প্রদ্যুম্ন নগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যা স্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা॥"

এই বচন অনুসারে সরস্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ এবং তাহারও উত্তরে প্রদ্যুম্ননগরএর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলেই "চাকদহ মণ্ডল"ই প্রদ্যুম্ননগর বলিয়া খ্যাত ছিল অনুমিত হয়।

রঘুনন্দন যখন ইহাকে প্রদ্যুম্ননগর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন সেই সময়ে বিভিন্ন ঘটকগণের কারিকায় এই স্থানের "আচম্বিতা" নামও দেখা যায়। "আচম্বিতা" দেবীর ঘটকের ৩৬ মেলের এক মেল। জমিদারী কাগজাদিতেও ইহার আচম্বিতা নাম পাওয়া যায়। এই প্রদ্যুম্ননগর পূর্ব্বে বহু দেবমন্দির ও মঠাদি দ্বারা সুশোভিত ছিল জানা

যায়। এখনও দুই একটী প্রাচীন দেবতাহীন মন্দির এখানে বিদ্যমান আছে।[১৮]

বহু পূর্ব্বের সঠিক বিবরণ জানা না যাইলেও দেড়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহার যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে এই স্থানটি তদানীন্তন কালের সমৃদ্ধ স্থানের অন্যতম শ্রীসম্পন্ন গ্রাম ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও ইহা মহারাজের চারি সমাজের এক সমাজ বলিয়া পরিচিত ছিল। এখানে ও ইহার নিকটবর্ত্তী পালপাড়া, মনসাপোতা, জশোড়া প্রভৃতি স্থান সকলে বহু টোলধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। "কুলার্ণব" প্রণেতা ন্যায় ও তন্ত্রের পরম পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার কালে এ স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। পালপাড়ায় তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ড বিশপ হেবার সাহেব তাঁহার রোজ নামচায় এই পণ্ডিতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মিশিনারি মিঃ কেরি এই সময়ে এই সকল স্থানে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর এক জন সাহেব ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দেও এখানে ব্যাঘ্রের উপদ্রবের বর্ণনা করিয়াছেন। এখনকার নিবিড় জঙ্গলে ব্যাঘ্রাদির ন্যায় বহু নরাকার পশুও আশ্রয় লইয়া চুরি ডাকাইতি প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে হানিফ নামে এক বিখ্যাত দস্যু ও তদীয় ৮ জন সহচরের এই স্থানের বাজারে নৃশংস ভাবে হত্যা ও ডাকাতি করা অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কতিপয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক একটী ব্রাহ্ম সভা ও স্কুল স্থাপিত হয় এবং এই বৎসরে একজন নীলকর সাহেব কর্ত্তৃক আর একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪০ জন। এখানে ২ টী স্মৃতির টোল ছিল। তাহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২ জন। ইহা তখন রাণাঘাটের পালচৌধুরী বাবুদিগের জমিদারী-ভুক্ত ছিল, এবং গঙ্গাতীরে তাঁহাদের গদীবাটিও ছিল। তখন চাকদহের বাজার খুব সমৃদ্ধ ছিল, অন্যূন দুইশত বৃহৎ আড়ত ছিল। গঙ্গাবক্ষ যাত্রীবাহী ও ভারবাহী নৌকায় সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন থাকিত। এক্ষণে গঙ্গা চাকদহ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ায় ও রেলপথের বিস্তার হওয়ায় বাজার, গঞ্জ সমস্তই লোপ পাইয়াছে, এবং গঙ্গাতীরস্থ পুরাতন চাকদহের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া রেলওয়ে ষ্টেসন চাপিয়া নূতন চাকদহ গ্রাম গঠিত হইয়াছে। এই স্থান পূর্ব্বে হিন্দুগণের অন্তিম তীরস্থ করিবার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার শ্মশান মহাশ্মশান বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও শব লইয়া সর্ব্বদা এখানে লোক আসিত। কালীপ্রসাদ পোদ্দার নামে যশোহরের একজন সদাশয় ধনী সুবর্ণবণিক যশোহর হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত, যশোহর বাসীর গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য এক প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা এখনও বিদ্যমান থাকিয়া তাহার স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে।

পূর্ব্বে প্রতি বৎসর বারুণীর সময়ে এখানে গঙ্গাস্নানার্থ বহু জনসমাগম হইত। এখানকার বাৎসরিক বারোয়ারি পূজা পূর্ব্বে খুবই জাঁকজমকে হইত। এখনও প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় উহা সমাহিত হইয়া থাকে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। ইং ১৯০৯ সালে এখানে একটী এনট্রান্স স্কুল

স্থাপিত হইয়াছে। উপস্থিত ছাত্রসংখ্যা প্রায় দুই শত।

চাকদহ মণ্ডলের অধিবাসীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত বংশ ও ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

চাকদহ কাজীপাড়ায় বংশ, চাকদহের দত্তবংশ, এই বংশীয় শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্ত মহাশয় চাকদহের বর্ত্তমান স্কুলের প্রাণস্বরূপ। জশোড়ার গোস্বামী বংশ; মিত্রবংশ এই বংশের বর্ত্তমান বংশীয়দের মধ্যে শ্রীবসন্তকুমার মিত্র উল্লেখযোগ্য; মজুমদার (গুহ) বংশ, ঘটকবংশ; গোড়পাড়ার মিত্রবংশ, বসু বংশ, সিংহবংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ, পালপাড়ার বারেন্দ্রগণের মধ্যে সান্ন্যাল চৌধুরী বংশ, ঢোল বংশ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চট্টোপাধ্যায় বংশ, চৌধুরী বংশ, মনসাপোতার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় বংশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কাজীপাড়া

এই কাজীপাড়ার প্রাচীন নাম পাজনৌর, এখনও এতদঞ্চল পরগণা পাজনৌরের অধীন। পূর্ব্বে এই কাজীপাড়া কাজী মহল্যা, মুফতি মহল্যা প্রভৃতি বহু পল্লীতে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন কাজীপাড়ার স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে এক্ষণে যাহা কাজীপাড়া নামে খ্যাত উহা পূর্ব্বে আচম্বিতা সহরের অন্তর্গত ছিল। কাজীদিগের বর্ত্তমান আবাস বাটী যে স্থানে উহাও ঐ স্থানে ছিল না। কাজীপাড়ার কাজীগণই সবিশেষ প্রাচীন বংশ। কথিত আছে এই কাজীগণের পূর্ব্বপুরুষগণ পাণ্ডুয়ার যুদ্ধকালে এদেশে আগমন করেন। এই বংশে বহু বিদ্বান ক্রিয়াবান দানশীল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে হজরত আবদস্ শুকুর মরহুম নামে একজন বিদ্ধপুরুষ জন্মলাভ করিয়াছিলেন। ইহার নিম্নতম সপ্তম পুরুষে মুনসী এতেমদ্দীন মহম্মদ মরহুম ওরফে বেলাত মুনসী জন্মলাভ করেন, তিনি মহা বিদ্বান ছিলেন দিল্লী তখ্তের শেষ বাদসাহ আমলের সময় তিনি বাদসাহের প্রয়োজনে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ বিলাত গমন করেন, এই কালে তিনি লর্ড ক্লাইবের মীর মুনসী পদে অধিষ্টিত ছিলেন এখনকার খাঁ বাহাদুর মৌলবী মুজাহার হোসেন মরহুম লর্ড মেও বাহাদুরের মীর মুনসী ছিলেন।

কাজী পাড়ার মুন্সী বংশেও বহু মহাত্মা জন্মলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুনসী ছলিমুল মরহুম একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে নবাব মীরকাশিম তাঁহার প্রতি কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া সেকেল্লা নামক যন্ত্রে তাঁহার প্রাণবধের আজ্ঞা দেন, কিন্তু কাজীবংশীয় প্রাগুক্ত বেলাত মুনসী লর্ড ক্লাইবের দ্বারা নবাবকে অনুরোধ করিয়া সেযাত্রা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কাঁচড়াপাড়া

কাঞ্চনপল্লী বা বর্ত্তমান কাঁচড়াপাড়া নদীয়ার একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। বহু পূর্ব্বকালে ইহার নাম ছিল নবহট্টগ্রাম; এখান হইতেই বৈদ্যদিগের নব হট্টির সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। তৎপরে এই স্থানে কুমারহট্টের[১১] অন্তর্গত ছিল এবং পরস্পর সংযুক্ত ছিল। অধুনা বাগের খাল নামে যে খালটি কাঞ্চন পল্লী ও কুমারহট্টের মধ্যে বিদ্যমান আছে সেটী মল্লিক সাহেব নামক কোনও এক ধনী কর্ত্তৃক খাত হয়; এখনও কাঞ্চনপল্লী হাবলী সহর পরগণার অধীন ও কুমারহট্ট সমাজভুক্ত। বর্ত্তমান কাঞ্চনপল্লী গ্রামটী গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থানের চরভূমির উপর স্থাপিত। পূর্ব্ব খ্যাত কাঞ্চনপল্লী কালের কুটীল গতিতে এখন গঙ্গাবক্ষে বিরাজ করিতেছে। বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ পাঠমালা গ্রন্থে দেখা যায় যে কাঞ্চনপল্লী গ্রামটি সেন শিবানন্দের পাঠ বলিয়া উক্ত আছে। শ্রীমহাপ্রভুচৈতন্যদেব এই শিবানন্দের বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন ও এখান হইতে শান্তিপুর অদ্বৈত মন্দিরে, পরে তথা হইতে নবদ্বীপে জননী দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেন শিবানন্দ নিজ গুরু শ্রীনাথ আচার্য্যের নামে যে কৃষ্ণরায় বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন, ঐ বিগ্রহ প্রথমে শ্রীনাথ আচার্য্যের দৌহিত্র শ্রীমহেশের নিজ বাটীতে থাকিতেন; ঐ বিগ্রহের পদ্মাসনে এই শ্লোকটী খোদিত আছে—

"স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায়ঃ প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহায় দ্বিজঃ কিঞ্চিৎ শ্রীয়ঃ শ্রীনাথ সজ্ঞকঃ॥

কথিত আছে বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত-পুত্র যশোহরজীৎ কচুরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দিল্লীদরবারে যাইবার কালীন কাঞ্চনপল্লী হইয়া গমন করেন; তখনও কাঞ্চনপল্লী, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান যশোহর রাজসংসার ভুক্ত ছিল। তিনি যাত্রাকালে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইরূপ মানসিক করেন "যদি এ যাত্রায় আমি দরবারে ফতে হই, তাহা হইলে ঠাকুরের একটী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিব।" সেবার তিনি দরবারে সফলমনোরথ হওয়ায়, প্রত্যাগমন কালে পুনরায় কৃষ্ণরায়কে দর্শন করিতে আসেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির, দোলমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেন; এবং ঠাকুরের নিত্য সেবা নির্ব্বাহার্থ কৃষ্ণবাটী নামে একখানি নিষ্কর তালুক জায়গীর দেন। এখনও উক্ত তালুক তাঁহার সেবার্থ নিয়োজিত আছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস দশশালা বন্দোবস্তর সময় ইহার বার্ষিত ২৮ টাকা ১৪ আনা কর ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন কাঞ্চনপল্লী যখন গঙ্গার ভাঙ্গনে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তখন যশোহরজিতের নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। বর্ত্তমান শ্রীমন্দির যাহা ভারতীয় শিল্প চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে তাহা ১৭০৭ শকে কলিকাতার প্রসিদ্ধ নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের ব্যয়ে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ সুন্দর গঠন, সুঠাম মন্দির সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। শিবানন্দ সেনের পুত্র চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি

গ্রন্থপ্রণেতা পুরী গোস্বামী—যিনি মহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ লেহন মাত্রেই, শৈশবে শাস্ত্রপাঠ ব্যতিরেকে অসাধারণ কবি হইয়া কবিকর্ণপুর নামে খ্যাত হয়েন, সেই ভক্তিময় পুরুষটী এই কাঞ্চন-পল্লীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গবিখ্যাত শ্রুতিধর নিমচাঁদ শিরোমণি, যিনি ন্যায়শাস্ত্রে প্রথিতনামা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের তুল্যাতুল্য বলিয়া খ্যাত, তাঁহারও জন্মভূমি এই কাঞ্চনপল্লী। এতদ্ব্যতীত বঙ্গভাষাবিৎ বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অদ্ভুত রামায়ণ ও তুলসীদাসী রামায়ণের অনুবাদক হরিমোহন সেন গুপ্ত, জ্ঞানার্ণব গ্রন্থ-প্রণেতা প্রেমচাঁদ কবিরত্ন প্রভৃতি অনেক যশস্বী পণ্ডিত এই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়া নানারূপ অমূল্য গ্রন্থাবলী রচনা দ্বারা ইহার যশশ্রী সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। স্বনামখ্যাত দানশীলা রাণী রাসমণির জন্মভূমিও এই কাঞ্চনপল্লীর অন্তর্গত কোনা গ্রাম। তাঁহার স্থাপিত গঙ্গার চাঁদনী এখনও এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কাঁচড়াপাড়া বলিলে সাধারণে কাঁচড়াপাড়া রেলষ্টেসান যেস্থানে স্থাপিত সেই স্থানটীকে মনে করেন, কিন্তু কাঁচড়াপাড়া ষ্টেসনটি অধুনা নদীয়ার সীমা বহির্ভূত। এই কাঁচড়াপাড়া বিজ্‌পুরে ই, বি, রেলের গাড়ী প্রস্তুতের কলকারখানা স্থাপিত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে মাননীয় ডিউক অব্‌ কনট্‌ ও বহু সম্মানস্পদ প্রিন্স্‌ অব্‌ ওয়েলস্‌, প্রিন্স্‌ এলবার্ট ভিক্টর মহোদয় পক্ষী শীকার উদ্দেশে এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

বাগের গ্রাম

পাঠানগণ যখন পশ্চিমভারতে আসিয়া প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহারা নিম্নবঙ্গকে, বাদা ও সুন্দরবনের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর নিমিত্ত "দোজাক্‌" বা নরক বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল এই দেশে বাস করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য; এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা কোনও আমীর বা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে চূড়ান্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইলে তাঁহার বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে, দণ্ডিত ব্যক্তির শিরঃচ্ছেদ না করিয়া মৃত্যু নিশ্চয় জ্ঞানে এই প্রদেশে নির্ব্বাসিত করিতেন। মালেক কাসিম নামে ঐরূপ এক আমীর হুগলীর অব্যবহিত পশ্চিমে আসিয়া বাস করেন। এখনও তথায় তাঁহার নামে একটী হাট চলিয়া আসিতেছে। মালেক মীর আমেদ বেগ নামে ঐরূপ আর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া বংশবাটীর অপর পারে সুবৃহৎ বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন ও বিস্তীর্ণ সৌধশ্রেণী, বাজার প্রভৃতি স্থাপনা করেন এবং গঙ্গা হইতে যমুনা পর্য্যন্ত একটী খাল কাটিয়া দেন; উহাই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বেগের খাল অপভ্রংশে বাগের খাল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গঙ্গার উপর হুগলীর বিপরীত তটেও মীর বেগের আর একটী গড় বেষ্টিত বসতবাটী ছিল, উহা এখনও মীর বেগের গড় নামে খ্যাত। অনেকে

আবার বলিয়া থাকেন যে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে মুরশিদাবাদ নিজামৎ বংশের মালেক বারখোদাদার নামক জনৈক আমীর কোন দুষ্কার্য্যের শাস্তিস্বরূপে এখানে নির্ব্বাসিত হয়েন, তাহারই বাগ বাগিচা হইতে এই স্থানটী মল্লিক-বাগ নামে ও খালটী বাগের খাল নামে খ্যাত হয়।

এই গ্রামটী যাঁহারই স্থাপিত হউক উহা যে এককালে শোভা সমৃদ্ধি পূর্ণ স্থান ছিল তাহা ইহার ধ্বংশাবশিষ্ট বালাখানা, রংমহল পিলখানা, গোরস্থান প্রভৃতি দর্শনে বিশেষরূপ উপলব্ধি হয়। একটী সুবৃহৎ অর্দ্ধভগ্ন মসজীদ এখনও এই স্থানের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এরূপ সুবৃহৎ মসজীদ নিকটবর্ত্তী কোনও জেলায় নাই। ইহা বর্ত্তমান কালে মুন্সী বারী আবদুল আলি ও মুন্সী মহম্মদ জুল ফক্কর হাশদার সাহেবদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে আছে। এই স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা বনাকীর্ণ জনহীন ও অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও গ্রামটী সমৃদ্ধিশালী ছিল। তখন এখানে সপ্তাহে ২ দিন দেশী সুতা ও দোক্তা তামাকের হাট হইত। প্রতি হাটে প্রায় ৭০০০।৮০০০ হাজার লোক সমাগম হইত; এই হাট এক্ষণে হরিংঘাটা (সুবর্ণপুরে) উঠিয়া গিয়াছে।

বাগের খালটী এক্ষণে পূর্ব্বকার যমুনানদীর ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র জাগরুক রাখিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টলেমীর বর্ণনায় ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ডি, ব্যারো ও ব্লাভের ম্যাপে ত্রিবেণী দ্বীপের যে মানচিত্র আছে তাহাতে কাঞ্চনপল্লীর বাগের গ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি দ্বীপ আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে।[২০] এই ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডের দক্ষিণে বাগের খাল, পশ্চিমে গঙ্গা এখনও বহতা। উত্তরদিকে সুপ্রশস্ত যমুনা বহতা ছিল উহার চিহ্ন এখনও কাঁচড়াপাড়া ও মদনপুরের মধ্যবর্ত্তী ঘোষপাড়া গ্রামের উত্তর পার্শ্বে এবং মদনপুর ষ্টেসানের প্লাটফরম হইতে ৫০।৬০ হাত দক্ষিণে আসিয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে। ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল লাইনের উচ্চ মৃত্তিকায় ইহার গতিরোধ হইয়া মূল স্রোতবেগ বাহত হওয়ায় দিনে দিনে ইহা ক্ষীণকায়া হইয়া মূল খাত ত্যাগ করিয়া ক্ষীণ রজত রেখার ন্যায় এক্ষণে কুলীয়া গ্রামের নিকট হইতে বাগের খালের সহিত যুক্ত হইয়া বাগের খাল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ডি, ব্যারো ও ব্লাভের ম্যাপে ত্রিবেণীতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীই একরূপ প্রশস্ত দেখান হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিধারাকেই মুক্ত ত্রিবেণী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং এই স্থানকেই দক্ষিণ প্রয়াগ নির্দ্দেশে ইহার উচ্চ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।[২১] ১৮১০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট সার্ভেতে এই যমুনা ও বাগের খাল, সুন্দর বনের উত্তর সীমা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া ইচ্ছামতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালের অধিবাসীগণ, স্রোতের বেগে গঙ্গাগর্ভে পতিত হইবে জ্ঞানে, এই যমুনাতে মৃতদেহ ভাসাইয়া দিত। এক্ষণে এই বাগের খাল নদীয়া জেলার দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে।

সুখ সাগর

এই গ্রাম খানির বর্ত্তমান অস্তিত্ব না থাকিলেও, ইংরাজ আমলের প্রথমে এই স্থানটী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কালচক্রের আবর্ত্তনে বর্ত্তমান সময়ে সুখ সাগরের পূর্ব্ব চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান নাই। পূতঃতোয়া ভাগিরথীর বিষম তরঙ্গাঘাতে সুখসাগরে সুখস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও অশীতিপুর বৃদ্ধগণ সুখসাগরের পূর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। তৎকালে সুখসাগর প্রকৃতই "সুখ সাগর" ছিল। রেনেলের মানচিত্রে সুখ সাগর গঙ্গা হইতে কিছু দূরে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কালে গঙ্গা ক্রমে সরিয়া আসিয়া, ইংরাজের মুরশিদাবাদ হইতে অপসৃত রেভিনিউ বোর্ডের প্রাসাদোপম্ অট্টালিকাদি, যাহা দেড়লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তদানীন্তন সুবিখ্যাত ধনী, নীল কুঠিয়াল ব্যারেটো সাহেবের সৌধশ্রেণী ও তাঁহার ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯,০০০ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত রোমেন ক্যাথলিক গির্জ্জাঘর প্রভৃতি গ্রাস করতঃ ধরণীবক্ষ হইতে সুখ সাগরের চিহ্ন মাত্রও মুছিয়া লইয়াছে।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে খালসা দপ্তর এখানে উঠিয়া আসিবার কিছু পরেই এই স্থানটী ইংরাজদিগের আমোদ আহ্লাদের উপযোগী মনে হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণমেন্টের পল্লী-আবাস এখানেই নির্ম্মিত হয়, পরে উহা উঠিয়া বারাকপুরে যায়। সপারিষদ মারকুইস কর্ণওয়ালীশ সাহেব গ্রীষ্মকালে প্রায়শঃ এখানেই আগমন করিতেন। ফরাসী চন্দননগর, হুগলী চুঁচড়া প্রভৃতি হইতে সাহেবরাও এখানে সর্ব্বদা আমোদ করিবার জন্য আগমন করিতেন।

সুখ সাগরের সমৃদ্ধির কারণ কুঠিয়াল ব্যারেটো সাহেব। তিনি এখনে বহু বর্ত্ম নির্ম্মাণ ও তাহার উভয় পার্শ্বে নিম্ব বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়াছিলেন। এগুলির দুই চারিটী অদ্যাপি স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এখানে একটী মদের ভাঁটী স্থাপনা করেন। এই কালে লোকে এই স্থানকে "ছোট কলিকাতা" বলিত। ব্যারেটো এই স্থানে মদ ও নীলের কুঠী চালাইয়া এতই ধনী হইয়াছিলেন যে তিনি বলিতেন, "সুখ সাগরের গঙ্গা আমি টাকা দিয়া ভরাট করিতে পারি।" সাধারণ লোকে, তাঁহার এই অসম্ভব ধনাগম দেখিয়া তাঁহাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ও যে কোন ধাতুকে টাকায় পরিণত করিতে শক্তিশালী মনে করিত। ইহার কুঠী বেশ সুরক্ষিত ছিল ও কুঠীর গঙ্গার দিকের অংশে কামান সাজান থাকিত। লর্ড ক্লাইব যখন সুখ সাগরের তলা দিয়া পলাসী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন তখন ব্যারেটো তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কামানধ্বনি করিলে ক্লাইব উহাকে শত্রুর শিবির মনে করিয়া ধ্বংস করিতে অনুমতি দেন।

পূর্ব্বকালে সুখ সাগরের নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুপুর, শ্রীনগর, ও ভাগড়া ও অদূরস্থিত জাগুলী প্রভৃতিতে বড়ই ডাকাইতের উপদ্রব ছিল। একবার জাগুলীতে ইষ্টইণ্ডিয়া

কোম্পানীর খাজনা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। সেই সময় হইতে ইহার নাম হয় হুণ্ডীমারা জাগুলি। পূর্ব্বে যখন রেলপথের বিস্তার হয় নাই এবং স্থলপথে সৈন্যাদি যাতায়াত করিত, তখন মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় যাইতে এই জাগুলিতেই সৈনিকদলের পথশ্রান্তি নিবারণ কল্পে ছাউনি পড়িত। সুখসাগরের জমিদারী-স্বত্ব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল। তিনি এখানে একটী বাজার স্থাপনা করেন এবং এক মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে উগ্রচণ্ডী দেবীর মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। কেহ কেহ দেবীকে সিদ্ধেশ্বরীও বলিয়া থাকেন। কালের ক্রীড়ায় এই মন্দির এখন গঙ্গাগর্ভে, সুতরাং দেবী, কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলী কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়া হরধামে চিন্ময়ী দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে রক্ষিত হইয়াছেন।

সুখসাগরের অবনতির ২টী কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। ১ম কারণ, গঙ্গার ভাঙ্গনে কুঠিয়াল সাহেবদিগেন কুঠী ও ইমারতাদি জলমগ্ন হওয়া। ২য়, রাণাঘাটের উদীয়মান পাল-চৌধুরী কর্ত্তৃক জোরস্বত্বে সুখসাগরের বাজার ভাঙ্গিয়া চাকদহের বাজার পত্তন। সুখ সাগরের এইরূপ অধঃপতনের পরেও এখানে বহুদিন ধরিয়া একটি উচ্চ শ্রেণীর দেওয়ানী আদালত ছিল।

বিশব হেবার তাঁহার পত্রিকায় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ লিখিয়া গিয়াছেন। "আমি সুখ সাগরের নিকট একটি সুসভ্য নগরীরচিহ্ন সকল দেখিয়াছিলাম। একটি ফাঁসী কাষ্ঠে ২টি কঙ্কালসার মৃতদেহ শৃঙ্খলিত অবস্থায় লম্বমান দেখিয়াছিলাম। তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে ডাকাতি ও খুন করা অপরাধে ২ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই স্থানটির নাম ডাকাতাদি নানা কারণে কলঙ্কিত।" ফাষ্টার নামে এক সাহেব ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "সুখ সাগরের ক্রাষ্ট ও ল্যাকনকস সাহেবের কুঠী ও চাষ আবাদাদি, বিশিষ্ট মূল্যবান ও উন্নতিশীল। ইহাদের এই স্থানে স্থাপিত সাদা সূক্ষ্ম মসলীনের কুঠীতে কোম্পানী বার্ষিক ২লক্ষ টাকা দাদন করিয়া থাকেন তাঁহারা এখানে রেশমের গুটির চাষও আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ক্রমে প্রসার ও উন্নতি দেখিয়া স্থাপয়িতাদের চেষ্টা পরিশ্রমের বিলক্ষণ পুরস্কারের আশা করা যায়।" ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে গভর্মেন্ট কর্ত্তৃক একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়। একজন জমিদার পূর্ব্বে ব্যারেটো সাহেবের নির্ম্মিত একখানি "চৌরিঘর" পাঠশালার জন্য দান করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এক মুনসেফ কর্ত্তৃক এখানে একটী কেরাণী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় ১৫০ জন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ভদ্র সন্তান পরীক্ষা প্রদান করেন।"

বর্ত্তমান কালে সুখসাগরের নাম ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। গঙ্গাবক্ষ হইতে লোকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গঙ্গার ভাঙ্গন ও দুই চারিটি প্রাচীন বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া দেখাইয়া থাকে—"ঐ খানে সুখসাগর ছিল"।

চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা মহকুমার পরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২৫৪৫৮৯। ইহা বর্ত্তুলাকারে উত্তর দক্ষিণ লম্বা। পূর্ব্ব বঙ্গ রেল পথ ইহার মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। আলমডাঙ্গা, মুন্সীগঞ্জ, নীলমণিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, জয়রামপুর ও দর্শনা ষ্টেসন এই মহকুমায় সীমার মধ্যে পড়ে। মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ (যশোহর) মহকুমায় যাইতে হইলে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে নামিতে হয়। মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে, ঝিনাইদহ ২২ মাইল পূর্ব্বে; দুইটি পাকা রাস্তা দ্বারা মিলিত। মাথাভাঙ্গা বা হাউলিয়া নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে চুয়াডাঙ্গার মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। স্ববলপুর নামক স্থানে মেহেরপুর হইতে ভৈরব আসিয়া হাউলিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে চুয়াডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী হাজরাহাটি নামক গ্রামে নবগঙ্গা নামক আর একটি নদী হাউলিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে; কিন্তু এই নদীর প্রথম ৩।৪ মাইল এখন শুষ্ক। এই নদী ঝিনাইদহ অভিমুখে চলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলরাস্তার জন্য ইহার মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কয়টি বড় নদী ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কয়েকটি মরা নদী আছে; কিন্তু সেগুলিতে প্রায়ই জল থাকে না। স্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট বড বিল আছে তাহার মধ্যে রায়সা, দলকা প্রধান।

চুয়াডাঙ্গায় চারিটী থানা—চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, দামুরহুদা ও জীবননগর এই চারি থানার গ্রামগুলি ৫৩টী চৌকীদারি ইউনিয়ানে বিভক্ত। কুড়ুলগাছি, কাপাসডাঙ্গা দামুরহুদা, জয়রামপুর, দৌলতগঞ্জ (জীবননগর) ডুমুরদিয়া, আলোকদিয়া, কুমরী, বেলগাছী, নাটুদহ এই কয়টী গ্রাম খুব বড় আলমডাঙ্গা, বেহালা (মুন্সীগঞ্জ,) হাবোলিয়া, দামুরহুদা, রামনগর (দর্শনা এই কয়টি প্রাধান বানিজ্য স্থান। রামনগরে একটি সবরেজষ্টরি আফিস ও আছে। এই মহকুমা হইতে পাট, ছোলা, তিসি, লঙ্কা, মুগ কলাই, অড়হর, গম প্রধানতঃ রপ্তানি হয়। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ধান ও চাউল প্রধান। পূর্ব্বে অনেকগুলি গুড়ের কারখানায় চিনি প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হইত। কিন্তু দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় চিনির মূল্য কম হওয়ায় সেই সকল চিনিরকারখানা লোকসান পড়িয়া প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। কুমরি, বেলগাছি মমিনপুর প্রভৃতি গ্রামের জোলা ও তাঁতিগণ কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে কিন্তু তাহার পরিমাণ খুব কম।

চুয়াডাঙ্গা মহকুমা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে দৌলতগঞ্জ (জীবননগর) একটি মুনসেফী চৌকী ছিল, আর দামুরহুদায় ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে একজন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কয়েকজন ডেপুটী কালেক্‌টরের কাছারি স্থাপিত হইয়াছিল। নীলকরদিগের কর আদায়ের সুবিধা ও প্রজাদিগের কর বৃদ্ধির মোকদ্দমার বিচারের জন্য দামুরহুদায় এই সকল কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ

খুলিলে, সেই মুনসেফী কাছারি ও দামুরহুদার কাছারি উঠিয়া আসিয়া বর্ত্তমান চুয়াডাঙ্গা মহকুমা স্থাপিত হয়। পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সার চার্লস ইলিয়ট লাট সাহেবের আমলে চুয়াডাঙ্গা মহকুমা উঠিয়া গিয়া মেহেরপুরের সামিল হয় ; চুয়াডাঙ্গাতে তখন মাত্র একটী মুনসেফের কাছারি থাকে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হওয়া গবর্ণমেন্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করা হয়। পরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আবার চুয়াডাঙ্গা মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে। মহকুমা উঠিয়া যাইবার সময় কালুপোলে থানা উঠিয়া গিয়াছিল, আর জীবননগর থানা সদরের এলাকা ভুক্ত হইয়াছিল। মহকুমা পুনঃ স্থাপিত হইলে জীবনগর আবার চুয়াডাঙ্গায় ফিরিয়া আসিল, কিন্তু কালুপোলে আর আসিল না।

এই মহকুমার মধ্যে কোন প্রাচীন কীর্ত্তি নাই। চুয়াডাঙ্গা হইতে ২ মাইল পশ্চিমে উজিরপুর নামক গ্রামে একটি পুরাতন দীঘি আছে, ও পাকা কোঠার ভগ্নাবশেষ আছে। শুনা যায় নবাবী আমলে উজিরপুরে একটী কাছারি ছিল।

এক সময়ে চুয়াডাঙ্গার অধিকাংশ স্থান নাটোরের জমিদার প্রাতঃস্মরণীয়া ৺রাণীভবানীর এলাকাভুক্ত ছিল। এখন মাত্র ৭।৮ খানা গ্রাম সেই ষ্টেটের মধ্যে আছে। পরে নীলকরগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত এই মহকুমার মধ্যে মধ্যে আধিপত্য করিয়াছিল। তাহারা এই মহকুমাকে ছয়টী কুঠির এলকায় বিভক্ত করিয়া লইয়াছিল, যথা—নিশ্চিন্দীপুর কাচিকাটা, লোকনাথপুর সিন্দুরিয়া, খাড়াগোদা, পোড়াদাহ। ইহার মধ্যে নিশ্চিন্দীপুর ও কাচিকাটা লোকনাথ পুর ও সিন্দুরিয়া কুঠীর সাহেবগণ খুব প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারে যে প্রজাবিদ্রোহ হয়, জয়রামপুর ও আলোকদিয়াতে সেই সকল বিদ্রোহী প্রজার দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পরে নীলকরগণ প্রজাদিগের নামে করবৃদ্ধি ও নীলপাট্টার নালিস করিয়া তাহাদিগকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের সেই সকল মোকর্দ্দমার বিচারের জন্য কতকগুলি সিবিলিয়ান ও ডেপুটি কলেকটর নিযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু তবুও নীলের চাষ ক্রমশঃ কম হইতে লাগিল। নয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই মহকুমায় অল্প পরিমাণে নীলের চাষ হইতেছিল। পরে জার্ম্মণ কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় নীলের চাষ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বর্ত্তমান সময়ে মাত্র নিশ্চিন্দীপুর কন্‌সার্ণের মিঃ বার্কার ও হ্যামিলটন সাহেবদিগের জমিদারী আছে। কানাই নগরে তাঁহাদের সনে একটি কুঠী আছে। সিন্দুরিয়া কন্‌সার্ণের মালিক মিঃ সেরিফ সাহেব কয়েক বৎসর মারা গিয়াছেন। এই কুঠি এখন ঝিনাইদহের অন্তর্গত পোড়াদহ কুঠির অন্তর্গত হইয়া মিঃ ম্যাক্‌ডোলেন সাহেবের অধীনে আছে। এই সকল সাহেবগণ এখন কেবল জমিদারী করিতেছেন ; নীলের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে নিশ্চিন্দীপুর কন্‌সার্ণের জমিদারীই সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাঁহাদের আয় বার্ষিক প্রায় ১২৫০০০ লক্ষ টাকা। তাহার পরে শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পালচৌধুরী। এই মহকুমায় তাঁহার জমিদারীর আয় প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা তাহার পরে আমলা সদরপুরের সাহা বাবুদের জমিদারী ; তাহার আয় এই মহকুমায় পনর হাজার টাকা। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ছোট ছোট জমিদার ও তালুকদার আছেন।

এই মহকুমায় শতকরা প্রায় ৭৫ জন প্রজা কৃষিজীবি ; ১২ জন মজুর ; ৮ জন ব্যবসায়ী ও কর্ম্মচারী ; ৫ জন শিল্পী। কৃষিজীবি প্রজার মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ জন মুসলমান।

সৌভাগ্যের বিষয় এ মহকুমায় তেমন ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ১৮৬৫—৬৬ সালে। শুনা যায় তখন কোন গৃহস্থ ঘরের বাহিরে বসিয়া ভাত খাইতে পারিত না, পেটের জ্বালায় অন্য লোকে আসিয়া তাহা কাড়িয়া খাইত। সে বৎসর উড়িষ্যায়ও খুব ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল সুতরাং তাহা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ। তাহার পর ১৮৮৯, ১৮৯৭ ও ১৯০৬ সালে অল্পপরিমাণে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। অল্পপরিমাণে সাহায্য বিতরণেই লোকের কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল।

১২৭৮ সনে ইং ১৮৭১-৭২ সনে খুব ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল। তাহাতে রেলের রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইহার পরে আর তেমন বড় বন্যা হয় নাই। তবে ১৮৭৯, ১৮৯২, ১৮৯৭ সনেও নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্লাবিত হইয়াছিল।

চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত আন্দুলবেড়িয়া ভৈরব নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে একটী বন্দর ছিল এক্ষণে নদীর অবস্থা মন্দ হওয়ায় গ্রামখানিরও হানী ঘটিয়াছে।

আন্দুলবেড়িয়া

"নবদোয়া" নামে একটী হ্রদ এখানে আছে দোয়ায় নবাই সন্ন্যাসী নামক একজন সিদ্ধ পুরুষ দোয়ার জলমধ্যে বাস করিতেন এবং জল হইতে কখন কখন উঠিতেন। জীবনের অধিকাংশ সময় জলমধ্যে থাকিয়া ধ্যান-নিরত রহিতেন। তাঁহার দেহাবসানে লোকে ঐ জলাশয়কে পবিত্র ও সিদ্ধ স্থান বলিয়া প্রতি বৃহস্পতিবারে পূজা দিয়া থাকে। অত্রস্থ খোদা ফারাসের কবরেও হিন্দু মুসলমান সকলেই মানসিক পূজা দিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে ভৈরবের তীরে শ্মশানের নিকট একটী মেলা বসিয়া থাকে ও গঙ্গা পূজা হয়। প্রাচীনবংশাবলীর মধ্যে সরকার বংশের নাম উল্লেখযোগ্য সীতানাথ দাই নামক একব্যক্তি ও তাঁহার ৫। ৬ ভাই সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ।

চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত এই গ্রামখানি ইতিপূর্ব্বে ভৈরব নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল এক্ষণে গ্রাম প্রান্ত হইতে নদী দূরে সরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে

কুড়চাডাঙ্গা

এখানে বহু সিদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও গ্রহবিপ্রগণের আবাস ছিল। বহুপূর্ব্বে রামব্রহ্ম রায় এখানকার জমিদার ছিলেন তাঁহার দত্ত ব্রহ্মোত্তর অদ্যাপী অনেক ভোগ করিতেছেন। দুর্গারাম বিদ্যাবাগীশ একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে গ্রামখানির আর পূর্ব্বের সমৃদ্ধির চিহ্নও নাই। একটি অতি সুন্দর গঠিত প্রাচীন মন্দির ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়া গ্রামখানির পূর্ব্বসমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। এই মন্দিরটি ব্যতীত ইহার চতুসীমানায় আর কোনও ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ দেখা যায় না প্রবাদ আছে যে তরফ আন্দুলবেড়িয়া সামিল যে কয়েকখানি গ্রাম আছে তাহার বাসগৃহের নিমিত্ত কেহ ইট পোড়াইতে বা পাকা ইমারত করিতে পারিবে না। খোদা ফারাস নামক প্রাগুক্ত সিদ্ধ ফকীরকে ইট দিয়া প্রহার করায় তাঁহার মৃত্যু হয়, মৃত্যুর

পূর্ব্বে তিনি অভিসম্পাত করেন যে তরফ আন্দুল বেড়িয়ার বাস গৃহের জন্য কেহ ইষ্টক পুড়াইলে সে সবংশে নিধন পাইবে তদবধি এখানে কেহ পাকা ইমারত প্রস্তুত করে নাই। আন্দুল বেড়িয়া গ্রামে খোদা ফারাসের গোর ইষ্টক নির্ম্মিত।

মেহেরপুর

নদীয়ার অন্যান্য প্রাচীন স্থানগুলির মধ্যে মেহেরপুর অন্যতম প্রাচীন গ্রাম। কেহ কেহ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের কালে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এই স্থানটিকে মিহির-খানার বাসস্থান বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন এবং মিহিরের নাম হইতে মিহিরপুর, অপভ্রংশে মেহেরপুর নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন।

গ্রামখানি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫ মাইল লম্বা। গ্রামের পশ্চিম দিকে ভৈরবনদ প্রবাহিত। পূর্ব্বে এই ভৈরব প্রকৃতই ভৈরবনদ ছিল, এক্ষণে ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রামখানি মুখোপাধ্যায় পল্লী, মল্লিক পল্লী প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি পল্লীতে বিভক্ত। অধুনা এখানে আনন্দবাজার,, কালীবাজার, বড়বাজার ও বৌবাজার নামে চারিটী বাজার বিদ্যমান।

বহু পূর্ব্বে মেহেরপুরে গোয়ালাচৌধুরী উপাধী-ভূষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ বাস করিতেন; ইঁহাদের প্রধান ছিলেন রাজা রাঘবেন্দ্র ও রাজুঘোষাণী (ইহার নাম হইতে রাজপুর পরগণার নাম হইয়াছে) তাঁহাদের সাক্ষরিত সনন্দ, কোবালা, দানপত্র প্রভৃতি দলিলাদি অনেক গৃহস্থের ঘরে আছে। কথিত আছে বর্গীর হাঙ্গামা কালে মহারাষ্ট্রগণের অন্যতম নেতা রঘুজী ভোঁসলার সহিত যুদ্ধে এই বংশীয়েরা সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েন। চৌধুরীদিগের নিধনের পর বহুদিন তাঁহাদের অধিকৃত মেহেরপুরের অন্তর্গত প্রসাদোপম অট্টালিকাদি ক্রোশৈকদূরস্থ সুবিস্তীর্ণ গড়ভূমি, দীর্ঘিকা ইত্যাদি বনাকীর্ণ হইয়া ছিল, এবং প্রয়োজন হইলেও কেহ কখন ইহার ইষ্টকাদি ব্যবহার করিত না। সাধারণের মনে ইহাই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, চৌধুরী বংশের ইষ্টকাদি লইলে কাহারও শুভ হয় না; কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালটী স্থাপিত হইলে এই আবাসভূমির মধ্যেই মিউনিসিপাল আপিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস, জমীদারী কাছারি এবং দুই এক ঘর গৃহস্থেরও বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। দীর্ঘিকাটী মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক পুনঃসংস্কৃত হইয়া পানীয় জলের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ত্তমান কালে এই আবাস বাটীর অনতিদূরে একটি সুগঠিত প্রাচীন শিবমন্দির এবং গোয়ালা চৌধুরীদিগের একটি কালীমন্দির আজিও বিদ্যমান আছে।

প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী যখন রাজপুর পরগণের অধিকারিণী হয়েন, তখন

মেহেরপুরেরও তিনি অধিশ্বরী হয়েন। সেইকালে তাঁহার দত্ত ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, দেবোত্তর প্রভৃতির বহু সনন্দ আজিও লোকের গৃহে থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

রাণী ভবানীর হস্ত হইতে মেহেরপুর কাশিমবাজারাধিপতি হরিনাথ কুমারের হস্তে আসে। পরে হরিনাথের পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ এই ডিহি মেহেরপুর Mr. James Hill নামে এক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নিলকুঠিয়ালকে পত্তনী দেন। James Hill এর সহিত নীল হাঙ্গামাকালে অত্রস্থ জমিদার মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের বিবাদ বাধিয়া উঠে।

মুখোপাধ্যায় বাবুদের বংশের গজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় আসিয়া মেহেরপুর বাস করেন। গজেন্দ্র বাবু একজন বিশিষ্ট ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইহার ঘনশ্যাম, গোলক, আনন্দ, গোবিন্দ, অনুপ, ও বীরেশ্বর নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য ও কার্য্যক্ষম ছিলেন। গজেন্দ্র বাবু পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্রগণ একযোগে বিষয় কার্য্যের বহু উন্নতি সাধন করেন। এই সময়ে নদীয়ায় নীলের আবাদের বিলক্ষণ প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার ১২০টী নীল কুঠী স্থাপনা করেন। জ্যেষ্ঠ ঘনশ্যামের মৃত্যুর পর ইহাদের বিষয়ের আয় ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগের পর গোলকের তিন পুত্র মথুরা লাল, রামচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ নীলকুঠী চালাইয়া স্ব স্ব বিষয় আরও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মথুরানাথ অতিশয় বুদ্ধিমান বিধায়, মুখোপাধ্যায়গণের ষোল আনা রকম বিষয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া এতদঞ্চলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার বাবুয়ানা সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। শুনা যায় একবার ইহার জনৈক ভৃত্য কলিকাতার বাজারে গিয়া প্রসিদ্ধ ছাতু বাবু লাটু বাবুর ভৃত্যের সহিত বাদাবাদি করিয়া ১০০ শত টাকা দিয়া একটী রোহিত মৎস্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। এই সূত্রে ছাতু লাটু বাবুর সহিত পরে তাঁহার সবিশেষ সদ্ভাব হয়। বারয়ারি উপলক্ষে ইনি খুব সমৃদ্ধি সহকারে মহিষমর্দ্দিনীর পূজা করিতেন। একবার এতদুপলক্ষে আগত স্বনামখ্যাত কবি হরু ঠাকুর গাহিয়াছিলেন :—

মুখোপাধ্যায় বংশ

"সত্যযুগে স্বরত রাজা, করেছিল দেবী পূজা
ত্রেতাযুগে রাম।
কলিযুগে মথুর নাথে, সদয় হল ভবাণী,
এমনি পূজার ঘটা মেহেরপুরে মহিষমর্দ্দিনী॥"

১২৪৮ সালে জেম্স হিল মেহেরপুর পত্তনী লইলে মথুর বাবুর সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে মথুরবাবু কতকটা মালের জমি নিজ দখলে আনিবার জন্য এক রাত্রির মধ্যে প্রায় ৪০ চাল্লিশ বিঘা জমি রেল দিয়া ঘিরিয়া লইয়া তাহার পশ্চিম পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী খনন ও কামরা ঘর প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ বৃক্ষাদি রোপণ ও বাগিচা প্রস্তুত করেন। অদ্যাপি সে রেল বাগানটী মথুর বাবুর রেল বাগান নামে প্রসিদ্ধ। মথুর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবকৃষ্ণ বাবু গ্রামস্থ রামমোহন মৈত্র, কেদারনাথ

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বুদ্ধিমান ও বলশালী লোকের সহায়তায় বহু সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ সৈন্য লইয়া দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত জেমস্ হিলকে মেহেরপুর বেদখল রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়ের পোষ্য পুত্রের মকর্দ্দমা লইয়া মুখোপাধ্যায় বংশের মধ্যে গৃহ বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই কালে মথুর বাবুর মৃত্যু হওয়ায় নবকৃষ্ণ বাবু একাকী জেমস্ হিলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কৌশলী হিল মথুর বাবুর পুত্র চন্দ্রমোহন বাবুকে তোষামদে সন্তুষ্ট করিয়া এবং তাঁহার উপযুক্ত নজরানা দিয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলে নবকৃষ্ণ বাবুর সহিত তাঁহার মনান্তর হয় এবং নবকৃষ্ণ বাবু স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া বহরমপুর প্রস্থান করেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। এক্ষণে নবকৃষ্ণ বাবুর একটী দৌহিত্র, মথুরা বাবুর একটী প্রপৌত্র, পদ্মবাবুর দুটী প্রপৌত্র ও অপর প্রপৌত্রের চারিজন পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।

নবকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুর পর জেমস্ হিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে এমন লোক মেহেরপুরে না থাকায় ১২৬০ সালে জেমস্ হিল সম্পূর্ণরূপে মেহেরপুর দখল করিয়া লয়েন এবং এখানে তখন রাজকীয় বিচারালয় না থাকায় নিশ্চিন্তপুরের কুঠীতে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে মেহেরপুরে প্রজাপীড়ন করিতে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ মহেশ মুখোপাধ্যায়, যিনি নীলদর্পণে 'গুপে' নামে খ্যাত, জেমস্ হিলের মন্ত্রী ছিলেন। বর্ত্তমানকালে এই বংশের উল্লেখযোগ্য বংশধরগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় M. A. ও জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

মল্লিক বংশ

মুখোপাধ্যায় বংশের যখন দোর্দ্দাণ্ড প্রতাপ, তখন এখানকার অন্যতম জমিদার কৃষ্ণকান্ত মল্লিক আসিয়া মেহেরপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কৃষ্ণকান্ত-পুত্র নন্দকুমার অন্যূন লক্ষাধিক টাকা লাভের জমিদারী করিয়াছিলেন। ইহার ছয় পুত্র। তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্রের অকালে মৃত্যু হইলে, নন্দকুমার শোক শন্তপ্ত হইয়া পুত্রের নামে আনন্দ বিহারী বিগ্রহ স্থাপনা করেন অদ্যাবধি তাঁহার সেবা চলিয়া আসিতেছে। নন্দকুমার পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পঞ্চ পুত্র তুল্যাংশ বিষয় বন্টন করিয়া লয়েন। তিনি অতিথিসেবা স্থাপনা করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যান এবং বাটীতে ধূমধামের সহিত বার মাসে তের পার্ব্বণের ব্যবস্থা করিয়া যান। নবকৃষ্ণের পুত্র পদ্মলোচন কাশিমবাজারের কৃষ্ণনাথ কুমারের এষ্টেটের কিছুদিন ম্যানেজারি করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারও নানারূপ উচ্চপদস্থ কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া বহু অর্থোপার্জ্জন করেন। পদ্মলোচন এইরূপে কিছুদিন রাজসরকারে কার্য্য করিয়া পরে নিজ এষ্টেটের কার্য্য পরিদর্শনে মেহেরপুরে চলিয়া আসেন। সাধারণ লোক মাত্রেই তাঁহাকে গ্রামের মণ্ডল বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় দয়াবান ও কীর্ত্তিমান ছিলেন। এই বংশীয় ৺রমনীমোহন মল্লিক মহাশয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি পদ্মলোচন বাবুর পৌত্র ছিলেন। বর্ত্তমান কালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মল্লিক মহাশয় একজন সদাশয় ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত। এই বংশের বড়

তরফের উত্তরাধিকারী দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। পূর্ব্বে মুখোপাধ্যায় ও মল্লিক বংশের আশ্রয়ে উভয় পক্ষের দলভুক্ত আশ্রিত প্রায় ৪০০ ঘর ব্রাহ্মণ, শতাধিক ঘর কায়স্থ, পঞ্চাশৎ ঘর বৈদ্য, অসংখ্য নবশায়ক, ও অন্যান্য জাতি মেহেরপুরে বাস করিতেন। গ্রামে কয়েকটী সংস্কৃত টোল এবং পারসী ও আরবী বিদ্যালয়, এবং লাঠী ও সড়কী খেলার অনেক গুলি আখড়া বিদ্যমান ছিল। মুখোপাধ্যায় বংশের ন্যায় ইঁহাদের বংশেও পদ্মলোচনের ভ্রাতা কেশব বাবুর অপুত্রক মৃত্যু হইলে, পোষ্যপুত্র গ্রহণ উপলক্ষে গৃহবিবাদ বাধিয়া যায়। এই মকর্দ্দমার সময় পদ্ম বাবুকে জেমস হিল নানারূপে সাহায্য করায় পদ্মবাবুর ইচ্ছা থাকিলেও নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষ লইয়া হিলের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারেন নাই।

মুখোপাধ্যায় ও মল্লিকবংশের প্রতিপত্তিকালে মেহেরপুরের যেমন জাঁকজমক ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। ১২৬৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাহার মহামারীতে অসম্ভব লোকক্ষয় হওয়ায় গ্রাম হতশ্রী হইয়া পড়ে; পরে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানে মহকুমা স্থাপিত হইলে বিদেশী লোক লইয়া ইহার জনসংখ্যা কথঞ্চিত বৃদ্ধি পাইলেও পূর্ব্বের সে শ্রী আর ফিরিয়া আসে নাই।

এখানকার অন্যান্য প্রাচীন বংশাবলীর মধ্যে কায়স্থ বংশের ঘোষ ও দত্ত, বৈদ্য বংশের সরকার ও মজুমদার এবং ব্রাহ্মণ বংশের চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা এবং তিলিকুলে পাল ও রায়গণ উল্লেখযোগ্য। রায়েরা বহুদিনের প্রাচীনবংশ। এতদ্বংশীয় সন্তোষ রায় গোয়ালা চৌধুরীদের দেওয়ান ছিলেন। এই বংশের যদুনাথ রায় ও ব্রজনাথ রায় মহাশয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সুলেখক দীনেন্দ্র কুমার রায়, ব্রজবাবুর পুত্র। মজুমদার বংশের সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে কথিত আছে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে ধাতু-ফলকে খোদিত এক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন[২২] আরও কথিত আছে বহু পুরাকালে ইহাদের গৃহে একটী ডাকিনী আসিযা ছদ্মবেশে কিছুদিন বাস করার পর আত্ম প্রকাশ হইলে ঐ ডাকিনী গৃহস্বামীকে একখানি খড়্গ প্রদান করিয়া ইহাদের গৃহ পরিত্যাগ করেন। অদ্যাপি সেই খড়্গ যথোচিত ভক্তি ও সম্মান সহকারে পূজিত হইয়া আসিতেছে। উপস্থিত দুইটী মাত্র বিধবা ব্যতীত এ বংশের আর কেহই পরিচয় দিবার নাই।

এস্থানের উৎপন্ন ও উল্লেখযোগ্য সামগ্রী— খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে রসকদম্ব, ক্ষীরের মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বলরাম হাড়ীর আড্ডার ভজন সম্প্রদায়ের আখড়া, গোয়ালা চৌধুরীদিগের মন্দিরাদি, ঘোষ বংশের শিবমন্দির, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ও আদালত গৃহ উল্লেখযোগ্য। এখানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা নাই, তবে ১৯১০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গের ছোটলাট সার্ এডওয়ার্ড নর্ম্মান বেকার মহোদয় নদীয়া পরিদর্শনে আসিয়া দরবারে বক্তৃতা কালে কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়ে খুলিবার আশা দিয়া গিয়াছেন। উক্ত রেল খুলিলে জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়।

মেহেরপুরের অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে ভৈরব নদ তটস্থ পীরোজপুর একখানি প্রাচীন গ্রাম। বহু পূর্ব্বকালে এখানে শাহ এনাত নামে এক সিদ্ধ ফকীর বাস করিতেন। এই গ্রামে তাঁহার সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা বুড়া দেওয়ানের দরগা নামে খ্যাত। তাঁহার সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে ভক্তেরা তাঁহাকে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বা উপহার প্রদান করিত তৎসমুদয় তিনি ভৈরবে নিক্ষেপ করিতেন এবং কেহ কিছু যাচঞা করিলে তিনি ভৈরবকে আজ্ঞা দিয়া উহা প্রত্যর্পণ করিতেন। ভৈরবও নত মস্তকে আজ্ঞা পালন করিত। অত্রস্থ মোল্লাবংশের বীরু মোল্লাও একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত। ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন। ইহার সম্বন্ধেও বহু কিম্বদন্তী শুনা যায়। পীরোজপুর পশ্চিম পল্লীতে যে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত একটি মসজীদ দেখা যায় উহা ইহার ভ্রাতা হীরু মোল্লার নির্ম্মিত। হীরু মোল্লার প্রপৌত্র লক্ষণ মোল্লা এখনও পীরোজপুরে বাস করিতেছেন।

পীরোজপুর

নবদ্বীপ

নবদ্বীপ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু কথাই ইতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রামখানি যাহা এক্ষণে নবদ্বীপ নামে পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপ কি না, এবং তাহা না হইলে ঐ প্রাচীন নবদ্বীপের স্থানই বা কোথায়, এবং স্থান সম্বন্ধে কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকিলে, তাহাই বা কবে হইয়াছে, অথবা আদৌ ঐরূপ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে বহুদিন হইতে বহু বাদানুবাদ হইলেও এ সম্বন্ধে যে অভ্রান্ত সত্য তথা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে স্থুলতঃ আদি নবদ্বীপের যে বহুবার স্থান পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং কিছু দিন পূর্ব্বেও যে নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান গুলি গঙ্গার পূর্ব্বকূলে স্থাপিত ছিল, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[২৩] এমন কি পাশ্চাত্য জাতিরগণের অঙ্কিত নানা ভাষায় লিখিত মানচিত্রেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নবদ্বীপেই মহম্মদ-ই-বখতিয়ার আসিয়া লক্ষণ সেন দেবকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত করেন।[২৪]

এই নবদ্বীপেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কাণভট্ট শিরোমণি, স্মার্ত্ত প্রধান রঘুনন্দন, তন্ত্রবিৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শঙ্কর তর্কবাগীশ[২৫] আনন্দরাম তর্কবাগীশ (যিনি অর্ঘ্যদানের সুবিধার জন্য কোশার মুখ বিস্তারিত করিয়া ছিলেন এবং সেই জন্য কোশার নাম আনন্দার্ঘ্য হয়) প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যশঃ ও খ্যাতি জগৎব্যাপী করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইহাদের কে কোথায় কোন স্থানে জন্ম

পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বা বাস করিতেন সে সকলের সঠিক নির্দ্দশন পাইবার কোনও উপায় নাই, এমনকি ইহাদের অধিকাংশের বংশ পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে।[২৬] সম্প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভিটা আবিষ্কারের চেষ্টা কেহ কেহ করিতেছেন এবং কেহ কেহ বর্ত্তমান নবদ্বীপের পরপারে মায়াপুর নামক স্থানে তাঁহার জন্মভূমি নির্দ্দেশ করিয়া তথায় তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

নবদ্বীপের তলবাহিনী ভাগিরথী ও জালাঙ্গী বহু প্রাচীনকাল হইতে এত অধিকবার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে যে নবদ্বীপ-মণ্ডলের চতুঃসীমান্তবর্ত্তী ৮।১০ মাইলের মধ্যে কোথায় গঙ্গা বা জালাঙ্গী বা তাহাদের শাখা ছিল এবং কোথায় না ছিল তাহা বলা সুকঠিন। এই ৮।১০ মাইলের মধ্যে অসংখ্য স্রোত ও জলহীন খাদ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ গ্রামখানি যেবার একটু অধিক পরিমাণে বন্যার জল বৃদ্ধি পায় সেই বারই জলে পূর্ণ হইয়া যায় এই প্লাবন নিবারণার্থ কোনও সময়ে গ্রামের চতুষ্পার্শে বাঁধ বাধা হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে ঐ বাঁধের অবস্থা অতি শোচনীয়; ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার্ জন উড বরণ বাহাদুর যখন নবদ্বীপ পরিদর্শনে আগমন করেন তখন ঐ বাঁধ মেরামতের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি গ্রামের লোক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিলে সদাশয় গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু উভয় পক্ষই এ বিষয়ে তদবধি আর কোনওরূপ মনোযোগ প্রদান করেন নাই।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতেই এই স্থানটি হিন্দু বৈষ্ণবগণের নিকট পরম সমাদরের স্থান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের চক্ষে ইহার মহিমা শ্রীবৃন্দাবনের তুল্যাঙ্গতুল্য এবং সেই কারণে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে এই স্থানে জীবনের অবশিষ্টকাল বাস করিতে দেখা যায়। হেষ্টিংসের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ জীবনে সোপার্জ্জিত অতুল বিত্ত বৈভব, নিজ পুত্র লালাবাবুকে অর্পণ করিয়া দুই তিন শত বৈরাগী সঙ্গে এই নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপ সন্নিহিত রামচন্দ্রপুরে একটি ৬০ ফুট উচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অতিথি অভ্যাগত বৈষ্ণবাদির সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় উহা চিহ্নরহিত হইয়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেনসিয়া এখানে একটী মুসলমান কলেজ দেখিয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত শ্রীমন্দিরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে দেখা যায়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এইখানেই সর্ব্বপ্রথম কলেরা রোগের সৃষ্টি হইয়া ক্রমে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উহা ভারতব্যাপী এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চীনে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আরব ও পারস্য, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রুসিয়া, প্রুসিয়া এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে বিস্তারিত হইয়া পড়ে।[২৭]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব গ্রন্থ সমুদয়ের নবদ্বীপের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে, তদানীন্তন নবদ্বীপকে অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সেই পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সহস্রাংশের এক অংশও অধুনা বিদ্যমান নাই। নদীর গতি পরিবর্ত্তনে

সহিত নগরের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং কালের ক্রীড়ায় ইহা একরূপ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে একজন সাহেব এখানে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের উপদ্রবের কথা লিখিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ডরাটর লেডন, যিনি কয়েক মাস নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সার এস ব্যাকোল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি এখানে সর্ব্বদাই ব্যাঘ্রাদি শীকারে নিযুক্ত রহিতেন।

নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জহ্নু নগরে পূর্ব্বে প্রতিবৎসর ভাদ্রীয় সংক্রান্তিতে একটী বৃহতী মেলা হইত, এখনও উহা গাছপূজা নামে প্রচলিত এবং প্রতি বৎসর ঐ দিনেই হইয়া থাকে।[২৮] কথিত আছে এই স্থানেই জহ্নুমুনি একগণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। এখানে এক গৃহস্থের বাটীতে একটি কামধেনু ছিল এবং বহু লোকে উহার পূজা করিত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দেও এখানে অন্যূন ৩০টী সুন্দর শ্রীমন্দির ও একশত সংস্কৃত টোল বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে মন্দিরের সংখ্যাও অতি অল্প এবং টোলের সংখ্যা মাত্র পঞ্চদশ। পণ্ডিতের সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

১২২৬ সালের হটু ঘটকের তত্ত্বাবধানে এক বিরাট কালীকা মূর্ত্তি গঠন করিয়া বহু জাঁকজমকের সহিত এক বিরাট বারোয়ারী পূজা হইয়াছিল ইহা অদ্যাবধি এখানে হটুঘটু পূজা বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এখানে খৃষ্টান পাদরী সাহেবগণ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। তৎপূর্ব্বে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ ডিয়ার সাহেব এখানে কোন কোন বালককে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। বর্ত্তমান কালে এখানে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; ছাত্র সংখ্যা অন্যূন দুইশত।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একজন প্রতারক "গোপাল পাইয়াছে এবং ঐ গোপালের আদেশে মৃতব্যক্তিগণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া ১৬ই আশ্বিন যমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিবে" বলিয়া এক হুজুক তুলিয়াছিল। বহু অশিক্ষিত নরনারী তাহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই দিনে মৃত আত্মীয়গণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় হইতে এখানে বহু কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের এখানকার বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে শ্যামা বাউলের নাম সুপ্রসিদ্ধ। শ্যামা নবদ্বীপাধিপতি গিরীশচন্দ্রের সমসাময়িক। প্রেমিক ভক্ত শ্যামের মধুর কণ্ঠে তদানীন্তন আবাল বৃদ্ধ বনিতা মুগ্ধ ছিল, এখনও প্রাচীনাদের নিকট শুনা যায়—

"বাজলো শ্যাম বাউলের খোল,
যত মাগী চরকা তোল।"

এখানকার উল্লেখযোগ্য বংশাবলীর মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বরেণ্য ঋষিকল্প পণ্ডিত মণ্ডলীর মহিমান্বিত নামাবলী ও সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়াদি ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এখানকার গোস্বামী মহোদয়গণ শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈত বংশের শাখা, ভক্তশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় ব্রজানন্দ গোস্বামী প্রভুর বংশ, মণিপুরের রাজবংশ, কাংস্যবণিক কুলোদ্ভব কীর্ত্তিমান

গুরুদাস দাস মহাশয়ের বংশ, রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের বংশ, বাবু তারিণী-চরণের বংশ, প্রসিদ্ধ যাত্রাকার পণ্ডিত ৺মতিলাল রায় ও তৎপুত্র কৃতী ধর্ম্মদাস রায় প্রভৃতির বংশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য, যথা—অত্রস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিভিন্ন চতুষ্পাঠী সকল, ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন স্থাপিত হরিসভা ও চতুষ্পাঠী, ৺পোড়ামাতা সিদ্ধেশ্বরী, ৺ভবতারণ ও ভবতারিণীর মন্দির, ৺পাড়ার মা, ৺বুড়োশিব, ৺আগমেশ্বরী মাতা, ৺শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির, শ্রীবাস আঙ্গিন[২১] প্রভৃতি। বিভিন্ন বৈষ্ণবপাটাবলী, এবং গঙ্গার পরপারস্থিত মায়াপুর ও তথাকার শ্রীমন্দিরাদি এবং চাঁদ কাজীর কবর। বল্লাল দিঘী ও টিবী ও স্থবর্ণ বিহার ও তত্রস্থ প্রাচীন রাজবাটীর লুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষ।

সভাসমিতির মধ্যে "বঙ্গবিবুধ জননী সভা ও গঙ্গাটিকুরী-বাসী স্বনাম-খ্যাত ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থাপিত "নবদ্বীপ সমাজ" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবি-বুধজননী সভার পূর্ব্ব নাম সংস্কৃত বিদগ্ধ-জননী সভা। ইহা প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, ডি এল কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তখন ইহার সভাপতি ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, সম্পাদক সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম ছিলেন। পরে মহেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর ঐ সভা বঙ্গ বিবুধজননী সভা নামে খ্যাত হয় এবং নদীয়াধিপতি মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র ঐ সভার সভাপতি হয়েন। পরে সভাগণের সহিত মহারাজের কতকগুলি বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিলে ৪।৫ বৎসর ইহা স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে রক্ষিত হয় তৎপরে বঙ্গের স্থকৃতি সন্তান স্থপণ্ডিত, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী এম এ; ডি, এল; এফ, আর, এস, ই, মহোদয় ঐ সভার সভাপতি হইয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য, সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার, উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ। নবদ্বীপ সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দুসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কারসাধন ও ব্রাহ্মণেতর জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। ইহার বর্ত্তমান মন্ত্রী শ্রীহরিদাস ন্যায় সিদ্ধান্ত।

নবদ্বীপের উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পিত্তল কাংস্যের সামগ্রী, মাটীর বাসন, তুলসীর মালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নদীয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মধ্যে মায়াপুর, স্বরূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য। একশ্রেণীর ব্যক্তি বিশেষের নিকট মায়াপুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মায়াপুর

মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া পূজিত। তাঁহাদের মতে ইহা অষ্টক্রোশ পরিমিত নবদ্বীপ মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলী। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পর, নদীর গতি পরিবর্ত্তনাদি নানা কারণে ইহা কিছু কাল পরিত্যক্ত পল্লীর ন্যায় লুপ্তভাবে ছিল, এক্ষণে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে; এই মতের পরিপোষকগণের মধ্যে স্বনামখ্যাত শিশির কুমার ঘোষ, শ্রীকেদার নাথ দত্ত প্রভৃতি প্রধান। সম্প্রতি

শ্রীশ্রীগৌরও বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য সেবা এখানে স্থাপিত হইয়াছে। এখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মযাত্রা উপলক্ষে কয়েক বৎসর হইতে একটী মেলা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে বিখ্যাত চাঁদ কাজির সমাধির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এখানে অদ্যাপীও অসংখ্য তুলসীবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। উহা বিনা আয়াসে, আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে।

মহেশগঞ্জ

খড়িয়া (জলঙ্গী) নদীর উপরেই স্থাপিত। উপস্থিত ইহা একটী ক্ষুদ্র পল্লী, জমিদার নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ও ইংলণ্ড প্রত্যাগত কৃতবিদ্য ও স্বদেশহিতৈষী জমিদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের পিতা স্বর্গীয় মহেশ বাবুর নামে স্থাপিত, এখানে বিপ্রদাস বাবু নূতন আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, এবং তিনি এখানে কল কারখানা স্থাপিত করিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত প্রথায় বাসনের কারখানা ও নদীয়া টেনারী নামে জুতার কারখানা স্থাপিত করিয়াছেন। মেহেরপুর হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত রেল খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে ; এই রেল গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়া রেলের সহিত সংযুক্ত হইবে।

স্বরূপগঞ্জ

জলঙ্গীর উপরে স্থাপিত, ইহা শিবনিবাসের জমিদার স্বর্গীয় স্বরূপচন্দ্র সরকার চৌধুরীর নামে স্থাপিত। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তি বিনোদ মহোদয় এখানে একটী আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সুখদ-কুঞ্জ নামে অভিহিত করিয়াছেন ও তথায় বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

বিল্বপুষ্করিণী

একটী ক্ষুদ্র পল্লী হইলেও এখানে পূর্ব্বে বহু পণ্ডিতের আবাসস্থান ছিল, এক্ষণে পণ্ডিতের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। অধুনা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ তর্করত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভাজনঘাট

নদীয়া জেলার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান ; এখানে পূর্ব্বে বহু বৈদ্যের বাস ছিল, এক্ষণেও বহু বৈদ্য এখানে বাস করিয়া থাকেন। রাই-উন্মাদিনীপ্রণেতা প্রেমিক কবি স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর আবাসস্থল। এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণের নাম উল্লেখযোগ্য। সুলেখক ও সুচিকিৎসক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ধন্বন্তরীকল্প কবিরাজ স্বর্গীয় লক্ষ্মণ চন্দ্র কবিভূষণ, এবং স্বনামখ্যাত শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া জেলা নদীয়ার একটি অতি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রাম না হইলেও ইহা জনসংখ্যাধিক্যে ও বিস্তৃতিতে নদীয়ার সর্ব্বপ্রধান মহকুমা। এখানকার অধিবাসীগণের ১৫ আনা ভাগ মুসলমান এবং কৃষিকার্য্যই তাহাদের প্রধান অবলম্বন।

নবাব মুরসিদকুলির সময়ে যখন অগ্রদ্বীপ পাটুলির রাজগণের এলেকাধীন ছিল এবং যখন এখানকার শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউব মেলায় প্রতি বৎসর অন্যূন একলক্ষ লোকের সমাবেশ হইত, তখন এখানকার এই অসাধারণ জনতায় পিষ্ট হইয়া কতকগুলি লোক প্রাণত্যাগ করে এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি এইরূপ অকারণ নরহত্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া যখন ঐ স্থানের জমিদারকে শাস্তি দিবার জন্য, অগ্রদ্বীপ কোন জমিদারের জমিদারীভুক্ত এই বিষয় জমিদারগণের পক্ষের মোক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন, কি জানি প্রভুর কি শাস্তি হইবে মনে করিয়া উক্ত জমিদারের মোক্তার অন্যান্য মোক্তারগণের সহিত ঐ স্থান তাঁহার মনিবের নহে এই কথা বলায় নবদ্বীপাধিপতির সুচতুর মোক্তার এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে কাতরকণ্ঠে, উহা তাঁহার মনিবের এলেকাধীন স্বীকার করিয়া, যথাবিহিত উত্তর দানে নবাবের ক্রোধ শান্তি করিয়া চতুরতাফলে অগ্রদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভুকে জ্ঞাপন করেন। তখন নদীয়ার রাজা, শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউকে এইরূপ অপ্রত্যাশিতরূপে স্বীয় তত্ত্বাবধানে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করেন এবং তাঁহার সেবার নিমিত্ত বর্ত্তমান কুষ্টিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রাম দেবসেবায় অর্পণ করেন ও ঐ সকল স্থানের নাম রাখেন গোপীনাথবাদ। এই গোপীনাথবাদই বর্ত্তমান কালের কুষ্টিয়া। ইহা বর্ত্তমান নদীয়া জেলার উত্তর সীমায় পদ্মা ও গড়ুই নদীর সংযোগ স্থলের কিছুদূরে গড়ুইএর উপর অবস্থিত, এবং জেলা ফরিদপুর ও যশোহরের সহিত সংশ্লিষ্ট; এখানকার কোনও কোনও স্থানের অধিবাসীগণের বাগ ভঙ্গী পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসী গণের ন্যায়। ইহার এলেকাধীনে যে সমস্ত নদী আছে তাহাদের মধ্যে গড়ুই ও কালীগঙ্গা প্রধান।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ সর্ব্ব প্রথম এই কুষ্টিয়া পর্য্যন্তই স্থাপিত হয়। এই রেলস্থাপিত হওয়ার পর হইতেই এবং মহকুমা স্থাপিত হইয়া ইহা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। মধ্যে এই কুষ্টিয়াকে সেন্টার (Center) করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী জেলা হইতে দুএকটী করিয়া মহকুমা লইয়া, উহাকে কুষ্টিয়া জেলা নামে একটি স্বতন্ত্র জেলা করিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু পরিশেষে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়।

সমগ্র কুষ্টিয়ায় ধান, খর্জ্জুর ও ও পাটের চাষের বিলক্ষণ প্রসার। নিজ কুষ্টিয়ার কাপড় ও ছিট এক্ষণে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় বিগত ১৯০৭ সাল হইতে এক লক্ষ টাকা মূলধনে এখানে "মোহিনী মিল" নামে একটী কাপড়ের কল

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোহিনী বাবুর তত্ত্বাবধানে ইহা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এই কলের কাপড় অন্যান্য কাপড়ের সহিত যেমন প্রতিযোগীতায় শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তেমনি মূল্যেও অসাধারণ সুলভ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কুষ্টিয়ার সাহেবী একটী কারখানায় আকের রস বাহিরের জন্য বিহিয়া প্যাটরন নামে এক প্রকার কল প্রস্তুত হইতেছে।

এখানকার মধ্যে দ্রষ্টব্য, হাই স্কুল, কেনিস কন্সারণ বা নৈকীদালান, রাজকীয় অফিস গৃহাদি ও চর্চ্চ মিসিনারী সোসাইটির শাখা বিভাগ ও গোরস্থান।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই গোর স্থানটী তদানীন্তন লর্ড বিশপ মহামতি কটনের পবিত্র পদস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, এই উপলক্ষে সেইদিন এখানে এক উৎসবের আয়োজন হয়। এই উৎসব সমাহিত হইলে ঐ দিন রাত্রিকালেই শ্রদ্ধাভাজন বিশপ কটন একখানি পিচ্ছিল অপরিসর সিঁড়ি দিয়া জাহাজে উঠিতে গিয়া পা পিছলাইয়া চিরদিনের জন্য নদীবক্ষে নিমজ্জিত হয়েন। এই বিষাদময় শোচনীয় ঘটনা সার্ব্বজনীন শোকের ঘটনা বলিয়া ইণ্ডিয়া গেজেট প্রকাশিত হয়।[৩১]

কুষ্টিয়া মহকুমার অধীনে, উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রাম সংখ্যা অতি বিরল, তবে উহারই মধ্যে কুমারখালি, আমলাসদরপুর, ছেঁউরিয়া প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের নাম উল্লেখযোগ্য।

এখানে নবাবী আমলে একটী কাছারি ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী ফ্যাকটারি ছিল। বর্ত্তমান রেল ষ্টেসনের সংলগ্ন যে একটী অযত্ন রক্ষিত গোরস্থান দৃষ্ট হয়, উহা সেই কোম্পানীর আমলে স্থাপিত, ইহার প্রথম কবরটীর তারিখ ১৭৯০ খৃঃ অব্দ। কুমারখালি এক সময়ে জেলা পাবনার একটী মহকুমা ছিল তখন থানা পাঙ্গসা ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল পরে ১৮৭১ অব্দে যখন গোয়ালন্দকে জেলা ফরীদপুরের একটি মহকুমা করা হয় তখন কুমারখালিকে লইয়া কুষ্টিয়া মহকুমার অধীনে ও পাঙ্গসাকে গোয়ালন্দ মহকুমার অধীনে করা হয় এখানে যে মুনসফী আদালত ছিল তাহাও ঐ কালে উঠিয়া যায়। এখানকার জমিদার কলিকাতার ঠাকুর বাবুরা। সুপ্রসিদ্ধ কাঙ্গাল হরিনাথ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নিবাস এই স্থানে এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক রাজসাহির প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের জন্মস্থান ইহার সন্নিকটবর্ত্তী।

মারখালি

এই গ্রামখানি ধর্ম্ম-সংস্কারক লালন ফকিরের জন্যই প্রসিদ্ধ হয়। তাঁহার চরিত্র ... না অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ। তাঁহার ধর্ম্মমত অতি সরল ও উদার ছিল। তিনি জাতিভেদের নিন্দা করিতেন এবং নিজে যদিও জাতিতে কায়স্থ (কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী চাপড়ার ভৌমিকগণের আত্মীয়) ছিলেন, তথাপি কেহ তাঁহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি স্বপ্রণীত এই গানটী শুনাইতেন —

[illegible] রয়

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। লালন ভাবে জাতির কি রূপ দেখলাম না এ নজরে। কেউ মালা কেউ তজবী গলায় তাইতে তো জাত ভিন্ন বলায়, যাওয়া

কিম্বা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কাররে? যদি সুন্নত নিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কি হয় বিধান। বামন চিনি—পৈতা প্রমাণ, বামনী চিনি—কিসে রে? জগৎ বেড়ে জেতের কথা, লোকে গৌরব করে যথা তথা লালন সে জেতের কাতা ঘুচিয়েছে সাধ বাজারে।

লালন নিরক্ষর ছিলেন। তাহার সুললিত পদাবলী তাঁহার হিন্দুত্বের পরিচয় দিত। বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্ম মতের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে কখন কখন অবতার স্বীকার করিতেন। সত্য ভাষ, সরল ব্যবহার, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল। ছেঁউরিয়া গ্রামে তাঁহার প্রধান আখড়া ছিল। প্রতিবৎসর শীতকালে তিনি তথায় একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। ইহার শিষ্যসংখ্যা শুনা যায় প্রায় দশ সহস্র—প্রায়ই নিরক্ষর কৃষক। ইং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে ১১৬ বৎসর বয়সে লালনের মৃত্যু হয়।[৩২]

মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও এখানকার সমৃদ্ধি বর্ত্তমান ছিল। মধ্যে একেবারেই ইহার নাম লোকে ভুলিয়াছিল, এক্ষণে রণাঘাট লালগোলা লাইনের একটি ষ্টেসন হওয়ায় ইহা আবার অনেকের নিকট পরিচিত হইতেছে। গ্রাম খানির পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কারণ অত্রস্থ দেবীদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়; ইনি হিজলীতে তদানীন্তন নিমকির দেওয়ান ছিলেন। উক্ত কার্য্যে থাকিয়া দেওয়ান মহাশয় লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেন এবং শীঘ্রই অতুল ধনের অধিপতি হইয়া উঠেন; তিনি সজ্জন-সেবী ও আত্মীয় পোষক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত দেবী সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির এবং শিবমন্দিরটী অদ্যাপি এখানে তাঁহার স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে, বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতিবৎসর এই দেবীর নিকট একটী মেলা হইয়া থাকে। এই বংশীয়েরা নদীয়ায় অদ্যাপি বিশেষ সম্মানিত। এক্ষণে এখানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, গ্রামের জনসংখ্যা ৬০০ শতাধিক এখানকার ছানা চিনি সন্দেশ প্রসিদ্ধ। ইহার সন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের মধ্যে ধর্ম্মদা বোরগাছি প্রসিদ্ধ। স্বনামখ্যাত 'রস-লেখক' বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস এই স্থানে।

এই মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে :—

"শাকে সোমনবেষু চন্দ্রগণিতে পুণ্যৈকরত্না করো
ধীর শ্রীযুত রাঘবোদ্বিজমনি ভূ'মীভুজামগ্রণীঃ।
নির্ম্মায় স্ফুরদূর্ম্মিনির্ম্মল জল প্রোত্যাতিনীং দীর্ঘিকাং

তত্তীরে কৃত রম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমাস্থাপয়ৎ ॥

অর্থ—১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মণ শিরোমণি রাজশ্রেষ্ঠ ধীরমতি রাজা-রাঘব এই স্বচ্ছ জলসঙ্কুল উর্ম্মীময় দীর্ঘিকা খনন করাইয়া ও তত্তীরে এই সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শিব স্থাপনা করিলেন।

২ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী রাণী ভবাণী তিন কন্যা লইয়া কৃষ্ণনগর চাঁদসড়কে অবস্থিতি করেন। রাণী সাধারণতঃ সেজ মা ঠাকুরাণী নামে পরিচিতা ছিলেন। এখনও রায়বাহাদুর দিগের বাটী সেজমা ঠাকুরাণীর বাটী বলিয়া খ্যাত। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত একটী পুষ্করিণী হাঁসখালির পথে বিদ্যমান রহিয়া তাঁহার স্মৃতি যাগরূক রাখিয়াছে। সেজ স্ত্রী ঠাকুরাণীর বাটীতে প্রথমা কন্যার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ রায় দ্বিতীয়া কন্যার বংশোদ্ভব রায়, যদুনাথ রায় বাহাদুরের পুত্রগণ শ্রীযুক্ত কুমার নাথ রায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ রায়, ও সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺রায় দেবেন্দ্র নাথ রায় বাহাদুরের পুত্রগণ এবং তৃতীয় কন্যার বংশোদ্ভব একটি দত্তকপুত্র বাস করিতেছেন।

৩ এই "হরিহর" মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে :—

"গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুত্যনুগত সুকৃত ক্ষৌণিপালঃ শকেস্মিন্
শ্রীযুক্তঃ বাজপেয়ী ভূবি বিজিত মহারাজ রাজেন্দ্র দেবঃ ॥
ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারি 'ত্রিপুরহরভিদাসজ্ঞাতাং পামরানাং
অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহর মুময়া স্থাপয়ল্লোনয়াচ ॥"

ভাবার্থ :—যে পামরসকল শিব ও বিষ্ণুকে পৃথক জ্ঞানে একের বিদ্বেষ করে সেই সকল নিরয়গামী ব্যক্তিগণের ভ্রান্তি বিনোদনার্থ, ভুবনবিদিত বাজপেয়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক ১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও তন্মধ্যে হরিহরের অদ্বৈত মূর্ত্তি লক্ষ্মী ও উমার সহিত স্থাপিত হইল।

স্বর্গীয় মহারাজা ক্ষিতীশ চন্দ্রের সময়ে এই গঙ্গাবাসের প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে ৪টি ছোট ছোট কামান বাহির হইয়া পড়ে। ঐ গুলি এক্ষণে কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গনে রক্ষিত হইয়াছে। গঙ্গাবাসের অপর অংশের নাম আমঘাটা। হরিহর মন্দির ও রাম পদক ভিন্ন আর এখানে পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কোনও চিহ্নই বিদ্যমান নাই। কথিত আছে যে এই রামপদক বা শ্রীরাম চন্দ্রের পদ চিহ্ন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র চিত্রকুট পর্ব্বত হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

৪ "জাল প্রতাপচাঁদ" লেখক ভ্রমক্রমে গ্রন্থে ইহাকে হরধামের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৫ আনন্দধামের রাজবংশ—ঈশানচন্দ্র। তাঁহার তিন পুত্র—নরহরিচন্দ্র, শ্রীহরিচন্দ্র ও জয়হরিচন্দ্র। নরহরি চন্দ্রের পুত্র—চন্দ্রধর। জয়হরি চন্দ্রের পুত্র—হরেন্দ্র চন্দ্র ও শিবেন্দ্র চন্দ্র। উভয়েই মৃত।

৬ শিবনিবাসের রাজবংশ—মহেশচন্দ্র, তৎপুত্র উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্রের পুত্র গঙ্গেশচন্দ্র।

৭ এই শিবনিবাস তৎকালে কাশীতুল্য স্থান বলিয়া খ্যাত হয় যথা প্রবাদ বাক্য—
"শিবনিবাসী তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা। উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠঠনা।"

৮ এই মন্দির ৩টী ও রাজপ্রাসাদাদি মহারাজা শিবচন্দ্রের পর হইতেই হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় লর্ড বিসপ হেবার সাহেব জলভ্রমণ করিতে বাহিত হইয়া যখন এইস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন তখনও তিনি এই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন এবং এই স্থান সম্বন্ধে Hebbers Journal vol I. P. 120 তে বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন; তিনি প্রাসাদ ও মন্দিরত্রয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

The first temple which we visited was evidently the most modern being, as the officiating Brahmin told us, only fifty seven yers old. In England we should have thought it at least 200 but in this climate a building soon assumes, without constant care. all the venerable tokens of antiquity. It was very clean, however, and of good architecture ; a square tower, surmounted by a pyramidal, roof with a high cloister of pointed arches surrounding it externally to within ten feet of the springing of the vault. The cloister was also vaulted, so that, as the Brahamin made me observe, with visible pride the whole roof was "pucka" or brick and "belathee" or foreign. A very handsome Gothic arch, with an arabesque border opend on the south side, and shewed within the statue of Rama, seated on a lotust, with a gilt but tarnished umbrella over his head, and his wife the earth born Seeta, beside him, A sort of deessert of rice, ghee, fruit, sugar candy, &c. was ranged before them on what had the appearance of silver dishes ; * * *

* * * * * * *

Form hence we went to two of the other temples which were both octagonal, with domes not unlike those of glass houses. They were both dedicated toSiva, (who Abdullah, according to his Mussulman notions, said was the same with Asan, and contained nothing but the symbol, of the deity, of black Marble)

The villagers asked if I would see the Raja's palace. On my asseting, they led to a really noble Gothic gateway, overgrown with beautiful broad leved ivy but in good preservation and decidedly handsomer though in pretty much the same style with the 'Holy

Gate" of the Kremlin in Moscow. Within this, which had apparently been the entrance into the city, extended a broken but still stately avenue of tall trees and on either side a wilderness of ruined buildings, over grown with trees and brushwood, which reminded Stowe of the baths of Caracalla, and me of the upper part of the city of Caffa. I asked who had destroyed the palace and was told Serajo Dowla an answer which (as it was evidently a Hindu ruin) fortunateiy suggested to me the name of the Raja kissen Chund. On asking whether this had been his residence, one of the peasants answered in the affirmative, adding that the Raja's grand children yet lived hard by. By this I supposed he meant some where in the neighbourhood, since nothing here promised shelter to any beings but wild beasts.

* * * * *

Our guide meantime turned short to the the right and led us into what were evidently the ruins of a very extensive palace. Some parts of it reminded me of Conway castle and others of Bolton Abbey. It had towers like the fromer, though of less statly height, and had also long and striking cloisters of Gothic arches, but all overgrown with ivy and jungle, roofless and desolate. Here, however, in a court, whose gate way had still its old folding doors on their hinges and the two boys whom we had seen on the beach came forward to meet us, were announced to us as the great grandsons of Raja kissen Chund, and invited us very courteously in Persian, to enter their father's dwelling."

৯ "শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিন দিকে।"—অদ্বৈতঃমঙ্গল।

১০ "Here Holwell was landed as a prisoner on his way to Mursidabad after surviving the misery of the Blackhole he was marched up to the Zeminder of Santipur "in a scorching sun near noon. For more than a mile and a half, his legs runing in a stream of blood from the irritations of the irons." From thence he was sent to an open fishery boat to Mursidabad, 'exposed to a suocession of hevy rain or intense sunshine." He was lodged in an open stable; he experienced however every act of kindness from Messrs Law and

Vernit, the French and Dutch chiefs of Kassimbazar as also from the Armenian merchants. He was led about the city ' in chains as a spectacle to the inhabitants to show the condition the English were reduced to."—Vide Cal. Review vol. VI. 1846 A. D.

১১ অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামী এবং উড়িয়া গোস্বামী। ইঁহারা উড়িষ্যা হইতে আনীত; রাঢ়ী শ্রেণী।

১২ সম্প্রতি এই বিষয়ে সরকারি দপ্তরে Mr. J. Lumsden. Registrar, to the Secretary to the Government in the Revinue and Judicial Department কর্তৃক ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবরের তারিখে লিখিত পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে,—

"Sir,—In a trial before the third Judge of the Calcutta court of circuit at the last Jail delivery for Zilla Nuddea which came under refference before the Nizamut Adawlut, it appeared in evidence that a night attack having been made on the house of Mahadeo Mukherjee, a respectable resident of the village of Ooloo, by a large gang of armed Dacoits, the inhabitants of the village immediately assembled, surrounded the house, and after a desperate resistance in which nine of the villagers were wounded, apprehended on the spot eighteen of the Robbers, who were tried and convicted and sentenced to perpetual imprisonment and Transportation.

2. The Judge of circuit considered the inhabitants of Ooloo as entitled to some mark of distinction for their behaviour on this occasion, and the Nizamut Adawlut concurring in this opinion, desired him to propose some specific recompense which might with propriety be made to them.

3. I have now received the orders of the court to transmit to you the enclosed copies of 2 letters form the 3rd. Judge of the Calcutta court of circuit on this subject, and to request that you will lay them before the most noble the Governor General in Council, with their recommendation that his Lordship will be pleased to authorize the Magistrate of Nuddea to pay reward of 20 sicca rupees to each of the nine villagers who were wounded in appehending the Robbers and to change the name of the village from Ooloo to Birnagar, as

proposed by the Judge, notifying the same by proclaimnation in the manner suggested in Mr. came's letter of the 25th. instant.

4. The timid behaviour of the Natives of Bengal in general in deserting their Habitations and Property when attacked by gangs of Dakaits, is to be ascribed, in the opinion of the court, more to the horrid acts of Barbarity which are often perpetrated by the Robbers, than to any want of personal courage and it is believed that the occasinal notice and approbation of an opposite line of conduct by Government, may operate as a spur to excite others to follow the example and by means of checking the depredations of the banditti and raising up opponents to them in every village.

১৩ Vide Calcutta Review Vol. VI.

১৪ As Guptipara is noted for its monkey, Halishahar for its drunkards so is Ulla for fools, as one man is said to become a fool every year at the Mela.—Cal Review. Art III Vol VI, 1846.

১৫ In 1834 the Baboos of Ulla raised a large subscription and gave it to the authorities to make a Pukka road through the town. —Cal Review 1846. Vol VI. Page 308—448.

১৬ ইঁহার মৃত্যুতে নদীয়ার মুখপত্র "বার্ত্তাবহ" প্রকৃতই লিখিয়াছিলেন যে ইনি সদাশয় পরোপকারী ও জনপ্রিয় ছিলেন * * * ইঁহার মৃত্যুতে রাণাঘাটবাসী একজন অকপট সুহৃদ হারাইলেন" * *। বার্ত্তাবহ ১ম বর্ষ ১১ সংখ্যা।

নদীয়ায় অন্যতম মুখপত্র বঙ্গরত্ন (৬ষ্ঠ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা) লিখিয়াছিলেন,—

* * * * *

"কিন্তু আজি অকস্মাৎ একি শুনি হায়,
'দীনের সুহৃদ কালী লয়েছে বিদায়'।
সমস্ত নগর জুড়ে উঠে হাহাকার,
উথলে শোকের সিন্ধু নাহি পারাপার।
বয়সে প্রবীন সে যে, বিজ্ঞ বিচক্ষণ,
শান্তির আধার সে যে সমাজ শোভন,
কোমল স্বভাব সে যে, সৌম্য দরশন।
না মজিয়া শোকে মোরা কঠিন পরাণে,
কেমনে ভুলিব মোরা সে নর রতনে ?
গিয়াছে ধীমান, হায় সহিব কেমনে,
কে আর ঢালিবে শান্তি ব্যথিত জীবনে ?"

১৭ এই লাইব্রেরীটী ইং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৺সুশীল চন্দ্র বোস ও কতিপয় উত্তমশীল যুবক কর্ত্তৃক ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী নামে স্থাপিত হয় পরে ইংরাজী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহা রাণাঘাট মল্লিক বংশের অন্যতম বংশধর বাবু কালীকুমারের মধ্যম ভ্রাতা বাবু মহেন্দ্রকুমার মল্লিকের পুণ্য স্মৃতিতে ইং ১৮৬১ সালের Act xxi আইন অনুসারে গবর্মেন্টে রেজেষ্টারী হইয়া পাবলিক লাইব্রেরী নামে খ্যাত হয়, এবং "সুরেন্দ্র স্মৃতি গৃহে" স্থায়ীরূপে স্থাপিত হয়।

১৮ There is an old temple at Chagdaha which at present lies in a, neglected and dilapidated state. The owners Babu Kalikumar Chaudhuri and others of Palpara having taken no care about its preservation. The owners are willing to give up their right to the temple if it is kept in repair by Government, and if they are allowed to use it as a place of worship in the customary way. There has been no idol in the temple nor it is used as a place of regular worship now.

The temple is of ordinary size and has ornamental cut brick-work. Its age may, as it appears and as has been reported by persons who had the inscription read, be 500 years. There is no idol there now. People say there was a lingam in it. Mr. J. S. M. Beglar, when Archaeological Surveyor of Bengal took measurement of it and also a photograph. There were two inscriptions or stone, which were taken of by Roy Ramsankar Sen, Subdivisional Officer of Ranaghat, and although afterwards returned, are not forthcoming, —Vide the List of Ancient Monuments in the Presidency Division Published by the Government.

১৯ কুমারহট্ট বা হাবলী সহর বা বর্ত্তমান হালিসহর পূর্ব্বে নদীয়ার মধ্যে একটী পণ্ডিত প্রধান বিশিষ্ট গ্রাম ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানের মৃত্তিকা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি বলিয়া দুর্লভ জ্ঞানে, মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও এ স্থানে বিদ্যার চর্চ্চা বিশিষ্টরূপ ছিল। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন এই মহাতীর্থে বসিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এখনও তাঁহার পঞ্চমুণ্ডির আসন বিদ্যমান রহিয়াছে। গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, প্রসাদের অমৃতাধিক সুমধুর কাব্যে ও গীতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের সময়ে এখানে আজু গোস্বামী নামে একজন মেধাবী কবি প্রসাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দী হইয়াছিলেন।

২০ "The island opposite Tribeny has a conspicuous place on De-

Barros Map of Bengal and on that by Blaev (Vide pt. IV.) The maps also agree with Abul Fazel's statement in the Ain, that at Tribeny there are 3 branches, one of the Saraswati on which Satgaon lies, the other the Ganga now called the Hugli and the third the Jan or Jabuna (Jamuna), De Barro's and Blaev's map show the three branches of almost equal thickness the Saraswati passing Satgaon and Chowna (Chaumnha in Hugli District north) and the Jabuna flowing westward to Borhan in the 24 Perganas. --Vide Journal of the Asiatic Society Bengal Vol XLII, 1873. pp. 214.

২: দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্ত গ্রামাখ্যা
দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ ॥

এই দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্ত বেণী দক্ষিণ দেশে সপ্ত গ্রামের নিকট ত্রিবেণী বলিয়া খ্যাত। এখানে যমুনা ও সরস্বতী আসিয়া জাহ্নবীর পূত-সলিলে মিলিত হওয়ায় উহার নাম যুক্তবেণী, এই স্থান হইতে এই সম্মিলিত স্রোত জাহ্নবী খাতে প্রবাহিত হইয়া ত্রিবেণীতে মুক্ত অর্থাৎ পুনর্ব্বার বহির্গমনপূর্ব্বক পৃথক ভাবে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়া এই স্থানের নাম মুক্তবেণী হইয়াছে।

২২ আমরা অনেক চেষ্টায় উহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে অনেকগুলি প্রাচীন লোকের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন।

২৩ কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ পূর্ব্বেও নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বকূলে স্থাপিত ছিল এবং উহার পূর্ব্ব দিয়া জালাঙ্গী বা খড়ে প্রবাহিত ছিল। গোয়ালাপাড়া গ্রামে তখন নবদ্বীপের পূর্ব্বসীমা বাহিনী জালাঙ্গী ও পশ্চিম সীমা বাহিনী গঙ্গার সম্মিলন ছিল। কথিত আছে ১২০৬ সনের প্রবল বন্যায় গঙ্গার স্রোত নবদ্বীপের পশ্চিমতলবাহিনী খাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বতলবাহিনী জালাঙ্গী খাতে প্রবাহিত হয় এবং নবদ্বীপ তদবধি গঙ্গার পশ্চিমকূলে গিয়া পড়িয়াছে এবং বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব কোলে গঙ্গা জালাঙ্গীর সঙ্গম দাঁড়াইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন ফলে "শ্রীচৈতন্য দেবের নবদ্বীপের" যে কিছু অবশিষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, তাহা সমস্তই প্রায় ধ্বংস অথবা স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্য দেবের সময় কোন্ কোন্ গ্রাম লইয়া নবদ্বীপ গঠীত হইয়াছিল, এবং কোন গ্রাম কোথায় স্থাপিত ছিল ইত্যাদি নরহরি দাসের (চক্রবর্ত্তী) নবদ্বীপ পরিক্রমায় সবিশেষ উল্লিখিত আছে।

২৪ একথারও সম্প্রতি স্থানে স্থানে প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে এবং সুখের বিষয় যে এবিষয়ে নানারূপ তথ্যানুসন্ধান হইতেছে। যাঁহারা এই চির প্রচলিত বহুজন মান্য মতের প্রতিবাদী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ বলেন যে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্তৃক নদীয়া বিজয় সত্য নহে, হয়তো বখতিয়ার এই পথে লক্ষণাবতী গমন করিয়াছিলেন। বখ্তিয়ারের বঙ্গবিজয়ের বহু বর্ষ পরে নদীয়া সম্পূর্ণভাবে মুসলমান অধিকারে আইসে। তাঁহারা অন্যান্য

যুক্তির মধ্যে Asiatic Society তে সংগৃহিত ও রক্ষিত বঙ্গের মুসলমান নরপতি মুঘাসুদ্দিন জুজুবাকের সময়ে তদানীন্তন রাজধানী লক্ষণাবতী সহরে মুদ্রিত একটী মুদ্রায় লিখিত কথাগুলির উল্লেখ করেন এবং বলেন যে ইহাই নদীয়ায় মুসলমান অধিকারের পর প্রথম মুদ্রা ; কিন্তু কে বলিবে যে, একদিন ভূগর্ভের অন্ধকারময় গর্ভ হইতে ইহার পূর্ব্বকার তার কোনও মুদ্রা সহসা আবিষ্কৃত হইবে কি না ? উহাতে লিখিত আছে :—

This was minted at Lakhanabati for (Paying) the revenue of Karmandan (Burdankar—Burdangarh Bardhanksta (skt) and Nudiah in the mohth of Ramzan in the year 653 Hijri (February 1255 A, D.).—H. Nelson Wright—Catalogue of Coins in the Indian Museum Vol. 11 Part 1 page 146.

২৫ এই নামের দুইজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একজন নবদ্বীপের আদি পণ্ডিত অপর রাজা গিরিশ চন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন।

২৬ উপস্থিত ঐ সকল প্রাচীন বংশাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বংশ অদ্যাপি নবদ্বীপে বিদ্যমান আছে—

১। গদাধর ভট্টাচার্য্য বংশে—অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

২। জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশে—দ্বারকানাথ শিরোমণি, রামদাস ন্যায়লঙ্কার।

৩। রামভদ্র সিদ্ধান্তের বংশে—মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পুত্রাদি।

৪। গোপাল ন্যায়লঙ্কারের বংশে—হরিপদ স্মৃতিতীর্থ, শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ।

৫। স্মার্ত্ত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের বংশে—নিবারণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নৃসিংহ ও সিতিকণ্ঠ।

৬। মাধবসিদ্ধান্তের বংশে—হরিদাস ন্যায় সিদ্ধান্ত।

৭। আগমবাগীশের বংশে—অজিতনাথ ন্যায়রত্ন।

২৭ In May 1817. the Cholera began in Nadiya, in 1818 it spread through India then in 1820 to China, 1821 to Arabia and Persia 1823 to Russia, and in 1832 to London.—Vide Calcutta Review Vol. VI. Pages 421—26.

In the Bengal Medical Report it is distinctly stated, as an undeniable fact, that the epidemic (Cholera) first appeared in the Nnddeah and Mymunsing Dists, in May 1817, that it raged extensively there in June and in July had reached the distant district of Dacca, —Vide W. H. Carrey's Good old days of Honble John Company, p. 273 vol. I (1600—1858 A. D.)

কেহ কেহ বলেন যে কলেরা সর্ব্ব প্রথম বর্ত্তমান যশোহর জেলায় গদখালি গ্রামে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে পৃথিবী ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে এবং গদখালি গ্রাম তদানীন্তন নদীয়া

ডিভিসনের অন্তর্বর্ত্তী থাকায় প্রাগুক্ত পুস্তকগুলিতে সর্ব্বপ্রথম নদীয়াতে কলেরার উৎপত্তির বিষয় লেখা আছে।

২৮ কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ইহাই ব্রাহ্মণী পূজা বলিয়া উল্লিখিত আছে।

২৯ শ্রীবাস আঙ্গিন পূর্ব্বে পুরাণগঞ্জের দক্ষিণ ভাগে রাধী কলুর পোঁতায় ছিল তথা হইতে গঙ্গার চড়ায় বর্ত্তমান বাজারের পূর্ব্ব উত্তর, তৎপরে এখন বাজারের দক্ষিণ অংশে স্থাপিত হইয়াছে।

৩০ বিগত ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাহায় কুষ্ঠিয়া মহকুমা হইতে কতকগুলি গ্রাম বাহির করিয়া লইয়া গবর্ণমেন্ট গেজেট করিয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়াছিলেন।

৩১ A special notice was published in the India Gazette in the following terms :—"There is scarcely a member of the entire christian community throughout India who will not feel the premature loss of this prelate as a personal affliction. It has rarely been given to any body of christians in any coutry to witness such depth of learning and variety of accomplishment, combined with piety so earnest and energy so untiring. His excellency in Council does not hesitate to add the expression of his belief that large numbers, even amongst those of Her Majesty's subjects in India who did not share in the faith of the Bishop of Calcutta, had learned to appreciate his great knowledge,his sincerity, and his charity and will join in lamenting his death." বিলাত হইতে Secretary of state বাহাদুরও এই সংবাদ প্রাপ্তে প্রাগুক্ত মর্ম্মে তার করেন।

৩২ মৌনীবাবা—লালনের ন্যায় অত্র জেলাস্থ আবুদিয়া গ্রামের মৌনীবাবাও একজন ভক্তিমান সাধক। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র ঘোষ জাতি কায়স্থ রামচন্দ্রের দুইপুত্র প্রথম প্যারীলাল ২য় হীরা লাল, প্যারীলালই পরবর্ত্তী কালে মৌনীবাবা নামে খ্যাত হয়েন। ইনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃনিবাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাবনায় রহিয়া বিদ্যালাভ করেন। অল্প বয়সে পিতা মাতা বিয়োগ হইলে উভয় ভ্রাতা চাকরীতে প্রবেশ করেন। প্যারিলাল জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী গোপালপুরে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হয়েন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, গোপালপুরে থাকিতে তিনি বিবাহ করেন এবং এই সময় হইতেই আবার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যোগাদিতে মন দেন। এই সময়েই তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করেন ও ক্রমে ইহাতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েন। দ্বাদশ বৎসর পরে পত্নী বিয়োগ হইলে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন তথায় তিন বৎসর রহিয়া ওঁকার নাথ পর্ব্বতে গমন করেন এবং কঠোর অপস্যায় নিযুক্ত হয়েন। এই কালে তিনি নিদ্রা ও আহারে এমনি সংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন যে বহুদিন অন্তর এক দিন কিছু আহার করিতেন, বা একটু নিদ্রা যাইতেন। রৌদ্র বা বৃষ্টিতে বাহির হইতেন না

এই সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণ শেঠ নামক একজন বণিক্ তাঁহার নিমিত্ত একটি গুহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন তদবধি প্যারিলাল কঠোরতম তপসাধনে ব্রতী হয়েন এবং মৌনব্রত অবলম্বন করেন এবং তদবধি মৌনীবাবা নামে খ্যাত হয়েন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি তাঁহার গুহাদ্বারে সমবেত হইত এবং যাহারা সৌভাগ্য-বশতঃ তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইত তাহাদের সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না, ওঁকারনাথের মহন্ত বলেন—তিনি জীবনে শত সহস্র সাধু দেখিয়াছেন কিন্তু মৌনীবাবার মত আর একজনও দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে মৌনীবাবা যোগাসনে বসিয়া স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন।

নদীয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয়

জেলা নদীয়া বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, এবং ২৪°, ১১ ০´´ ৩২২´৫২´৩৩´ উত্তর ল্যাটিচিউড এবং ৮৯´২২´৬০´´ ও ৮৮°৯´০´´ পূর্ব্ব লঙ্গিচিউডের মধ্যে অবস্থিত। স্থূলতঃ ইহার উত্তর সীমা জেলা রাজসাহী, পূর্ব্বসীমা জেলা পাবনা ও যশোহর, দক্ষিণ সীমা ২৪ পরগণা এবং পশ্চিম সীমা জেলা বীরভূম বর্দ্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর-পশ্চিম সীমা জেলা মুরসিদাবাদ। ইহার বিস্তৃতি ১৮৭১ সালে ৩৪১৪ বর্গ মাইল ছিল এক্ষণে উহা আ॥ও কমিয়া দাঁড়াইয়া হইয়াছে ২,৭৯৩ বর্গ মাইল। ১৭৯৫-৯৬ এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র জেলায় গ্রামসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০৪১। ১৮৭০ অব্দে ছিল প্রায় ৩২৫০, ১৮৭২ অব্দে আদমসুমারীতে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬৯১। বিগত ১৯০১ অব্দে সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৩,৪২০।[১]

বিগত অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে দৃষ্টিপাত করিলে, নদীয়ার যে গ্রাম-সংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে দেখা যায়, উহার কারণ এই যে, বঙ্গদেশে ইংরাজ বিজয়ের পর সর্ব্বপ্রথম নদীয়ায় জেলা স্থাপিত হয়। তখন ইহার আধুনিক চতুঃপার্শ্বস্থ সকল জেলার অনেক অংশ, বিশেষতঃ হুগলী, যশোহর ও মুর্শিদাবাদের অনেক গ্রামই নদীয়ার অন্তর্গত ছিল, পরে সময়ে সময়ে ইহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া লইয়া চতুঃসীমাস্থ জেলার সহিত যোগ করিয়া দেওয়ায়, ইহার আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বশিরহাট ও তৎসংলগ্ন বহুস্থান নদীয়া হইতে বাহির করিয়া যশোহরে যুক্ত করা হয়। ঐ বৎসর ঐ তারিখে মৌজে আনারপুর নদীয়া হইতে বাহির করিয়া ২৪ পরগণায় যোগ করা হয়, ঐ বৎসর ২৯শে আগষ্ট স্বরূপপুর ও পবানপুর লইয়া যশোহরে যোগ করা হয়। এইরূপ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর নদীয়ার বহুস্থান বর্দ্ধমান ও হুগলীর অন্তর্গত করা হয়। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারী নদীয়ার বহুস্থান মুর্শিদাবাদের সামিল করা হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহা হইতে অনেক গুলি পরগণা বাহির করিয়া লইয়া বারাসাত জেলা গঠন করা হয়; ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বারাসাত ঐরূপ অর্দ্ধ জেলা ছিল ও তথায় একজন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন। ১৮৮২ অব্দের ১লা জুন তারিখে বনগ্রাম সবডিভিসনকে জেলা যশোহরের অধীন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল অগ্রদ্বীপকে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত করা হইয়াছে। উপস্থিত কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাট এই পাঁচটি সবডিভিজন লইয়া নদীয়া জেলা গঠিত। ইহার মধ্যে কৃষ্ণনগর, জেলার রাজধানী ও সদর। কথিত আছে এখানে ১৭৭২ অব্দে প্রথম জজ ও কালেক্টরী আদালত স্থাপিত হয়।

১৭৯৩ অব্দে সমগ্র জেলায় মোট একটী দেওয়ানী আদালত ও একজন মাত্র

কভেনেন্টেড অফিসর ছিলেন ; ১৮০০ অব্দে ৩৯টী আদালত ও ২টি ইংরাজ কভেনেন্টেড অফিসর ছিলেন। ১৮৮৩ অব্দে ২৬টি ফৌজদারী আদালত (অনারারী বেঞ্চ লইয়া) এবং ১৮টি দেওয়ানী (রাজস্ব সম্বন্ধীয়) আদালত এবং ৪ জন কভেনেন্টেড অফিসর ছিলেন।

নদীয়ার নদী

নদীয়া জেলায় অনেকগুলি নদী বর্ত্তমান আছে। ইহাদের সকলগুলিই পদ্মার শাখা। পদ্মা, যে স্থান হইতে জালাঙ্গী নদী বাহির হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পূর্ব্বমুখে কুষ্টীয়া পর্য্যন্ত যাইয়া নদীয়ার উত্তর সীমা গঠন করিয়াছে। জলাঙ্গী বা খড়িয়া পদ্মা হইতে বাহির হইয়া নানারূপ বক্রগতিতে নদীয়া জেলার উত্তর পশ্চিম সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণনগরের তলদেশ দিয়া নবদ্বীপের পাদচুম্বন করিয়া নবদ্বীপ তলদেশ বাহিনী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ জেলার স্থতি থানার অন্তর্গত ছাপঘাটী গ্রামে মূল নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিয়দ্দূর আসিয়া বিধুপাড়ার নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের নিম্নে জলাঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ভাগীরথী জলাঙ্গীর সঙ্গম স্থান হইতে ইংরাজগণ দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথীর "হুগলী রিভার" নাম দিয়াছেন। পদ্মার যে স্থান হইতে জলাঙ্গী বাহির হইয়াছে, তথায় প্রায় পাঁচ ক্রোশ নিম্ন দিয়া মাথাভাঙ্গা বা হাঙ্গুই বহির্গত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে পরে কিয়দ্দূর আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণগঞ্জের তলদেশে আসিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে ও দুই মুখ দুই নামে দুইদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই দুই স্রোতের একের নাম চূর্ণী, অপরের নাম ইছামতী। চূর্ণী কৃষ্ণগঞ্জ হইতে দক্ষিণ পশ্চিম মুখে মামজোয়ান, রাণাঘাট, হরধাম প্রভৃতির তলদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া শান্তিপুর ও চাকদহের মধ্যবর্ত্তী হুগলী রিভারে পতিত হইয়াছে। ইছামতী প্রধানতঃ যশোহর ও ২৪ পরগণা দিয়া প্রবাহিত। ভৈরব নদের উত্তরাংশ জালাঙ্গী হইতে বাহির হইয়া মেহেরপুর প্রভৃতির তলদেশ দিয়া কাপাশডাঙ্গার নিকট মাথাভাঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। মাথাভাঙ্গা হইতে চাঁদপুরের নিকট কপতক্ষ (কপোতাক্ষ) ও সমানপুরের নিকট পাঙ্গাসী বা কুমার নদী বহির্গত হইয়া জেলা যশোহরের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।

এই সকল নদীর মধ্যে ইংরাজদপ্তরে ভাগীরথী, জালাঙ্গী এবং মাথাভাঙ্গা প্রধানতঃ নদীয়ার নদী নামে খ্যাত। পূর্ব্বকালে এই সকল নদীই দেশদেশান্তরে যাইবার একমাত্র উপায় ছিল এবং দেশের অন্তর ও বহির্ব্বাণিজ্য বিস্তারের একমাত্র উপায় ছিল। জানি না, ভারতের কি পাপে আজ সেই সকল স্বভাবজাতা স্রোতস্বতীর এই অভাবনীয়

দুর্দ্দশা। পূর্ব্বে যে সকল নদী দিয়া সুবৃহৎ জলযান ও অর্ণবপোত সকল অবাধে গতায়াত করিত, যে শান্তিপুরের কুঠী হইতে সূতা, বস্ত্র এবং বহুল পরিমাণে মদ্য এবং মালদহ, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান সকল হইতে রেশমী সূক্ষ্ম বস্ত্র, চিনি চাউল প্রভৃতি এবং নদীয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শত সহস্র কুঠী হইতে নীল সংগ্রহ করিয়া সুবৃহৎ অর্ণবপোত সকল সর্ব্বদা গমনাগমন করিত, আজ সেই সকল নদী নানা কারণে কোথাও বদ্ধসলিলা, কোথাও ক্ষীণ-কলেবরা, কোথাও সূক্ষ্ম রজত ধারার ন্যায় মৃদু হইতে মৃদুতর গতিতে বহমানা। এমন কি, যে দুই একটী নদীতে সমস্ত বৎসর ধরিয়া কিছু জল থাকে, তাহাতেও গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী চালনা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। গবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর জালাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা নদীতে খরস্রোত প্রবাহিত করাইবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং করিতেছেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হয় নাই বা হইতেছে না।[২] এই ব্যয়িত অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত ১৮২৪ খ্রীঃ হইতে গবর্ণমেন্ট নদীয়া জেলার দুই স্থানে "টোল" বা চলিত নৌকার উপর কর ধার্য্য করিয়া উহা সংগ্রহের নিমিত্ত আড্ডা স্থাপনা করিয়াছেন। ১ম নবদ্বীপে গঙ্গা জালাঙ্গী সঙ্গমে; ২য় কৃষ্ণগঞ্জে, যেখানে মাথাভাঙ্গা চূর্ণী ও ইছামতী নামে দুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ১৮৬১ অব্দ হইতে ১৮৭০ অব্দ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে নদীয়ার নদী সকল হইতে মোট ২৪৯,৬৩২ টাকা চারি আনা আদায় হয়; উহা হইতে সর্ব্ব কারণে মোট খরচ হয় ১৪৫,০৯৪ টাকা চারি আনা এবং বক্রী ১০১,৫৩৮ টাকা খাঁটি রাজস্ব আয় হইয়াছে।

এই সমস্ত নদীর উপর পূর্ব্বে যখন রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই, তখন বহু স্থানে গঞ্জ ও নৌকার আড্ডা বর্ত্তমান ছিল। সেই লুপ্তপ্রায় গঞ্জগুলির মধ্যে সুখসাগরের গঞ্জই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে গঙ্গা অতিশয় বিস্তীর্ণ ছিল এবং অনেকগুলি নীলকুঠী ইহার উপর ছিল; তন্মধ্যে প্রধান ছিল (জুজুব্রাট) সাহেবের কুঠী।[৩] প্রথম যখন মুনসেফী আদালতের সৃষ্টি হয়, তখন এখানে উলায় এবং মামজোয়ানে রাণাঘাট সবডিভিসনের প্রথম মুনসফী আদালত স্থাপিত হয়। সুখসাগরের আদালতে জজ্ হোসেন খান সাহেবের নাম পাওয়া যায়। অন্যান্য স্থানের গঞ্জগুলি এখনও অতি হীন অবস্থায় বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গঞ্জ কয়টী অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী। ভাগীরথীর উপর কালীগঞ্জ ও নবদ্বীপ, হুগলী রিভারের উপর শান্তিপুর ও চাকদহ। জালাঙ্গীর উপর করিমপুর, চাপড়া, গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর, স্বরূপগঞ্জ। মাথাভাঙ্গার উপর মুন্সিগঞ্জ, দামুরহুদা, কৃষ্ণগঞ্জ। চূর্ণীর উপর হাঁসখালী ও রাণাঘাট। পাঙ্গসা বা কুমারের উপর আলমডাঙ্গা। পদ্মার উপর কুষ্টিয়া অবস্থিত। অদ্যাপি এই সকল গঞ্জে কিয়ৎপরিমাণে ধান, চাল, সরিষা, গুড় ও পাটের আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

এই সকল বহতা নদী ব্যতীত নদীয়ায় আরও কতকগুলি নদী আছে, যাহারা পূর্ব্বে বেগবতী স্রোতস্বিনী ছিল, এক্ষণে হয় বদ্ধসলীলা, না হয় শুষ্ক অবস্থায় পরিণত। ইহারা বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ বিলের আকার ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১ম কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে স্থিত অঞ্জনা। ইহা পূর্ব্বে জালাঙ্গী নিঃসৃত ক্ষুদ্র কলেবরা স্বচ্ছসলিলা

স্রোতস্বিনী ছিল। কথিত আছে, নদীয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ, কৃষ্ণনগর স্থাপয়িতা রাজা রুদ্রের সময়ে ১০৮৭ হিজরি বা ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি মুসলমান সৈনিকপুরুষ এই জলপথে অঞ্জনা দিয়া যাইবার সময় রুদ্রের দৌবারিকগণের সহিত বিবাদ করে; তাহাতে উভয় পক্ষের একটী ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয়; এই কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা রুদ্র পরবর্ষেই অঞ্জনার গতি রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ২য়—কাঁচিকাটা নদী ইহারই উত্তরে সুবিখ্যাত কাঁচিকাটা কন্‌সারণ নামীয় নীলকুঠী স্থাপিত ছিল। ৩য়—রাণাঘাটের উত্তর এবং দক্ষিণ পূর্ব্বদিক বেষ্টন করিয়া যে দুইটি জলহীন খাত বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যাহারা বাচকো ও হাঙ্গরের খাল বলিয়া খ্যাত,—যাহারা বর্ষাকালে অদ্যাপি নদীর আকার ধারণ করে, তাহা পূর্ব্বে চূর্ণী নিঃসৃত দুইটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ছিল। রাণাঘাটের এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাচকোর উত্তর কূলে স্থিত নৌকাড়ি বলিয়া একখানি বহু পুরাতন ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। গ্রামখানির নাম হইতেই উপলব্ধি হইবে যে, ইহা পূর্ব্বকালে নৌকার আড়ি বা নৌকার আড্ডা ছিল। এই গ্রামখানি বহু পুরাতন, এমন কি ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বেও যে ইহা বিদ্যমান ছিল তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্য লীলার প্রধান নায়ক শান্তিপুরবাসী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু (১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) এই গ্রামে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এ বৃত্তান্ত অদ্বৈতমঙ্গল লেখক শ্রীমদ শ্যামদাস বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে সেকালেও এই বাচকোর খাল বহতা ছিল এবং ইহার উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গ্রামখানি তখনও নৌকাড়ি বা নৌকার আড্ডা ছিল। এই ক্ষুদ্র খাতে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত যে প্রবাহ ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীতে আমরা দেখিয়াছি যে তিনি এই গ্রাম দিয়া নৌকাযোগে গমনকালে এই নৌকাড়ি গ্রামের কোন অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে জলক্রীড়া-কালীন দর্শন করিয়া তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও অর্থাৎ ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দেও এই নদীটী বহতা ছিল।

এই সকল স্রোতস্বিনী বা স্রোতোহীনা বা খাতমাত্রে পর্য্যবসিতা নদী, গঙ্গা ও অন্যান্য নদী সকল বহু পূর্ব্বকাল হইতে বহুরূপে গতি পরিবর্ত্তন করায় নদীয়ার বহু স্থানে বহু খাত দৃষ্ট হয়। বর্ষাকালে প্রায়শঃ এগুলি এক একটি নদীর আকার ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলার আয়তনের সহিত তুলনা করিলে এস্থানে যত স্বাভাবিক খাল, বিল ও জলভূমি দৃষ্ট হয়, নিম্ন বঙ্গের আর কোনও জেলায় এরূপ নহে। এই সকল বিল ও খালের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী সমধিক বিখ্যাত; এই সকল বিলে প্রতি বৎসর অনেক সাহেব ও বাবু পক্ষী শিকার করিয়া থাকেন।

১ম। কৃষ্ণনগর সদর সবডিভিজনের অন্তর্গত—হাড়খালি বিল, হাঁসডাঙ্গা বিল, উমৎপুর বিল, ভাললের বিল, দোগাছীয়ার বিল, নোয়ালদহের বিল, কলিঙ্গ বিল, জাইদ বিল, পলদার বিল।

২য়। রাণাঘাট সবডিভিজনের এলেকায়—বাগদেবী খাল, হরিপুর খাল, নিঝোর খাল, তারাপুর বিল, আমদার বিল, প্রিয়নগরের বাঁওড়, চামটার বিল, ঝাকড়ির বিল, পুমুলি বিল, চিনিয়ালী বিল, যমুনার খাল।

৩য়। মেহেরপুর সবডিভিজনে—কলমার বিল, পদ্মার বিল, কাজলা নদ, জিনদণ্ডর খাল, নাটোর বিল, ধামদর বিল, মাদিয়া বিল, ধলার বিল।

৪র্থ। চুয়াডাঙ্গা সবডিভিসনের এলেকায়—রায়সা বিল, দলকা বিল, সোনাগাড়ী বিল, পুরাপাড়া বিল, এলাঙ্গী বিল, কমলদর বিল, তালবেড়ের বিল, পরশুরামগাড়ী বিল।

৫ম। কুষ্টিয়া সবডিভিজনে—আমলার বিল, তালবেড়ের বিল, ঝাঁঝার বিল, বোয়ালিয়ার বাঁওর, মহেশ কুণ্ডুর ডামোশ, কোচো ডাঙ্গার ডামোশ, খোলাদর ডামোশ।

এই সকল নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জলকর হইতে মৎস্য ধরা একটী প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু মৎস্যের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতেছে, অধুনা গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং কিসে মৎস্যের চাষ ভালরূপে করা যাইতে পারে, তাহার বিষয়ে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। নদীয়ার বিল খালে ও নদীতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত মৎস্যগুলি পাওয়া যায়,—রুই, কাতলা, মৃগেল; কালবোস, খয়রা, জিওল, কৈ, ইটে, মাগুর, সোল, সিংড়ী, পাঁকাল, আড়, বোয়াল, গড়চা, পুঁটী, টেঙ্গরা, চেলা, বেলে, চিতল, চাঁদা, ট্যাপা, শঙ্কর, ল্যাটা বান, কাঁকলে, তোড়া, খলসে, মেতিচিঙ্গড়ি, ইলিস প্রভৃতি

নদীয়ার রাজপথ

অন্যান্য জেলার আয়তনের সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র নদীয়া জেলার যত নদী, রাজপথ রেলওয়ে প্রভৃতি যাতায়াতের সুযোগ দৃষ্ট হয়, নিম্নবঙ্গের অন্য কোন জেলায় তদ্রূপ দেখা যায় না। যদিও পূর্ব্বকালে নদীয়ার অন্তর ও বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথেই চলিত, তথাপি বাণিজ্য কার্য্য, ও গমনাগমনের সুবিধার জন্য মুসলমানদিগের সময়ে এদেশে বৃহৎ বৃহৎ সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম বিদ্যমান ছিল। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকশিত একখানি মানচিত্রে বঙ্গের কয়টী প্রধান প্রধান রাস্তা লক্ষিত হয়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত রাস্তাটী নদীয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। যে স্থানে ভাগীরথী ও পদ্মা পৃথক হইয়াছে, পাটনা মুঙ্গের ও রাজমহল দিয়া সেই স্থান পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আসিয়া দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটী মুকসুদাবাদ, পলাসী, অগ্রদ্বীপ, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়া কটকাভিমুখে গিয়াছে, অপরটী পদ্মার দক্ষিণ ধার দিয়া কাত্তাবাদ (ফরিদপুর) পর্য্যন্ত যাইয়া ঢাকার অভিমুখে

গিয়াছে। জেমস্ রেনেল্স্ কৃত ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ডেস্‌ক্রিপ্‌সান অব্ রোডস (Description of Roads) নামক গ্রন্থেও আমরা এই রাস্তাটীর উল্লেখ দেখিতে পাই; তাহাতে মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমান দিয়া নদীয়া পর্যান্ত রাস্তাটীর উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে রেনলসের "ম্যাপ অব্ বেঙ্গলে" নদীয়ার মানচিত্রে আমরা নিম্নলিখিত স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য ও বড় অক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাই। (১) কৃষ্ণনগর—এস্থানে নদীয়ার রাজাগণের বাসস্থান বলিয়া একটী মন্দির-চূড়াদ্বারা চিহ্নিত করা আছে (২) পলাশী—আম্রকুঞ্জ দ্বারা চিহ্নিত। (৩) অগ্রদ্বীপ—ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। (৪) নবদ্বীপ (৫) শিবনিবাস—ইহাও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম রাজধানী বিধায় বড অক্ষরে মুদ্রিত। (৬) শান্তিপুর (৭) শ্রীনগর—তদানীন্তন নদীয়া ও রাজসাহির সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত।

এই সকল প্রধান স্থানগুলিকে সম্বন্ধ করিয়া নিম্নলিখিত প্রধান রাজবর্ত্মগুলি অঙ্কিত দেখা যায়।

১। কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর—ইহা নবদ্বীপাধিপতি রাজা রুদ্রের নির্ম্মিত। (২) কৃষ্ণনগর হইতে শিবনিবাস। (৩) কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট, শ্রীনগর, মল্লিকপুকুর, বরানগর হইয়া কলিকাতা। (৪) শিবনিবাস হইতে রাণাঘাট দিয়া বারাসাত; (৫) শিবনিবাস হইতে বনগ্রাম ঝিকডগাছা এবং (৬) শ্রীনগর হইতে বনগ্রাম।

বর্ত্তমানকালে ১১৬টী সাধারণের অর্থে চলিত রাস্তার মধ্যে নদীয়ার নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর ...	দৈর্ঘ্য	৯	মাইল।
কৃষ্ণনগর হইতে কৃষ্ণগঞ্জ পর্য্যন্ত	"	১২½	"
কৃষ্ণনগর হইতে নদীয়া ..	"	৬½	"
কৃষ্ণনগর হইতে মেহেরপুর .	"	২৫½	"
কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট দিয়া জাগুলি (পূর্ব্বে এই রাস্তা দিয়া সৈন্য চলিত ..	"	৩২	"
চাপড়া হইতে তেহাটা (ডাকরাস্তা)	"	১৪	"
মেহেরপুর হইতে রামনগর রেলষ্টেসান	"	১১	"
কৃষ্ণনগর হইতে বগুলা .	"	৮½	"
কৃষ্ণনগর হইতে বহরমপুর ..	"	২৮½	"
চাকদহ হইতে সুখসাগর .	"	৬	"
রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম .	"	২০	"
রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর ...	"	৮¾	"
চুয়াডাঙ্গা রেল ষ্টেসন হইতে ঝিনেদহ (যশোহর)	"	১১	"
চুয়াডাঙ্গা রেল ষ্টেসন হইতে মেহেরপুর	"	১৮	"

কুষ্টিয়া হইতে দাদপুর ...	"	৬	"
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে কোর্ট চাঁদপুর .	"	২০	"
কৃষ্ণনগর হইতে শিবনিবাস .	"	১৪	"
তেহাটা হইতে দেবগ্রাম দিয়া কাটোয়া	"	২৫½	"
ভেড়ামারা হইতে শিকারপুর	"	১৬	"
কুষ্টীয়া হইতে কুমারখালি দিয়া সিমলা	"	১৩	"
দর্শনা হইতে কাপাসডাঙ্গা দিয়া কেদারগঞ্জ	"	১৭	"
পলাশী ষ্টেসন হইতে পলাশী মনুমেণ্ট	"	২½	"
কৃষ্ণনগর হইতে পলাশী ..	"	২৮½	"

আদম সুমারি

ইংরাজ-রাজ আমাদের দেশে যে সমস্ত কল্যাণকর বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে আদমসুমারী প্রথা অন্যতম। এতদ্বারা আমরা আমাদের দেশের লোক-সংখ্যা কত, গৃহের সংখ্যা কত, কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক কত, উহাদের মধ্যে শিক্ষিত কতকজন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অশেষবিধ সংবাদ জানিতে পারিয়াছি এবং প্রতি দশম বৎসর ঐরূপ গণনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ সময়ের মধ্যে উক্ত সংখ্যাগুলির হ্রাস বৃদ্ধি কিরূপ হইতেছে, তাহা জানিয়া দেশের অবস্থা বিশেষরূপে অনুধাবন করিতে পারিতেছি। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম যখন উক্ত নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তখন জনসাধারণ ইহার উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করে এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ আবার বুঝি কোনও রাজকর ধার্য্য হইবে তাই এইরূপ মানুষ গণনা হইতেছে মনে করিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে। ফলে সে বৎসর আদমসুমারী ঠিক মনোমত হয় নাই। হাণ্টার সাহেবের "ষ্ট্যাটিষ্টীকাল একাউণ্ট অব্ নদীয়া" পাঠে জানা যায় যে সে বৎসর নদীয়ার জনসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া এই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তখন এখানকার কোনও সুশিক্ষিত সুচতুর জমিদার মহাশয় লোককে নানারূপে উহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে এই বলিয়া সকলকে আশান্বিত করেন যে "মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্রের এ দেশে শুভাগমন উপলক্ষে মহারাণীর আদেশে বাঙ্গলার সকলকে একদিন সন্দেশ প্রভৃতি নানা উপাদেয় মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইবে, তাই যার ঘরে যে কয়জন লোক আছে, সরকারে লিখাইয়া দিলে তাহাকে সেই মত মিষ্টান্ন দেওয়া যাইবে।" এই মহা লোভনীয় আশ্বাস বাক্যে ঝাকি দলে দলে লোক আসিয়া বিনা আপত্তিতে আপনাদের যথাযথ সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু অনেকে তথাপি নানা কুসংস্কারের বশে আপনাদের সংখ্যা গোপন করিয়াছিল।

এই আদম স্থমারীর রিপোর্টে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি একেবারে যথাযথ না হইলেও, অনেকটা প্রকৃত এবং ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে। বিগত পাঁচ বারের আদমস্থমারীর লোক-সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ১৮৭২ অব্দ অপেক্ষা ১৮৮১ অব্দে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ১৮৭২ অব্দে প্রথম লোকগণনা হওয়ায় সে বৎসরের গণনা ও তালিকায় স্বতই বহু ত্রুটি ও ভ্রম সংঘটিত হইয়াছিল; স্থতরাং ১৮৮১ অব্দের সংখ্যাই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরে ১৮৯১ অব্দের গণনায় দেখা যায় যে, পূর্ব্ব বারের গণনা অপেক্ষা এইবার ২৮,৬৮৭ জন লোক কমিয়া যায়। পরে ১৯০১ অব্দের গণনায় ১৮৯১ অব্দের সংখ্যা অপেক্ষা ২৩৩৮৩ জন বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ ১৮৯১ অব্দের যে সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইয়াও মোট ৪৬৯৬ জনবৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু বিগত ১৯১১ অব্দের গণনা ফল হইতে জানা যায় যে গত ১০ বৎসরে পুনরায় ১৯০১ অব্দ অপেক্ষা ৪২৬৪২ জন কমিয়া গিয়াছে। অধুনা রেল প্রভৃতি গমনাগমনের স্থযোগ হওয়ায় যত সংখ্যক বিদেশী আসিয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ নদীয়ার অগণিত ইটখোলায়, রেলের বিভিন্ন কার্য্যে পোষ্ট অফিসের সহস্র ব্যাপারে, নানা কল কারখানায় সাধারণ ভৃত্যের, বেহারার, পাচকের ও দ্বারবানের এবং পুলিশের কার্য্যে, নৌকাবাহী মাঝীর কার্য্যে, ৯টী মিউনিসিপালীটীর শত শত মেথর ও ধাঙ্গড়ের কার্য্যে, কনট্রাক্টারের ঠিকদারের কার্য্যে এবং নদীয়ার বাজারের শত শত বিপণীতে এবং কোথায় নহে, যেরূপ উড়িয়া খোট্টা, বিহারী প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিদেশী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে তাহাতে নদীয়ার আদি জনসংখ্যা যে ভীতিজনকরূপে দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। স্থখের বিষয় প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

সেনসাস্ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুলনায় সমগ্র জেলায় লোকসংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হইবে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ক্ষেত্রে যোগের চিহ্ন (+) ও হ্রাস ক্ষেত্রে বিয়োগের চিহ্ন (—) প্রদর্শিত হইয়াছে।

সমগ্র জেলার লোকসংখ্যার হিসাব।°

খৃষ্টাব্দ।	মোট জন সংখ্যা।	তুলনায়	হ্রাস বা বৃদ্ধি।
১৯১১	১,৬২৭,৮৪৬	১৯০১—১৯১১	৪২৬৪৫—
১৯০১	১,৬৬৭,৪৯১,	১৮৯১—১৯০১	২৩৩৮৩+
১৮৯১	১,৬৪৪,১০৮	১৮৮১—১৮৯১	১৮,৬৮৭—
১৮৮১	১,৬৬২,৭৯৫	১৮৭২—১৮৮১	১৬২,৩৯৮+
১৮৭২	১,৫০০,৩৯৭		

নদীয়ার কৃষি

নদীয়ার ভূমিসকল বিশেষ উর্ব্বরা নহে জমির উর্ব্বরতাশক্তি কম বলিয়া জমির মূল্য খুব কম। এক বিঘা রায়তি জমির মূল্য ৫।৭ টাকার বেশী নহে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে ইহার মূল্য ২৫।৩০ টাকা হইবে। জমির খাজনা বিঘা প্রতি ৸৹ আনা হইতে ১।৹ পর্য্যন্ত দেখা যায়। ওঠবন্দী জমির পরিমাণই বেশী; রায়তি জমাইজমি অপেক্ষাকৃত কম।

কৃষকদিগের মধ্যে প্রায় দশ আনা লোক মহাজনগণের নিকট ধান্য ও টাকার ঋণে আবদ্ধ। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছোট বড় মহাজনগণের অনেক গোলা দেখিতে পাওয়া যায়। একবার যে কৃষক মহাজনের কাছে ঋণে আবদ্ধ হয়, তাহার আর সহজে নিষ্কৃতি নাই। তবে দুর্ভিক্ষের সময়ে মহাজনগণ ধান ও টাকা কর্জ্জ দিয়া প্রজাদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকেন। ঋণীকে "আসামী" বলে। প্রত্যেক মহাজনগণই যে কোন উপায়ে হউক ধান কিম্বা টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার আসামীর জীবনরক্ষা করিতে বাধ্য। সুখের বিষয় পাটের চাষ দ্বারা কৃষকগণ ক্রমশঃ মহাজনদিগের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে।*

ধান্য চাউল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের খোরাকী খরচও ক্রমে বাড়িতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কৃষকশ্রেণীর একটী লোকের গড়ে মাসিক ৪ টাকা নয় আনার কম খোরাকী নির্ব্বাহ হয় না। তাহার হিসাব দেওয়া যাইতেছে—

খোরাকী খরচ।	মাসিক।
চাউল মাসে ২৫ সের, ৪ টাকা মণ দরে*	২ টাকা ৮ আনা
ডাউল তরকারী মাছ রোজ গড়ে ২ পয়সা হিসাবে	১ টাকা
হলুদ লঙ্কা ইত্যাদি মশলা	৮ আনা
লবণ	১ আনা
তেল খাওয়া ও মাথা . . .	৮ আনা
(কাঠ প্রায়ই কেহ কেনেনা)	৪ টাকা ৯ আনা
এক বৎসরে .. .	৫৪ টাকা ১২ আনা
বস্ত্র	
ধুতি ১ বৎসরে ৪ খানা . .	৩ টাকা
গামছা ২ খানা	৮ আনা
শীতের চাদর ১টা	১ টাকা
	৪ টাকা ৮ আনা

জ্বালানি তেল, ঘরমেরামত ও অন্যান্য খরচা ... ৫ টাকা

৬৪ টাকা ৪ আনা

গড়ে একটী পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচটী, সুতরাং একটী কৃষক পরিবারের বার্ষিক ব্যয় ৩২০ টাকা অর্থাৎ মোটের উপর ৩০০ টাকার কম নহে।

এইরূপ এক জন কৃষকের দুই খানা লাঙ্গল; ৪টী গরু ও ৩২ বিঘা জমি থাকা দরকার। তাহাতে কি আয় হয় দেখা যাউক।

৩২ বিঘা জমির মধ্যে ধরা যাক ২৪ বিঘায় ধান ও রবিখন্দ জন্মে আর ৮ বিঘায় পাট চাষ করা হয়।

২৪ বিঘা জমিতে গড়ে ৩৯ মণ ধান জন্মে, মূল্য	...	২০০ টাকা
৮ বিঘা জমিতে গড়ে ২৪ মণ পাট, তাহার মূল্য	...	২০০ „
রবিখন্দের মূল্য	...	১০০ „
মোট উৎপন্ন ফসলের মূল্য	...	৫০০ „

বাদ অবাদের খরচ

বিঘাপ্রতি ৭ টাকা হিসাবে চাষের
বায় ও খাজনা ১২ আনা

৭ টাকা ১২ আনা × ৩২ বিঘা = ২৪৮ টাকা

অর্থাৎ মোটামুটী বাদ	...	২৫০ টাকা
সুতরাং কৃষকের লাভ	...	২৫০ টাকা

যদি কেহ নিজ ক্ষেতে কাজ না করিয়া মজুর নিযুক্ত করিয়া চাষ আবাদ করে, তাহার এইরূপই লাভ দাঁড়াইবে; কিন্তু কৃষকগণ নিজেরাই ক্ষেতের কাজ করে ও গাঁতা দ্বারা পরস্পরের সাহায্য করে। সেজন্য আবাদের বিঘা প্রতি ৭ টাকা না পাড়িয়া ৩ টাকা ৮ আনা পড়িবে। এই জন্যই তাহারা কোন ক্রমে বাঁচিয়া থাকে।

কিন্তু ৩২ বিঘা জমি চাষ করে, এরূপ কৃষকের সংখ্যা বেশী নহে; আবার জমি থাকিলেও সব বছর ভাল ফলে না। খোরাকী খরচ বাদে বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কাজের জন্য ও গরু কিনিবার জন্য এক সময়ে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। এই সব কারণে তাহাদিগকে মহাজনের নিকট ঋণ করিতে হয়। পাটের চাষ বৃদ্ধি হইলে ও পাটের দাম ক্রমে বাড়িলে কৃষকগণের সুবিধা হওয়ার সম্ভব। কোন কোন কৃষক জমি চাষের সঙ্গে অন্যের মজুরি করে। ইহা একটী শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। মজুরি খাটা সম্বন্ধে অনেক চাষীরই অন্যায় কুসংস্কার আছে, তাহাদের ধারণা মজুরি খাটিলে তাহাদের মান যায়। কেহ কেহ দেশে মজুরি খাটিতে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু বিদেশে গিয়া মজুরী খাটা অপমানের কাজ মনে করে না। এইরূপে অনেক চাষী দক্ষিণ ও পূর্ব্ব জেলায় ধান

কাটিতেও মাটি কাটিতে যায় এবং বেশ দশ টাকা রোজগার করিয়া আনে। এই কুসংস্কার দূর হইলে কৃষকদিগের উন্নতি হওয়া সম্ভব।

মজুরদিগের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়িতেছে ধান্যের দর বৃদ্ধি হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। কিন্তু যে পরিমাণে খাদ্য জিনিষের মূল্য বাড়িতেছে, মজুরির আয় সে পরিমাণে বাড়ে নাই সাধারণ মজুরের পূর্ব্বে দৈনিক আয় ছিল ৩ আনা হইতে সাড়ে ৩ আনা; এখন হইয়াছে ৪ আনা হইতে সাড়ে ৪ আনা; তবে ধান ও পাট কাটার সময় মজুরগণ খুব বেশী উপার্জ্জন করে। ধান কাটার মজুরি দৈনিক ৫ আনা ও দুই বেলার খোরাকী। পাটকাটার মজুরির কোন নির্দ্দিষ্ট হার নাই; ফুরাণ চুক্তি করিয়া প্রায় কাজ করা হয়। ইহাতে কোন কোন মজুর দৈনিক ২ টাকা হইতে ৩ টাকাও রোজগার করিতে পারে। এই জন্য অনেক মজুরের অবস্থা চাষী অপেক্ষা ভাল।

জিনিষ দুর্মূল্য হওয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা মধ্যবৃত্তি শ্রেণীর লোকেরই বেশী কষ্ট হইয়াছে। যে গরিব ভদ্রলোকের পরিবারে পাঁচটি লোক ও মাসিক আয় ২৫ টাকা কিম্বা ৩০ টাকা তাহার বর্ত্তমান সময়ে ৪।৫ টাকা দরে চাউল কিনিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা বড়ই কঠিন এই জন্য মধ্যবৃত্তি ভদ্রলোক স্বচ্ছল অবস্থায় থাকিতে গেলে মাসে গড়ে ৮ টাকার কম কিছুতেই কুলায় না। কারণ কৃষক অপেক্ষা তাঁহার মাছ, ডাইল, দুধ, জ্বালানি কাঠ, কাপড়, ঘর মেরামত, ধোপা, নাপিত, ছেলেদের লেখা পড়া ইত্যাদি অনেক বেশী খরচ পড়ে। একটি পরিবারের পাঁচটি লোক থাকিলে ৫×৮=৪০ টাকার কম মাস নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। অর্থাৎ বৎসরে খরচ ৪৮০ টাকার আবশ্যক। তবে একান্নবর্ত্তি পরিবার বলিয়া অনেকের তিন চারিশত টাকার মধ্যেই চলিয়া যায়। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপস্থিত হইলে ঋণ করিতে হয়।

নদীয়ার অধিকাংশ ভূমিই বালুকামিশ্রিত, বা বালুকাময়। হৈমন্তিক ধান্যের উপযোগী জল ইহাতে দাঁড়াইতে পারে না, বালুকায় উহা বিশোষিত হয়। নদীয়ার কেবলমাত্র কালান্তরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, কুষ্টিয়া মহকুমার স্থানে স্থানে হৈমন্তিক ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানেও অল্পবিস্তর জন্মিয়া থাকে এখানকার কৃষকেরা তাদৃশ কঠিন পরিশ্রমী নহে, ইহারা কেবল দৈব ও পর্জ্জন্য দেবের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকে; জমিতে দিবার জন্য সার সংগ্রহের প্রতি ইহাদের সেরূপ লক্ষ্য ও যত্ন নাই। বিনা আয়াসে বা অল্প পরিশ্রমে যে সার সংগ্রহ হয়, তাহাই ব্যবহার করে। অধিকাংশ জমিতে প্রজার কায়েমী স্বত্ব না থাকায় ইহারা জমির উন্নতিকল্পে পরিশ্রম ও যত্ন করে না। তাহার উপর আবার যে বৎসর পর্জ্জন্যদেবের কৃপা না হয় সে বৎসর জলাভাবে যেমন কৃষীর ক্ষতি হয় তেমনি স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়ে। এ প্রদেশে জমির শুষ্কতাপ্রযুক্ত খালখনন (Irrigation) করিয়া ক্ষেত্রে জল দিইয়া যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। তজ্জন্য এখানে খাল খনন কার্য্য Irrigation) হয় না, করাও হয় না। ১৯০৩।৪ সালে মোট ৯০১ বর্গ মাইল আবাদ

হইয়াছিল, আবাদযোগ্য পতিতজমি ৫৪৪ বর্গ মাইল ছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউলই প্রধান। ৭৭৬ বর্গ মাইল ভূমিতে চাউলের আবাদ, তন্মধ্যে আশু ধান্যই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রায় ৬০৭ বর্গ মাইল জমিতে আশুধান্য উৎপন্ন হয়। এই আশুধান্য বৈশাখ মাসে বুনান হইয়া ভাদ্র মাসে কাটা হয়। আমন ধান্য অর্থাৎ হৈমন্তিক ধান্যের বীজ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিয়া আষাঢ় মাসে ঐ চারা ক্ষেত্রান্তরে রোপণ করিয়া অগ্রহায়ণমাসে কাটা হয়। আশু ধান্য ভাদ্র মাসে কাটিয়া ঐ জমিতে চাষ দিয়া পুনরায় উহাতে রবিখন্দ বুনানি করা হয়। রবিখন্দের মধ্যে মুগ, কলাই মটর ছোলা অড়হর খেঁসারি মুসুরি সরিষা ও মসিনা। গম যবের চাষ এখানে নাই বলিলেও হয় বর্ষাকালে কোষ্টা কাটা হয়। পূর্ব্বে কয়বৎসর কোষ্টার চাষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল কিন্তু আজকাল কোষ্টার চাষ অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইক্ষুর আবাদ কিছু কিছু হইয়া থাকে, বেশী নহে। পূর্ব্বে এখানে অধিক পরিমাণে নীলের চাষ ছিল এক্ষণে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। সমস্ত নীল কুঠীই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খর্জ্জুরের গুড় এ প্রদেশে উত্তমরূপে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। শান্তিপুর গ.. চিনি প্রস্তুত ও জেলার দক্ষিণাংশে তামাকের চাষ হইয়া থাকে. এবং উত্তম হিংলী তামাক জন্মে কিন্তু বেশী নহে। চাকদহ থানার এলাকায় পানের বরজ আছে। আশুধানের জমিতে প্রত্যেক বৎসর আবাদ হয় না; জমী উর্ব্বরা নহে বলিয়া, একবৎসর আবাদের পর উপর্যুপরি ২।১ বৎসর তাহাকে, উর্ব্বরতাশক্তি সঞ্চয়ের জন্য পতিতভাবে রাখিতে হয়। এ প্রদেশে তরিতরকারী উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। গঙ্গার চর ভূমিতে, এবং অন্যান্য নদীর চরে পটল, কুমড়া, কাঁকুড়, তরমুজ, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আলুর চাষ এখানে নাই। জমি বালুকাময় হেতু ও সাঁতা নহে বলিয়া, এখানে নারিকেল বৃক্ষ তত অধিক নাই। সুপারি বৃক্ষ নাই বলিলেই চলে। গোচারণ ভূমি এখানে নাই; একারণ গবাদির বিশেষ কষ্ট হয়। মোট কথা, এ প্রদেশে যে পরিমাণ চাউল জন্মে, তাহাতে এই জেলায় লোকের পক্ষে কোনরূপ চলিতে পারে। তবে অজন্মা হইলে, ও রপ্তানি হইলে সংকুলান হয় না, কাজেই মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এখানে বৃষ্টি রীতিমত হইয়া থাকে। তবে দৈবপাতে, সময়ে সুবৃষ্টির অভাবে ও অসময়ে অতি বৃষ্টি-প্রযুক্ত শস্যের বিশেষ হানি হইয়া থাকে।

নদীয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্য

নদীয়ার মধ্যে শান্তিপুরে, বাট গাছিতে পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠি ছিল। শান্তিপুর সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের প্রধান-স্থান, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, শান্তিপুর হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতি বৎসর ১২০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সূক্ষ্ম বস্ত্র

ক্রয় করিয়া বিদেশে চালান দিতেন। এক্ষণে শান্তিপুরে বহুতর তন্তুবায় আছে। কিন্তু সেরূপ পরিমাণে বস্ত্র আর প্রস্তুত হয় না সুতরাং আজিও তথায় উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র হইলেও, যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় ঐ বয়ন-শিল্প অতি অল্প কাল মধ্যেই লুপ্ত হইবে। শান্তিপুর সুতরাগড়ে এখনও অল্প বিস্তর চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুনসীগঞ্জ আলমডাঙ্গা অঞ্চলেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নবদ্বীপ, রাণাঘাট, মেহেরপুর প্রদেশে পিতলের দ্রব্য উত্তমরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কৃষ্ণনগরে মাটির পুতুল, মাটির কৃত্রিম ফল সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কুষ্টীয়ার ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে, ইক্ষুর মাড়ার কারখানা আছে। সম্প্রতি কুষ্ঠীয়ার অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু মোহিনী-মোহন চক্রবর্ত্তী স্বয়ং একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাধারণে অর্থ সাহায্য করিলে, উহা বিশেষ সুফল প্রসব করিবে। নদীয়ায় নদীর সুবিধা থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাকর। বিশেষতঃ ইহার বক্ষ দিয়া প্রায় ১০০ মাইল ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল ও তাহার মুর্শিদাবাদ শাখা ৪০ মাইল ও শান্তিপুর লাইট রেল থাকায় নদীয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের আরও সুবিধা হইয়াছে। ছোলা, সর্ব্ব প্রকার ডাইল, কোষ্টা, মসিনা, সরিসা ও লঙ্কা এখান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখান হইতে পূর্ব্ব বঙ্গে চিনি রপ্তানি হয়। বর্দ্ধমান ও মানভূম প্রদেশ হইতে এ প্রদেশে জ্বালানি কয়লা আমদানী হইয়া থাকে; কলিকাতা হইতে এখানে লবণ, তৈল, বস্ত্র আমদানী হইয়া থাকে কলিকাতা হইতে কেরোসিন তৈল আমদানী হইয়া যশোহর মুর্শিদাবাদ প্রদেশে আবার রপ্তানি হয়। কালনা হইতে বহু পরিমাণে আলু আমদানী হইয়া স্থানীয় খরচ বাদে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হয়। বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, বগুড়া যশোহর হইতে এখানে চাউল আমদানী হয়। রেলওয়ের ধারে বাণিজ্যকেন্দ্র যথা, চুয়াডাঙ্গা, বগুলা, কৃষ্ণগঞ্জ, রাণাঘাট, দামুকদিয়া এবং পোড়াদহ। নদী সমূহের ধারে নৌকা যোগে দ্রব্য সম্ভার আমদানি-রপ্তানি-কেন্দ্র:—যথা শান্তিপুর, রাণাঘাট, করিমপুর, আড়ুলিয়া, কৃষ্ণনগর, স্বরূপগঞ্জ, হাঁসখালি, কৃষ্ণগঞ্জ, বোয়ালিয়া, নোনাগঞ্জ, আলমডাঙ্গা, পাংশা, কুষ্টিয়া, কুমারখালি, খোক্সা, এই সকল স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৮টী মেলা হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে অধিকাংশই প্রায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মেলা, এই সব মেলার মধ্যে শান্তিপুরের রাসমেলা, নবদ্বীপের পট পূর্ণিমার মেলা, কুলিয়া অপরাধ-ভঞ্জনের পাঠ মেলা, এবং ঘোষপাড়া দোল মেলাই প্রধান ও এই গুলিতে অধিক লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই সকল মেলায় নানা স্থান হইতে (স্থানীয় ও অন্য স্থানীয়) বহুতর দ্রব্যাদি আমদানী ও খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

---

১ "Bengal Mss Record" এর ২৬৪৭, ২৭৯০, ২৭৯৩, ৩০৬৮, ৩০৮৫, ৩২২৬—৭ এবং ৩৭৮৭, ৩৭৯৭, ৩৮৯৩—৯৪, ৩৯৭৪—৭৫, ৫০৮৩, ৫১০৭, ৫১৮৬, ৫২১৭, ৫৩৮২,

৫৪৭৭, ৫৮২৭, ৫৯২০, ৫৯২৭, ৫৯৩৮, ৬১৭৮ প্রভৃতি সংখ্যক পত্রের মূল পত্রগুলি দৃষ্টি করিলে নদীয়ার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি উপলব্ধ হইবে।

১ ১৮১৭—১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নদীগুলির উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে, ইঞ্জিনিয়ার C. K, Robinson প্রথম এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হয়েন পরে Mr. Mag এবং Major Lang প্রমুখ বহু দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু কেহই ইহার উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়েন নাই। ১৮৫১ অব্দে Major Lang এ বিষয়ে সুবৃহৎ মন্তব্য গবর্ণমেন্টে প্রেরণ করেন, ঐ মন্তব্যের উপর তাৎকালীক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা Friend of India এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

"In fact we have scarcely any instances in record in the History, of British India in which such long continued and arduorous efforts have resulted in so signal a failure."—Vide "Friend of India" 28 aug. 1851.

৩ Mr. George Barreto অপভ্রংশে "জুজুব্রাট" হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই জর্জ ব্যারেটোর সুখসাগরে একটি ক্ষুদ্র কেল্লা ছিল। Lord Clive যখন পলাশী বিজয়ে এই সুখ সাগরের তলবাহিনী গঙ্গা দিয়া গিয়াছিলেন, তখন ব্যারেটো তাঁহার সম্মানের জন্য কামান দাগিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাশীর কেল্লা ভাবিয়া Clive পলাশীর যুদ্ধের পর প্রত্যাগমন কালে এই ক্ষুদ্র কেল্লাটী ধ্বংশ করিয়াছিলেন।

৪ ১৯০১ অব্দের সেনসসের ফল

				পুরুষ		স্ত্রীলোক
মোট হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী—		৬৭৮,৩৯১ জন	তন্মধ্যে	৩৩৩,৯৮৭		৩৪১,৮০৪
„ মুসলমান	„	৯৮২,৯৮৭	„	৪৮৯,৫৮১	„	৪৯০,৬০৬
„ খৃষ্টান	„	৮,০৯১	„	৪,১২৭	„	৩,৯৬৪
„ অ্যানিমিষ্ট	„	৪	„	২	„	২
„ অন্যান্য	„	১৮	„	১২	„	৬

৫ জমা, জমি, চাষ, আবাদ, প্রজার অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে এখানে যাহা লিখিত হইল তাহা নদীয়ার সকল মহকুমা সম্বন্ধে প্রযুজ্য। এ বিষয়ে নদীয়ার সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে হইলে চুয়াডাঙ্গার S. D. O. Mr. F. H. B. Skrlne I. C. S. লিখিত Material Condition of the people of Bengal নদীয়ার Civil Surgeon Mr. U. N. Mukherjee M. D. Edin লিখিত Nutrition and Dysentry নামক পুস্তক I Appendix, ও Statistical accounts of Bengal প্রভৃতি পাঠ করা উচিত।

৬ চাউলের মূল্য কম বেশী হইলে সেই অনুপাতে খরচেরও কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

৭ Annual rainfall averages 57 inches of which 6.5 inches fall in May. 6.7 in june, 103 in August, 8.1 in September, and 4.1 in October.—Imp. Gazeteer (New edition) vol XVIII page 273.

পরিশিষ্ট

Names of Members of the Indian Civil Service who were connected with the administration of the District and who subsequently held higher positions, with short notices of their career.

1. Sir Rivers Thomson, K. C. S. I.—was District and Sessions Judge of Nadia from 1862 to 1865; while Lieutenant Governor of Bengal, visited Krishnagar in 1886 and Ranaghat when his visit was commemorated by the establishment of a public library which bore his name.

2. Sir William Harschel, K. C. S. I.—was Magistrate of the District and as such, was very popular. Still remembered as a staunch friend of the Indigo *rayyat*. Rose to be a Member of the Board of Revenue.

3. Sir Charles Cecil Stevens, K. C. S. I.—was the most popular Magistrate and Collector of the district. His amiable manners and unfailing courtesy and kindness won for him the heart of everybody who came in contact with him. His name is still remembered in the remotest corners of the District. Rose to be acting Lieutenant Governor of Bengal.

4. Sir Henry Cotton, K.C.S. I.—was connected with the District as Subordinate officer of Chuadanga. Rose to be Chief Commissioner of Assam. His memory is still preserved there in a beautiful avenue bearing his name. A portrait is also preserved in the Local Criminal Court. His name is a household word for his love of India.

5. Sir James Westland, K. C. S. I.—was associated with the administration of the District as Magistrate and Collector. Rose to be an ordinary Member of the Imperial Council.

6. Sir Stuart Colvin Bayley, K.C.S.I.—known as a very popular Magistrate and Collector for his amiable disposition. Rose to be

a Member of the Board of Revenue and subseqnently Lieuteanant Governor of Bengal.

7. Sir Alexander Mackenzie, K. C. S. I.—was connected with the District as Sub-divisional officer of Kushtea. Became ultimately Lieutenant Governor of Bengal.

8. Lord Ullick Browne,—was for sometime the Magistrate and Collector and was known as a popular officer. Became a Member of the Board of Revenue.

9. Horace A Cockrale, C. S. I.—was Magistrate and Collector. Rose to be a member of the Board of Revenne and subsequently acting Lieutenant Governor of Bengal.

10. James Monro, C, B.—a popular Magistrate and Collector. His love of the District and specially its people was subsequently evinced by his settling as a Missionary at Ranaghat. His knowledge of the District is sufficiently wide to enable him to speak with authority.

11. W. B. Oldham, C. S. I.—known as an able administrator. was for a short time Magistrate and Collector, Rose to be a Member of the Board of Revenue.

12. W. C. Macpherson, C. S. I.—For a short time an acting Magistrate and Collector, known as an able officer. Now a Member of the Board of Revenue.

13. Sir, A. Earle, K. C. S. I.—A popular Magistrate and Collector. Now Chief Commissioner of Chitagong and Assam.

14. L. R. Tottenham, C. I. E.—Magistrate and Collector. Became a Judge of the High Court.

15. Sir, K. G. Gupta, K. C. S. I.—was for long the Magistrate and Collector and was very popular. Known as an intelligent and able officer. Now a colleague of the Right Hon' ble the Secretary of State.

16. E. A. Gait, C. S. I.,—One of the most poplar Magistrate. His affability and unfailing courtesy endeared him to the people. His interest in furthering Sanskrit learnrng in the District especially in *navadweep* the sent of ancient Sanskrit literature is still remem-

bered by the Educated Community, Now holds the position of a member of of the Excutive council of Behar and Orissa.

17. R. C. Dutt Esq C. I. E.—Formerly subdivisional officer of Meherpur where he composed his famous novel Madhabikankan. Rase to be a divisional commissioner and Primeminister of Boroda.

18. Sir Antony Mocdonald G. C. S. I.—connected with the District as subdivisional officer of Meherpur became afterwards the most popular Lieutenant Governor of united provinces and of Bengal for some time.

19. H. Holmwood Esqr C. S. I.—A very Popular subdivisional officer of Meherpur, now adorns the Calcutta High court as a judge.

20. L. Barley Esqr—The present District Magistrate has possesses uncommon administrative ability and has a brilliant career before him.

EDUCATIONAL

Of the formost educationists who held charge of the Krishnagar College, the only College in the District, the following are worthy of notice—

Captain D. L, Richardson ; Sir Roper Lethbriege, K. C. S. I. Norman Chevirs ; S, Lobb ; F, J, Rowe, Prof Livingstone ; J. Mann ; and S. C. Hill, Some of them held high positions at present. The last named now holds the position of Director of Public Instruction, Central Provinecs.

নিজ নদীয়াবাসী নদীয়ায় জমিদারবর্গ ব্যতীত বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার যে সমস্ত প্রধান জমীদার বর্গের জমিদারী নদীয়ায় আছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যানুরাগী মহানুভব জমীদার বাবুগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (কাসিমবাজার), রাজা সার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর (কলিকাতা), মহারাজা সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (কলিকাতা), সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা) সুকবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা), রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), রাজা প্রমথ ভূষণ দেবরায় (নলডাঙ্গা), রাজা হৃষিকেশ লাহা (কলিকাতা), বাবু অম্বিকা চরণ লাহা (কলিকাতা), বাবু গৌরচরণ লাহা (কলিকাতা), রাজা কৃষ্ণদাস লাহা (কলিকাতা), কুমার শরৎ কুমার রায় (দীঘাপতিয়া), কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ (পাকপাড়া), বাবু উপেন্দ্রনাথ নাথ ঘোষ (কলিকাতা), ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ (কলিকাতা)।

যে রাজার রাজত্বকাল মধ্যে কোনও পুস্তক রচনা সমাপ্ত হয় সেই পুস্তক ঐ রাজার রাজত্বকালের যে বৎসরে সমাপ্ত হয়, পুস্তক সমাপ্তির তারিখে সেই বৎসরের উল্লেখ করা সনাতন আর্য্য প্রথা। নদীয়া কাহিনী লেখা, পুণ্যশ্লোক, শান্তিপ্রিয়, রাজরাজেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজত্বকালের ৮ম বর্ষের আরব্ধ হইয়াছিল এবং ইচ্ছা ছিল তাঁহাই পুণ্যনাম লইয়া তাঁহারই রাজত্বকাল মধ্যে উহা সমাপ্ত করিব, কিন্তু বিগত ইং ১৯১০ সালের ৬ মে, বঙ্গাব্দ সন ১৩১৭ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে নিদারুণ কাল তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লওয়ায় এ সাধ বাদ পড়িয়াছে। এক্ষণে উপযুক্ত পিতার প্রতিচ্ছায়া, মহাশক্তিধর দয়াময় রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের মহামহিমান্বিত নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে ইং ১৯১০ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে, সন ১৩১৭ সালের ১৪ ভাদ্র এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম। ভগবান তাঁহার কর্ম্মময় জীবন শান্তিপূর্ণ ও সুদীর্ঘ করুন; তাঁহার শান্তিমাখা কোমল আশ্রয়ে কমনীয় বঙ্গভাষা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক ভগবচ্চরণে ইহাই প্রার্থনা।

শাকে পক্ষ-গুণেভ-চন্দ্র-বিমিতে সিংহঙ্গতে ভাস্করে
বেদেন্দু প্রমিতে কুজে হসিত-তিথৌবেকাদশীসংজ্ঞকে।
ত্রিংশৈকাব্দবয়ঃ প্রবেশ সময়ে সম্পাদিতা শ্রীমতা
রাণাঘাট নিবাসিনা কুমুদনাথেন প্রযত্নাদিয়ং।
নদীয়াকাহিনীনাম মল্লিকোপাধিধারিণা।
পুস্তিকা সতত্তারাধা স্বয়াপ্রীণাতু মাধবঃ॥

সম্পূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

সংকেত : ১/২ অর্থাৎ ১ পৃষ্ঠায় ২ লাইন

১/২ : 'হর্ম্ম্যরজিত' শব্দটি 'নদীয়া কাহিনী' দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপার ভুল, হবে হর্ম্ম্যরাজিত অর্থাৎ সৌধশোভিত।

২/৪ : ফাহিয়ান—ভারত-পর্যটক চীনদেশীয় বৌদ্ধভিক্ষুগণের অন্যতম ফা-হিয়েন। বৌদ্ধধর্মজগৎ ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে কৌতূহল না থাকায় তাঁর পর্যটন-বিবরণীতে ভারতের সমকালীন রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয় উপেক্ষিত। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে তিনি ভারতে অবস্থান করেন। আনুমানিক ৪০০-৪১০ সালে তিনি ভারত পর্যটন করেন।

২/৬ : হুয়েন্তসাং—ভারত-পর্যটক চীনদেশীয় বৌদ্ধভিক্ষুগণের অন্যতম প্রধান হিউ-এন-ৎসাঙ (৬০০-৬৬৪ সাল)। ভিন্ন উচ্চারণ ইউয়ান্-চুয়াঙ্। তিনি ৬২৯ সালে ভারতে এসে ১৪ বছর অবস্থান করেন। তাঁর লিখিত ভারতভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রাচীন ইতিহাসের আকর-উপাদান।

২/২৭ : 'নবদ্বীপের অপর নাম নদীয়া'। ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মতে 'নদীয়া' নবদ্বীপ শব্দেরই প্রাকৃত তদ্ভব রূপ। নবদ্বীপ=ণ অ দ্দী অ=নদীআ=নদীয়া। 'নবদ্বীপ অর্থে জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ন'টি দ্বীপ নয়। নব উদ্ভূত দ্বীপ, ভাগীরথী এবং জলঙ্গীর প্রবাহ দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপাকৃতি অঞ্চল।'—ডঃ দাসের অভিমত। মিনহাজ-উস্-সিরাজ লিখিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' (রচনাকাল ১২৬০ খৃস্টাব্দ) গ্রন্থে প্রথম লিখিত ভাবে নুদীয়া বা নোদিয়াহ্ শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং ২য় পৃষ্ঠায় প্রদত্ত নবদ্বীপ ও নদীয়া সম্পর্কিত তথ্য সঠিক নয়।

৩/২১ : জালাঙ্গী—জলঙ্গী, এই নদী পদ্মা থেকে উৎপন্ন হয়ে নবদ্বীপে গঙ্গায় মিশেছে।

৪/ পাদটিকা-১ : ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ তারিখে ঐতিহাসিক দিল্লীর দরবারে বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

৫/৬ : টলেমি—Ptolemy. খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ভূগোল-গণিত-জ্যোতির্বিদ্যায় পণ্ডিত। পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণ তিনি লিখে-ছিলেন। তিনি ভারতেরও ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর গণনায় ভুল

থাকায় স্থানের অবস্থান ও নাম জানতে পারা যায় না। তবে, তিনি ভারতের কিছু সঠিক স্থানও উল্লেখ করেছেন।

৫/৮ : আদিশূর-কাহিনী কুলজী-আশ্রিত, ইতিহাস-আশ্রিত নয়। ৯৯৯ শক হল ১০৭৭ খৃস্টাব্দ ১০৬৩ খৃস্টাব্দ নয়। এই সময় বাংলায় পালরাজ রামপাল রাজত্ব করছিলেন, রামপালের রাজত্বকাল আনুমানিক ১০৭২-১১২৬ খৃস্টাব্দ। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন : '... বাংলাদেশের ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে আদিশূর নামক কোনও নরপতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।' ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন : 'বাংলাদেশে আদিশূর নামক কোনও রাজা ছিলেন, অদ্যাবধি ইহার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই ।...আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন।' তাঁর মতে কুলজী অনুযায়ী আদিশূর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য (প্রাসাদোপরি গৃধ্রপতনজনিত অমঙ্গল দূর করবার জন্য ভগবৎ প্রীতিসাধনের ইচ্ছা ইত্যাদি) কান্যকুব্জ থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বঙ্গে এনেছিলেন, অথচ বঙ্গে কোনসময়েই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে ১৭২৮ খৃস্টাব্দে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে লিখিত 'ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিতং' পুঁথিতেও। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানির বার্লিনস্থ Staatsbibliothek Preussis cher Kulturbestiz গ্রন্থাগারের প্রাচ্যবিদ্যাবিভাগে [Orientabteilung] রক্ষিত। আদিশূর কাহিনী আছে।

৬/১ : সুবর্ণবিহার—কোতোয়ালী (কৃষ্ণনগর) থানার অন্তর্গত ও কৃষ্ণনগর স্বরূপগঞ্জ বাসপথের ধারে অবস্থিত। এখানকার ঢিপি ধ্বংসীভূত বৌদ্ধ বা জৈন স্তূপ অনুমিত। মৌর্যসম্রাট অশোকের আমলে সুবর্ণদ্বীপ নামে এক বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু সুবর্ণদ্বীপ ও সুবর্ণবিহার অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়নি। এখানে প্রত্নবিজ্ঞান ভিত্তিক উৎখনন হয়নি। কারুকার্যমণ্ডিত বহু প্রস্তরখণ্ড এখানে পাওয়া গেছে।

৬/১০ : বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার দেবপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত এক প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ বিজয়প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে সেনরাজ সামন্তসেন (আনুমানিক ১০৭০--৮০ খৃস্টাব্দ) বৃদ্ধ বয়সে পবিত্র গঙ্গাপুলিনে সপরিসর পুণ্যাশ্রমনিচয়ে বাস করতেন :

'উদগন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মৃগশিশুরসিতাখিন্ন বৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপরায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিন পরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমাণি ॥'

(Epigraphia Indica, Vol. 1, p. 308)

৬/১৭ : কৌলীন্য প্রথা—সামাজিক প্রথা, বাংলায় ও মিথিলায় প্রচলিত ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজের ব্যবস্থা হলেও বাংলায় কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজেও প্রচলিত ছিল। এই

ব্যবস্থায় কয়েকটি বংশ সামাজিক মর্যাদায় সমজাতীয় অপরাপর বংশ থেকে উচ্চ ও সম্মানিত বলে কুলীন নামে পরিচিত। বাংলায় কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি বল্লালসেনের প্রতি আরোপিত। কুলজীতে উল্লিখিত তথ্য এবং প্রচলিত প্রাসঙ্গিক জনশ্রুতি অনৈতিহাসিক। বাংলায় কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে বল্লালসেনের সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য-প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়নি।

৬/২২ : বল্লালঢিপি—নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত ও বামনপুকুর গ্রামে অবস্থিত এই প্রত্নস্থলে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ পূর্বাঞ্চল চক্রে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এখন প্রত্নবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উৎখনন চলেছে। এখানে ত্রিরথ সর্বতোভদ্র বৌদ্ধস্তূপের (যা পরবর্তীকালে পঞ্চরথ ব্রাহ্মণ্যমন্দিরে রূপায়ণ করা হয়েছিল) ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, পাওয়া গেছে অষ্টমপরবর্তী শতকের অসংখ্য নানা পুরাবস্তু। দ্র. মোহিত রায়, বল্লালঢিপি কি বৌদ্ধস্তূপ, আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয়, ৩১ মার্চ ১৯৮৫।

৭/২৭ : মিনহাজ-উস্-সিরাজ লিখিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' (রচনাকাল ১২৬০ খৃস্টাব্দ) গ্রন্থ থেকে জানা যায়, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তুর্কী সেনাপতি মহম্মদ-ই-বখতিয়ার মাত্র অষ্টাদশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ১২০২ খৃস্টাব্দে নদীয়া আক্রমণ করেন। এই কাহিনী বর্তমানে ঐতিহাসিকেরা সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করেন না। কারণ, মিনহাজ-উস্-সিরাজ এই ঘটনার বহুকাল পরে লক্ষ্মণাবতী নগরের নিজামউদ্দীন ও সম্‌সামউদ্দীন ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছ থেকে শোনাকথার ভিত্তিতে এই বিবরণ লেখেন। তবে একথা ঠিক যে, বখতিয়ার অতিসহজেই নদীয়া অধিকার করেন এবং ব্যাপক লুণ্ঠন, পীড়ন ও নিধন চালিয়ে প্রচুর ধনরত্নাদি নিয়ে ফিরে যান। নদীয়া যে সামগ্রিকভাবে বখতিয়ারের অধিকারভুক্ত হয়েছিল, তারও প্রমাণ নেই। বখতিয়ারের অভিযানের প্রায় ৫০ বছর পরে মুগীসউদ্দীন য়ুজবক্ নদীয়া ও তৎসন্নিহিত ভাগীরথী অববাহিকা অঞ্চল অধিকার করেন এবং এই বিজয়ের স্মারক হিসাবে ১২৫৫ খৃস্টাব্দে নদীয়ার টাঁকশাল থেকে প্রস্তুত এক বিশেষ শ্রেণীর রজতমুদ্রার প্রচলন করেন। Catalogue of Coins in the Indian Museum : Calcutta, vol.II, pt.II, p-146, no. 61 দ্রষ্টব্য। য়ুজবকের রাজত্বকাল ৬৪৪ থেকে ৬৫৬ হিজরা অর্থাৎ ১২৪৬ থেকে ১২৫৮ খৃস্টাব্দ। এই মুদ্রাটি ৬৫৩ হিজরায় অর্থাৎ ১২৫৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মুদ্রাটি কলিকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে আছে।

প্রাসঙ্গিক কালানুক্রম :

পালরাজ বংশ :

গোপাল (১ম) [আ ৭৫০—৭৫ খৃ.]
|
ধর্মপাল [আ ৭৭৫—৮১০ খৃ.]
|
দেবপাল [আ ৮১০—৪৭ খৃ.]
|

শূরপাল (১ম) [আ ৮৪৭—৬০ খৃ.]
|
বিগ্রহপাল (১ম) [আ ৮৬০—৬১ খৃ.]
|
নারায়ণপাল [আ ৮৬১—৯১৭ খৃ.]
|
রাজ্যপাল [আ ৯১৭—৫২ খৃ.]
|
গোপাল (২য়) [আ ৯৫২—৭২ খৃ.]
|
বিগ্রহপাল (২য়) [আ ৯৭২—৭৭ খৃ.]
|
মহীপাল (১ম) [আ ৯৭৭—১০২৭ খৃ.]
|
নয়পাল [আ ১০২৭—৪৩ খৃ.]
|
বিগ্রহপাল (৩য়) [আ ১০৪৩—৭০ খৃ.]
|
মহীপাল (২য়) [আ ১০৭০—৭১ খৃ.]
|
শূরপাল (২য়) [আ ১০৭১—৭২ খৃ.]
|
রামপাল [আ ১০৭২—১১২৬ খৃ.]
|
কুমারপাল [আ ১১২৬—২৮ খৃ.]
|
গোপাল (৩য়) [আ ১১২৮—৪৩ খৃ.]
|
মদনপাল [আ ১১৪৩—৬১ খৃ.]
|
গোবিন্দপাল [আ ১১৬১—৬৫ খৃ.]
|
পলপাল [আ ১১৬৫—১২০০ খৃ.]

সেনরাজ বংশ :

সামন্তসেন [আ ১০৬০—৮০ খৃ.]
|
হেমন্তসেন [আ ১০৮০—৯৬ খৃ.]
|
বিজয়সেন [আ ১০৯৬—১১৫৯ খৃ.]
|
বল্লালসেন [আ ১১৫৯—৭৯ খৃ.]
|
লক্ষ্মণসেন [১১৭৯—১২০৬ খৃ.]
|
বিশ্বরূপসেন [আ ১২০৬—২৫ খৃ.]
|
সূর্যসেন [আ ১২১০—১৫ খৃ.]

(দীনেশচন্দ্র সরকার—পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত)

৮/৬ : সপ্তগ্রাম—বর্তমানে হুগলী জেলার মগরা থানার একটি গ্রাম। সরস্বতী নদীতীরবর্তী। একদা ভাগীরথীর জলরাশি সরস্বতীর খাতে প্রবাহিত হত এবং তখন সপ্তগ্রাম পূর্বভারতের প্রধান বন্দর-নগর ছিল। ১১—১৬ শতকে সপ্তগ্রামের উজ্জ্বল অবস্থিতি, ১৭ শতকের মধ্যভাগে সপ্তগ্রামের গৌরব সূর্য অস্তমিত হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য :

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের তালিকা

মুবারকশাহী বংশের সুলতান ও আলীশাহ

১। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ১৩৩৮—১৩৪৯ খৃ.
২। ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ ১৩৪৯—৫২ খৃ.
৩। আলাউদ্দীন আলী শাহ ১৩৪১—৪২ খৃ.

ইলিয়াস শাহী

১। সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২—৫৮ খৃ.
২। সিকন্দার শাহ ১৩৫৮—৯১ খৃ.
৩। গিয়াসুদ্দীন আজমশাহ ১৩৯১—১৪১০ খৃ.
৪। সৈফুদ্দীন হমজাশাহ ১৪১০—১২ খৃ.

বায়াজিদ শাহী

১। শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ১৪১২—১৪ খৃ.
২। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। ১৪১৪ খৃ.

রাজা গণেশ

১। রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব ১৪১৫—১৭ খৃ.
২। জলালুদ্দীন মুহম্মদশাহ (গণেশ পুত্র) ১৪১৭—১৮ খৃ.
৩। মহেন্দ্রদেব (গণেশ পুত্র) ১৪১৮—৩৩ খৃ.
৪। শামসুদ্দীন আহমদশাহ ১৪৩৩—৩৬ খৃ.

মাহমুদ শাহী

১। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৪৩৬—৫৫ খৃ.
২। রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ ১৪৫৫—৭৬ খৃ.
৩। শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ ১৪৭৬—৮০ খৃ.
৪। সিকন্দর শাহ ১৪৮০—৮১ খৃ.
৫। জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ ১৪৮১—৮৭ খৃ.

সুলতান শাহজাদা ও হাবসী

১। বারবাক বা সুলতান শাহজাদা ১৪৮৭ খৃ.
২। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (হাবশী) ১৪৮৭—৯০ খৃ.
৩। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৪৯০—৯১ খৃ.
৪। শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহ ১৪৯১—৯৩ খৃ.

হোসেনশাহী

১। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩—১৫১৯ খৃ.
২। নাসিরুদ্দীন নসরত শাহ ১৫১৯—৩২ খৃ.
৩। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৫৩২—৩৩ খৃ.
৪। গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৫৩৩—৩৮ খৃ.

(সুখময় মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল।)

৯/১৪ : পিরালী—মুসলমানদের অন্নগ্রহণরূপ দোষযুক্ত ব্রাহ্মণশ্রেণীবিশেষ। নবদ্বীপের নিকটবর্তী পিরল্যা (বর্তমানে বর্ধমান জেলা ভুক্ত পারুলিয়া গ্রাম) গ্রামের অধিবাসী তাহের আলি 'পীর আলি' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর নাম থেকেই পিরালী শব্দটির উৎপত্তি হয়। তিনি ছিলেন পূর্বে হিন্দু, পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তুর্কী-আমলে খান জাহান আলি তাহের আলিকে সঙ্গে নিয়ে যশোহরে আসেন ও চেঙ্গুটিয়া পরগণার অধিকার পান। পরে তাহের হন তাঁর দেওয়ান। তাহেরের কর্মচারী ছিলেন কামদেব ও জয়দেব নামে দুই ব্রাহ্মণভ্রাতৃদ্বয়। একদিন রোজার সময় তাহের লেবুর ঘ্রাণ নেওয়ায় ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজন হেতু তাঁর রোজা পণ্ড হয় বলে উল্লিখিত দুই ভাই বিদ্রূপ করেন। পরে তাহের তাঁদের সকলকে এক জলসায় নিমন্ত্রণ করেন। কাছেই মুসলমানী খানার গন্ধ নির্গত হওয়ায় ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজন হেতু তাঁদেরও জাত গিয়েছে বলে তাহের দাবী করেন। এভাবেই কামদেবরা জাতিচ্যুত হন ও পিরালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন।

কামদেবের ভ্রাতা শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করে পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ কুশারি পতিত হন। জগন্নাথের বংশধরেরা কলিকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুরে এসে বাস করতে থাকেন এবং ঐ এলাকায় বসবাসকারী একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার বলে তাঁরা ঠাকুর-মশাই নামে পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ এই বংশেরই উত্তর পুরুষ।

১১/২১ : হোসেন শাহ নবদ্বীপের মন্দিরাদি পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারাদি করেছিলেন একথার কোনও প্রমাণ নেই।

১৩/৩৪ : ডক্টর ইরফান হাবিব লিখিত 'An Atlas of Mughal Empire—Political and Economic Maps with detailed notes, bibliography and Index' গ্রন্থ প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য।

১৫/১৮ : দেবগ্রাম—দেগাঁ। রাণাঘাট থানার অন্তর্গত ও গাংনাপুর রেলস্টেশন থেকে পাকাসড়কপথে পাঁচ কি. মি. উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখনও এখানে দুর্গ-প্রাকার (আয়তাকার) দেখা যায়। চারদিকে মাটির ত্রিভুজাকৃতি প্রাচীর। চারকোণে চারটি সুউচ্চ ঢিপি। শত্রুবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ লক্ষ্য করবার জন্য নিরীক্ষণকেন্দ্র রূপে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'List of Ancient Monuments in Bengal' গ্রন্থের ১১৮ পৃষ্ঠায় আছে : Outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity, as evidenced by the size of the bricks. They are the only undoubtedly pre-Muhammadan ruins seen or heard of in the district.' এখন অবশ্য এখানে মন্দিরাদির চিহ্নমাত্র নেই।

১৬/১০ : কামালপুর—চাকদহ থানার অন্তর্গত, চাকদহ-বনগাঁ সড়কের ধারে অবস্থিত প্রাচীন জনপদ, একদা বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র। এখানে পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত বাংলা চালারীতির দুটি মন্দির আছে। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুদেব বাচস্পতি ও পণ্ডিত বনমালী বিদ্যাসাগর এই গ্রামের সন্তান।

১৬/১৫ : সরাবপুর—চাকদহ থানার অন্তর্গত। এখানে এক প্রাচীন বটগাছের নিচের উঁচু জমিতে ভূপ্রোথিত এক প্রকাণ্ড অবয়বহীন কালো পাথর 'পোড়া মহেশ্বর' নামে পরিচিত ও শিবলিঙ্গ হিসাবে পূজিত। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে পোড়া মহেশ্বর শিব কর্ণসুবর্ণরাজ শৈবপন্থী গৌড়াধিপ শশাঙ্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দীনবন্ধু মিত্র লিখিত 'পোড়া মহেশ্বর রচনা দ্রষ্টব্য।

২৪/১৯ : রাইরাঁইয়া—রামচন্দ্র সেন (১৭১৮—১৭৯২)। কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র সেনের বিরোধ প্রসঙ্গে 'নদীয়া-কাহিনী'-তে কোনও তথ্য নেই। ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বিপিনমোহন সেন লিখিত 'চাঁদরাণী' গ্রন্থে এই বিরোধের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায়—সোমড়ার সেন পরিবারের ত্রিভুজা দুর্গা, 'রূপে রূপে দুর্গা'।

২৫/২০ : বর্গীর হাঙ্গামা—ভারতচন্দ্র রায় লিখিত 'অন্নদামঙ্গল' ও গঙ্গারাম লিখিত 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' গ্রন্থে বাংলায়, নদীয়ায় বর্গীর হাঙ্গামার-দৌরাত্ম্যের বিবরণ আছে। ১৭৪২—১৭৫১ খৃস্টাব্দে এই হাঙ্গামা দেখা দেয়। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায়—বর্গী-দৌরাত্ম্য ও স্থাননাম, 'নদীয়া স্থাননাম'।

৩২/১৮ : বিশ্বনাথ—'ডাকাত', 'দস্যুদলপতি' নামে আখ্যাত হলেও বিশ্বনাথ ছিলেন একজন কৃষকনেতা, গরিবের বন্ধু। সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন : 'ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের ভয়ঙ্কর অরাজকতার সময় দেশের মধ্যে এমন মানুষ খুব অল্পই ছিলেন, যাঁহারা অসহায় কৃষক জনসাধারণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনসাধারণের মহাশত্রু জমিদার-নীলকর-ইংরেজ শাসকগণের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন, জনসাধারণের জন্য নিঃশেষে আত্মদান করিতে পারিতেন। যে দুই-একজন মানুষ এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারাও সরকারী নথিপত্রে এবং বিদেশীদের রচিত ইতিহাসে দস্যু-ডাকাত নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল তথাকথিত ডাকাতদের মধ্যে বিশ্বনাথ বা বিশে ডাকাত খ্যাতি-অখ্যাতিতে সর্বাগ্রগণ্য। ......বিশ্বনাথ জমিদার-নীলকর ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শোষিত-উৎপীড়িত শত সহস্র অসহায় দরিদ্র মানুষের দুঃখ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পূর্বপুরুষদের অনুসৃত নিরুপদ্রব জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া অসহায় দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ মোচনের জন্য ডাকাতির পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, সেকালের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ কৃষকের জীবনধারণের জন্য একমাত্র ডাকাতির পথই উন্মুক্ত ছিল। বিশ্বনাথের ডাকাতির পথ বিদ্রোহের পথ। বিশ্বনাথ সাধারণ ডাকাত ছিলেন না, ছিলেন বিদ্রোহের নায়ক।' প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর 'নীলবিদ্রোহ ও বাঙালীসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন : 'বাঙলার নীলচাষের প্রায় প্রথম থেকেই নীলকৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের একটা ঐতিহ্য আছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হচ্ছেন বিশ্বনাথ সর্দার, বিশে ডাকাত নামে যিনি পরিচিত। তখন কোনো রাজনৈতিক দল বা আন্দোলন না থাকায় এইসব দুঃসাহসী ব্যক্তিরা অনেক সময় ডাকাত দল গড়তেন ; আসলে এঁরা বিদ্রোহের নায়ক।'

অত্যাচারী নীলকর স্যামুয়েল ফেডির নীলকুঠি ছিল কৃষ্ণনগরে, তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর পাশেই (বর্তমান কৃষ্ণনগর গভর্মেন্ট গার্লস স্কুলের পুরনো বাড়িটিই ছিল ফেডির নীলকুঠি তথা আবাসগৃহ)। বিশ্বনাথ দেশজ অস্ত্রে সজ্জিত একদল বীর কৃষককে নিয়ে ফেডির কুঠি আক্রমণ করে ফেডিকে বন্দী করে তাঁদের জঙ্গলকেন্দ্রে নিয়ে যান। কৃষকেরা ফেডির মৃত্যুদণ্ড দাবী করে। কিন্তু বিশ্বনাথ তাঁর প্রতি অনুকম্পা দেখিয়ে তাঁকে মুক্তি দেন। মুক্ত হয়েই ফেডি ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয়।

তৎকালীন নদীয়ার জেলাশাসক ইলিয়ট ও ইংরেজ সেনাদলের নায়ক ব্ল্যাক ওয়ারের নেতৃত্বে বিশ্বনাথ-দমন-অভিযান পরিচালিত হয়। বিশ্বনাথের পালিত পুত্রের বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাঁরা বিশ্বনাথের গোপনকেন্দ্রের সন্ধান পান। অবশেষে তাঁদের হাতে বিশ্বনাথ দলবলসহ অবরুদ্ধ হয়ে অনুচরদের রক্ষার জন্য নিজে দায়িত্ব নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। বিচারের প্রহসনে বিশ্বনাথের মৃত্যুদণ্ড হয়, প্রকাশ্য স্থানে বিশ্বনাথের ফাঁসী হয়। এইভাবে নদীয়া জেলার কৃষক-আন্দোলনের প্রথম বীরনেতা বিশ্বনাথ শহীদ হন। নদীয়া জেলার চাপড়া থানার গাঁটরা ভাতছালা (বর্তমানে দুটি পৃথক মৌজা, ৭৭ ও ৮৩) গ্রামে বিশ্বনাথের জন্ম। চাপড়া-কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিশ্বনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল। বিশ্বনাথের স্মৃতিবিজড়িত 'ডাকাতগাড়ির মাঠ' আজও বর্তমান।

বিশ্বনাথের সহযোদ্ধা কৃষকনেতারা হলেন মেঘা বা মেঘাই সর্দার, কেষ্ট বা কৃষ্ণরাম সর্দার, নলদা ও সন্ন্যাসী।

৩৪/১২ : মে ১৭৬৫-তে ক্লাইভ বাংলার গভর্নর হয়ে আবার কলকাতায় আসেন। ক্লাইভের প্রত্যাগমন উপলক্ষে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১২ মে ১৭৬৫ তারিখে দুটি স্বর্ণমোহর ও নয়টি রৌপ্যমুদ্রাদি সহ (নজরানা) ক্লাইভকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায় সম্পাদিত—'ক্ষিতীশ-বংশাবলিচরিত', পরিশিষ্ট। এতে কৃষ্ণচন্দ্রের পত্রের পাঠ আছে। সুতরাং পঞ্চমোহর নয়, কৃষ্ণচন্দ্র ক্লাইভকে দুটি মোহর নজর পাঠিয়েছিলেন।

৩৫/১০ : নীরহ—নিরীহ।

৩৫/২৯ : কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৮২ খৃস্টাব্দে গঙ্গাবাস রাজপ্রাসাদে (কৃষ্ণনগরের অদূরে আমঘাটা গ্রামে) পরলোকগমন করেন। এখন রাজপ্রাসাদের চিহ্নমাত্র নেই, অলকানন্দা নদীও বহতা নয়, বিলে পরিণত হয়েছে।

৩৬/২২ : সুখসাগর—চাকদহ থানার গঙ্গাতীরবর্তী এই জনপদ বর্তমানে গঙ্গার ভাঙনে অবলুপ্ত।

৩৬/৩২ : স্যার উইলিয়ম জোন্স (এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা) ১৭৮৩-৮৪ খৃস্টাব্দে সংস্কৃত শিক্ষালাভের জন্য কৃষ্ণনগরে নীলকুঠিয়ালদের আবাসগৃহে (বহুবার হস্তান্তরিত হয়ে বর্তমানে কৃষ্ণনগর কলেজের অদূরে জেলা শিক্ষা বিভাগের কার্যালয়) অবস্থান করেন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কাছে গিয়ে শাস্ত্রচর্চা করতেন। কৃষ্ণনগরের বৈদ্যবংশজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রামলোচন কবিভূষণের কাছে জোন্স সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন।

৩৭/১৭ : বদ্ধ-সলীলা—বদ্ধসলিলা। শ্রীবন—কৃষ্ণনগর শহরের দক্ষিণে অঞ্জনা নদীতীরবর্তী দোগাছি গ্রামে অবস্থিত ছিল, বর্তমানে আর শ্রীবন নেই, অবলুপ্ত।

৩৮/১২ : ভাগিরথী—ভাগীরথী।

৩৮/২১ : কৃষ্ণপান্তি—রাণাঘাটের পালচৌধুরী জমিদারদের আদিপুরুষ কৃষ্ণপান্তি (১৭৪৯—১৮০৯ খৃস্টাব্দ)। 'পালচৌধুরী' নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি।

৪০/১১ : তিতুমীর—বীর কৃষকনেতা তিতুমীর (১৭৮২—১৮৩১ খৃস্টাব্দ)।

প্রথম জীবনে ছিলেন পেশাদার পালোয়ান, পরে লাঠিয়াল। দাঙ্গা-অপরাধে কারাদণ্ডিত হন। মুক্তির পর মক্কায় যান এবং সেখানে ওয়াহাবি আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। দেশে ফিরে ওয়াহাবি ধর্মমতানুসারে ইসলামের সংস্কার সাধনের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। দরিদ্র অত্যাচারিত কৃষকদের রক্ষার জন্য হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে তিতুর বিরোধ হয়। নদীয়া (অবিভক্ত), যশোহর ও চব্বিশ পরগণা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অত্যাচারিত কৃষকদের সংগঠিত করেন। শাসকগোষ্ঠী ও নীলকর সাহেবরা তিতুর বিরুদ্ধে যান। তিতুকে দমনের জন্য বিরাট সেনাবাহিনী নিয়োজিত হয়। নারিকেল-বেড়িয়ায় তিতুর বাঁশের কেল্লা ইংরেজ সৈন্যেরা গোলার আঘাতে ধ্বংস করেন। তিতু নিহত হন। তিতুর প্রধান সহকর্মী বীর কৃষকনেতা মাসুমের ফাঁসি হয় ও সহযোদ্ধা ১৪০জনের কারাদণ্ড হয়। তিতুর আন্দোলন ও বিদ্রোহ গণবিক্ষোভে পরিণত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য বিহারীলাল সরকার—'তিতুমীর', স্বপন বসু সম্পাদিত।

৫১/১৬ : শিয়ালদহ-কুষ্টিয়া (ভায়া রাণাঘাট) রেলপথ খোলা হয় ১৫ নভেম্বর ১৮৬২ (অন্যমতে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬২)। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মীর মশাররফ হোসেন—'আমার জীবনী' ; দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

৫৫/৬ : কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে বাংলা লিপিযুক্ত অনুরূপ একটি 'স্মরণার্থ' কূপ এখনও বিদ্যমান, তবে অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত।

৫৯/পাদটীকা ২২ : আনুলিয়া—রাণাঘাটের নিকটবর্তী এই প্রাচীন জনপদে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে সেনরাজ লক্ষ্মণসেনের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। তার পাঠ অনুযায়ী জানা যায় যে মহারাজ 'অরিরাজদমনশঙ্কর' লক্ষ্মণসেন তাঁর তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে ভাদ্র মাসের নবম দিবসে পৌণ্ড্র বর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটী গ্রাম কৌশিক গোত্রীয় যজুর্বেদীয় কান্বশাখাধ্যায়ী বিপ্রদাসের প্রপৌত্র শঙ্করের পৌত্র ও দেবীদাসের পুত্র রঘুদেব শর্মাকে প্রদান করেন।

৬২/পাদটীকা ৩১ : সমুদ্রগড় রাজবাড়ির ধর্মান্তরিত মুসলমান পরিবারের অনুষ্ঠানাদি বিবরণের জন্য প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায়—সমুদ্রগড় রাজবাড়িতে মহরম ও দুর্গাপূজা, 'রূপে রূপে দুর্গা'।

৬৩/পাদটীকা ৩৭ : শিবনিবাসের পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণপুর গ্রামে মরমী সাধক জাফর খাঁর মাজার অবস্থিত।

৭৯—১২০ : 'নদীয়ায় বিদ্যাচর্চা' অধ্যায়ের জন্য প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—'বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা : বাঙালীর সারস্বত অবদান।'

৮১/১৭ : পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৫—১৪৭৬ খৃস্টাব্দ)—এঁর দরবারে গিয়ে সংবর্ধিত হন কবি কৃত্তিবাস।

১২৮/২১ : 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদ নাকি শ্যামাচরণ সরকারই করেছিলেন বলে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।

১২৯/২৯ : দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০—১৮৮৫) ১৭২৮ খৃস্টাব্দে নদীয়া

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে রচিত সংস্কৃত পুঁথি (এখন বার্লিনে আছে) 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতং'-এর অনুবাদ করেননি, তাঁর লিখিত ও ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' গ্রন্থ নদীয়ারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় পর্যন্ত নদীয়ার রাজপরিবারের ও বাংলার সামাজিক ইতিহাস। সংস্কৃত পুঁথিটির ইংরেজি অনুবাদ করেন সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত Dr. Wilhelm Pertsch (১৮৩২—১৮৯৯ খৃস্টাব্দ) এবং ১৮৫২ খৃস্টাব্দে বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়।

১৪৯/৫ : ফুলিয়ায় অধুনা কৃত্তিবাস-স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। ২৭ চৈত্র ১৩২২ বঙ্গাব্দে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশেই প্রতিবছর মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথির পরের রবিবারে কৃত্তিবাস-স্মরণোৎসব হয়ে থাকে। এখানে সরকার-পোষিত 'কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল কমিউনিটি হল কাম মিউজিয়াম' নামে একটি গ্রন্থাগার আছে। এখানে রামায়ণ-সংগ্রহ আছে।

১৫০/১৮ : ব্রাহ্মণী পূজা—ব্রহ্মাণী পূজা। নদীয়ায় মনসার লোকায়ত নাম ব্রহ্মাণী। নাকাশিপাড়া থানার ব্রহ্মাণীতলায় শ্রাবণ-সংক্রান্তি তিথিতে ব্রহ্মাণী পূজা হয়। সাপখেলা হয়, শোনা যায় ঝাঁপান গান, মনসাপুরাণের গান।

১৬৪/৩২ : কুলিয়া—কল্যাণী থানার অন্তর্গত। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে এখানে অপরাধভঞ্জনের মেলা বসে। শ্রীচৈতন্য কুলিয়ায় এসে এখানকার বৈষ্ণবনিন্দুক ও বৈষ্ণববিদ্বেষী দেবানন্দের অপরাধমার্জনা করেছিলেন, বৈষ্ণবদের কাছে তাই কুলিয়া 'অপরাধভঞ্জনের পাট' রূপে পরিচিত।

১৬৬/১৬ : প্রায়াগ—প্রয়াগ, তীর্থস্থান।

১৬৮/২ : সিথিল—শিথিল।

১৭২/৮ : মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭—১৯১২) বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম। 'বিষাদসিন্ধু' ও 'জমিদার-দর্পণ' প্রভৃতির রচয়িতা হিসাবেই শুধু তিনি খ্যাত নন, মুসলমান শিশুদের প্রথম পাঠ-গ্রন্থ 'মুসলমানের বাংলা শিক্ষা'-র (১ম ভাগ, ২য় ভাগ) রচয়িতা হিসাবে বাংলার আর এক বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত।

১৭৫/২০ : কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির কাছে আমিনবাজারে ব্রাহ্মসমাজ (দালান) মন্দির অবস্থিত, কিন্তু বর্তমানে কোনও ক্রিয়াকলাপ এখানে হয় না। শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজ মন্দির আছে। এছাড়া, বর্তমানে নদীয়ায় অন্যত্র কোথাও ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নেই।

১৮১—১৯১ : শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বা নববৈষ্ণব ধর্মের লৌকিক শাখাসমূহ (কর্তাভজা, সাহেবধনী প্রভৃতি) উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছিল অবিভক্ত নদীয়া জেলায়। বর্তমানে নদীয়া জেলায় এই সব লোকধর্ম কেন্দ্র হল :

কর্তাভজা—ঘোষপাড়া (কল্যাণী থানা), এখানে দোলপূর্ণিমায় সতীমার মেলা বসে।

সাহেবধনী—বৃত্তিহুদা (চাপড়া থানা)।

বলরামী—নিশ্চিন্তপুর (তেহট্ট থানা)।

খুশী বিশ্বাসী—ভাগা (কালীগঞ্জ থানা)।

কর্তাভজা লোকধর্ম সম্পর্কে 'নদীয়া-কাহিনী'-লেখকের বিরূপ ধারণা থাকায় তিনি সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য সুধীর চক্রবর্তী—'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান'।

১৮১/৯ : অগ্রদ্বীপ—অগ্রদ্বীপ। বর্তমানে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত, গঙ্গাতীরবর্তী জনপদ। এখানে বারুণী তিথিতে সাহেবধনী লোকধর্মসম্প্রদায়ভুক্তদের মেলা বসে। ভক্তেরা গরুর গাড়িতে আসে-যায়। বাংলার অন্য কোন মেলায় এত গরুর গাড়ির সমাবেশ হয় না।

১৯৪/২৩ : ঘোষপাড়া-কল্যাণী-সীমান্ত রেলপথে ঘোষপাড়ায় রেলস্টেশন হয়েছে।

১৯৪/২৯ : তেহট্ট—১৯৪৭ খৃস্টাব্দে দেশভাগের পর তেহট্ট থানা নদীয়ার সদর-উত্তর মহকুমা ভুক্ত। তেহট্ট গ্রামে এখন তেহট্ট থানার সদর দপ্তর অবস্থিত।

১৯৫/৩ : কৃষী—কৃষি।

১৯৫/২১ : সুন্দরপুর—সুন্দলপুর নামে পরিচিত। গ্রামের দাস-সরকার পরিবারের পারিবারিক বিগ্রহাদি কেন্দ্র করে ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় মেলা বসে। এছাড়া, তুলসীবিহারমেলাও বসে।

১৯৫/২৫ : গোস্বামী দুর্গাপুর—কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত।

১৯৬/১১ : বণেন্দ্—বাণেন্দ্।

১৯৭/৩২ : ব্রাহ্মণীতলা—ব্রহ্মাণীতলা (নাকাশিপাড়া থানা)।

১৯৭/৩৩ : বীরহী—বিরহী (হরিণঘাটা থানা)।

২০৫/ পাদটীকা ১২ : প্রস্তরমূর্তিটি অদ্যাবধি বিদ্যমান। বিষ্ণুমূর্তি—উচ্চতা ও প্রস্থ ১·৪ মি × ৬৯ সে. মি.। দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ, বাম হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে গদা ও পদ্ম। মস্তকের দুই পার্শ্বে দুটি উড্ডীয়মান গন্ধর্বের ক্ষুদ্র মূর্তি এবং পাদদেশের দুই পার্শ্বে চামরব্যজনরতা দুটি নারীমূর্তি। বর্তমানে শিবরূপে পূজিত এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে এই মূর্তিকে কেন্দ্র করেই এখানে গাজন উৎসব হয়।

২০৬/৯ : বেদশর্ব্ব—বেদগর্ভ।

২০৬/১৯ : সেনরাজ বল্লালসেন কর্তৃক কৌলীন্যপ্রথা সৃষ্টির কাহিনী ইতিহাসসম্মত নয়। ঐতিহাসিকেরা এইমত গ্রহণও করেননি। সেন আমলের সাহিত্য ও তাম্রশাসনাদি থেকে কৌলীন্য প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। আবার, আদিশূর কাহিনীও গৃহীত হয়নি। সেনরাজদের পূর্বেই বাংলায় ও মিথিলায় ব্রাহ্মণসমাজে কৌলীন্য প্রভাব ছিল। সম্প্রতি আবিষ্কৃত পালরাজ তৃতীয় বিগ্রহপাল (রাজত্বকাল আ ১০৪৩—১০৭০ খৃস্টাব্দ) -এর বনগাঁ ও তাম্রশাসনের পাঠ থেকে জানা গেছে যে পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতব্রাহ্মণদের সঙ্গে

স্থানীয় ব্রাহ্মণদের সম্পর্কসৃষ্টির জন্যই কৌলীন্যের উৎপত্তি ও কুলজীসাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল।

হিন্দুআমলে সেকালের সমাজে রাজাই ছিলেন সমাজের কর্তা, সমাজপতি। রাজা সমাজ পরিবর্তন সহজেই করতে পারতেন। কিন্তু বাংলার হিন্দুসমাজ পরিবর্তনে সেনরাজ বল্লালসেনের কোনও ভূমিকা বা অবদান—ইতিহাস-উপাদানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় নি।

২০৯/২৩ : মুদ্রিত পঞ্জিকার পূর্বে পুঁথি-পঞ্জিকা (হস্তলিখিত) প্রচলিত ছিল। পুঁথি-পঞ্জিকার লিখন-পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ :

৭	২	১
৪	১৬	৫৫
১৩	২৭	২৭
৯	৭	৮

তিনটি স্তম্ভের অঙ্কের ব্যাখ্যা :

প্রথম স্তম্ভ : ৭—বার (অর্থাৎ শনিবার), ৪—তিথি (অর্থাৎ চতুর্থী), ১৩—দণ্ড ৭ ৯—পল।

দ্বিতীয় স্তম্ভ : ২—ভরণী নক্ষত্র, ১৬—দণ্ড, ২৭—পল ও ৭—বিষ্টিকরণ।

তৃতীয় স্তম্ভ : ১—বিষ্কুম্ভ যোগ, ৫৫—দণ্ড, ২৭—পল ও ৮—মাসের তারিখ।

প্রথম বাংলা মুদ্রিত পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ ১২২৫ সালে।

সেকালের সমাজে বিবাহে লগ্নপত্র (পাত্র পাত্রীপক্ষের চুক্তিপত্র) ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, লগ্নপত্র লিখতেন লগ্নাচার্য ব্রাহ্মণেরা।

২১০/৭ : ষোড়শ শতকের নবদ্বীপের প্রখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দ্বাদশ শতকে জীমূতবাহন রচিত 'দায়ভাগ' গ্রন্থের টীকাসহ বহুবিধ স্মৃতিতত্ত্ব, তীর্থযাত্রাবিধি ও দায়তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁর পুঁথির নির্দেশ-বিধান আজও বাঙালী হিন্দুসমাজে সুপ্রচলিত।

২১০/১৬ : কৃষ্ণচন্দ্র সহ অন্যান্য নদীয়ারাজদের অব্রাহ্মণ শিল্পীদের (মৃৎশিল্পী, ভাস্কর, বয়নশিল্পী, কাংস্যশিল্পী প্রভৃতি) ভূমি দানপত্রের সন্ধান আমরা পাইনি।

২১২/৮ : কীর্ত্তিবাস—কৃত্তিবাস।

২১২/৩৪ : নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ (চাকদহ) ও কুশদ্বীপ (কুশদহ) হিন্দুসমাজের প্রধান এবং রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির ধারক-বাহক। স্বভাবতই শ্রেণীস্বার্থে তিনি সমাজকে চালনা করতেন। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন : "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র···স্বদেশের কোনো কলুষিত ব্যবহার পরিশুদ্ধ করণে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই।...তিনি...কোনো...ব্যক্তি স্বদেশের কোনো দূষিত ও অহিত ব্যবহার নিরাকরণে যত্নবান হইলে, তাঁহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন।'

২১৩/৪ : নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে নদীয়ারাজ-সিংহাসন অধিকার প্রসঙ্গে উল্লিখিত 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' দ্রষ্টব্য।

২১৩/১০ : নদীয়ায় অষ্টাদশ শতকে 'খেউড়' লোকগান সুপ্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্র লিখেছেন : 'নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব / নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।' খেউড় থেকে আখড়াই গান উদ্ভূত ও বিকশিত হয়। আখড়াই গানেরও জন্মস্থান নদীয়া। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন : 'সর্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্রসন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন।' আখড়াই গানেরই বিবর্তিত রূপ—তর্জা লড়াই ও কবিগান। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুগে রসরুচির মান ছিল রাজসভাকেন্দ্রিক। সামন্ততন্ত্র প্রভাবিতেরা স্বভাবতই অশ্লীলতা উপভোগী ছিলেন, অনুরক্ত ছিলেন।

২১৩/১৭ : প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায়—'কৃষ্ণনগরের কামান নির্মাণশিল্প ধারা', কৌশিকী, শারদীয় ১৩৯১।

২১৫/৩০ : রায়বাঁশ—রাইবেশে। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায়—'নদীয়ার লোকনৃত্য রাইবেশে ও জটাই সর্দার', কৌশিকী, শারদীয় ১৩৯২।

২১৬/৮ : প্রাসঙ্গিক স্মরণীয়—শান্তিপুরের অমিত বলশালী বীর আশানন্দ ঢেঁকি (মুখোপাধ্যায়)। অসামান্য শারীরিক ক্ষমতা ও বীরত্বের জন্য তিনি আজ প্রবাদ-পুরুষ।

২১৬/২৬ : তরবেতর—তরহ্-বে-তরহ্ অর্থাৎ হরেক রকম বা নানা প্রকার।

২১৭/২৮ : বাংলার সঙ্গীত ইতিহাসে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির ভূমিকা উল্লেখ্য উজ্জ্বল। 'বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীতচর্চা' গ্রন্থে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বাংলার রাগসঙ্গীতচর্চার প্রচলনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণনগরের রাজসভারও বিশেষ দান আছে। ...মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে এই দরবারের সঙ্গীতচর্চা বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বর্তমান ছিল।' কৃষ্ণনগর রাজদরবারে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা প্রভৃতি রাগসঙ্গীতচর্চার প্রচলন ছিল। পাখোয়াজ চর্চাও হত। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কৃষ্ণনগর রাজদরবারের উচ্চমানের সাঙ্গীতিক পরিবেশের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

২১৯/২৪ : নদীয়ায় সতীদাহপ্রথা, সহমরণ, অনুমরণ ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য 'নদীয়া-কাহিনী' লেখক কুমুদনাথ মল্লিক লিখিত 'সতীদাহ' এবং স্বপন বসু লিখিত 'সতী'। নদীয়া জেলার সতী পরিসংখ্যান : ১৮২৩ খৃস্টাব্দে ৫৯জন সতী হন, ১৮২৪ খৃস্টাব্দে ৭৩ জন সতী হন এবং ১৮২৫ খৃস্টাব্দে ৬০ জন সতী হন (এই ৬০ জনের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৩৭, কায়স্থ ৮, বৈদ্য ২ ও অন্যান্য তাঁতী, বেনে, গোয়ালা, তেলি, সদগোপ, নাপিত ও সেকরা ১৩)। নদীয়ার সতীদাহ স্থান : নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ফুলিয়া, সুখসাগর (অধুনা গঙ্গাগর্ভে লুপ্ত), চাকদহ, বিল্বপুষ্করিণী (বেলপুকুর) ও মাণিক্যডিহি (কালীগঞ্জ থানা)।

২২০/৫ : নদীয়ার মাণিক্যডিহি (কালীগঞ্জ থানা) গ্রামে বৈষ্ণব-গোস্বামী বংশের

লক্ষ্মীদেবী ১৮২৭ খৃস্টাব্দে গঙ্গাতীরে সহমৃতা হন, তাঁর পরিত্যক্ত শাড়ি ('সতীর শাড়ি' নামে পরিচিত) মহাসমাদরে গোস্বামী-পরিবারে রক্ষিত।

২২১/২১ : নদীয়ার মিষ্টান্ন বিখ্যাত। কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, সরভাজা, শান্তিপুরের নিখুঁতি, রাণাঘাটের পান্তুয়া, মুড়াগাছার ছানার জিলাপী ও মাজদিয়ার কাঁচাগোল্লার নামডাক আজও আছে।

২২৩/ পাদটীকা ৬ : কামানের বুকে খোদিত বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত লিপির সঠিক পাঠ :

জয়

কালিকা।

অখণ্ড···তৎসৎ।

শ্রীযুত কৃষ্ণ	শ্রীযুত
চন্দ্র রায়	বলরাম
মহারাজা	চট্টো উপধা
মহাশয়	মুদ্রাঙ্কিত

শ্রীব্রজকিশোর দাস দে কর্ম্মকার

২২৫/৮ : নদীয়ায় এখন এ নিয়ম প্রচলিত নেই।

২২৫/২২ : প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—'শান্তিপুর পরিচয়', প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং রাধিকানাথ মণ্ডল—'শান্তিপুর স্মৃতি'।

২২৭/১ : ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে স্বাধীনতাকালে নদীয়া জেলার সদর (কৃষ্ণনগর) ও রাণাঘাট মহকুমা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথমে এই জেলার নাম ছিল নবদ্বীপ, পরে হয় নদীয়া। নদীয়া জেলার মেহেরপুর (করিমপুর ও তেহট্ট থানা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়), চুয়াডাঙা ও কুষ্টিয়া মহকুমা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ') সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথমে এই জেলার নাম ছিল নদীয়া, পরে হয় কুষ্টিয়া। আবার ১৯৮৪ খৃস্টাব্দে পূর্বতন কুষ্টিয়া জেলা কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা ও মেহেরপুর জেলায় বিভক্ত হয় (এই তিনটি জেলার ১২টি থানা ১২টি উপজেলায় পরিণত হয়)।

২২৮/১৮ : বাগোয়ান—বর্তমানে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার বাগোয়ান ইউনিয়ানের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম।

২২৮/২৪ (ও ২২৮/২৯,) : ভাবানন্দ—ভবানন্দ।

২২৮/২৬ : কাননগু—কানুনগো—জমির হিসাবরক্ষক কর্মচারী বিশেষ।

২২৮/২৯ : মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ-কাহিনী ইতিহাস-আশ্রিত নয়। প্রখ্যাত

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ফারসী ইতিহাস-পুঁথি 'বহারিস্তান-ই-ঘাইবী' (রচয়িতা—আলাউদ্দীন ইস্ফাজানী শিতাব খাঁ, ছদ্মনাম—ঘাইবী, ডাকনাম—মির্জা নথন) থেকে প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাতে জানা যায় যে মানসিংহ মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৯৪ খৃস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬০৫ খৃস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বৃত ছিলেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হবার পর ১৪ অকটোবর ১৬০৫ মানসিংহকে এই পদে বহাল রেখে রাজধানী দিল্লী থেকে বাংলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর কয়েকমাসের মধ্যে বর্ধমানের শের আফগানের বেগম নূরজাহানকে হস্তগত করার জন্য কুতবুদ্দিন খাঁকে মানসিংহের স্থলে সুবাদার নিযুক্ত করেন। মানসিংহ বাংলা ত্যাগ করেন, আর ফিরে আসেননি। কাজেই মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বিনাশ করলে ১৬০৬ খৃস্টাব্দের মধ্যেই ঘটত। অথচ, ২৬ এপ্রিল ১৬০৯ তারিখে প্রতাপাদিত্য বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কয়েকদিন পরে যশোহরে ফিরে যাবার অনুমতি পান। উল্লিখিত 'বহারি-স্তান-ই-ঘাইবী' পুঁথিতে (মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৫৬) ১৬০৮ থেকে ১৬২৪ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই প্রামাণ্য পুঁথি থেকে জানা যায় যে রাজশাহী জেলার শাহপুর থানার আত্রেয়ী নদীতীরবর্তী বজ্রপুর গ্রামে প্রতাপাদিত্য বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছয়টি হাতি, নানা মূল্যবান দ্রব্য, কর্পূর, অগুরু ও নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ইসলাম খাঁকে উপঢৌকন প্রদান করেন। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে এই শর্তে বিদায় দিলেন যে বর্ষান্তে ভাটী প্রদেশের জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রতাপাদিত্যকে সসৈন্যে ইসলাম খাঁর সেনাদলের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু, শর্ত স্বীকৃত হলেও প্রতাপাদিত্য এই শর্ত পরে যথাসময়ে না মানায়, ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অভিযানে প্রথমে ইনায়েৎ খাঁ অগ্রসর হন, পরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন ফারসী পুঁথির লেখক মির্জা নথন তোপবাহিনী নিয়ে। এই বাহিনীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়ের তুমুল যুদ্ধ হয়। উদয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। মির্জা নথন প্রতাপের দুর্গ জয় করেন। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এই বাহিনীর কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও বন্দিত্ব ঘটে। সুতরাং মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য যুদ্ধকাহিনী ইতিহাস-আশ্রিত নয়, প্রমাণভিত্তিকও নয়।

২২৯/২ : ভাবানন্দ—ভবানন্দ।

২২৯/৫ : মাটিয়ারী—বর্তমানে নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার বাংলাদেশ-সীমান্তবর্তী গ্রাম। এখানে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও অবলুপ্ত। তবে পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত শিবমন্দির বর্তমান ও শিবলিঙ্গ ('রুদ্রেশ্বর' শিব নামে পরিচিত) নিত্য-পূজিত। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায়—'নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি'।

২২৯/১২ : জেষ্ঠ—জ্যেষ্ঠ=অগ্রজ।

২২৯/১৫ : উখড়া—উখড়া (নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার মৌজা) ; কুশদহ—কুশদ্বীপ (চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ থানায় অবস্থিত)।

২২৯/২৩ : রেউই > রেবতী=বলরামের স্ত্রী। কৃষ্ণনগরের পূর্বনাম রেউই।

২২৯/২৭ : দীগনগর—দিগ্‌নগর (নদীয়া জেলার কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত)।

২২৯/৩৪ : মৰ্দ্দানা গ্রামের নামকরণ করা হয় শ্রীনগর, বর্তমানে নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অন্তর্গত গ্রাম।

২৩০/১৫-১৬ : জাহাঙ্গীরা—জাহাঙ্গীরনগর=ঢাকা।

২৩০/১৭ : এই 'সুনিপুণ পূর্তকার্যক্ষম স্থপতি' হলেন আলা বথ্‌শ, তাঁর মাজার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির অদূরে পীরতলায় অবস্থিত।

২৩০/২১ : প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায় সম্পাদিত—সংস্কৃত 'ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতং'।

২৩০/২৪ : জেষ্ঠ্য—জ্যেষ্ঠ।

২৩০/৩০ : কিৰ্ত্তীমান—কীর্তিমান।

২৩৩/১ : কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বিদূষক গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক আছে। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু গোপালভাঁড়ের উল্লেখ করেননি।

২৩৩/৭ : দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন : রাজা কৃষ্ণচন্দ্র… 'স্বদেশের কোনো কলুষিত ব্যবহার পরিশুদ্ধ করণে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। …তিনি…কোনো…ব্যক্তি স্বদেশের কোনো দূষিত ও অহিত ব্যবহার নিরাকরণে যত্নবান হইলে, তাঁহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন।' কৃষ্ণচন্দ্র বাল্যবিধবার পুনর্বিবাহে সম্মত ছিলেন না।

২৩৪/২ : দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর 'ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিত' গ্রন্থে লিখেছেন : '…রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই রাজবিপ্লবের প্রবর্তক…ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। …লোকেরা তাঁহাকে নেমকহারাম কহিত।…এই রাজবিপ্লব সংগঠন বিষয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যে বিশেষ যত্ন ও সংস্রব ছিল, তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে।' ক্লাইভ-প্রদত্ত কামানগুলি আজও কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে আছে। একটি বিশাল তোপ-কামানের পাদপীঠের লিপি : Plassey Gun Presented by Lord Clive, 1757.

২৩৫/১ : কুব্যাহার—কুব্যবহার।

২৩৫/৪ : এই দানপত্রের পূর্ণপাঠ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় লিখিত 'ক্ষিতীশ-বংশাবলিচরিত' গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে।

২৩৬/২১ : নদীয়ারাজ গিরীশচন্দ্র রায় কর্তৃক কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত আনন্দময় শিবমন্দির ও আনন্দময়ী কালীমন্দির এবং নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ভবতারণ শিবমন্দির ও ভবতারিণী কালীমন্দির আজও বর্তমান।

২৩৭/১৭ : ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় (১৮৯০-১৯২৮)-এর পর বংশলতা : সৌরীশচন্দ্র—সৌমীশচন্দ্র—মণীশচন্দ্র।

২৩৭/২৫ : ১২০২ খৃস্টাব্দে বখতিয়ারের আক্রমণ-অভিযানের ফলে লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ থেকে পলায়নে হিন্দুরাজত্বের অবসান হয়। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের ফলে মুসলমান রাজত্বের অবসান হয়। আবার এপ্রিল ১৯৭১ খৃস্টাব্দে অবিভক্ত নদীয়ার মুজিবনগরে (বর্তমানে বাংলাদেশভুক্ত) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সূচনা হয়। সুতরাং বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বৃহত্তর নদীয়া ভূখণ্ডের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

২৩৭/৩১ : মনোমোহন ঘোষ নির্মিত বাসভবনে এখন কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণনগর কলেজ ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে ও কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে স্থাপিত হয়।

২৩৯/৮ : হরধাম রাজবংশের সঙ্গেই একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ রক্ত-সম্পর্ক বিদ্যমান। হরধাম শাখায় কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ বংশধর যোগেশচন্দ্র রায় এখন রাণাঘাট ছোটবাজারে বসবাস করেন। হরধামের চিন্ময়ী কালীমূর্তি এবং সুখসাগর (চাকদহ থানার গঙ্গাতীরবর্তী এই গ্রাম অধুনা গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত) গ্রামের উগ্রচণ্ডী (বা সিদ্ধে-শ্বরী) কালীমূর্তি এখন রাণাঘাটে যোগেশচন্দ্র রায়ের আবাসে দালান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা ও নিত্যপূজিতা।

২৪১/১৯ : নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার চূর্ণীনদীতীরবর্তী গ্রাম শিবনিবাস। এখানে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এখন পাঁচটি মন্দির বর্তমান। এখানকার সবচেয়ে উঁচু দেবালয়টি সাধারণের কাছে 'বুড়োশিব'-এর মন্দির নামে পরিচিত। শিবের আনুষ্ঠানিক নাম 'রাজরাজেশ্বর'। দেবালয়টি বাংলায় প্রচলিত মন্দিররীতির কোনও শ্রেণীতে পড়ে না। অষ্টকোণ প্রস্থচ্ছেদের এ দেবগৃহের শিখর ছত্রাকার। খাড়া দেওয়ালের প্রতি কোণে মিনার ধরনের আটটি সরু থাম নির্মিত হয়েছে। স্থাপত্যের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় এই আলংকারিক স্তম্ভগুলিতে মুসলমানী প্রভাব স্পষ্ট। উত্তরদিক ছাড়া আর তিনদিকে প্রবেশদ্বার আছে। প্রবেশদ্বারের খিলান ও অবশিষ্ট দেওয়ালে একই আকৃতির ভরাট করা নকল খিলানগুলি 'গথিক'-রীতির স্মারক। দক্ষিণদিকের দেওয়ালে উঁচুতে নিবদ্ধ শিলাফলকে উৎকীর্ণ লিপির শুদ্ধ পাঠ :

১৬৭৬

যো জাতঃ খলু ভারতে সুরতরু জেতা দিগীশাং শকে
সেনানীমুখবাজিরাজবিলসৎ সংখ্যাবতী দমপুরে।
কৃত্বা মন্দিরমিন্দু চুম্বিশিখরং ভূপাল চূড়ামণি
স্তত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতিঃ শম্ভুং সমস্থাপয়ত ॥

অর্থাৎ ১৬৭৬ শকাব্দে (১৭৫৪ খৃস্টাব্দে) ইন্দু চুম্বী শিখরযুক্ত মন্দির নির্মাণ করে নৃপশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র এখানে শম্ভু (শিব)-কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৬ ফুট (১.৮ মি) উঁচু, আটকোণা ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত ও মন্দিরের

আটটি খাড়া দেওয়ালের প্রতিটি প্রস্থ ১৭ ফুট ৩ ইঞ্চি (৫.৩ মি) ও চূড়া সমেত সৌধটির উচ্চতা প্রায় ৮০ ফুট (২৪.৪ মি.)। বস্তুত, এত উঁচু প্রাচীন দেবালয় পশ্চিমবঙ্গে (এবং বাংলাদেশে) আর নেই। নদীয়ার শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের যোগপীঠ মন্দির, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ISKCON) সমাধিমন্দির ও বেলুড়মঠের মন্দির উঁচু হলেও সাম্প্রতিককালে নির্মিত।

কালো পাথরের শিবলিঙ্গটির উচ্চতা ৯ ফুট (২.৭ মি.) এবং Spout-সমেত বেড় ২১ ফুট ১০ ইঞ্চি (৬.৭ মি.)। পূর্বভারতে এত বড় শিবলিঙ্গ খুব বেশি নেই। শিবলিঙ্গের পাদপীঠে বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ সংস্কৃত লিপির পাঠ :

ত্রৈলোক্য প্রভুনাপ্রতিষ্ঠিততয়া যো রামেণ রামেশ্বর স্তদ্বৎ
শ্রীদ্বিজকৃষ্ণচন্দ্র কৃতিনা ভূরাজ রাজাভিধাম্।
তৎ দ্বতাম দধতা স্বয়ং ত্রিজগতীনাথোঽপি সংস্থাপিতো নাম্না
ভক্ত পরায়ণঃ সমভবৎ শ্রীরাজরাজেশ্বরঃ ॥

অর্থাৎ ত্রিজগতে গুণাধিক রামচন্দ্র কর্তৃক যেমন রামেশ্বর (শিবলিঙ্গ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনই কৃতী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক পৃথিবীর রাজার রাজা সংজ্ঞা ধারণ করে ত্রিজগতীনাথ (শিবলিঙ্গ) ভক্তপরায়ণ শ্রীরাজরাজেশ্বর নামে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

বুড়োশিব বা রাজরাজেশ্বর শিবমন্দিরের পুবদিকে, কিছু ব্যবধানে, আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট চারচালা শিবমন্দির আছে। সেখানকার ৭½ ফুট (২.৩ মি.) উঁচু শিবলিঙ্গের নাম 'রাজ্ঞীশ্বর'। এই শিবলিঙ্গের পাদপীঠেও বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত লিপি উৎকীর্ণ আছে। লিপির পাঠ :

যঃ শ্রীমানধিগত্য রাজতি মহারাজাদিরাজেন্দ্রতাং
লক্ষ্মীস্তন্ মহিষী হরেরিব মহারাজ্ঞীতি সংকীর্ত্তিতা।
তৎসংস্থাপিত এব দীব্যতি মহারাজ্ঞীশ্বরোঽয়ং শিবঃ
খ্যাতঃ স্যাদ্ গিরিশস্তদীশ্বরতয়া ভক্ত্যা হি যৈঃ স্থাপ্যতে ॥

অর্থাৎ যে শ্রীমান্ (=শ্রীমন্ত/সৌভাগ্যমণ্ডিত পুরুষ=মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র) মহারাজ-সমূহের মধ্যে রাজশ্রেষ্ঠরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করে অবস্থান করেছেন, হরির যেমন লক্ষ্মী, তেমনি তাঁর মহিষীও মহারাজ্ঞীরূপে সংকীর্তিত হয়ে থাকেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহারাজ্ঞীশ্বর (নামক) এই শিব শোভা পাচ্ছেন (এই) গিরিশ (=শিব) তাঁর ঈশ্বররূপে খ্যাত হোন যেহেতু যিনি (=তিনি) ভক্তিসহকারে স্থাপিত হচ্ছেন।

৪ ফুট (১.২ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত এই বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদের মন্দিরটির প্রতি দিকের দৈর্ঘ ২৬ ফুট ৪ ইঞ্চি (৮ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট (১৮.৪ মি.)। উত্তরদিক ছাড়া অন্য তিনদিকে প্রবেশদ্বার আছে। পূর্বদিকের ভিত্তির গায়ে নিবদ্ধ পাথরের অতি সুন্দর প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ :

১৬৮৪

যঃ সাক্ষাৎ কৃতশৈবমূর্ত্তিবসুধেশানাং শকে সম্ভবাত

সুরেন্দ্রনাথের নামে 'Surendranath Palchaudhury Memorial Hall'—নির্মাণ করলে গ্রন্থাগার সেখানে স্থানান্তরিত হয়। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মনোজ ঘোষ সম্পাদিত —'রাণাঘাট পাবলিক লাইব্রেরী : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ', ১৯৮৪।

২৫৯/১৭ : পালচৌধুরীদের প্রাচীন সুবৃহৎ ভদ্রাসন দর্শনীয়। পালচৌধুরীবাড়ির বিস্তীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যে আছে পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত একজোড়া দক্ষিণমুখী আটচালা শিবমন্দির। কাছেই নাচঘর, সিংহদ্বার ও ভগ্ন জীর্ণ রম্য অট্টালিকা।

২৬৩/৯ : কুমুদনাথ মল্লিক হলেন 'নদীয়া-কাহিনী'-র গ্রন্থকার। কুমুদনাথের একমাত্র সন্তান শচীন্দ্রনাথ, তাঁর স্ত্রী সরোজিনী দেবী। শচীন্দ্রনাথ রাণাঘাটের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাণাঘাট পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। ৫ অকটোবর ১৯৬৭ তিনি পরলোকগমন করেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁদের চার পুত্রের মধ্যে দেবীপ্রসাদ ও বিজয়প্রসাদ জীবিত, শঙ্করপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ মৃত এবং চার কন্যার মধ্যে বাণী (স্বামী ভবানীপ্রসাদ পালচৌধুরী, রাণাঘাট) ও গীতা (স্বামী নির্মলকুমার দে, কুরকেল্লা) জীবিতা, কল্যাণী ও প্রতিমা মৃতা।

২৬৫/১ : উল্লিখিত পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দিরগুলি পালপাড়ায় অবস্থিত। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত চারচালা মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, এই মন্দিরের দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি (৮.১ মি.), প্রস্থ ২১ ফুট (৬.৪ মি.) ও উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট (১২.২ মি.)। গম্বুজাকৃতি ছাদ ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যশৈলী বিচারে মন্দিরটি সতেরো শতকের সূচনায় নির্মিত। প্রবেশদ্বারের পত্রাকৃতি খিলানের উপরে ও দুপাশে ভাস্কর্য। এখানেই আছে রামায়ণের দৃশ্য—লঙ্কাযুদ্ধ, বামে রামচন্দ্র ও বানরসেনা, ডানে দশানন রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও রাক্ষসগণ। এত উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির ভাস্কর্য নদীয়ার অন্য কোনও মন্দিরে নেই।

পালপাড়ায় একসময় প্রখ্যাত পণ্ডিতসমাজের বসবাস ছিল। তাঁদের মধ্যে ন্যায়টীকাকার লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ, রামমোহন রায়ের তান্ত্রিকগুরু হরিহরানন্দ অবধূত (নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার), ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও প্রথম বাংলা অভিধানকার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রামধন বিদ্যালঙ্কার ও কৃষ্ণনগর রাজসভার পণ্ডিত শ্রীধর সার্বভৌম প্রমুখ উল্লেখ্য।

২৬৭/২৮ : বর্তমানে কল্যাণী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনপল্লী গ্রামে অবস্থিত কৃষ্ণরায় বিগ্রহের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ আটচালা মন্দির। আয়তাকার—দৈর্ঘে ৪৯ ফুট ৬ ইঞ্চি (১৫.১ মি.), প্রস্থে ৩৩ ফুট ৬ ইঞ্চি (১০.৩ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৬০ ফুট (১৮.৩ মি.) ত্রিখিলানযুক্ত অলিন্দের পিছনে গর্ভগৃহ। পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত এই মন্দিরের প্রবেশদ্বার কাষ্ঠনির্মিত—পৌরাণিক নকশা ক্ষোদিত।

২৬৮/১৭ : বাগেরগ্রাম এখন চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত ও প্রাচীন মসজিদটি পরিত্যক্ত ও ভগ্নদশায় পরিণত।

২৭০/১ : সুখসাগর গ্রাম এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন।

২৭২/১ : চুয়াডাঙা এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

২৭৩/১৮ : অবিভক্ত নদীয়া জেলার নীলবিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন প্যারীসুন্দরী দেবী। তিনি কুখ্যাত অত্যাচারী নীলকর টমাস আইভান কেনীর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই নিঃসন্তান বিধবা ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানার (বর্তমানে উপজেলা) সদরপুরের জমিদার। তাঁর পিতা রামানন্দ সিংহ কুমারখালির ইংরেজ রেশম কুঠির নায়েব ছিলেন, পরে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে চাকরী করেন। মীরপুর এলাকায় জমিদারীলাভ করে তিনি সদরপুরে স্থায়ী নিবাস নির্মাণ করেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা প্যারীসুন্দরী পিতার জমিদারীর অর্ধাংশ লাভ করেন। এই সময় নীলকর কেনী কুষ্টিয়া অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকার জমিদারী ক্রয় করে ব্যাপক নীলচাষ শুরু করেন এবং তাঁর অত্যাচারে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। কেনী বাস করতেন কুষ্টিয়ায় ও শালঘর-মধুয়ায়। কুষ্টিয়া শহরে পুরাতন থানার উত্তরে ছিল কেনীর বাসভবন, পরে গড়াই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কেনীর কুষ্টিয়াস্থিত অপর বাসগৃহও (বেকী দালান নামে পরিচিত) ধ্বংসীভূত। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে কেনীর অত্যাচারের বর্ণময় চিত্র তুলে ধরে লিখেছেন : 'কেনীর দৌরাত্ম্যে আগুনে দেশের লোক জলিয়া পুড়িয়া খাক হইতে লাগিল।' কেনী প্যারীসুন্দরীর ভাড়ল-পোড়াদহ অঞ্চলের ধানের জমিতে বলপূর্বক নীলচাষ শুরু করেন। ফলে দুজনের মধ্যে বিরোধ বাধল। চাষী-প্রজাবৃন্দ প্যারীসুন্দরীর কাছে গিয়ে দিনের পর দিন কেনীর অত্যাচারের কথা জানাতে লাগল। প্যারীসুন্দরী তাঁর নায়েবকে প্রজাদের মাঠের ধান রক্ষার জন্য লাঠিয়াল বাহিনী নিয়োগের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কেনী বাহিনীর হাতে তারা পরাজিত হল, প্যারীসুন্দরীর ভাড়লকুঠি লুণ্ঠিত হল, কেনীর অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পেল। প্যারীসুন্দরীর নির্দেশে দেশী অস্ত্রে সজ্জিত অগণিত চাষী কেনীর শালঘর-মধুয়ার কুঠি আক্রমণ করল। শ্রীমতী কেনী অজস্র কাঁচা টাকা ছড়িয়ে দিয়ে কেনীকে পালাবার সুযোগ করে দিলেন। কেনী প্যারীসুন্দরীর বিরুদ্ধে কুঠিলুঠের মামলা আনলেন। আসামী প্যারীসুন্দরী সগর্বে ঘোষণা করলেন : 'আমার লাঠিয়াল কুঠি লুঠ করেছে জেনে আমার সুখবোধ হচ্ছে। আমি বাঙালীর মেয়ে—সাহেবের কুঠি লুঠ করেছি—এর চেয়ে বেশী সুখের বিষয় আর কী আছে।' একথা শুনে কেনী জানালেন যে প্যারীসুন্দরীকে যে তাঁর কাছে এনে দিতে পারবে তাকে তিনি একহাজার টাকা পুরস্কার দেবেন এবং প্যারীসুন্দরীকে গাউন পরিয়ে মেম সাজিয়ে তাঁর কুঠিতে রাখবেন। এর উত্তরে প্যারীসুন্দরী নির্ভীক চিত্তে জানালেন : 'কেনীর মাথা আমার সামনে যে আনবে সে পাবে নগদ একহাজার টাকার তোড়া।' প্যারীসুন্দরী প্রতিজ্ঞা করলেন : 'আমার সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আমি কেনী-হত্যার জন্য রাখলাম।' প্যারী-সুন্দরীর লাঠিয়াল বাহিনী কেনীর শালঘর-মধুয়ার কুঠি পুনর্বার আক্রমণ করে বিধ্বস্ত

করে। কেনী পালিয়ে বাঁচেন। দারোগা খুন হয় লাঠিয়ালদের হাতে। পুলিশেরাও পালিয়ে যায়। আবার প্যারীসুন্দরীর বিরুদ্ধে সরকারী মামলা শুরু হয়। বিচারের প্রহসনে প্যারীসুন্দরীর যাবতীয় জমিদারী ইংরেজ সরকার অধিকার করেন। পরে প্যারীসুন্দরী এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে ও বহু অর্থ ব্যয় করে জমিদারী ফেরৎ পেলেন। কিন্তু তখন তিনি ঋণভারে জর্জরিতা, ফলে জমিদারীর বিরাট অংশ পত্তনী-বন্দোবস্ত করে দিলেন। পরে প্যারীসুন্দরী তাঁর দত্তকপুত্র তারিণীচরণ সিংহকে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। নীলকর কেনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্যারীসুন্দরী দেবী যে নির্ভীক ভূমিকা পালন করেছিলেন—তা আজও স্মরণযোগ্য। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য শ. ম. শওকত আলী—'প্যারীসুন্দরী : নীল বিদ্রোহের নেত্রী', ছুটি, (ঢাকা), ৯ মে ১৯৮৬।

২৭৩/৩১ : অবিভক্ত নদীয়া জেলায় নীলকরদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির অধিকাংশই ক্রয় করেন পালচৌধুরী জমিদারেরা। নীলকুঠিগুলিও তাঁদের অধিকারে আছে। নবদ্বীপ থানার স্বরূপগঞ্জের নীলকর স্যাবি সাহেবের সুরম্য নীলকুঠি এখন পালচৌধুরীদের বংশধরদের আবাসগৃহ। কৃষ্ণনগর শহরের একটি নীলকুঠিতে (পরবর্তী-কালে পালচৌধুরী-জমিদারীভুক্ত) এখন হোলি ফ্যামিলি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় অবস্থিত। কৃষ্ণনগরে জেলা শাসক ও জেলা জজের আবাসগৃহ, রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন এবং জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ, নদীয়ার কার্যালয় একদা ছিল নীলকুঠি।

২৭৫/৫ : 'ষোড়শ শতাব্দীতে মেহের আলী শাহ নামক এক দরবেশ এই শহর স্থাপন করেন বলে কিংবদন্তী আছে।' দ্র. সৈয়দ মুর্তাজা আলী—কুষ্টিয়ার কথা, 'কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী ৭৫ বছর পূর্তি স্মারকগ্রন্থ', ১৯৮৫।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৬৯—১৯৪৩) জন্মস্থান মেহেরপুর। তাঁর লিখিত 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য', 'পল্লীকথা', 'পল্লীবধূ' ও 'পল্লীচরিত্র' গ্রন্থগুলিতে মেহেরপুর অঞ্চলের জন-ইতিহাসের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান আছে।

২৭৮/২৮ : মেহেরপুর পৌরশহরের ভৈরবনদ-তীরবর্তী মালোপাড়ায় (মেহেরপুর মৌজা, দাগ নং ১৯২৩, জমির পরিমাণ—৩৫ শতক, দাতা—জমিদার জীবন মুখোপাধ্যায়) বলরাম হাড়ির আখড়া আজও জীর্ণদশায় বর্তমান। এখানে আটচালা মন্দিরের অবয়বে বলরাম হাড়ির সমাধিগৃহ। বারুণী তিথিতে এখানে বলরামী সম্প্রদায়ের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বলরামের পাদুকা অপহৃত, সর্বশেষ পাদুকা-সেবাইত বৃন্দাবন হালদার ৮০ বছর বয়সে ১৯৮৫-তে দেহ রেখেছেন।

২৭৮/৩৪ : মেহেরপুরে আজও রেলপথ হয়নি। কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা থেকে পাকা সড়কপথ আছে।

২৮০/১১ : দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান ও মুর্শিদাবাদের কান্দী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। জনশ্রুতি অনুসারে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোধানের পর বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত মল্লরাজ বীর হাম্বির (রাজত্বকাল ১৫৯১—১৬১৬ খৃ.) নবদ্বীপের রামচন্দ্রপুর (প্রাচীন মায়াপুর) এলাকায় কালো পাথরের

মহাপ্রভু মন্দির নির্মাণ করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ধর্মপ্রাণ এই মল্লরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের দীক্ষিত শিষ্য। কালক্রমে, হাম্বির-নির্মিত মন্দির ধ্বংস হয়ে গেলে, সেখানেই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ লাল পাথরের ৬০ ফুট উঁচু একটি নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরও এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন। এই মন্দির সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে বঙ্গীয় সরকার প্রকাশিত 'Territorial Aristocracy of Bengal' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৬—৭ পৃষ্ঠায়, 'Calcutta Review' পত্রিকায় (১৮৪৬ খৃ., পৃ. ৪২৩), এবং 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ খৃ.)। অনুমিত হয়, ১৮২০ খৃস্টাব্দের বিধ্বংসী বন্যায় এই মন্দির অবলুপ্ত হয়। সম্প্রতি নবদ্বীপের রামচন্দ্রপুর (প্রাচীন মায়াপুর) এলাকায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ পূর্বাঞ্চল চক্র প্রত্নসমীক্ষায় ও প্রাথমিক উৎখননে মসৃণ কালো কষ্টিপাথরের তৈরি স্থাপত্য-নিদর্শনের সন্ধান পেয়েছেন। পাথরের আকার ৬০×৪০×৪ সেন্টিমিটার এবং এই স্থাপত্য নিঃসন্দেহে মানুষের তৈরি কিন্তু কোনও লেখ (Inscription) বা অন্য কোনও পাথুরে প্রমাণ মেলেনি—যা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই স্থাপত্য বীর হাম্বির প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু-মন্দির। অনুসন্ধান চলছে।

১৮১/৭ : জহ্নুনগর—জাননগর বা জাহান্নগর, বর্তমানে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত। এখানকার মনসাপূজা বিখ্যাত ও প্রাচীন। জনশ্রুতি যে চাঁদসওদাগর নাকি এখানেই সর্বপ্রথম মনসাপূজা করেন। এখানে একটি মন্দিরে মনসাবেদী বা থান বর্তমান। কথিত আছে যে এই স্থানেই জহ্নুমুনি এক গণ্ডূষে গঙ্গাকে পান করেছিলেন, তাঁর নামেই স্থাননাম। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ১৪ আগস্ট ১৮১৯ ও ২০ নবেম্বর ১৮১৯ সংখ্যায় এখানকার মনসা তথা ব্রহ্মাণী পূজার বিবরণ আছে।

১৮১/১৮ : 'Bengal District Gazetteers : NADIA' (1910) গ্রন্থে J. H. E. Garrett লিখেছেন : "The first recorded visit of Church of England missionaries to the district occurred in 1822, when Messrs. Hill, Warden and Trawin of the London Missionary Society went to Santipur to see whether it would make a suitable mission Station. They reported that 'the people have much simplicity and received the truth more earnestly than the Bengalies generally.' They recommended the establishment of a station here for various reasons, among which was 'the favourable disposition of the moral feelings of the people, which we conceive, has been cherished materially by the general instruction which has been diffused by the Company's school.'......In 1832, a Mr. Deerr, who was then stationed at Kalna in the Burdwan district, went to Krishnagar for a change of air, and, while there, opened two schools

in the town of Nabadwip and one at Krishnagar itself. For the next few years work consisted mainly in the establishment of more schools, but, in 1838, 560 persons were baptised at Krishnagar, Rana bandha, Bhabarpara, Solo and Anandabash, and a mud church was build at Bhabarpara. In 1840 mission houses were built at Kapasdanga, Chapra and Ratanpur, and another church was built at Solo."

অবিভক্ত নদীয়া জেলায় ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রবর্তক Deerr সাহেবের সমাধি আছে চাপড়ায়, প্রোটেস্টান্ট গির্জা সংলগ্ন এলাকায়। এঁর কাছে নবদ্বীপে প্রথম ইংরেজি শিক্ষালাভ করেন রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য।

১৮৩৪ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে স্থাপিত জন সেন্ট জন্স চার্চ মিশনারী সোসাইটি বিদ্যালয়, বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয় এবং অখণ্ড বাংলার প্রাচীনতম বিদ্যালয়গুলির অন্যতম।

রতনপুর, ভবেরপাড়া, বল্লভপুর ও কাপাসডাঙা বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলাভুক্ত এবং চাপড়া, সোলো, রাণাবন্ধ ও আনন্দবাস নদীয়া জেলাভুক্ত।

২৮২/১১ : নবদ্বীপের সংস্কৃতচর্চার ইতিহাসের সঙ্গে 'বঙ্গবিবুধজননী সভা'র নাম বিশেষভাবে যুক্ত। ১২৯২ সালে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'সংস্কৃত বিদ্যাবিবর্ধিনী বিদগ্ধজননী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার উন্নতি এবং বিদ্যার্থীদের উৎসাহদানই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভা থেকে বিবিধশাস্ত্রে পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং উপযুক্তদের রত্ন সম্বলিত উপাধি ও পদকাদি দেওয়া হয়। প্রথম সভাপতি হন পাইকপাড়াধিপতি রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে সভাপতি হন নদীয়ারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়। এই সময়ে সভার নাম পরিবর্তিত হয়—বঙ্গবিবুধ-জননী সভা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ খৃস্টাব্দে এই সভার সভাপতি ছিলেন। আজ পর্যন্ত দেশবিদেশের বহু সংস্কৃতজ্ঞ জ্ঞানীগুণীকে উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করেছেন এই সভা। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে এই সভা পুরাতন পাকাটোলের গৃহাদি ক্রয় করে সেখানেই 'সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যাপীঠ' স্থাপন করেন।

২৮৩/১৯ : বিল্বপুষ্করিণীর লোকায়ত নাম বেলপুকুর। এই জনপদ শুধুমাত্র সংস্কৃতচর্চাকেন্দ্রের জন্য নয়, শাক্তাচার-তন্ত্রাচারকেন্দ্ররূপেও বিখ্যাত। এখানে কার্তিকী অমাবস্যা ও রটন্তী তিথিতে ঘরে ঘরে তন্ত্রাচারে কালীপূজা আজও হয়ে থাকে। প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য মোহিত রায়—'রূপে রূপে দুর্গা'।

২৮৪/১ : কুষ্ঠিয়া নয়, কুষ্টিয়া।

২৮৪/২৭ : ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে এখানে স্বতন্ত্র জেলা গঠিত হয়।

২৮৫/১৬ : কাঙাল হরিনাথ ও মীর মশাররফ হোসেনের জন্মস্থান কুমারখালিতে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ পদ্মা-গড়াইনদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত।

২৮৬/১৩ : মুড়াগাছা সংলগ্ন প্রাচীন জনপদ—ধর্মদহ, কাঁচকুলি ও বহিরগাছি।

এই তিনটি গ্রামও একদা ব্রাহ্মণপ্রধান ও সংস্কৃতচর্চাকেন্দ্র ছিল।

এই তিনটি গ্রামের পণ্ডিত সমাজের পরিচয়ের জন্য কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত 'সাধক' পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যশরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ধর্মদ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২১), 'কাঁচকুলি' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১) 'বহিরগাছি' (চৈত্র ১৩২০) প্রবন্ধ তিনটি পঠিতব্য।

২৮৭/১০ : যদুনাথ রায় কৃষ্ণনগর পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত পৌরপতি ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ রায়ের পৌত্র অজিতনাথ রায় ভারতের সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয়পুত্র ভৈরবচন্দ্রের কন্যার বংশধরদের চাঁদসড়ক মৌজার রায়পাড়া অঞ্চলে পুরুষানুক্রমিক বসবাস। নদীয়ারাজ রঘুরামের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজেশ্বরীর বংশধর হলেন রবীন্দ্রঘনিষ্ঠ, বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থকার ও শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর আদর্শ শিক্ষক জগদানন্দ রায় (১৮৬৯—১৯৩৩)। তাঁদেরও পুরুষানুক্রমিক বসবাস চাঁদসড়ক মৌজার রায়পাড়ায়।

২৮৮/৬ : ১৮ জুন ১৮২৪ খৃস্টাব্দে কলিকাতার লর্ড বিশপ রেভারেণ্ড হেবার জলপথে ঢাকা যাবার সময় শিবনিবাসের মন্দির ও রাজপ্রাসাদাদি দেখে মুগ্ধ হন। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর স্মৃতিকথা : 'Narrative of a Journey through the upper Provinces of India, vol. I, 1824—1825' by the Right Rev. Reginald Hebber, Lord Bishop of Calcutta, published by John Murray, London.

২৯১/২২ : 'বঙ্গরত্ন' সাপ্তাহিক পত্রিকা আজও কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, ১৯০৫ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, প্রতিষ্ঠাতা কানাইলাল দাস।

২৯১/৭ : এখানে পালপাড়ার চারচালা মন্দিরের কথাই বলা হয়েছে।

২৯২/১৯ : ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের আধিকারিক জোসেফ ডেভিড মেলেক বেগলার চাকদহ পৌরসভার প্রতিষ্ঠাতা-পৌরপতি। তাঁর চাকদহের বাসভবনে রক্ষিত পাথরের বিশাল বুদ্ধমূর্তি কলিকাতায় আশুতোষ সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত হয়েছে।

২৯২/২৫ : হালিশহর বর্তমানে চব্বিশ পরগণা জেলাভুক্ত।

২৯৪/২ : বখতিয়ারের অভিযানের প্রায় ৫০ বছর পরে মুগীসউদ্দীন য়ুজবক্ নুদীয়া ও তৎসন্নিহিত ভাগীরথী অববাহিকা অঞ্চল অধিকার করেন এবং এই বিজয়ের স্মারক হিসাবে ১২৫৫ খৃস্টাব্দে নুদীয়ার টাঁকশাল থেকে প্রস্তুত এক বিশেষ শ্রেণীর রজতমুদ্রার প্রচলন করেন। 'Catalogue of Coins in the Indian Museum', Calcutta, vol. II, pt. II, p. 146, no. 6। এবং মোহিত রায়—'নদীয়া স্থাননাম' দ্রষ্টব্য।

* ২৯৫/৪ : আঙ্গিন—অঙ্গন। শ্রীবাসঅঙ্গন এখন নবদ্বীপে সোনার গৌরাঙ্গমন্দির সংলগ্ন।

২৯৭/১ : এই তথ্য অবিভক্ত নদীয়া জেলা বিষয়ক।

২৯৮/৭ : খড়িয়া > খটিকা=খিল। খড়িয়ার লোকায়ত নাম খড়ে।

২৯৮/১৩ : নদীয়া জেলার যমুনা নদী (বর্তমানে স্রোতস্বিনী নয়) বাঁশবেড়িয়ার কাছে ভাগীরথী নদী থেকে বের হয়ে ইছামতীতে যুক্ত ছিল।

৩০২/২৪ : ডাগুলী থেকে রাণাঘাট, শান্তিপুর হয়ে কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর থেকে পলাশী পথের নাম এখন ৩৪ নং জাতীয় সড়ক। এই পথ কলিকাতা থেকে নির্গত এবং ডালখোলা পর্যন্ত গিয়েছে। এই জাতীয় সড়কপথে প্রত্যেক নদীর উপরই সেতু নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে নদীয়া জেলায় মোট ৮০৯ কিলোমিটার পাকা সড়কপথ (জাতীয় সড়কপথ ১২৭ কি. মি.+জেলা সড়কপথ ৬৮২ কি. মি.) আছে এবং এই পথে প্রতিদিন তিনশতাধিক বাস যাতায়াত করে।

৩০৪/২৫ : ১৯০১ থেকে ১৯৮১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান নদীয়া জেলার (ভারত রাষ্ট্রভুক্ত অংশ) জনসংখ্যা বিবরণ :

বৎসর	মোট জনসংখ্যা
১৯০১	৭,৭৩,১০২
১৯১১	৭,৭৫,৯৮৬
১৯২১	৭,১১,৭০৬
১৯৩১	৭,২১,৯০৭
১৯৪১	৮,৪০,৩০৩
১৯৫১	১১,৬৬,৯২৪
১৯৬১	১৭,১৩,৩২৫
১৯৭১	২২,৩০,২৭০
১৯৮১	২৯,৭৭,০১৬

১৯৪৭ খৃস্টাব্দে দেশভাগের পর নদীয়া জেলায় বিপুল পরিমাণে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

নদীয়া জেলার (ভারতভুক্ত অংশ) জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির হার :

বৎসর	হ্রাস-বৃদ্ধির হার
১৮৮১—১৮৯১	− ৪.৩ %
১৮৯১—১৯০১	+ ০.৩ %
১৯০১—১৯১১	− ০.৪ %
১৯১১—১৯২১	− ৮.৭ %
১৯২১—১৯৩১	+ ০.৪ %
১৯৩১—১৯৪১	+ ১৬.৫ %
১৯৪১—১৯৫১	+ ১৬.৯ %
১৯৫১—১৯৬১	+ ৫৯.৬২ %
১৯৬১—১৯৭১	+ ২৯.২৯ %
১৯৭১—১৯৮১	+ ৩৩.৪৮ %

নদীয়া জেলার ধর্মসম্প্রদায় বিভাগ : ১৯৭১ খৃস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী মোট

জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ হিন্দু, প্রায় ২৩ ভাগ মুসলমান ও খৃস্টান ০·৭৩ ভাগ।

ধর্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা হার
হিন্দু	১৬,৯৩,০০৬	৮,৭০,৯২৯	৮,২২,০৭৭	৭৫.৯১
মুসলমান	৫,২০,৫৭১	২,৬৫,৭৯৭	২,৫৪,৭৭৪	২৩.৩৪
খ্রিস্টান	১৬,৩৩৭	৮,০৬২	৮,২৭৫	০.৭৩
শিখ	৭৭	৪২	৩৫	—
বৌদ্ধ	৫৫	২৪	৩১	—
জৈন	১৬৮	৯৩	৭৫	—
অন্যান্য	৫৬	৩০	২৬	—
অকথিত	৭		৭	—

৩০৫/১ : বর্তমান নদীয়া জেলাও কৃষিপ্রধান। জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। ১৯৮১র জনগণনানুযায়ী, নদীয়া জেলার কৃষকের সংখ্যা ২৭৯১১৬ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৩১.৬৭ % এবং কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ২২৫১৯৭ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ২৮.৬৩ %। নদীয়া জেলার শতকরা ৭৭.২৬ ভাগ জমিই হল কৃষিজমি। বর্তমানে আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে সার-সেচ প্রয়োগে উন্নত প্রথায় উন্নত ও অধিক ফলনশীল শস্য চাষ হচ্ছে, এখন একর পিছু ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, একফসলী জমি বহুফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অধিক উৎপাদনের ব্যাপক ও বহুমুখী প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলেও এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির পরিমাণগত অধিকার সীমিত হলেও ফসলের প্রত্যক্ষ উৎপাদক চাষীর নিজ অধিকারে জমি আছে সামান্যই। নিজ অধিকারে যে সব চাষীর জমি আছে, তাদেরও অধিকাংশেরই জমির পরিমাণ পাঁচ একরেরও কম।

নদীয়ার কৃষিজমি অনুর্বর, ফলে উৎপাদনও ব্যয়সাপেক্ষ। সেজন্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। নদীয়ার মাটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত : 'The soils generally come under the category of New Alluvium, the eastern and southern part being composed of clay loam whereas the western part is formed of sandy loam.' B. Banerjee and N. M. Bowers—The Changing Cultural Landscape of Nadia, Calcutta, 1965.

স্বাধীনতার পর থেকেই নদীয়ায় সেচব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। আগে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর ছিল, ফলে খরা-ঝরায় বিপর্যস্ত হত সেচব্যবস্থা। এখন নদীয়ায় প্রায় ৫০০০ অগভীর নলকূপ, ৫০০ গভীর নলকূপ ও শতাধিক নদী থেকে জল-উত্তোলন ব্যবস্থা চালু আছে। এছাড়া, নদী-নালা-খাল-বিলকেও সেচের কাজে লাগানো হয়েছে।

কৃষিতে উন্নত পরীক্ষিত বীজ প্রয়োগ হচ্ছে। প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে বীজ উৎপাদন কেন্দ্র ছাড়াও ফুলিয়ায় জেলা বীজ খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'সার সমাচার' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্যে নদীয়া জেলায় জমি ব্যবহারের বিবরণ (একর অনুযায়ী):

জেলার মোট আয়তন	৯৬৫ ০০০
বনভূমি	৩ ০০০
চাষের অনুপযুক্ত জমি	১৬৯ ০০০
মোট আবাদী জমি	৭২১ ০০০
অনাবাদী জমি	
(চলতি কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী বাদে)	৪৪ ০০০
চলতি কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী	২৮ ০০০
দ্বিফসলী জমি	৬৫৮ ০০০
আউশ ধান	৩০৫ ০০০
আমন ধান	২২০ ০০০
বোরো	৭ ০০০
পাট	১২০ ০০০
মেস্তা	৪০ ০০০
ডাল জাতীয় রবিশস্য	২৭৪ ০০০
অড়হর	৩০ ০০০
কলাই	১৬ ০০০
তৈলবীজ	৭০ ০০০
আখ	১৬ ০০০
গম	৬৩ ০০০

৩০৮/২৫: নদীয়া জেলায় বৃষ্টিপাতের বার্ষিক হার ১৩১০.৪ মি. মি. (৫১.৫৯″)। গড়ে বছরে ৭৫ দিন বৃষ্টি হয়। জেলার কৃষ্ণনগর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশি, কৃষ্ণনগর অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের বার্ষিক হার ১৪৭৩.৬ মি. মি. (৫৮.০১″)।

২১৪/১৩: বাংলা অনুবাদ:

১৮৩২ শকাব্দায় ১৪ ভাদ্র মঙ্গলবার কৃষ্ণপক্ষে একাদশীতিথিতে ৩১ বৎসর বয়ঃকালে সততারাধ্য মাধবের প্রীত্যর্থে রাণাঘাট নিবাসী মল্লিক উপাধিধারী শ্রীমৎ কুমুদনাথ কর্তৃক নদীয়াকাহিনী নামক পুস্তিকা প্রযত্নপূর্বক রচিত। [পক্ষ—২, গুণ—৩, ইভ—৮ ও চন্দ্র—১ ধরে অঙ্কের বামাগতি অনুযায়ী ১৮৩২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৯১০ সাল (১৩১৭ সন)। সিংহঙ্গতে ভাস্বরে—ভাদ্রমাসে, বেদেন্দু—বেদ ৪ ও ইন্দু ১ অর্থাৎ ১৪ ভাদ্র। মাধব—শ্রীকৃষ্ণ। মূলগ্রন্থে সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ: 'তিথৌবেকাদশী' স্থলে হবে 'তিথাবেকাদশী' এবং 'স্তয়াপ্রীণাতু' স্থলে হবে 'তেনপ্রীণাতু'।]

সংযোজন

নদীয়া জেলা

স্বাধীনতাকালে দেশ বিভাগের সময় (আগস্ট ১৯৪৭) নদীয়া জেলাও বিভক্ত হয়। একাংশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়, অপর অংশ পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সঙ্গে যুক্ত হয়।

ভারতীয় অংশ প্রথমে নবদ্বীপ জেলা নামে পরিচিত হয়, পরে আবার পুনরায় নদীয়া জেলা হয়।

বর্তমান নদীয়া জেলা গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে ২২°৫৩′ ও ২৪°১১′ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৮°০৯′ ও ৮৮°৪৮′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। নদীয়া জেলার আয়তন ৩,৯২৬ বর্গ কি. মি. (১,৫১৪.৯ বর্গ মাইল)। নদীয়া জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, উত্তর-পূর্বে কুষ্টিয়া জেলা (বাংলাদেশ), দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভাগীরথীর অপরতীরবর্তী বর্ধমান ও হুগলী জেলা।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত জেলার সদর শহরের নামে জেলার নাম নদীয়া হয়নি। নদীয়া নবদ্বীপ শব্দের প্রাকৃত রূপ। নবদ্বীপ=ন অ দ্দী অ=নদীঅ=নদীয়া। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় লিখিত 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' গ্রন্থেও উল্লেখ আছে : 'নবদ্বীপ হইতে নদীয়া নামের উৎপত্তি হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই।' সুতরাং, নবদ্বীপ থেকেই জেলার নাম হয় নদীয়া।

বর্তমানে নদীয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই জেলা তিনটি মহকুমায় বিভক্ত : সদর, রাণাঘাট ও কল্যাণী। সদর মহকুমার জন্য দুজন মহকুমা শাসক আছেন, অচিরেই দুটি পৃথক স্থানে মহকুমার প্রশাসনিক দপ্তর স্থাপিত হবে। মোট থানার সংখ্যা ১৪। করিমপুর, তেহট্ট, নাকাশিপাড়া ও কালীগঞ্জ থানা সদর-উত্তর মহকুমাভুক্ত। কৃষ্ণনগর (কোতোয়ালী), নবদ্বীপ, চাপড়া ও কৃষ্ণগঞ্জ থানা সদর-দক্ষিণ মহকুমাভুক্ত। রাণাঘাট, শান্তিপুর ও হাঁসখালি থানা রাণাঘাট মহকুমাভুক্ত। চাকদহ, হরিণঘাটা ও কল্যাণী থানা নবগঠিত কল্যাণী মহকুমাভুক্ত। জেলায় মোট ১৪৮৩টি মৌজা আছে ও সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের সংখ্যা ১৭।

নদীয়ায় প্রধান নদী পাঁচটি—ভাগীরথী, জলঙ্গী, চুর্ণি, মাথাভাঙা ও ইছামতী।

জেলার প্রাকৃতিক গঠনে নদীগুলির ভূমিকা আছে। নদীর ভাঙাগড়ায় ও গতি পরিবর্তনে বিভিন্ন সময়ে ভূ-প্রকৃতি গঠনেরও তারতম্য হয়েছে। নদীয়ায় অনেক নদী এখন মজে গিয়েছে বা শুষ্কভূমিতে পরিণত হয়েছে।

জেলার মাটি পলিপ্রধান ও বেলে-দোআঁশ জাতীয়। ভূগর্ভস্থ জলস্তর খুব নিচে নয়। কর্কটক্রান্তিরেখা জেলার মাঝামাঝি দিয়ে যাওয়ায়, জলবায়ুতে চরমভাব অনুভূত হয়। জেলায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৩১০.৪ এম. এম.। ১৯৮১-র জনগণনানুযায়ী নদীয়া জেলার জনবিন্যাস :

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
মোট জনসংখ্যা	২,৯৭৭,০১৩	১,৫২৮,৬২৬	১,৪৪৮,৩৮৭
গ্রাম এলাকায়	২,৩৩৮,৮৪৮	১,২০২,০৬০	১,১৩৭,৭৮৮
শহর এলাকায়	৬৩৮,১৬৫	৩২৬,৫৬৬	৩১১,৫৯৯

প্রতি বর্গ কিলো মিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৭৫৮ জন।

সাক্ষর জনবিন্যাস :

	মোট সাক্ষর জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
মোট সাক্ষর জনসংখ্যা	১,০২৪,৫৭৬	৬৬৮,৭০০	৩৫৫,৮৭৬
গ্রাম এলাকায়	৭১১,৫২৪	৪৪৯,৫৭৯	২৬১,৯৪৫
শহর এলাকায়	৩১৩,০৫২	২১৯,১২১	৯৩,৯৩১

সাক্ষরতার হার :

	মোট সাক্ষর জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
মোট সাক্ষর জনসংখ্যা	৩৬.৭৭ %	৪৩.৭৪ %	২৯.৭০ %
গ্রাম এলাকায়	৩০.৭০ %	৩৭.৪০ %	২৩.০৭ %
শহর এলাকায়	৬৭.১০ %	৬৭.১০ %	৫২.৬১ %

নদীয়া জেলার পৌরশহর এলাকার জনবিন্যাস :

	মোট	পুরুষ	মহিলা	আয়তন (বর্গ কি.মি.)
কৃষ্ণনগর	৯৮,০৬৭	৪৯,৯৭২	৪৮,০৯৫	১২.৮০
নবদ্বীপ	১,২৯,৬৫৭	৬৫,৬৫২	৬৪,০০৫	১১.৬৬
শান্তিপুর	৮৪,৮৭৬	৪৩,১০৬	৪১,৭৭০	২৪.৬০
বীরনগর	১৪,৫৯৩	৭,৪৩২	৭,১৬১	৫.৫২
রাণাঘাট	৮৪,০৮১	৪৩,০৫১	৪১,০৩০	৭.৭২
চাকদহ	৫৯,৫৩৭	৩০,২৬২	২৯,২৭৫	১৫.৫৪

নদীয়া জেলার শিক্ষা পরিসংখ্যান :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫৩৭ (গ্রাম ২১৯৯ + শহর ৩৩৮)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা গ্রাম ৩,৯১,৩০৯ জন + শহর ৫৭,০৫২ জন মোট ৪,৪৮,৩৬১ জন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় ১৫১ ; মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১২২ ; উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫০।

নিম্নতর / মাধ্যমিক / উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসংখ্যা বালক ১০,৭,০৩৯ + বালিকা ৭১,৯৫১ মোট ১,৭৯,২৯০ জন।

মহাবিদ্যালয় সংখ্যা ১০ ; বিশ্ববিদ্যালয় ২ (কল্যাণী ও বিধানচন্দ্র কৃষি)।

গ্রন্থাগার সরকার ঘোষিত গ্রন্থাগার ১১৫ ; বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার ১০৭

নদীয়ার লোকসংস্কৃতি

গাঙ্গেয় সমতট নদীয়া যুগ যুগ ধরে তীর্থভূমি এবং বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবভূমি নদীয়া শুধু শাক্তাচারে প্লাবিত নয়, বৈষ্ণবরসধারায় সিক্ত। একদা শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬—১৫৩৩) প্রবর্তিত গৌড়ীয় বা নববৈষ্ণবধর্মের লৌকিক উপশাখা সমূহের (কর্তাভজা, সাহেবধনী, রাতভিখারী, বলরামী বা বলা হাড়ি, খুশী বিশ্বাসী প্রভৃতি) অর্থাৎ নানা লোকধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল নদীয়াতেই। নদীয়ার লোকসংস্কৃতির সিংহভাগ লোকধর্মসঞ্জাত কৃত্য এবং লোকশিল্প ও লৌকিক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত।

লোকায়ত নদীয়ার জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত এর লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য যা নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্বেও লোকজীবনে প্রবাহিত। যদিও মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত প্রতিকূলতা ভাঙন ধরিয়েছে সহজ বিশ্বাসে।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে পাল আমলে এই জনপদের উজ্জ্বল অবস্থিতি। পালরাজেরা ছিলেন বৌদ্ধ। পালযুগের স্মৃতিজড়িত প্রত্নস্থল বল্লালঢিপি উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে ত্রিরথ সর্বতোভদ্র বৌদ্ধস্তূপ। বৌদ্ধ দেবদেবী পরবর্তীকালে সামাজিক বিবর্তনে ব্রাহ্মণীকৃত হয়ে জন-সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সংমিশ্রণে লৌকিক দেবদেবীতে পরিণত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ শিবে পরিণত হয়েছে। নবদ্বীপের পাড়ডাঙার ধর্মঠাকুরের প্রতীক কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ড এখন নবদ্বীপের যোগনাথতলায় শিব-রূপে নিত্যপূজিত। এখানকার যোগনাথ (যুগনাথ ?) শিব হল লোড়াকৃতি প্রস্তরখণ্ড (বৌদ্ধমতে শূন্যতাজ্ঞাপক)। এছাড়া, নদীয়ার নানা স্থানে শিবরূপে পূজিত প্রস্তরখণ্ড বৌদ্ধ প্রতীকচিহ্নও লাঞ্ছিত আছে। আবার, ধর্মরাজ-এর রাজ ও বুড়োশিব-এর বুড়ো নিয়ে যুক্ত বুড়োরাজ নামে পূজিত প্রস্তরখণ্ড নদীয়ার নানা স্থানে আছে। বলাবাহুল্য যে এই বুড়োরাজ এখন শিবরূপে পরিণত হয়েছে। তেমনি হাজরা,

ওলাইচণ্ডী, কুলাইচণ্ডী এখন নদীয়ার লোকদেবী। আবার, চাকদহ থানার ঘেঁটুগাছি গ্রামে ও কৃষ্ণনগর শহরের মালোপাড়ায় ধর্মতলা, সর্দারপাড়া ও বাগদীপাড়ার ধর্মঠাকুরের পূজা হয় নানা লোকাচারের মাধ্যমে।

বাউল সাধনা প্রাচীন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই নদীয়ায় বাউল সাধনা বিকশিত, উন্মেষিত। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর নদীয়ার ব্রাহ্মণ্যশক্তি আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। হরি আর বিশ্বাসে মিলল না, কেননা তর্কে তিনি বহুদূর চলে গেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-আত্মা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল। শ্রীচৈতন্য-বিরুদ্ধ জাতিভেদ ও শাস্ত্রপ্রাধান্য আবার প্রচলিত হল। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণরূপে পূজিত হতে লাগলেন। অথচ, শ্রীচৈতন্য ভক্তি, প্রেম ও সাম্যের যে জ্বলন্ত জীবন্ত মানবিক আদর্শ জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন তা বিসর্জিত হল জড়তার মধ্যে। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে শোষণের পুঁজি ছিল পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান। শ্রীচৈতন্য এই দুটিকেই উপেক্ষা করেছিলেন। পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান আবার ফিরে এল এবং এই সহজ পথেই ব্রাহ্মণেরা আবার সমাজের প্রধানরূপে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আর সমাজের দুর্বলতর অংশ পিছিয়ে পড়া অসহায় মানুষ বা তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর চিরকালের শোষিত বঞ্চিত মানুষেরা তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের লৌকিক উপশাখাসমূহে বিলীন হয়ে আত্মরক্ষা করলেন। ব্রাহ্মণ্যশক্তির পোষক ছিলেন বিত্তবান রাজা-জমিদারেরা। কৃষ্ণনগরে নদীয়া কালেকটারীর রেকর্ডরুমে রাজা-জমিদারদের প্রদত্ত শত শত ভূমিদানপত্রে ব্রাহ্মণদেরই নাম পাওয়া যায়, অব্রাহ্মণদের নয়। নদীয়ায় ব্রাহ্মণ্যশক্তি নতুনভাবে বিকশিত হল চরম শাক্তাচার বা তান্ত্রিক শাক্তাচারের মধ্যে দিয়ে। দেশে তখন বৈষ্ণবপোষক পাঠান রাজশক্তির অবসান ঘটেছে, মোগলদের সূচনা হয়েছে। মোগল-আশ্রিত ও অনুগ্রহভাজন তাঁবেদার নদীয়ারাজদের প্রত্যক্ষ পোষকতায় নবদ্বীপে কার্তিকী পূর্ণিমায় বৈষ্ণবরাসে ও উলা-বীরনগরে বৈশাখী পূর্ণিমায় বৌদ্ধপ্রভাবিত উলাইচণ্ডীর জাতের জেলায় শাক্তদেবদেবীর পূজা প্রবর্তিত হল, উচ্চবর্ণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হল শাক্তাচার। অপরদিকে সমাজের বিত্তহীন দুর্বলতর জনজীবন নীরবে নিভৃতে সহজ সহজ সাধনায় গানের মধ্যে দিয়ে মনের মানুষকে খুঁজতে লাগলেন, অধরাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন, অচিন পাখির সন্ধানে ব্যস্ত হলেন।

নদীয়ার লোকসংস্কৃতির প্রাণপুরুষ সহজিয়া মরমীসাধক বাউল লালন ফকির (১৭৭৪—১৮৯০), সাহেবধনী সম্প্রদায়ভুক্ত চরণপাল-কুবির সরকার। কুবির গোসাঁই-য়ের পদ শুনে একালে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হতেন। যাদুবিন্দু হলেন কুবিরশিষ্য। বলরামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলরাম বা বলা হাড়ির কথা আছে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানে—'পাগলা হাওয়ায় বাদল দিনে'। নদীয়ার প্রতিটি সহজিয়া লোকধর্মেই আছেন সাধক-গীতিকার। এইসব লোকধর্মের তত্ত্বকথা সঙ্গীতের মধ্যেই প্রকাশিত। এই সহজিয়া সাধনার বিবর্তনও প্রবর্তককেন্দ্রিক। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মূলকেন্দ্র ঘোষপাড়ায়

(কল্যাণী)। এখানে দোলপূর্ণিমায় বসে সতীমার মেলা। কর্তাভজাদের তত্ত্বকথা 'ভাবের গীত'-এ প্রকাশিত। এই মেলায় শোনা যায় ভাবের গীত।

অষ্টাদশ শতকে নদীয়ায় খেড়ু বা খেউড় গান প্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্রের কথায় : 'নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব / নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।' আবার, আখড়াই গানেরও জন্মস্থান নদীয়া। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন : 'সর্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্রসন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন।' আখড়াই গানেরই বিবর্তিত রূপ—তর্জা লড়াই ও কবি গান। দুটিই নদীয়ায় আজও সমধিক প্রচলিত। সেকালের বিখ্যাত কবি ও পাঁচালী গায়কদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নদীয়ার মানুষ। যেমন, সাতু রায়, মধু কান, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রমুখ।

কৃষ্ণযাত্রাও একসময় নদীয়ায় ব্যাপক প্রচলিত ছিল। একদা নদীয়ার ভাজনঘাটের কৃষ্ণকমল গোস্বামীর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সঙ্গীত ও পালাদি লোকসমাজে গীত হত। অনুরূপ, চণ্ডীযাত্রা ও রামযাত্রাও নদীয়ায় প্রচলিত ছিল। রামায়ণ লোকগান আজও শোনা যায় নদীয়ায়।

সংয়ের গানের মধ্যে নদীয়ায় প্রচলিত ময়ূরপঙ্খীর গান বিশেষ প্রসিদ্ধ। শান্তিপুরে রাস উৎসবে ও ব্রহ্মাপূজায় এই গান আজও শোনা যায়। 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' গানটি শান্তিপুরের রক্ষণশীলদের প্রভাবে শাড়ির পাড়ে তাঁতীরা বুনেছিলেন : 'শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে।' সংয়েও নাকি এই ব্যঙ্গগান গাওয়া হত।

পলাশী যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে নদীয়ায় একসময় পলাশীর গান নামে করুণ রসাত্মক লোকগান প্রচলিত ছিল।

কীর্তন-সংকীর্তন লোকসংস্কৃতির অঙ্গ কী না তা নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে জানাই যে নদীয়ায় নামকীর্তন ও পালাকীর্তন সমধিক প্রচলিত। রূপকীর্তনও একসময় গীত হত।

নদীয়া জেলার প্রধান লোকনৃত্যগীত জারি। বর্তমান নদীয়ার মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হল মুসলমান সম্প্রদায়। নদীয়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জারি লোকনৃত্যগীত প্রচলিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পর্ব মহরম উপলক্ষে মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে জারি নৃত্যের সঙ্গে জারি গান গীত হয়। এই নৃত্যগীতে কেবলমাত্র পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন, মেয়েরা নয়। জারি নৃত্যসম্বলিত লোকগীতি, নৃত্য ব্যতিরেকে জারি গান শোনা যায় না। জারি লোকনৃত্যগীত দলবদ্ধ ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান।

জারি শব্দটি আরবী। সাধারণভাবে জারি শব্দের অর্থ হল প্রবর্তন, প্রয়োগ, প্রকাশ্যে প্রচার বা জাহির করা। মূল আরবী জাহিরী বা জাহরী থেকে জারি শব্দটি এসেছে বিবর্তিত হয়ে। এ কারণে অনুমিত হয় যে মধ্যযুগে মুসলমান আমলে জারি গানের সৃষ্টি হয়।

একজন মূল গায়েন দাঁড়িয়ে মাঝখানে থাকেন, তাঁকে বৃত্ত বা মণ্ডলাকারে ঘিরে

দাঁড়িয়ে থাকেন পনের থেকে পঁচিশ জন সহ-গায়ক। সকলেই লুঙ্গি বা পায়জামা, গেঞ্জি বা পাঞ্জাবী পরেন, মাথায় থাকে কালো রঙের টুপি। মূল গায়েন প্রথমে একক-ভাবে বিষণ্ণ করুণ সুরে গানের প্রথম কলি গান, পরে তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে সহ-গায়কেরা সমবেতভাবে গান ধরেন, দুহাতে বুক চাপড়ে তাল দেন ও মূল গায়েনকে কেন্দ্র করে সহজ ছন্দভঙ্গীতে নৃত্যের সঙ্গে ঘোরেন। জারিগানে কোনও বাদ্যযন্ত্র থাকে না। সকলেই করুণ সুরে কেঁদে হা-হুতাশ করে গান করেন। সহ-গায়কেরা অনেক সময় পায়ে ঘুঙুর বাঁধেন। সহ-গায়কদের এক হাতে কালো রঙের রুমালও থাকে, মূল গায়েনের হাতে চামরও থাকে, মূল গায়েন এই চামর দুলিয়ে গান ধরেন, সহ-গায়কেরা সমবেতভাবে তার পুনরাবৃত্তি করেন।

জারি গানের বিষয়বস্তু কারবালা প্রান্তরের যুদ্ধবৃত্তান্ত। কারবালা যুদ্ধের ইতিহাস অজানা নয়। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর আবুবককর, ওসমান, উমর ও আলি প্রমুখ অনুগামীরা পরপর ইসলাম জগতে খলিফা পদে বৃত হন। আলির মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র হাসান ও হুসেন এবং মোবিয়ার পুত্র এজিদের মধ্যে খিলাফতির দাবী নিয়ে খলিফা পদ দখলের জন্য ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। কারবালা প্রান্তরে অনুষ্ঠিত তাই এই যুদ্ধকে কারবালা যুদ্ধ বলে। তার স্মারক অনুষ্ঠানই হল মহরম। এজিদ কর্তৃক নিহত হাসান-হুসেন স্মরণে জারি গান গাওয়া হয়। হুসেনের তৃষ্ণার্ত শিশুপুত্র ফেরাত নদীতীরে শত্রু অবরুদ্ধ হয়ে জলের জন্য হাহাকার করে শত্রুর তীরে প্রাণ হারায়। অধিকাংশ জারিগানই ইতিহাসের এই কাহিনীকে আশ্রয় করে। জারি কাহিনীমূলক লোকগীতি। গানের কথা ও আবেদন সহজ-সরল।

জারিগানের বিষয় করুণ, করুণভাবে গীত হয় এবং করুণ-রস-সমৃদ্ধ। জারি দুঃখের গান, বীররস বা বীর্যবত্তা নেই, নেই পৌরুষের স্পর্শ। গ্রামের শিক্ষারহিত সহজসরল মানুষের গান জারি। মেহনতী শ্রমজীবী কৃষক ও কৃষিশ্রমিকেরা জারিগান গেয়ে থাকেন। জারিগানের গীতিকারদের নাম জানা যায় না। লোকমুখে প্রচলিত গান। গায়কেরা নিরক্ষর, তাই লিখে রাখার প্রশ্নও ওঠে না। আমরা অনেক অনুসন্ধানে নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থানার বামনপুকুর গ্রামের এক জারিগানের গীতিকারের নাম পেয়েছি, তাঁর নাম মুনশী মোহম্মদ মহছেন উল্লা। দেশভাগের পর তাঁর বংশধরেরা অন্যত্র চলে গেছেন। এই জারিগানের নাম মর্ছিয়া বা মর্সিয়া। নমুনা :

আকবর আলি কেঁদে বলে শোনো বাবা পানি চাই,
পানি বিনে আর বাঁচিনে দেল-কলেজা হল ছাই।
কেটেছি কাফের যত এ ময়দানে কেহ নাই,
পানি বিনে মরি প্রাণে রণ হতে এলাম তাই।
পোড়া পানি দেহ পিতে যাব ফের ঐ নিয়তে,
খোদা চাহে ফতে করে বোছা দিব কদমে।
এমাম শাহা কাঁদিয়া বলে পানি পাবে জান্নাতে,

পরাণ ভরে পানি পিও নবীজীর নিজ হাতে ॥

নদীয়ায় ধুয়ো বা ধুয়া জারিও প্রচলিত। এই জারিগানে মূল গায়েন ঘুঙুর পরে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে গান করেন। সহ গায়কেরা নিচে বসে বা পাশে দাঁড়িয়ে গানের শেষ পংক্তি পুনরাবৃত্তি করেন। একতারা, দোতারা ও খঞ্জনী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইসলামী ধর্মতত্ত্বের কথা বা কোরাণের বাণী গানের বিষয়বস্তু, তবে ভাষা বেশ সহজ সরল। ধর্মের প্রতি মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং মানুষকে আরও ধর্মপ্রাণ করাই হল ধুয়ো জারি গানের মূল লক্ষ্য। মুসলমান সুফী বা পীর-দরবেশদের তৌহিদ বা সাম্য, ত্যাগ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রসারিত হৃদয়ের মানবতার মর্মবাণীও ধুয়ো জারি গানে রূপায়িত হয়েছে। জারি নৃত্যগীতে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ গ্রহণ করে না। কিন্তু নদীয়া জেলায় ধুয়ো জারি গানে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান সম্প্রদায় নির্বিশেষে অংশ গ্রহণ করে থাকেন, বিশেষত চাপড়া থানায়। লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে চাপড়া থানায় প্রচলিত ধুয়ো জারি গানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা, কৃষক জীবনের দুঃখের কথা, সীমান্তের চোরাচালানের কথা, গ্রামের নিপীড়িত জনজীবনের কথা স্থান পেয়েছে। ধুয়ো জারির ছটি অংশ বা পর্যায়: ধুয়া, আয়েব, দেরতা, মুখড়া, বাহির ও চিতেন। ধুয়ো জারি গানে গায়ক নিজের নামধামের পরিচয় গানের কলিতেই জ্ঞাপন করেন, রচয়িতার নামও। মূল গায়েনকে বলে বয়াতি। বয়াতি অর্থে বয়াত রচনাকার বোঝায়। চাপড়া থানার ধুয়ো জারি রচয়িতা ও গায়কেরা হলেন আকসারচাঁদ, রূপচাঁদ সরকার, চায়েনউদ্দিন ও উপেন হালদার।

বোলান নদীয়ার উল্লেখ্য লোকগীতি। কৃষিপ্রধান নদীয়া জেলার প্রধান উৎসব গাজন বা চড়ক। গাজনের অর্থ গ্রামের জনসাধারণ (গা+জন) বলা হয়। আবার অনেকের মতে গর্জন থেকে গাজন হয়েছে। বোলান হল বালার গান। নদীয়ায় গাজনে সন্ন্যাসীদের বলা হয় বালা। আবার, বুলা ধাতু থেকে বোলান হবার কথাও বলা হয়েছে। বোলান ভাবমূলক নয়, আখ্যান বা পালামূলক। গাজন বা চড়কের উল্লেখ্য অংশ গাজনে সন্ন্যাসীদের আত্মনির্যাতিত আত্মনিবেদন: বাণফোঁড়া, ঝাঁপান, ভর, পাটভাঙা, মশান, শবনৃত্য, কাঁটাঝাঁপ ও জিবফোঁড়া প্রভৃতি। বোলান গানে ঢাক-ঢোল-কাঁসি ও সানাই ব্যবহৃত হয়। পালার কাহিনী বেশির ভাগই পৌরাণিক। তবে সমসাময়িক কালের ঘটনাও বোলানে স্থান পেয়েছে। দলবদ্ধ নৃত্যগীত। নদীয়ার বোলানকে বালাকিও ~~বলা~~ দীর্ঘ বোলান পালার বন্দনাংশ:

এসো গো মা সরস্বতী বসো গো মা রথে
বুলান বলিতে হবে বালকের সাথে।
যে বুলান বলিবা মা গো তাই বলিব আমি
দশের মাঝে ভাঙলে বুলান, লজ্জা পাবে তুমি।

বোলান গানেও বন্দনায় রচয়িতার ও গায়েনদলের নামধাম পরিচয় থাকে। শিবপার্বতী ইত্যাদি সেজেও বোলান গান গাওয়া হয় নৃত্য সহযোগে। নদীয়ার

গাজন চড়ক বিখ্যাত। নানা স্থানেই হয়। সে সময় শোনা যায় বোলানগান।

আলকাপ-পঞ্চরস-রঙপাঁচালিও শোনা যায় নদীয়ায়, যদিও আধুনিকীকরণ হয়েছে, যুক্ত হয়েছে মূকাভিনয়।

নদীয়ায় অষ্টক গান প্রচলিত। অষ্টক বোলানের মত আখ্যান ও পালামূলক। মূলে মনে হয় আটজনে গাইত—তাই গানের নাম অষ্টক। অষ্টক গানে কৃষ্ণযাত্রার প্রভাব আছে। নদীয়ার হাঁসখালি-কৃষ্ণগঞ্জ ও রাণাঘাট থানায় গ্রামাঞ্চলে অষ্টক গান বেশি প্রচলিত। অষ্টকে পৌরাণিক পালারই প্রাধান্য।

পুতুল নাচ নদীয়ায় প্রচলিত—বিশেষত হাঁসখালি থানায়। প্রায় ৫০টি পুতুল-নাচের দল আছে। মঞ্চের পুতুলকে উপর থেকে সুতোর সাহায্যে নাচানো হয়। পৌরাণিক-সামাজিক নানা বিষয়ে পালা। একটি দলে মাত্র একজন ব্যক্তিই নানা রকম পুরুষ-নারী-শিশুর কণ্ঠস্বরে কথা বলেন অসামান্য দক্ষতায়। এই পুতুল নাচের দলগুলি এখন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নানা স্থানে পুতুলনাচ দেখিয়ে থাকে। সম্প্রতি নদীয়ার পুতুলনাচের দলগুলি একই পতাকাতলে সংগঠিত-সংঘবদ্ধ হয়েছে।

নদীয়ায় বঁদ শব্দগান প্রচলিত। বন্দনা শব্দ থেকে বঁদ শব্দটি এসেছে। বঁদ গানের রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চাপড়ার সৈয়দ ফয়জুল্লা মুন্সী।

মণিপুরের রাসনৃত্যগীত বিখ্যাত। নবদ্বীপে আছে বৈষ্ণবভক্ত মণিপুররাজের প্রতিষ্ঠিত অনু মহাপ্রভুর মন্দির, এখানে মণিপুরী বৈষ্ণবভক্তেরা পুরুষানুক্রমে থাকেন। এখানে দেখা যায় দর্শনীয় রাসনৃত্য। এখন এই নৃত্যগীত বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

পীরেরা হলেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের সেতু। পীরের মাজারে (সমাধিতে), পীরের মেলায় (সাধারণত, বারুণী, অম্বুবাচি ও পৌষসংক্রান্তি তিথিতে) রাতে বসে ফকিরি গানের আসর। নদীয়ায় ফকিরি গান বহুল প্রচলিত।

খরা আর ঝরা নিয়ে প্রকৃতিনির্ভর জনজীবনে তীব্র খরার সময় বৃষ্টির জন্য গ্রাম নদীয়ায় হয় ব্যাঙের বিয়ের লোক-অনুষ্ঠান, শোনা যায় ছড়ার গান।

চিন্তানায়ক কার্ল মার্কসের (১৮১৮—১৮৮৩) এর ভারত বিষয়ক রচনায় রোমান হরফে নদীয়ার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক অনেক বাংলা শব্দ আছে। যেমন, ফকির, আউল, নকশী কাঁথা প্রভৃতি।

নদীয়ার বাউল-ফকিরেরা ইঙ্গিতে প্রতীকে গানে তত্ত্বকথা বলেছেন। গানেরও নানা নাম—বঁদ, শব্দ, ধুবা, ফকিরি, গাজী প্রভৃতি। হিন্দু লোকগীতিকারদের বলা হয় সরকার, মুসলমানদের মুন্সী।

নদীয়ায় মনসা হলেন ব্রহ্মাণী। ঝাঁপান ও মনসা মঙ্গলের গান শোনা যায় নদীয়ায়। নদীয়ায় লৌকিক দেবদেবীর নামে অসংখ্য স্থাননাম আছে।

কপিলাগীত হল গোপূজার গান। এই গানও নদীয়ায় প্রচলিত।

নদীয়ার নাকাশিপাড়ার সর্দারদের রায়বেঁশে নৃত্যগীত বিখ্যাত। ছুটো গরুর

গাড়ির চাকা, দুটো ঢেঁকি নিয়ে বলিষ্ঠ দেহীর নৃত্য। এছাড়া, এই নাচে আছে অন্যান্য শারীরিক কসরৎ। জটাই সর্দারের রায়বেঁশে নাচ ছিল বিস্ময়কর এখন তার পুত্র সুভাষ সর্দার রায়বেঁশে নৃত্য প্রদর্শন করে থাকে।

এছাড়া, নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে মুর্শীদ্যা, মারফতী, মানিকপীরের গান, জাগগান, সারিগান শোনা যায়। আদিবাসীদের করম, ঝুমুর ছাড়াও সীতব্রত অনুষ্ঠানে লাঙ্গল পূজায় ইন্দ্রবন্দনাগীত ও অন্যান্য আদিবাসী লোকনৃত্যগীত শোনা যায়, দেখা যায়।

নদীয়ায় নীলচাষের সময় আদিবাসীরা বন কেটে বসত গড়ে তোলে, আজ তারা মিলেমিশে গেছে নদীয়ার মাটিতে। তেহট্টের নফরচন্দ্রপুর গ্রামের মালপাহাড়ীদের মুখোশ নাচ, কালীকাচনাচ, ভোজনাচ ও শিকারীনাচ উল্লেখযোগ্য। এই মুখোশ নৃত্যগীত দর্শনীয়ও।

নদীয়ায় আছেন অনেক কৃতী ঢোলবাদক, তাঁরা নানা অঙ্গের ঢোল বাজিয়ে থাকেন। নদীয়ায় প্রচলিত অন্যান্য লোকবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আনন্দলহরী (খমক বা গাবগুবাগুব), একতারা, দোতারা, বাঁশী, প্রেমজুড়ি, করতাল, ঝাঁমর, সারিন্দা (সারঙ্গ বা সারঙ্গী), মন্দিরা, কাঁসি, ধামসা, মৃদঙ্গ, চেলি, ঘুঙুর, মাদল, ঢোলক, টিকারা (নাকারা), লাউ ও শিঙা উল্লেখযোগ্য। ১৭২৮ খৃস্টাব্দে রচিত সংস্কৃত 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' পুঁথিতে উল্লিখিত শানী ও তুণী নামের দুটি লোকবাদ্যযন্ত্রের সন্ধান আমরা পাইনি।

লোকাচার বিয়ের অঙ্গ। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বিয়ের গান প্রচলিত। আদিবাসী মেয়েরা ভাদুগানও করে। এছাড়া, নদীয়ায় প্রচলিত ছড়া ও বিশেষ করে মেয়েলি ছড়া উল্লেখযোগ্য। শান্তিপুরের গাজীর বিয়ের গান ও নবদ্বীপের বুড়োশিবের বিয়ের গান নদীয়ার আনুষ্ঠানিক লোকগীতি।

নদীয়া জেলার নানা অঙ্গের লোকগীতিকার ও পদকর্তাদের নাম হল : দুলালচাঁদ (লালশশী) ১৭৭৬—১৮৩৩, কুবির সরকার গোসাঁই ১৭৯৪—১৮৮৮, হাউড়ে গোঁসাই ১৭৯৫—১৯১০, খুশী বিশ্বাস, খুশীচাঁদ ১৭৯৮—১৮৬০, ভাদু শাহ ১৮১৪—১৮৮৯, সেকেন ফকির ১৮১৭—১৮৭২, যাদুবিন্দু গোসাঁই ১৮২২—১৯১৭, পাঁচু শাহ ১৮২৩—১৯২৮, নবীন গোসাঁই ১৮৩০—১৮৯০, কাঙাল হরিনাথ ১৮৩৩—১৮৯৬, গগন হরকরা ১৮৪০—১৯১০, ভোলাই শাহ ১৮৪৫—১৯৪০, গোসাঁই রামলাল ১৮৪৬—১৮৯৪, গোসাঁই রামচন্দ্র ১৮৪৬—১৯২০, গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৫০—১৯১০, নিয়ামত শাহ ১৮৫০—১৯৩০, গদাধর খ্যাপা ১৮৫২—১৯২২, কাসেম আলি শাহ ১৮৫৩—১৯৩৪, তারিণী গোসাঁই ১৮৬৫—১৯১০, ঠাকুর দাস ১৮৬৭—১৯৫১, গোসাঁই গোপাল ১৮৬১—১৯১২, শরৎ গোসাঁই ১৮৬২—১৯০১, আরজন শাহ ১৮৬৫—১৯৫১।

নদীয়ার লোকশিল্পের মধ্যে ডাকের সাজ, শোলার কাজ, কাঠের কাজ, মৃৎপট, মুখোশ, মাটির মনসামূর্তি, জড়ানো পট (মনসামঙ্গল, চৈতন্যলীলা, রামায়ণ, মহাভারত ও সামাজিক) প্রসিদ্ধ। পটুয়ার গানও নদীয়ায় শোনা যায়। নৌশিল্প ও কাংস্যশিল্প

নদীয়ার অন্যতম লোকশিল্প। এছাড়া, রকমারি নকশীকাঁথা ও সিকা তো গ্রাম-নদীয়ার ঘরে ঘরে মেলে।

শোষণ-বঞ্চনা অনাদর-অবহেলার মধ্যেও নদীয়ার লোকসংস্কৃতির নানা বিচিত্র রসধারা স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে আজও প্রবাহিত—শুকিয়ে যায়নি, হারিয়ে যায়নি। তার একটিই কারণ, নদীয়ার এই লোকসংস্কৃতি প্রকৃতই গণভিত্তিক এবং জনজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন আত্মিক যোগে যুক্ত।

নদীয়ার মন্দির

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পুরাকীর্তিসমৃদ্ধ জেলা নদীয়া। এখানকার বাংলা চালারীতির পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত বহু মন্দির ও শিবনিবাসের বৃহদায়তন ও বিরলরীতির দেবালয়গুলি নদীয়ারাজদের সংস্কৃতিপোষকতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

নদীয়ায় পাল-সেন যুগে নির্মিত যাবতীয় মন্দির আজ কালস্রোতে লুপ্ত। বিধ্বংসী জলবায়ু, প্লাবন, নদীর তটক্ষয় বা গতিপরিবর্তন এবং বখতিয়ার ও য়ুজবক্ প্রমুখের ধ্বংসলীলায় ইট বা পাথরের তৈরি সে সব মন্দির বা বিহার-স্তূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে অনুমিত হয়। চৈতন্যজীবনী ও অন্যান্য বৈষ্ণবপুঁথিতে নদীয়ার কোন মন্দিরের উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা যেতে পারে যে প্রাচীনতর মন্দিরগুলি তার পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পাললিক সমভূমি নদীয়ায় আজ পর্যন্ত কোন সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে বিভিন্নস্থানে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া গেছে পাল-সেনযুগের কিছু ভগ্ন বা অখণ্ড প্রস্তর-ধাতব মূর্তি। রাণাঘাটের অদূরবর্তী আনুলিয়া গ্রামে পাওয়া গেছে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন। বল্লালটিপিতে উৎখনন চলেছে। সুবর্ণবিহার, শালিগ্রাম, তুই দেবগ্রাম প্রভৃতি প্রত্নস্থলে উৎখনন হলে প্রাচীন দেবমূর্তি মন্দিরাদির সন্ধান পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন।

নদীয়ায় মুসলমান রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত কোন মন্দির বা পুরাকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়নি। স্থানীয় ইতিহাসের সেই অন্ধকার যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল রুদ্ধ। পঞ্চদশ শতকের শেষে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে জাতির জীবনে সূচিত হল নবজাগরণ। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য বিকশিত হতে লাগল নতুন উদ্দীপনায়। নদীয়া তথা নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে নব বৈষ্ণবধর্মের যুগান্তকারী

অভ্যুদয়ের স্পর্শে দেখা দিল পরিবর্তন। সমৃদ্ধ হয়ে উঠল মন্দির ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য। নদীয়ার মন্দিরগুলি বাংলার নিজস্ব মন্দির স্থাপত্যরীতি বা শৈলীতে নির্মিত হতে লাগল।

নদীয়ায় চালাশৈলীর অনেকগুলি বাংলা মন্দির আছে। বর্তমানে নদীয়ায় দোচালা মন্দির একটিও নেই। তবে ঘোড়াইক্ষেত্র (কালীগঞ্জ থানা) ও দোগাছি (করিমপুর থানা) গ্রামে দোচালা মন্দির ছিল, এখনও ভিত্তিভূমি-পাদপীঠাদি বর্তমান। দুটি মন্দিরই অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত এবং দুটিতেই পোড়ামাটির কাজ ছিল। প্রথমটি শ্যামরায় কৃষ্ণবিগ্রহের মন্দির, দ্বিতীয়টিতে ছিল দুর্গা ও বিষ্ণুর দুটি সেনযুগের প্রস্তরমূর্তি, মূর্তি দুটি এখন অন্যত্র আছে।

নদীয়ায় এখন মাত্র দুটি জোড় বাংলা বা জোড়া দোচালা মন্দির আছে। বীরনগরে ১৬৯৪ খৃস্টাব্দে রামেশ্বর মিত্র মুস্তৌফী বংশীধারী কৃষ্ণ-রাধিকার জন্য একটি এবং তেহট্টে ১৬৭৮ খৃস্টাব্দে রামদেব বা বামদেব কৃষ্ণরায় নামের কৃষ্ণবিগ্রহের অপরটি নির্মাণ করেন। দুটি মন্দিরই পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত।

চারচালা মন্দির নদীয়ায় অনেকগুলি আছে। চাকদহ থানার পালপাড়ার মন্দিরটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত, প্রহরারও ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠাফলক না থাকায় সঠিক নির্মাণকাল জানা যায় না। তবে, সতেরো শতকের কোন এক সময়ে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। মন্দিরটির ভিতরের ছাদ গম্বুজাকৃতি, কাজেই এটি মুসলিম পরবর্তীকালের। প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে অপরূপ টেরাকোটায় রামায়ণের দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে।

১৬০৬ খৃস্টাব্দে নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ভবানন্দ মজুমদার। নদীয়া-রাজদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রাঘব রায় এবং বর্তমান নদীয়ার চারচালা মন্দিরগুলির অধিকাংশই তাঁর সময়ে নির্মিত। রাজা রাঘব মাটিয়ারীতে (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) একটি (১৬৬৫ খৃস্টাব্দ), শ্রীনগরে (চাকদহ থানা) দুটি (১৬৭১ ও ১৬৭৪ খৃস্টাব্দ), দোগাছিতে (কোতোয়ালী থানা) একটি (১৬৬৯ খৃস্টাব্দ), দিগনগরে (কোতোয়ালী থানা) দুটি (১৬৬৯ খৃস্টাব্দ), শান্তিপুরে (জলেশ্বর শিবমন্দির) একটি, কৃষ্ণনগর শহরে চৌধুরীপাড়ায় একটি, সেনপাড়া ও ঘাটেশ্বরে (দুটিই কোতোয়ালী থানা) দুটি চারচালা শিবমন্দির নির্মাণ করেন। সবগুলি মন্দিরই পোড়ামাটির মূর্তি ও অলংকরণে সজ্জিত। মন্দিরগুলির প্রত্যেকটিতেই চারকোণে লহরার বিন্যাস করে গম্বুজাকৃতি ছাদ আছে।

এছাড়া, বীরনগরে ১৬৬৯ খৃস্টাব্দে কাশীশ্বর মিত্র প্রতিষ্ঠিত একটি, ভালুকায় (কোতোয়ালী থানা) একটি, বহিরগাছিতে (কোতোয়ালী থানা) একটি, মুগীতে (তেহট্ট থানা) একটি ও আকন্দবেড়িয়ায় (কালীগঞ্জ থানা) একটি চারচালা মন্দির আছে। নদীয়ার প্রায় সবগুলি চারচালা মন্দিরেরই আকার, গঠন ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য-

অলংকরণ মোটামুটি একই ধরনের। অনুমান, এই চারচালা মন্দিরগুলির নির্মাতা একই গোষ্ঠীভুক্ত স্থপতি-শিল্পীরা।

নদীয়ায় আটচালা মন্দির আছে অনেকগুলি। তার মধ্যে প্রাচীনতম হল বাগআঁচড়ার চাঁদরায় কর্তৃক ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির। বর্তমানে মন্দিরটি বিধ্বস্ত, কিন্তু তার দীর্ঘ বঙ্গাক্ষরের পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠালিপিটি অক্ষত অবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ প্রদর্শশালায় রক্ষিত আছে। এখানে নাকি আরও মন্দির ছিল। চাকদহের কামালপুরে শান্তিপুরে দুটি (গোকুলচাঁদ ও অদ্বৈত প্রভুর মন্দির) দুটি, আটচালা মন্দির পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত। এছাড়া, উল্লেখ্য আটচালা মন্দির হল বেলপুকুরে (কোতোয়ালী থানা) একটি, মাঝেরগ্রামে (নাকাশিপাড়া থানা) পাশাপাশি তিনটি, দিগম্বরপুরে (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) ও বড়জাগুলীতে (হরিণঘাটা থানা) একটি করে। মন্দিরগুলি প্রাক্-অষ্টাদশ শতকে নির্মিত।

অষ্টাদশ শতকে নদীয়ার মন্দিরের ইতিহাসে সূচিত হয় নতুন অধ্যায়। নদীয়া তখন বঙ্গসংস্কৃতির অধিকেন্দ্র। বিদ্যা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুরাগী-পোষক নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় (১৭১০—১৭৮২) নির্মিত বিভিন্ন মন্দিরের গঠনরীতিতে গতানুগতিকতা বর্জিত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাকে 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় মন্দির স্থাপত্যরীতি' বলে চিহ্নিত করা চলে। আজকের দিনে কলকাতা কালচার যেমন সারা বাংলার কালচার, আঠারো শতকে নদীয়ার কালচার ছিল সারা বাংলার কালচার। কৃষ্ণচন্দ্র-প্রবর্তিত মন্দিরশৈলীর বৈশিষ্ট্য হল—বৃহত্তম আকার, চিরাচরিত বাংলারীতি একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও সম্পূর্ণ নতুন আয়তন ও রূপ, পোড়ামাটির ভাস্কর্যের অনুপস্থিতি (তখনও কিন্তু এই শিল্প উন্নত ছিল), এবং খিলান-মিনার প্রভৃতির সংযোজনে সমসাময়িক মুসলিম স্থাপত্যরীতির, এমনকি গথিক স্থাপত্যরীতির প্রতিফলন। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, পরবর্তীকালে এই রীতি অনুসৃত হয়নি—কারণ, অর্থাভাব, যুগপরিবর্তন ও কারিগরি দক্ষতার হ্রাস। কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত শিবনিবাসের পাঁচটি মন্দির তাই বাংলা মন্দিররীতিতে উল্লেখ্য সংযোজন। শিবনিবাসের সবচেয়ে উঁচু দেবালয়টি সাধারণের কাছে বুড়োশিবের মন্দির নামে পরিচিত। শিবের আনুষ্ঠানিক নাম 'রাজরাজেশ্বর'। এই দেবালয়টি বাংলার প্রচলিত মন্দিররীতির কোনও শ্রেণীতে পড়ে না। অষ্টকোণ প্রস্থচ্ছেদের এই মন্দিরের শিখর ছত্রাকার। খাড়া দেওয়ালের প্রতি কোণে মিনার ধরনের আটটি সরু থাম। উত্তর ছাড়া সবদিকেই প্রবেশদ্বার, প্রবেশদ্বারের খিলান ও অবশিষ্ট দেওয়ালে একই আকৃতির ভরাট করা নকল খিলানগুলি গথিক-রীতি অনুযায়ী। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৪ খৃস্টাব্দ। পাশেই রাজ্ঞীশ্বর শিবমন্দির উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদের মন্দির। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬২ খৃস্টাব্দ। পাশেই রামসীতার মন্দির—উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর চারচালা মন্দির। চালার প্রতিটি পিঠ ত্রিভুজাকার না হয়ে অনেকটা ঘণ্টার লম্বচ্ছেদের মতো বিরল আকৃতির। দালানের পাঁচটি প্রবেশখিলান ও গর্ভগৃহের তিনটি প্রবেশখিলান গথিক-রীতি অনুযায়ী। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬২ খৃস্টাব্দ। অদূরে চারচালা শীতলা মন্দির—ছাদ

গর্ভগৃহের কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের উপর স্থাপিত। কিছুদূরে আর একটি শিবমন্দির, এরও আকার বিরাট। শিবনিবাসের মন্দিরগুলিই শুধু বিরাটাকার নয়, শিবলিঙ্গগুলিও। 'বুড়োশিব' লিঙ্গের উচ্চতা নয় ফুট।

শিবনিবাসের কৃষ্ণচন্দ্রীয় মন্দির স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করেই সম্ভবত শান্তিপুরে ১৭২৬ খৃস্টাব্দে শ্যামচাঁদের ও কাঞ্চনপল্লীতে ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণরায়ের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই দুটি মন্দির বাংলার অন্যতম বৃহৎ আটচালা মন্দির। এই দুটি মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আবৃত অলিন্দে পাঁচ খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বৃহদাকার স্তম্ভের উপর রক্ষিত। নদীয়ারাজ গিরীশচন্দ্র রায় উনিশ শতকের গোড়ায় কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী কালীর ও নবদ্বীপে ভবতারিণী কালীর দুটি সমতল ছাদদালানের উপর চারচালা শিখরযুক্ত ও পঙ্খ-অলংকৃত চারচালা মন্দির নির্মাণ করেন। রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের ও শান্তিপুরে কাঁসারীপাড়ায় নির্মিত চারটি আটচালা মন্দির পোড়ামাটি শিল্পের অবক্ষয়ের কালে নির্মিত, অলংকরণও উল্লেখ্য নয়।

নদীয়ায় রত্নমন্দিরের সংখ্যাও কম নয়। রত্নমন্দির হল চূড়াযুক্ত মন্দির, দেখতে রথের মত। বীরনগরে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রতিষ্ঠিত জগত্তারিণী ও দীন দয়াময়ী রত্নমন্দির দুটি নয় বা ততোধিক চূড়াযুক্ত ছিল। প্রতিষ্ঠাকাল যথাক্রমে ১৮১৭ ও ১৮১৮ খৃস্টাব্দ। শান্তিপুর, রাণাঘাট, আঁইশমালী, নবদ্বীপ, সোনাডাঙা ও শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠ রত্নমন্দির —অধিকাংশই পঞ্চরত্ন বা চূড়াযুক্ত।

নদীয়ার দালান মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে অলংকরণ আছে। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির সুবিশাল ঠাকুরদালান অপরূপ নকাশি-পঙ্খ-অলংকৃত। আড়ংঘাটায় নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ১৭২৮ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত যুগলকিশোর বিগ্রহের পঙ্খ-অলংকৃত ও পাঁচটি ফুলকাটা খিলানের দুইটি সারিসংযুক্ত প্রশস্ত দালানমন্দির বিরলরীতির।

একদা নদীয়ায় বহু দক্ষ কারিগর মন্দির টেরাকোটা শিল্পে যুক্ত ছিলেন। বলিষ্ঠ শিল্পনৈপুণ্যের অভিব্যক্তি ও সূক্ষ্ম রেখামণ্ডিত প্রাণবন্ত পোড়ামাটির মূর্তিগুলি অনুপম ভাস্কর্যের অসামান্য নিদর্শন। তাছাড়া, জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশা তো আছেই। নদীয়ার মন্দির-ভাস্কর্যের প্রধান উপজীব্য হল কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর দশাবতার, রামায়ণ-মহাভারতীয়-পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র। মিথুনমূর্তিও অনেকগুলিতে আছে। এই সব ভাস্কর্যে প্রতিফলিত সেকালের সামাজিক দৃশ্যগুলি জন-সামাজিক ইতিহাসের অসামান্য উপাদান। বীরনগরে দুটি ও মাঝের গ্রামে একটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে শিল্পীদের নামধাম পাওয়া যায়।

নদীয়ার মন্দির আমাদের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের ও সংস্কৃতির নীরব সাক্ষী। সরকার ঐতিহ্যবাহী পুরাকীর্তি সংরক্ষণে সচেষ্ট। সরকারী প্রচেষ্টার সাফল্য ও শক্তির মূল উৎস দেশের জনগণ। নদীয়ার মন্দির সংরক্ষণে নদীয়াবাসীর গণচেতনা প্রয়োজন।

বল্লালঢিপি উৎখনন

কৃষ্ণনগর থেকে তেরো কিলোমিটার পশ্চিমে বামনপুকুর বাজার সংলগ্ন বল্লাল-ঢিপিতে ভারত সরকারের পোষকতায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চল চক্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গত ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ থেকে আধুনিক প্রত্নবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে উৎখননের কাজ চলেছে। প্রায় তেরো হাজার বর্গমিটার আয়তাকার এই ঢিপির উচ্চতা ছিল প্রায় নয় মিটার। পশ্চিমে খাড়াই, উত্তর-পূর্বে ঢাল। পশ্চিমে অদূরে ভাগীরথী নদী। খোঁড়াখুড়ির ফলে এখন অবশ্য এই ঢিপির হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে, উদ্ঘাটিত হয়েছে আমাদের ইতিহাসের বহু অজানা তথ্য।

এই ঢিপি সম্পর্কে নানা লোকশ্রুতি প্রচলিত ছিল। অনেকে ভাবতেন যে এই ঢিপিতে সমাহিত আছে বাংলার পাল-আমলে (অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে) নির্মিত কোন বৌদ্ধস্তূপ বা বিহার। আবার, অনেকে মনে করতেন যে সেনযুগে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নির্মিত কোন রাজপ্রাসাদ এই ঢিপি। সেনরাজ বল্লালের নামাঙ্কিত ঢিপি, তাই অনুমিত হত যে ঢিপির মধ্যে সমাহিত আছে বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রস্তরফলক ও লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী অনেকে মনে করতেন সেন-রাজধানী বিজয়পুর ঘুমিয়ে আছে ঢিপির মধ্যে।

ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে ঢাকা এই বিশাল ঢিপিটিকে প্রথমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে সম্পূর্ণ ঢিপিকে সুশৃঙ্খলভাবে দাবার ছক অনুযায়ী ভাগ করে (প্রতিটি ঘর দশ বর্গমিটার) খাদবিন্যাস করে কালানুক্রমিক পর্যায়ভিত্তিক প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত নকশা অনুযায়ী উৎখনন এগিয়ে চলেছে। কারণ, আগেই বোঝা গিয়েছিল যে এখানে সমাহিত আছে এক সুবিশাল গঠন স্থাপত্য। এই গঠনস্থাপত্যের কী চরিত্র—তা অবশ্য প্রথমে জানা যায়নি। তাই, এই উৎখননের উদ্দেশ্য হল—ধ্বংসকবলিত ইমারতের সার্বিক উন্মোচন ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর বিশ্লেষণ। দেখা গেল, ঢিপির মূল গঠনস্থাপত্য পোড়ামাটির টালি ইটের সুনিপুণ গাঁথনির বিশাল প্রাচীরে আবৃত। প্রাচীরের বেধ প্রায় পাঁচ মিটার, উচ্চতা চার মিটার। দক্ষিণে প্রায় ৯০ মিটার ও পূর্বে প্রায় ৬০ মিটার এই প্রাচীর। ভারতে এই ধরনের বিশালাকার গঠনশৈলী বিরল। অন্তত তিনবার সংস্কার করা হয়েছে। মূল প্রাচীরের সঙ্গে প্রায় দুই মিটার বেধের আরও একটি প্রাচীর সংযুক্ত। এই স্থাপত্য বার বার বন্যা কবলিত হয়েছে। প্রমাণ পাওয়া গেল—ভিতরে রয়েছে গাঙ্গেয় পলিমাটি আর বালি।

প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে পোড়ামাটির নানা আকারের সুন্দর টালি ইটের মূল গঠনস্থাপত্য। ইটের আকার নানা প্রকার। উন্মোচিত গঠন-স্থাপত্য নিঃসন্দেহে বিহারের বিক্রমশীলা ও বাংলাদেশের রাজশাহীর সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহারের মত

গঠনশৈলীর। + যোগচিহ্নের আকারে নানা প্রশাখায় বিস্তৃত, খাড়াই ও বিন্যস্ত। শীর্ষভাগ ক্রমসংকীর্ণ ও সূক্ষ্মাগ্র। অন্তত তিনবার পুনর্নির্মিত হলেও এবং প্রতিবারই আয়তন বৃদ্ধি করা হলেও অনুসৃত হয়েছে একই গঠনরীতি। লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এই কেন্দ্র ধ্বংস বা পরিত্যক্ত হবার কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নয়, মানবিকও। অধিকাংশ প্রস্তরভাস্কর্য মূর্তি খণ্ডিত-বিখণ্ডিত চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্তিই প্রমাণ করে যে মানবিক আঘাতেই এমন হয়েছে।

দক্ষিণে পাওয়া গেছে হোমকুণ্ড বা যজ্ঞস্থলী। তার ব্যাসার্ধ ৭০ সেন্টিমিটার, গভীরতা ৫০ সেন্টিমিটার, ভিতরে ভস্ম। উত্তরে পবিত্র বারিকুণ্ড। গোলাকার, অনতিগভীর বাঁধানো কূপ। পবিত্রবারি নির্গমনের জন্য তার মাথার ঠিক উপরেই পাথরের তৈরী মকরমুখ একটি সংকীর্ণ প্রণালীর সঙ্গে সংযুক্ত। এখানেই একটি প্রকোষ্ঠে পাওয়া গেছে প্রস্তরনির্মিত অনুপম ভাস্কর্য শৈবগণমূর্তি। কক্ষতল চুনসুরকি পেটানো আর ইঁট বিছানো।

প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যের মধ্যে উল্লেখ্য হল চুনবালির তৈরি উন্নত শিল্পধারার স্টাকো মডেলিং দেবদেবীর ও দৈত্যের অসামান্য মূর্তিমুখ এবং ফুলকারি অলংকরণ। দেবদেবীর মানবীয় মুখমণ্ডল লালিত্যে-সুষমায়-ব্যঞ্জনায় ভাস্বর। দৈত্যমুখ আসুরিক। উদ্ধত গোলাকার চক্ষু—বীভৎস ভীষণ মুখমণ্ডল। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে মুর্শিদাবাদ জেলার রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধমহাবিহার-খ্যাত কর্ণসুবর্ণ উৎখননেও অনুরূপ মূর্তিমুখ পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া, পাওয়া গেছে নানা যুগের অজস্র ভগ্ন মৃৎপাত্র, মালার পুঁতি, ভগ্নপ্রস্তরমূর্তি ও নানা ধাতব দ্রব্যাদি। পাওয়া গেছে অখণ্ড নরকঙ্কাল। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এই সব নরকঙ্কালের দেহীরা সকলেই অকস্মাৎ বন্যাকবলিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

উন্মোচিত মূল গঠনস্থাপত্যের শৈলী ত্রিরথ সর্বতোভদ্র বৌদ্ধস্তূপের মতো। পরবর্তীকালে পঞ্চরত্ন ব্রাহ্মণ্য দেবালয়ে পরিণত করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনও উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায় নি।

নদীয়ার মসজিদ

তেহট্ট থানার বেতাই-এর কাছে সাধুবাজারে পোড়ামাটির জ্যামিতিক-ফুলকারি নকশা-ভাস্কর্য মণ্ডিত ও পদ্ম-অলংকৃত মসজিদটি প্রাচীনতম। বর্তমানে পরিত্যক্ত।

করিমপুর থানার কেচুয়াডাঙার মসজিদটিও প্রাচীন ও গঠনস্থাপত্যমণ্ডিত।

চাপড়া থানার পীতাম্বরপুর মসজিদ পদ্ম-অলংকৃত, নির্মাতা শিল্পীর নামও খোদিত আছে।

শান্তিপুর শহরে অবস্থিত তোপখানা মসজিদ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তৎকালীন শান্তিপুরের ধর্মপরায়ণ ফৌজদার গাজী মহম্মদ ইয়ার খাঁ কর্তৃক নির্মিত। প্রতিষ্ঠাফলক আছে, নির্মাণকাল ১১১৫ হিজরী অর্থাৎ ১৭০৩-৪ খৃস্টাব্দ।

এছাড়া, নদীয়ায় আরও কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ ও মাজার আছে। তন্মধ্যে মাটিয়ারীর (কৃষ্ণগঞ্জ থানা) হজরত সাউ মুলুকে গোজ বা বুড়ো সাহেবের দরগা-মাজার উল্লেখ্য।

নদীয়ার গির্জা

কৃষ্ণনগর শহরে প্রোটেস্টান্ট গির্জার নির্মাণ ১৮৪০ খৃস্টাব্দে শুরু হয়ে ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে শেষ হয়। গির্জার নকশা তৈরি করেন জনৈক ক্যাপ্টেন স্মিথ। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ফাদার লইগী লিমানা কৃষ্ণনগরে আসেন এবং তিনি তখন যে বাড়িতে থাকতেন সেটিই পরে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় পরিণত হয়। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে বর্তমান রোমান ক্যাথিড্রাল গির্জা নির্মিত হয়।

ব্রাহ্মসমাজ মন্দির

কৃষ্ণনগর শহরে আমিনবাজারে ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে নদীয়ারাজ শ্রীশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক দানে ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মিত হয়। শান্তিপুরে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে ব্রাহ্ম সমাজমন্দির নির্মিত হয়।

নদীয়ার তাঁতবস্ত্র

বঙ্গসংস্কৃতির মনন ও চর্যার অন্যতম অভিকেন্দ্র শান্তিপুর। শান্তিপুর আবার ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুপম উজ্জ্বল তাঁতবস্ত্র শিল্পকর্মের জন্য ইতিহাসখ্যাত। কৌটিল্যের

অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে তাঁর কালে বাংলা বস্ত্রবয়নশিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল। কিন্তু তখন শান্তিপুর জনপদের অস্তিত্ব ছিল কি না তার পাথুরে প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। পঞ্চদশ শতকে গৌড় অধিপতি রাজা গণেশ দনুজমর্দনদেবের আমলে (১৪০৯ খৃস্টাব্দ) শান্তিপুরের সুনির্দিষ্ট অস্তিত্ব জানা যায়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের (১৪৩০—১৫৫৮ খৃস্টাব্দ) জীবনীমূলক পুঁথি 'অদ্বৈতমঙ্গলে' শান্তিপুরের ভক্তিমান বৈষ্ণব তন্তুবায়দের সবিশেষ উল্লেখ আছে :

'শান্তিপুর যত ছিল তন্তুবায়,
আচার্য প্রাঙ্গণে আসি হরি গুণ গায়।'

নদীয়ারাজ রুদ্ররায়ের আমলে (১৬৮৩—১৬৯৪) শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্র শিল্পের উদ্ভব সূচিত হয় এবং বিগত শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই শিল্পকর্মের চরম বিকাশ, সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ ঘটে। আজও শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্রের খ্যাতি জগৎজোড়া এবং শান্তিপুর বাংলার একটি অতি প্রসিদ্ধ তন্তুশিল্পকেন্দ্র রূপে পরিচিত। শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্প তন্তুবায়দের পারিবারিক পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য এবং কারুশিল্প হিসাবে উজ্জ্বল ও গৌরবময়।

মোগল আমলেই প্রথম শান্তিপুরের উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম তাঁতবস্ত্র বহির্বঙ্গে ও বহির্ভারতে বাজার সৃষ্টি করেছে। দুর্গাচরণ সান্যাল তাঁর 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ভারতের বাইরে আফগানিস্থান, ইরাক, ইরান, আরব প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এবং গ্রীস, ইতালি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্রের সমাদর হত স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। আবার, মোগল অন্তঃপুরচারিণীদের বরতনুতেও শোভা পেত শান্তিপুরী তাঁতবস্ত্র।

বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিপোষক নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে (১৭২৮—১৭৮২) শান্তিপুরে তাঁতবস্ত্রের বিরাট আড়ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই আড়ত থেকে শান্তিপুরী তাঁতবস্ত্র বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপে রপ্তানী হতে থাকে। শুধু শাড়ি নয় শান্তিপুরে সূক্ষ্ম সুতোর ধুতিও উৎপাদিত হতে থাকে এবং অচিরেই সমাদৃত হয়। নদীয়ারাজদের পোষকতায় এই সময় এই শিল্পকর্মের চরম বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে। চরকা ও টেকোয় সরু সুতো তৈরি করতেন মহিলারা। সূচনায় তাঁতবস্ত্রের চার রকম ভেদ ছিল—এগুল, দাম, সাম ও চাহারাম। পরে নানা নামে শাড়ি তৈরি হত—সাদা, রঙিন, ডুরে (সর্বসুন্দরী, সিঁদুরী, খড়কেমুটি, চৌরঙ্গী), তাসখুপী, চৌখুপী, আয়নাখুপী প্রভৃতি। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে উল্লিখিত 'মেঘডম্বরু' শাড়িও নিশ্চয় তৈরি হত। দেবদেবীর বিগ্রহের জন্য ছিল জোড়। পাড়ের নাম—চাঁদমালা, তাজ, তাজকল্কা, কল্কা, চৌকল্কা, টেক্কা, এড়ো, চাঁচ, রাজমহল, দোরোকা (দুদিকে দুরকমের পাড়), কানাডুমরী, গান, আঁইস, মাছ, মানুষ ও পশুপাখি প্রভৃতি। ৪০ থেকে ৩০০ সংখ্যক রঙিন সুতো, রেশম ও জরিতে পাড় বোনা হত। উড়ানিও তৈরি হত। বোনবার সময় আড়াআড়ি-বিন্যস্ত টানাপোড়েনে সুতোগুলিকে অসামান্য দক্ষতায় চালনা

করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নক্‌শা-অলংকরণ আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতায় অনুপমভঙ্গীতে ফুটিয়ে রমণীয় করে তোলা হত।

শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী, নিপুণ ও কর্মদক্ষ। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন শিল্পীরা। সুদীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমিক অভিজ্ঞতায় তন্তুবায়েরা এই বিস্ময়কর বস্ত্রশিল্পকর্ম গড়ে তুলেছিলেন এর মাধ্যমেই তাঁদের জীবিকানির্বাহ হত। মোটা ভাত-কাপড়ের কোনও অসুবিধা হত না। নিজেদের পূর্ণ স্বাধীনতায় তাঁরা উৎপাদন করতেন। ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁর সময়ে ১৭৫৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্তও শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা স্বাধীনভাবে তাঁতবস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারতেন কিন্তু তারপর থেকেই নানাভাবে তাঁদের উপর উৎপীড়ন শুরু হয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই এগিয়ে আসে শান্তিপুরে। শান্তিপুরে বাইগাছিতে লক্ষাধিক টাকায় তৈরি হয় কোম্পানীর বাণিজ্যিক কুঠি (কমারশিয়াল রেসিডেন্সী)—একটি 'মর্মর-খচিত প্রাসাদ'। কোম্পানীর একজন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এই কুঠির ভারপ্রাপ্ত প্রধান ছিলেন। কোম্পানী শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়। তখন বৎসরে ১,২০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের শান্তিপুরী তাঁতবস্ত্র কোম্পানী বিদেশে বিক্রয় করত। ১৮৭১ খৃস্টাব্দের নদীয়ার প্রথম জনগণনায় দেখা যায় যে শান্তিপুরে তখন বস্ত্রবয়নকারীর সংখ্যা ১৩,৬৮০ জন এবং পাটবয়নকারীর সংখ্যা ২৭৩ জন। স্যার উইলিয়ম হান্টার লিখেছেন যে তখন শান্তিপুর থেকে কলকাতায় ব্যাপকভাবে তাঁতবস্ত্র রপ্তানী হত অধিক উৎপাদনের জন্য নয়, তাঁতবস্ত্রের বিশেষত্বের জন্য। কোম্পানী তাদের শান্তিপুরের বাণিজ্য প্রতিনিধি মারফত তাঁতবস্ত্র ব্যবসা ব্যাপকভাবে গড়ে তোলেন। ভারতের অর্থনীতিতে ইংরেজ মূলধনের এইভাবে অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পরিণত হতে থাকে। পলাশী যুদ্ধের সমসাময়িক কালে কোম্পানী তাদের গোমস্তাদের মাধ্যমে শান্তিপুরের তাঁতীদের দাদন দিতে শুরু করেন এবং অনেককে কলকাতায় নিয়ে যেতে থাকেন। হলওয়েল তাঁর 'ইনটারেসটিং হিসটোরিকাল ইভেন্টস্' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ১৭৬৬ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরের সূক্ষ্ম তাঁতবস্ত্র খুব প্রসিদ্ধ ও দেশবিদেশে জনপ্রিয় বাণিজ্যিক সম্ভার ছিল এবং নদীয়ায় বর্গী-দৌরাত্ম্যে (১৭৪২—৪৩) এই শিল্পকর্মের ক্ষতি সাধিত হয়। ১৭৭৫—৭৭ খৃস্টাব্দে ফরাসি বণিক বিলো শান্তিপুরে এসে বাড়িভাড়া করে তাঁতবস্ত্র ক্রয় করেন। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরের ইংরেজ বাণিজ্যিক কুঠির তত্ত্বাবধায়ক জন বেব কর্তৃপক্ষকে পত্রে জানান যে শান্তিপুরে কোম্পানীর কাপড়ের আড়ত আক্রান্ত হয় এবং সুতো সরবরাহক গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্যকে ডাকাতেরা আটক করে। কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর ইংরেজ ও এদেশীয় কর্মচারীদের সঙ্গে শান্তিপুরের তন্তুবায়দের সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণভাবে ধনবাদী শোষণ ও নির্মম অত্যাচারমূলক। কোম্পানীর বিদ্রোহী কর্মচারী প্রত্যক্ষদর্শী উইলিয়ম বোলটস্ প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় যে কোম্পানীর

কর্মচারীরা তন্তুবায়দের ডানহাতের আঙুল কেটে নিয়ে বেত্রাঘাতাদি করে বর্বর নৃশংস অত্যাচার করত, জরিমানা-কারাগারে আটক-বলপূর্বক মুচলেকা আদায় ইত্যাদিও করত। নানাভাবে দরিদ্র তাঁতীদের কোম্পানী প্রতারিত-প্রবঞ্চিত করত এবং কোম্পানীর দমন-উৎপীড়নের সীমা ছিল না। বাজার-নির্দিষ্ট দর থেকে কম দরে মাল সরবরাহ করবার জন্য ও খতাপত্রে স্বাক্ষর-টিপসইএর জন্য বলপ্রয়োগ করা হত। একমাত্র কোম্পানীর জন্য ভিন্ন তাঁতবস্ত্র উৎপাদন করতে দেওয়া হত না। যদি কেউ গোপনে তাঁতবস্ত্র অন্যকে বিক্রয় করত তাহলে তার তাঁতবস্ত্র বিনষ্ট করা হত। কোম্পানীর দাদন চুক্তিপ্রথায় তাঁতীরা সর্বস্বান্ত হতে লাগল। তাঁতবস্ত্রের দরিদ্র কারিগর-শ্রমিকেরা কার্যত কোম্পানীর একচেটিয়া ক্রীতদাসে পরিণত হল। শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্র শিল্প হল বিদেশী ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যবসায়ী মূলধনের একচ্ছত্র প্রভুত্বে প্রথম ও প্রধান শিকার। উল্লেখ্য যে এই সময় কোম্পানী শান্তিপুরে মদের বিরাট ভাটি খুলে অভাবী দারিদ্র্য-পীড়িত তাঁতশিল্পীদের চরম নৈতিক অধঃপতনের মুখে ঠেলে দেন চিরাচরিত ধনবাদী চক্রান্তের পথে।

১৭৭৩ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কমিটি অব কমার্সের চারজন ও কোম্পানীর সামরিক বাহিনীর চারজন মোট আটজনের একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয় শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের অবনতির কারণ অনুসন্ধানের জন্য। সমিতির সদস্যেরা শান্তিপুরে এসে সরজমিনে তদন্ত করেন ও তাঁতীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। রমাপতি, রামলোচন ও গোপী প্রমুখ তন্তুবায়শিল্পী দর, মজুরি, বেত্রাঘাত, বাইরের দালাল, আদায়, মূল্য প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে কোম্পানীর নানা শ্রেণীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে বস্তুনিষ্ঠ সপ্রমাণ ও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন। অনুসন্ধান সমিতি সুপারিশ করেন যে শান্তিপুরে তাঁতীদের বাধ্য করে দাদন দেওয়া চলবে না, এদেশীয় ব্যবসায়ীরা কোম্পানীর প্রয়োজনীয় বস্ত্রসম্ভারের জন্য কোম্পানীর সঙ্গে সরাসরি জামিনসহ চুক্তি করতে পারবে, তাঁতীদের নগদমূল্য দিতে হবে, কোম্পানীর কর্মচারী তাঁতীদের জোর করে দাদন দিলে তাকে কর্মচ্যুত করতে হবে। কোম্পানী এই সুপারিশ গ্রহণ করে আংশিক ভাবে কার্যকর করায় শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের ভেঙেপড়া অচলায়তনে কোনরকমে জোড়াতালি পড়ে, কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। লণ্ডন থেকে এক ইংরেজ বণিক ২৬ জানুয়ারি ১৭৮১ তারিখে এক প্রতিবেদনে জানান যে বিদেশের বাজারে শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্র বিক্রয় করে কোম্পানী প্রচুর মুনাফা লুটছে।

শান্তিপুরের উত্তরাঞ্চলে ছিল কোম্পানীর কুঠি। আর ছিল দুটি আড়ত (কারখানা), বানক ও ঘাই নামে। কোম্পানী জলপথেই বাণিজ্য করত। তাই তাদের ছিল কয়েকখানা বজরা নৌকা। কুঠিতে একাধিক ইংরেজ কর্মচারী সহ প্রায় পাঁচশতাধিক দেশীয় কর্মী ছিল। কোম্পানীর অনুগ্রহে এই দেশীয় কর্মচারীদের একাংশ নিজেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। ফলে, শান্তিপুরের অর্থনীতিতে এক

নতুন বিত্তবান শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা অনেকেই তৈরি করে সুরম্য আবাসিক ভবন অপরিমিত বিত্তের দৌলতে।

বাণিজ্যকুঠির প্রধান জে. মারজরিবাঙ্কস তখন বৎসরে ৪২,৩৫১ টাকা বেতন পেতেন। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা করলে কোম্পানীর ব্যবসায় ক্ষতি হয়। তাঁর পরেই কুঠিয়াল হন জে. জি. লারল এবং তিনিই শেষ কুঠিয়াল। বিভিন্ন সময়ে শান্তিপুরের বাণিজ্যকুঠির ইংরেজ কুঠিয়াল ছিলেন ই. ফ্লেচার, জন ডিকক প্রমুখ। কোম্পানী কুঠির মাধ্যমে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করত। ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে আইনানুগভাবে ভারতে কোম্পানীর ব্যবসা রদ হলে বাণিজ্যকুঠি বন্ধ হয়ে যায়। এই কুঠিতেই হেজেস ও পরে বমওয়েচ পাঠশালা খুলেছিলেন। ১৮৭০—৮০ সালের মধ্যে কুঠি ধ্বংস হয়ে গেলে ধ্বংসস্তূপসহ এলাকা বিক্রয় হয়ে যায়। এখন আর কুঠির চিহ্নমাত্র নেই।

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটায় বিগত শতকের সূচনায় ইংলণ্ডের মানচেসটারে উৎপাদিত বস্ত্র ও সুতো শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্র শিল্পের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কবি নবীনচন্দ্র সেনের কথায় 'শান্তিপুরের তন্তু সকল মানচেসটারের কলের আগুনে নির্বাণলাভ।' ১৮২৫ খৃস্টাব্দ থেকে ইংলণ্ড শান্তিপুরে সুতো আমদানী করতে থাকে, দেশী সুতোর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শান্তিপুরের এক 'দুঃখিনী সুতাকাটিনী'র পত্র: 'চরকা আমার ভাতারপুত'। এই পত্র থেকেই বোঝা যায়: শান্তিপুরে গরিব মহিলারা বিশেষ করে বিধবা ও সহায়সম্বল-হীনা দুঃস্থারা জীবিকার জন্য নিজ হাতে চরকায় কেটে সুতো তৈরি করতেন, কাপড়ে ফুল বুনতেন। শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্র শিল্পে মহিলাদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: 'পূর্বকালে এদেশে বিলাতী সূতার আমদানী ছিল না। এদেশস্থ স্ত্রীলোকেরাই যে সূতা প্রস্তুত করিতেন তাহাতেই সর্বপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এ প্রদেশে সূতা কাটিবার দ্বিবিধ যন্ত্র বিদ্যমান আছে। তক্র ও চরকা। প্রথমোক্ত যন্ত্র দ্বারা সূক্ষ্ম সূতা ও শেষোক্ত যন্ত্র দ্বারা স্থূল সূতা প্রস্তুত হয়।...এই ব্যবসায়...সংসার যাত্রা নির্বাহের অনেক আনুকূল্য হইত।' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন যে শান্তিপুরের তাঁতশিল্প বিদেশ থেকে সুতো আমদানীর ফলে ধ্বংস হয়েছে। ভোলানাথ চন্দ্রের ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে লিখিত পর্যটন বিবরণীতে জানা যায় যে তখন শান্তিপুরে দশহাজার তাঁতী ছিলেন। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে অবনতির কালে শান্তিপুরে বৎসরে মাত্র তিনলক্ষ টাকার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হত। ১৮৮০—৮৫ খৃস্টাব্দে ম্যালেরিয়া মহামারীতে ও ১৮৯০ খৃস্টাব্দে বিধ্বংসী বন্যায় শান্তিপুরে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। অনেক তাঁতী কলকাতা ও অন্যত্র চলেও যান।

বর্তমান শতকে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের আবার প্রসার ঘটতে থাকে। এই সময়ের এক প্রতিবেদনে জানা যায় যে শান্তিপুরের তাঁতের সংখ্যা ১২০০, ৫০ থেকে ৬০ সুতোর তাঁতবস্ত্র বেশি তৈরি হয়, বছরে গড়ে ৮৬,৪০০ খানি বস্ত্র (মোট দাম ৬,০৪,৮০০ টাকা) উৎপন্ন হয়, তাদের গড় দাম সাত টাকা। মোট

মূল্যের অর্ধেক হল তাঁতীদের পারিশ্রমিক। শান্তিপুরের তাঁতের মূল উপাদান সূক্ষ্ম সুতো। এই সুতো বিদেশ থেকে আমদানীকরা—এই ধুয়ো তুলে একসময় স্বদেশীদের একাংশতা বয়কটের আহ্বান জানান। শান্তিপুরের তাঁতীরা তার তীব্র প্রতিবাদ করেন সভাসমিতির মাধ্যমে।

কোম্পানীর আমলে তাঁতীরা দাদন প্রথায় জর্জরিত ছিলেন। আবার কোম্পানীর পর মঞ্চে আবির্ভূত হল এদেশীয় বিত্তবান শোষক মহাজনেরা। তাঁতীদের সত্তর শতাংশ বিভিন্ন নামভেদী দাদন প্রক্রিয়ায় মহাজনদের ঘরে বাধা পড়তে লাগলেন। এছাড়া ছিল বিক্রয়কর। সুদূর অতীতে শান্তিপুরের যে অতুলনীয় শিল্পসম্ভার তাঁতবস্ত্র বিকশিত হয়েছিল, বাণিজ্যিক লোভের আগুনে তা নিশ্চিহ্ন হতে লাগল ধীরে ধীরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। বাংলার মাটিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ব্যবসায়ের নামে শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্র শিল্পের উপর যে আক্রমণ শুরু করেছিল তার ফলে তন্তুবায়রা প্রথম থেকেই তাদের চিনতে পেরেছিলেন। তন্তুবায়রা সংগঠিত হতে লাগলেন, গড়ে তুলেছিলেন প্রতিরোধের দুর্গ। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন যে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ও তাঁদের গোমস্তা তাগাদগার প্রভৃতি অনুচরবর্গের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তন্তুবায়দের এক অংশ সশস্ত্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন। শান্তিপুরের কোম্পানীর বাণিজ্য-কুঠির কনট্রাকটর ব্র্যাকোয়ার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে তন্তুবায়রা কৌশলে কোম্পানীর চুক্তি এড়িয়ে গোপনে বস্ত্র বয়ন করে কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করেনি বা দাদন নেয়নি এমন তন্তুবায় মারফত বস্ত্র বিক্রয় করত। তন্তুবায়দের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রাবল্যে কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের কাছ থেকে চুক্তি অনুযায়ী বস্ত্র আদায় করতে না পেরে মজুরি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন। কোম্পানীর কুঠির কনট্রাকটর বোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শান্তিপুরে তন্তুবায়রা তুমুল বিক্ষোভ দেখায়। জানা যায় যে তন্তুবায়রা শঙ্খধ্বনি শুনে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে অভাব অভিযোগ আলোচনা করত। তন্তুবায়রা কোম্পানীর বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করলে অবস্থা চরমে ওঠে। কোম্পানী তন্তুবায় আন্দোলনের নয়জন নেতাকে আটক করে। পরে ছয়জন শর্তাধীন মুক্তি পান, বাকি তিনজন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। নেতাদের কারাদণ্ডের ফলে তন্তুবায়দের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাছে গণ-স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়। শান্তিপুরের তন্তুবায় আন্দোলনের নায়ক ছিলেন তন্তুবায় বিজয়রাম। বিজয়রামের পর শান্তিপুরের তন্তুবায়দের সংগ্রামের নেতৃত্বপদে ছিলেন লোচন দালাল, রামহরি দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল ও রামরাম দাস প্রমুখ। তাঁদের নেতৃত্বে তন্তুবায়দের এক প্রতিনিধি দল শান্তিপুর থেকে কলকাতায় পদযাত্রা করেন এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের অমানুষিক নির্মম অত্যাচার-উৎপীড়নের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আরজি পেশ করেন। অধ্যাপক হরিরঞ্জন ঘোষালের মতে শান্তিপুরের তন্তুবায়রা আধুনিক ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের অনুরূপ সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে

তুলেছিলেন এবং ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দুর্বার সঙ্ঘশক্তি ও সংগ্রাম-কৌশলের পরিচয় দেন।

শান্তিপুরের তাঁতশিল্প সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও উল্লেখ্য উপাদান। তাঁতবস্ত্রের নক্শার পাড়ে নানা গীত, ছড়া ও কবিতা উৎকীর্ণ করা হত। শান্তিপুরের শাড়ির পাড়ে বুনে লেখা হয়েছিল: 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।' আবার তার বিরুদ্ধ লেখাও পাড়েই বোনা হয়েছিল: 'শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে।' বাংলা সাহিত্যে বিশেষত কাব্যসাহিত্যে শান্তিপুরের তাঁতের শাড়ির সবিশেষ উল্লেখ আছে। শান্তিপুরের তন্তুবায়শিল্পী গিরিশচন্দ্র পাল তাঁতবস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি সোনালী-রুপালী জরির কলাবতী পাড়ের অনুপম শাড়ি তৈরি করেন, এই শাড়ির এক একখানির মূল্য ছিল তখন মাত্র ২৫০ টাকা। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে গিরিশচন্দ্রের কলাবতী পাড় শাড়ি পুরস্কৃত হয়। এছাড়া, তাঁর তৈরি একখানি রুমালের চারধারে বাইবেলের বাণী ইংরেজি ও সংস্কৃতে এবং মাঝখানে ইংরেজিতে নিজ নাম ও কলকাতা প্রদর্শনী ১৮৮৩ বয়ন করা ছিল। সেকালের অন্যান্য খ্যাতনামা তাঁতশিল্পীরা ছিলেন কিশোরীলাল, পূর্ণচন্দ্র, গোরাচাঁদ, বামাচরণ, রামচন্দ্র, মথুরামোহন, ব্রজমোহন, নিতাইচাঁদ, ভূপতিচরণ, শিবকালী, হরকালী ও হাজারীলাল প্রমুখ।

বর্তমান শতকে শান্তিপুরের তাঁতশিল্পে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। পূর্বে সুতো কাটতেন মেয়েরা, এখন মেসিনের সুতোয় বস্ত্র বয়ন করা হয়। আগেকার ৩০০ কাউন্টের সুতোয় বোনা কাপড় আজ পর্যন্ত মিলের সুতোর উৎকৃষ্ট কাপড়ের চেয়ে উচ্চমানের। যুগ পরিবর্তনে উন্নত উৎপাদন হয়েছে, পাড়েরও উন্নতি হয়েছে। শান্তিপুরের মহিষখাগীতলার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাড়ের কল জাকার্ড মেসিন নিয়ে এসে পাড়ে নক্শা-অলংকরণে বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন। ভূপতিচরণ ও কিশোরীলালও তাঁদের সৃজনশীল বয়ন-প্রতিভায় পাড়ে বিপ্লব ঘটান। আগে সুতো রং করতেন শান্তিপুরের মুসলমান কলাকারেরা। দেশভাগের পর তাঁরা চলে যাওয়ায় সাবেক রং আর সুতোয় দেখা যায় না। কলাকারেরা যেমন চলে যান, তেমনি আবার দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) থেকে আগত অনেক তন্তুজীবী শান্তিপুর ও সন্নিহিত এলাকায় বিশেষত ফুলিয়ায় এসে শান্তিপুরী নক্শার সঙ্গে ঢাকা-টাঙ্গাইল নক্শার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বর্তমানে শান্তিপুরে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার তাঁত আছে এবং লক্ষাধিক মানুষ তাঁতের উপর নির্ভরশীল। তবে আজও অধিকাংশ তন্তুজীবীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মহাজন-আশ্রিত, তাঁদের দুর্দশার শেষ নেই। সরকার বহুভাবে এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করেছেন। সমবায় সমিতি গড়েও উঠেছে কিন্তু মহাজনী শোষণ থেকে মুক্তি ঘটেনি। তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ে ছাড় আছে বটে তেমনি আবার চুঙ্গি কর আছে। মিল পাওয়ারলুমের সঙ্গে তো চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই। উৎপাদিত বস্ত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নক্শাদির যুগোপযোগী আধুনিকী-

করণ প্রয়োজন। সাবেক তাঁতকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বেশী উৎপাদনের জন্য এবং নক্‌শা কারুকার্যের সূক্ষ্ম সরলীকরণে জ্যাকার্ড—ডবী—চিত্তরঞ্জন প্রায় স্বয়ংক্রিয় তাঁতের প্রবর্তন হলেও নিকৃষ্টমানের কাঁচা রঙ ও বৈচিত্র্যহীন একই ধরনের হালকা নকশার জন্য শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্র ক্রমেই বাজার হারাচ্ছে। এছাড়া, দিনের পর দিন সুতোর দাম বেড়ে চলেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাঁতবস্ত্রশিল্প। তন্তুবায়দের আসল শক্তি জনগণ। জনগণ পোষকতা না করলে তাঁতশিল্প ধ্বংস হয়ে যেত। তাঁতশিল্প শান্তিপুরের অতীত গৌরবের উজ্জ্বল ইতিহাসের উল্লেখ্য উপাদান বলে হৃদয়ে পুলক জাগতে পারে—সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ শোকাবহ সঙ্গীতলিপির মতো বেদনায় দীর্ণও হবে হৃদয়। কিন্তু প্রয়োজন তন্তুবায়দের গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস। শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের বর্তমান সমস্যার কিভাবে সমাধান হবে—অসুবিধা কিভাবে দূর করা যাবে—সংকট কিভাবে মোকাবিলা করবেন তন্তুবায়রা —তার উপরেই নির্ভর করছে বঙ্গসংস্কৃতির এই অসামান্য শিল্পকৃতির ভবিষ্যৎ।

কৃষ্ণনগরের বারদোলের মেলা

কৃষ্ণনগরের বারদোলের মেলা বাংলার অন্যতম বিখ্যাত মেলা এবং দীর্ঘকালের প্রাচীন ও বিশাল মেলা হিসাবে এর প্রসিদ্ধি আছে। প্রতি বছর দোল পূর্ণিমার পর চৈত্রের শুক্লা একাদশী তিথিতে নদীয়ারাজ পোষকতায় কৃষ্ণনগরে রাজবাড়ির চকের মাঠে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণনগরে লোকশ্রুতি প্রচলিত যে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০—৮২) এই মেলার প্রবর্তক। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যের একান্ত অভাব। ১৭৫২ খৃস্টাব্দে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর লিখিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে অনেক তথ্য থাকলেও বারদোল সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং মনে হয়, ১৭৫২ খৃস্টাব্দের পূর্বে বারদোল প্রবর্তিত হয়নি। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে ১৭৪২—৫০ খৃস্টাব্দে দেশে দেখা দেয় বর্গী-দৌরাত্ম্য। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্র বারলক্ষ টাকা কর অনাদায়ে মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খাঁ কর্তৃক ধৃত হন এবং বন্দীদশায় কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নে দেবী অন্নদার আদেশ পান, সে কারণেই কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। ১৭৫২ খৃস্টাব্দের পরেই আসে ২৩ জুন ১৭৫৭ সাল : নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলে সারা দেশে অস্থিরতা —পলাশীর যুদ্ধ—অস্তমিত হল দেশের স্বাধীনতা-সূর্য : অবসান হল দেশে মধ্যযুগের।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই সময় বর্গীদের ভয়েই শিবনিবাসে নদীয়ার রাজধানী নিয়ে যান। শিবনিবাসে ১৭৫৪ খৃস্টাব্দে বুড়োশিবের মন্দির এবং ১৭৬২ খৃস্টাব্দে অন্যান্য চারটি মন্দির কৃষ্ণচন্দ্র নির্মাণ করেন। ১৭৬২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্র শিবনিবাসে অবস্থান করেন। ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে ফিরে আসেন কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে, দেশে তখন স্থিতি ফিরেছে। আবার, কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে গঙ্গাবাসে রাজপ্রাসাদাদি নির্মাণ করে আমৃত্যু সেখানেই বসবাস করেন। বাংলা ১১৭৬ সনে অর্থাৎ ১৭৭০ খৃস্টাব্দে দেখা দেয় মন্বন্তর। সে কারণেই অনুমিত হয় যে ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে ফেরার পর ১৭৭০ খৃস্টাব্দের মন্বন্তরের পূর্বে আনুমানিক ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে বারদোলের মেলা প্রবর্তন করেন।

রংদোলের পর একমাত্র কৃষ্ণনগরেই রাধাকৃষ্ণের বারদোলের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। 'হরিভক্তিবিলাস'-এ এই দোলের উল্লেখ আছে :

'চৈত্রে সিতৈকাদশ্যাঞ্চ দক্ষিণাভিমুখং প্রভুম্।
দোলয়া দোলনং কুর্যান্নীতনৃত্যাদিনোৎসবম্॥
তথা চ গরুড়ে—
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিম্।
দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ॥

অর্থাৎ চৈত্রমাসে শুক্লা একাদশী তিথিতে নৃত্যগীতাদি উৎসব সহকারে দেবদেবীকে দক্ষিণ মুখ করে দোলা দিয়ে দোলাতে হয়। গরুড় পুরাণেও উল্লিখিত আছে যে কলিকালে চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে দক্ষিণমুখী হরি বিগ্রহকে পূজার্চনা করে এক মাস দোলনে দোলাতে হয়।

এ কারণে, কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত চৈত্রমাসে রাধাকৃষ্ণের দোল শাস্ত্রানুগ, শাস্ত্রবিরোধী নয়।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পঙ্খ অলংকৃত ঠাকুরদালানের দক্ষিণদিকে সুবিশাল নাটমন্দির বা চাঁদনী। এই নাটমন্দিরের পূর্বদিকের খিলানগুলির নিচে পাদপীঠের উপর নদীয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত নানা কৃষ্ণ বিগ্রহ বারদোলের প্রথম তিনদিন পৃথক কাষ্ঠসিংহাসনে-মঞ্চে স্থাপন করে পূজার্চনা করা হয়। বারটি বিগ্রহের দোল, তা থেকে বারদোল। আসলে কিন্তু, বিগ্রহের সংখ্যা বার নয়, তের। যদিও দোল, কিন্তু কোন কাষ্ঠ সিংহাসনকেই দোলানো হয় না, স্থাপন করে রাখা হয়।

নদীয়ারাজ কুলবিগ্রহ হলেন বড়নারায়ণ। বারদোলে বড়নারায়ণ বিগ্রহের সঙ্গে আরও বারটি কৃষ্ণ বিগ্রহ থাকেন এবং এই বারটি বিগ্রহ নদীয়ারাজ কর্তৃক বিভিন্ন স্থানের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। একসময় বারদোলের জন্য সমারোহ সহকারে বারটি বিগ্রহকেই কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে আনা হত। বারদোলের তিনদিন নাটমন্দিরে থেকে এই বারটি বিগ্রহ পূজা পান। পরে রাজবাড়ির দক্ষিণদিকের ঠাকুরবাড়িতে বড়নারায়ণের সঙ্গে বিগ্রহগুলি থাকেন। একমাস পর বিগ্রহগুলি পুনরায় যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

অন্যান্য বিগ্রহগুলি হল : বলরাম, শ্রীগোপীমোহন, লক্ষ্মীকান্ত, ছোটনারায়ণ, ব্রহ্মণ্যদেব, গড়ের গোপাল (শান্তিপুরের অদূরে সূত্রাগড়ের), অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, নদীয়া-গোপাল, তেহট্টের কৃষ্ণরায়, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দদেব ও মদনগোপাল। সকল বিগ্রহই বিভিন্ন নদীয়ারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, বেশির ভাগই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নদীয়ারাজ প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তিতে সারাবছর এইসব বিগ্রহের পূজার্চনা হয়ে থাকে। বিগ্রহগুলি বিরহী, শান্তিপুর, সূত্রাগড়, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, তেহট্ট, বহিরগাছি প্রভৃতি স্থানে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ও নিত্যপূজিত। অবশ্য, এখন সব বিগ্রহ রাজবাড়িতে আসে না। তবু তাঁদের নামে বারদোল বসে।

বিগ্রহগুলি বারদোলের তিনদিন পৃথক পৃথক মঞ্চে থাকেন। তিনদিনে বিগ্রহের তিন রকমের বেশ। প্রথমদিন রাজবেশ অর্থাৎ মূল্যবান স্বর্ণাদি অলংকারে সজ্জিত (এখন অবশ্য হয় না), দ্বিতীয়দিন ফুলবেশ—সুগন্ধযুক্ত পুষ্পমালো সজ্জিত। তৃতীয়দিন রাখালবেশ—দরিদ্র রাখালের বেশ।

কবিতায় বারদোলের বিগ্রহের বিবরণ :

বিরহীর বলরাম, শ্রীগোপীমোহন।
লক্ষ্মীকান্ত বহিরগাছি গুরুর ভবন ॥
নারায়ণচন্দ্র ছোট ব্রহ্মণ্যদেব সহ।
আর বড় নারায়ণ রাজার বিগ্রহ ॥
গড়ের গোপাল পেয়ে স্থান শান্তিপুর।
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ স্থানে ঘোষঠাকুর ॥
নদীয়ার গোপাল তবে নবদ্বীপে স্থান।
ত্রিহট্টের কৃষ্ণ রায়—অগ্রে স্থান পান ॥
অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র ; গোবিন্দদেব আর।
উভয় বিগ্রহ স্থান—আবাস রাজার ॥
মদনগোপাল শেষে—বিরহীতে স্থিতি।
বারদোলে তের দেব—আবির্ভূত ইতি ॥
হেরিলে দেবেরে হরে আধি-ব্যাধি-ক্লেশ,
রাজবেশ ফুলবেশ রাখালের বেশ ॥
ভক্তিভরে দেবনাম করিলে কীর্তন।
সকল পাতক নাশে শান্তি লভে মন ॥
ইতি চৈত্র শুক্লপক্ষে শ্রীমন নদীয়াধীপস্য
প্রাসাদোদ্যানে বারদোলাবির্ভূতনাং দেববিগ্রহানাং ॥

(বিধুভূষণ সেনগুপ্ত রচিত)

কৃষ্ণনগরে তথা নদীয়ায় পারিবারিক রীতি আছে যে অনেকে বাগানের বা বাড়ির গাছের বছরের প্রথম ফল বারদোলের মেলায় প্রথম দিন তেহট্ট থেকে আনীত কৃষ্ণরায়

দেববিগ্রহকে উৎসর্গ করেন। এখন আর এই বিগ্রহ কৃষ্ণনগরে আসে না। মেলার প্রথম তিনদিনই তেরটি বিগ্রহ অগণিত ভক্তপ্রাণ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রণামী পান। অবশ্য, এই সমুদয় অর্থ নদীয়া রাজকোষে বা বিগ্রহের পূজারীদের কাছে যায়—তা থেকে বিগ্রহের পূজাদিও হয়ে থাকে।

বারদোলের মেলা প্রবর্তনের পশ্চাৎপটে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দুজন মহিষী ছিলেন। দ্বিতীয়া মহিষী ছিলেন অশেষ রূপলাবণ্যময়ী ও গুণবতী (শিবনিবাসে রাজ্ঞীশ্বর শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক অনুযায়ী দ্বিতীয়া মহিষী হলেন 'মূর্ত্তেব লক্ষ্মীঃ স্বয়ং' অর্থাৎ মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মত)। কথা ছিল যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয়া মহিষীকে নিয়ে উলায় (বীরনগরে) নদীয়ারাজ রাঘব রায় কর্তৃক নির্মিত জলবাটিকায় কয়েকদিন অবস্থান করবেন। কিন্তু রাজকার্যে ব্যস্ত থাকায় কৃষ্ণচন্দ্র আর উলায় যেতে পারেননি। রাজমহিষী উলার যাতের মেলাও দেখতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থায় রাজমহিষীর পক্ষে মেলা দেখাও সম্ভব ছিল না। তাই নাকি কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরে রাজবাড়িতে একটা মেলার প্রবর্তন করেন যাতে রাজমহিষী ও অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীরা কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদ থেকেই মেলা দেখতে পারেন। এই মেলাই বারদোলের মেলা।

আবার, কৃষ্ণচন্দ্র-পরবর্তীকালে নদীয়ারাজ গিরীশচন্দ্র রায় (১৮০২—১৮৪১) বারদোলের মেলা প্রবর্তন করেন বলেও শোনা যায়। কথিত আছে, রাজমহিষীর অনুরোধেই নাকি গিরীশচন্দ্র মেলার প্রবর্তন করেন। ১৭২৮ খৃস্টাব্দে রচিত সংস্কৃত 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতং' ও ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় রচিত বাংলা 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' ও শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে বারদোলের মেলা সম্পর্কে কোন তথ্য নেই, এমনকি উল্লেখ পর্যন্ত নেই। ১৯১০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'Bengal District Gazetteers : NADIA' (by J. H. E. Garrett) গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠায় আছে : 'The great Hindu Swinging festival (Baradol) is celebrated at Krishnagar annualy in March or April, when 12 idols, belonging to the Maharaja of Krishnagar and representing Sri Krishna in twelve different personalities, are brought together to the Rajbari from different parts of the district and worshipped. Some 20,000 pilgrims assemble every year for this festival ; and a fair lasting for three days is held simulteneously.'

এই তথ্য থেকে জানা যায় যে এই শতকের গোড়ায় বারদোলের মেলায় কুড়ি হাজার মেলাযাত্রীর সমাগম হত।

তিনদিনের বারদোল উপলক্ষে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির চকের মাঠের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিরাট মেলা বসে। ঝড়-বৃষ্টি না হলে মেলা মাসাধিক কাল স্থায়ী হয়। মেলায়

নানা ধরনের দোকানপাট বসে, আসে সার্কাস, নাগরদোলা, ম্যাজিক আরও কত কী! বেচাকেনাও ভালই হয়। মেলায় মাঠে দোকান বসাতে গেলে রাজাকে খাজনা দিতে হয়। দূরদূরান্ত থেকে মেলায় দোকানপাট আসে। মেলায় সারি সারি কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের দোকানে ভিড় বেশি। ছোটদের খেলনার দোকান, মেয়েদের কাঁচের চুড়ির দোকান, গৃহস্থালী নানা জিনিসপত্রের দোকান বসে। এছাড়া, নানা মৃৎপাত্র, কলসী-কুঁজো, কাঠের ও পাথরের বাসনকোসন, মাদুর, বেতের কাঠা-ধামা, লোহার ছুরি-কাঁচি-বঁটি ও তালপাতার পাখার দোকান বসে। রকমারি জামা-কাপড়-শাড়ির দোকানে কেনাকাটার ভিড়। সরবতের দোকান বসে অনেক। খাবারের দোকানে থরে থরে সাজানো থাকে নানা মিষ্টান্ন। কাটা ফলের দোকান, সস্তায় ফটো তোলার ষ্টুডিওর সংখ্যাও কম নয়।

শহরের মেলা—শহরের মানুষ তো মেলায় যায়ই—কিন্তু সমাগম বেশি গ্রামের মানুষেরই। দল বেঁধে আশেপাশের গ্রাম থেকে মানুষ আসে সপরিবারে, কেনাকাটা করে। আগে আসত গরুর গাড়িতে চেপে, এখন আসে বাসে। নিয়মিত বাস চলাচলের ফলে মেলায় বিশেষ করে গ্রামের মানুষের ভিড় বেড়েই চলেছে।

পানীয় জল ও জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করেন কৃষ্ণনগর পৌরসভা ও সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ। মেলায় অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নেন জেলার আরক্ষাবাহিনী ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা।

আগে নাকি মেলায় নানা লোকশিল্প আসত, শোনা যেত নানা লোকগান। আসত দেহপসারিণীরাও এবং তাদের ব্যবসারও ব্যবস্থা ছিল।

বারদোলের মেলা নদীয়ারাজ কর্তৃক প্রবর্তিত হলেও এই মেলার সঙ্গে নদীয়ার সাধারণ মানুষের নিবিড় যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন। সাধারণ মানুষের পোষকতা না পেলে এই মেলা এত বিরাট ও ব্যাপক হতে পারত না।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প

দেশ-বিদেশে সমাদৃত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ইতিহাসখ্যাত ও ঐতিহ্যে উজ্জ্বল। জলঙ্গী (খোড়ে) নদীতীরবর্তী কৃষ্ণনগর পৌরশহরের পূর্ব-দক্ষিণ উপকণ্ঠে ঘূর্ণি—নদীর ঘূর্ণি-বাঁক থেকে এসেছে এই নাম। এছাড়া, শহরের আরও দুটি এলাকা—ষষ্ঠীতলা-কুমোরপাড়া এবং আনন্দময়ীতলা-রথতলা-নতুনবাজার। এই তিনটি এলাকাতেই মৃৎশিল্পী পরিবারের পুরুষানুক্রমিক বসবাস। ঘূর্ণি এলাকায় মৃৎশিল্পীদের সারি সারি দোকান, দোকানে

বিক্রয়ের জন্য সাজানো আছে বিপুল পরিমাণ মৃৎশিল্প-সম্ভার। বিগত দুশো বছরে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উদ্ভব-বিকাশ ঘটেছে, অর্জিত হয়েছে উৎকর্ষ ও আন্তর্জাতিক সমাদর। বাংলার অন্যান্য স্থানের মৃৎশিল্পের চেয়ে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের পার্থক্যের মৌল কারণ: কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্য—শিল্পকর্মের বস্তুনিষ্ঠ রীতি বা বাস্তবানুগ রূপায়ণ। আর এই কারণেই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা অনেকের চোখে 'শিল্পী' নয়, শুধুমাত্র সুদক্ষ কারিগর এবং এই মৃৎশিল্পকর্ম যথার্থ শিল্প-কৌলীন্য লাভে বঞ্চিত। অথচ, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) তাঁর 'আত্মকথা'-য় লিখেছেন: 'কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা ছিলেন যথার্থ আর্টিস্ট'। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা সামান্য মাটি দিয়ে যথাযথ রূপায়ণের মাধ্যমে যে অপূর্ব শিল্পমাধুর্য ফুটিয়ে তোলেন তা দেখে দর্শকেরা বিস্মিত না হয়ে পারেন না।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান মাটি। এঁটেল (আঁটালো) ও বেলে মাটি এবং ছাঁচের কাজের জন্য দোআঁশ মাটি। তাতে চালের তুঁষ ও কাঠের গুঁড়ো মেশাতে হয়। মাটির সঙ্গে পাতলা পাটের কুচিও মেশানো হয়। কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি এলাকায় এইধরনের মাটি পাওয়া যায়। জলঙ্গী নদীর মাটি মৃৎশিল্প তৈরির পক্ষে উপযোগী। রাজমহলের মাটিও উপযোগী।

দ্বিতীয় উপাদান রঙ। আগে গুঁড়ো রঙের ব্যবহার ছিল তাতে মেশানো হত তেঁতুল বিচির আঠা। এই আঠা মেশালে রঙ চকচক করে। এখন বাজারে নানারকম রাসায়নিক জলীয় রঙ মেলে।

নির্মাণকর্মে যন্ত্রপাতি বিশেষ নেই। বাঁশের তৈরি ডগা সরু ও ভোঁতা নরুণ জাতীয় চিয়াড়ি ও বোসুয়া। আজকাল লোহারও তৈরি হয়। আর, নানা মাপের তুলি ও ব্রাশ।

এছাড়া, প্রয়োজন খড়িমাটি, সাদা কাপড়-ন্যাকড়া, কাঠ ও তার। আজকাল নাইলনও ব্যবহৃত হচ্ছে।

কৃষ্ণনগরে প্রচলিত জনশ্রুতি যে নদীয়ারাজ-পোষকতায় এখানে মৃৎশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। কৃষ্ণনগরের কোনও মৃৎশিল্পী পরিবারই নদীয়ারাজদের দানভাজন নন। নদীয়ারাজ পরিবার বিষয়ক প্রামাণ্য আকর-পুঁথি ও গ্রন্থসূত্রেও নদীয়ারাজ-পোষকতা সমর্থিত নয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী ঢাকা মতান্তরে নাটোর থেকে মৃৎশিল্পীরা এখানে আসেন। কিন্তু সরজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে এই মত প্রামাণ্য নয়। আবার, দেশের প্রাকৃতজনের প্রাণবন্ত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প জড়িত নয়, লোকধর্ম থেকে উদ্ভূত নয় বলেই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প লোকশিল্পও নয়।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা কুম্ভকার, গোত্র আলম্বায়ন। সূচনায় তাঁরা ছিলেন দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাতা ও কুমোর। সূচনায় নদীয়া তথা কৃষ্ণনগরে আসেন বস্তুনিষ্ঠ শিল্পপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ খৃষ্টীয় মিশনারীরা এবং তার কিছু পরে শিল্প-সমজদার ইংরেজ প্রশাসকেরা। তাঁদের পোষকতাতেই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটে। দেওয়ান

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন যে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের পূর্বপুরুষেরা নদীয়ারাজদের উৎসাহ পেয়েছেন। তিনি নদীয়ারাজ-পোষকতার কথা লেখেননি। নদীয়ারাজেরা ছিলেন শাক্ত। বাংলায় ব্যাপক ব্রাহ্মণ্য-শাক্তাচার প্রচারে-প্রসারে নদীয়ারাজদের বিশেষ ভূমিকা আছে। শাক্ত নানা দেবদেবী মূর্তি নদীয়ায় ব্যাপকভাবে পূজিত হতে থাকে—নদীয়ারাজদের প্রত্যক্ষ পোষকতায়। এই দেবদেবীর মূর্তি কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা নির্মাণ করতেন। তাই, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের সমৃদ্ধিতে নদীয়ারাজদের ভূমিকা থাকলেও নদীয়ারাজদের প্রত্যক্ষ পোষকতায় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উদ্ভব ঘটেনি।

ইংরেজ প্রশাসক চার্লস্ আর্চারই প্রথম কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের নমুনা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'একজিবিশন অফ দি ওয়ার্কস অফ ইণ্ডাস্ট্রি অফ অল নেশনস্' প্রদর্শনীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী শ্রীরামপালের তৈরি মৃৎশিল্পকর্ম স্থান পায়। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে শ্রীরাম পালই প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান ও পদক লাভ করেন। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'এক্সপোজিসন ইউনিভার্সেলে দ্য প্যারিস' প্রদর্শনীতে শ্রীরামপালের মৃৎশিল্প প্রেরিত হয়। ক্রমেই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের আন্তর্জাতিক সমাদরলাভ ঘটতে থাকে। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দেও প্যারিসে অনুষ্ঠিত অনুরূপ প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের শ্রীরামপাল ও যদুনাথ পালের মৃৎশিল্প স্থান পায়। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে মেলবোর্নের, ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে আমস্টারডামের, বার্লিনের ও বোসটনের প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের মতিলাল, গোপালচন্দ্র, যদুনাথ ও চন্দ্রভূষণ পালের মৃৎশিল্পকর্ম প্রেরিত হয়। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশন্যাল একজিবিসন', এই প্রদর্শনীতে স্থান পায় শ্রীরাম, যদুনাথ, রাখালদাস ও মতিলাল পালের শিল্পকর্ম। ১৮৮৬তে লণ্ডনের, ১৮৮৮তে গ্লাসগোর ও ১৯০০তে প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরের চন্দ্রভূষণ, যদুনাথ, রাখালদাস, বক্রেশ্বর, নিবারণ ও চারুচন্দ্র পালের মৃৎশিল্প প্রেরিত হয়। বিদেশে আয়োজিত এই সব প্রদর্শনীগুলিতে শিল্পরসিকদের ও সাধারণ দর্শকদের চিত্ত জয় করে এইসব শিল্পকর্ম। পূর্ণাবয়ব মূর্তিগুলির জীবন্ত-প্রাণবন্ত রূপ দেখে সকলেই মুগ্ধ-বিস্মিত হয়। বিদেশে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের অসামান্য বস্তুনিষ্ঠা, কারিগরি দক্ষতা, শিল্পবোধ ও শৈলী প্রশংসা-প্রতিষ্ঠা পায় এবং কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জিত হয়।

মোটামুটিভাবে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পধারা চলেছে আট পুরুষ ধরে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দশ পুরুষ। অবশ্য বর্তমানে শিল্পীপরিবারের অনেকেই অন্য জীবিকায় ব্যাপৃত। আবার, কুম্ভকার নন, এমন অনেকেই মৃৎশিল্প-উপাদনকর্মের সঙ্গে যুক্ত। লক্ষাধিক জনবসতির কৃষ্ণনগরে মৃৎশিল্পীর সংখ্যা তিনশো। কৃষ্ণনগরের মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে তিনজন মৃৎশিল্পী বা মৃৎশিল্প-কারিগর। মৃৎশিল্পী-পরিবারে প্রায় সকলেই কোন না কোনভাবে উৎপাদনকর্মে যুক্ত। সাধারণত, পরিবারের লোকজনই মৃৎশিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত, বাইরের লোক খুব কম।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের আদিপুরুষ বলে বর্ণিত ('West Bengal Census Handbook : NADIA, 1961') মোহন পাল আজ থেকে প্রায় ২২৫ বছর আগে ঘূর্ণি অঞ্চলে মৃৎশিল্প-উৎপাদনকর্মের সূচনা করেন। মোহন পালের প্রপৌত্র হলেন শ্রীরাম পাল (১৮১৮—১৮৮৫), যাঁর শিল্পকর্ম বিদেশে যায় এবং সমাদৃত হয়। তাঁর পুত্র চন্দ্রভূষণ পালও ছিলেন বিখ্যাত মৃৎশিল্পী। শ্রীরামের ভ্রাতা তিলকচন্দ্রের পুত্র রাখালদাস (১৮৩৪—১৯১১) ও রাখাল-পুত্র বিজয়কৃষ্ণ (১৮৮৭—১৯৬৭) বস্তুনিষ্ঠ মৃৎশিল্প তৈরি করে খ্যাত হন।

আর এক পরিবারভুক্ত আনন্দ পালের পুত্র যদুনাথ পাল (১৮২২—১৯২৯) ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিখ্যাত মৃৎশিল্পী। যদুনাথের জন্মমৃত্যুর কাল বিতর্কিত, অন্যমতে ১৮২১—১৯২৪ খৃস্টাব্দ। প্রাজ্ঞ শিল্পীসন্ধানী হ্যাভেল সাহেব যদুনাথের মৃৎশিল্প-কর্মে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে আর্ট কলেজের মডেলিং ইনস্ট্রাক্টর করে দেন। কলিকাতার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইতালীয় ভাস্করকে দিয়ে তাঁর জীবিতা মাতৃদেবীর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন, কিন্তু মূর্তিতে অনেক অমিল থাকায় তাঁর অপছন্দ হয়। হ্যাভেল সাহেবের অনুরোধে যদুনাথ ঐ মূর্তি গড়েন। যদুনাথ যতীন্দ্রজননীর কাছে বসে দিনের পর দিন দেখে মূর্তি তৈরি করেন, যতীন্দ্র সেই মূর্তি দেখে জীবন্ত মা ভাবেন। যতীন্দ্র যদুনাথকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেন ও নানাভাবে সম্মানিত করেন। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে ঘূর্ণিতে বাংলার লাটসাহেব লিটন এসে বৃদ্ধ যদুনাথের সঙ্গে দেখা করে সম্মানিত করেন। জনশ্রুতি যে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যদুনাথের শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিলেতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু যদুনাথ যাননি। প্রমথ চৌধুরী তাই লিখেছেন : 'আমার ছেলেবেলায় যদুপাল নামক এক ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কারিগর ছিলেন, তাঁকে নির্ভয়ে আর্টিস্ট বলা যায়।···তিনি বিলেতি বইয়ের ছবি দেখে ভিনাস গড়তেন।' সেকালের ভারতের শিল্পরসিক ইংরেজ প্রশাসকেরা ছিলেন যদুনাথের গুণগ্রাহী এবং লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড কারমাইকেল প্রমুখ অনেকেই কৃষ্ণনগরে এসে যদুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শুধু ইংরেজেরাই নয়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখও যদুনাথ-গৃহে এসেছেন।

যদুনাথের শিল্পকর্ম নিয়ে নানা উপভোগ্য ঘটনা প্রচলিত। একবার যদুনাথ নদীর তীরে মাঠে মাটির তৈরি মরা গরু ফেলে রাখলে শকুনেরা নাকি দলে দলে আসতে থাকে। যদুনাথ একজন কাঠুরিয়ার কাঠ কাটা দেখে তাকেই মাটিতে রূপায়ণ করে সেই মূর্তি দিয়েছিলেন এক ইংরেজ শিল্পরসিককে। সেই অনবদ্য মূর্তি দেখে বিদেশী শিল্পরসিক যদুনাথের শিল্পকর্মের যথোচিত মর্যাদা দেন। শেষজীবনে যদুনাথ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধে কাশীতে গিয়ে বাস করেন।

আনন্দ পালের অপরপুত্র রামনাথের পুত্র বক্কেশ্বর পাল (১৮৭৫—১৯২৪) ছিলেন খ্যাতনামা মৃৎশিল্পী। এই বংশধারায় আজও মৃৎশিল্পচর্চা অব্যাহত এবং অনেকেই কৃতবিদ্য

মৃৎশিল্পী। বক্কেশ্বরের পৌত্র বীরেন ও গণেশ ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছেন। বীরেনের পুত্র সুবীর মাত্র দশ বছর বয়সে লণ্ডনের ভারত উৎসবে (১৯৮২) ও তেরো বছর বয়সে ওয়াশিংটনে ভারত উৎসবে (১৯৮৫) গিয়ে গৌরব অর্জন করেছেন।

আর এক বংশধারায় হটু পাল প্রথম পুরুষ। এই বংশধারায় ষষ্ঠ পুরুষ ক্ষিতীশচন্দ্র পাল। তাঁর পুত্র সুবিখ্যাত কার্তিকচন্দ্র পাল মৃৎশিল্পী ও ভাস্কর। তিনি ১৯৪০ খৃস্টাব্দে মাত্র ২৫ বছর বয়সে কালিম্পঙে রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তি তৈরি করেন কবির সামনে বসে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'কৃষ্ণনগরের মূর্তিশিল্পী শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র পাল আমার যে মূর্তি গঠন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহার দ্রুত হস্তের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। য়ুরোপে আমেরিকায় যে শিল্পীরা আমার মূর্তি গড়িয়াছেন তাঁহারা আমাকে ক্লান্তিতে পীড়িত করিয়াছিলেন—ইঁহার হাতে সে দুঃখ পাই নাই।'

কার্তিক-পুত্র গৌতম কলিকাতার আর্টকলেজে স্থাপত্য বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ইতালীর মিলান শহরে গিয়ে স্থাপত্যবিদ্যায় প্রথম হন (১৯৭৪)। গৌতম এখন কৃতবিদ্য ভাস্কর্যশিল্পী। শুধু মৃৎমাধ্যম নয়, প্রস্তরধাতুমাধ্যমেও তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন অসামান্য ভাস্কর্য।

এই বংশধারায় অপর বিখ্যাত শিল্পী গোপেশ্বর পাল (১৮৯৪—১৯৪৪)। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি ইংলণ্ডের ওয়েমব্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে যোগ দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিদেশে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতায় কুমারটুলীতে গিয়ে বসবাস করেন।

কলিকাতা ভারতীয় যাদুঘরের সহকারী অবেক্ষক টি. এন মুখার্জীই (রসসাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়) প্রথম কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সম্পর্কে লেখেন তাঁর ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত 'Art Manufactures of India' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সম্পর্কে বহু তথ্য আছে। এই গ্রন্থের তথ্যে জানা যায় ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের মূল্য:

বিষয়	মূল্য
চা বাগিচা	১২০০ টাকা
দুর্গাপূজা	১৭৫ টাকা
বিয়ের শোভাযাত্রা	৪৭৫ টাকা
জমিদারের কাছারি	১৫০ টাকা
রথযাত্রা	৩৬০ টাকা
অহিফেন সেবন	৪০ টাকা
চড়ক উৎসব	১৮০ টাকা
নবদ্বীপের পণ্ডিতসভা	৪০ টাকা
মানুষের মূর্তি	১ টাকা

বর্তমানে শতাধিক বৎসর পরে এই শিল্পকর্মগুলির মূল্য ৬ থেকে ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৬ খৃস্টাব্দে গৃহীত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে কৃষ্ণনগরের ১০০ জন মৃৎশিল্পীর মাসিক গড় আয় তিনশো টাকার বেশি নয়। এক হাজার টাকার বেশি মাসিক আয় দশজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখন শিল্পীদের অনেকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পান, সরকারী অনুদান পান—কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছু নয়। দৈনিক পত্রিকাসূত্রে জানা যায় যে (২৬ আগস্ট ১৯৭৯) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তশিল্প উন্নয়ন পর্ষদ আট হাজার টাকা মূল্যের মৃৎশিল্প ক্রয় করে বিদেশে পাঠিয়েছেন।

পুরুষানুক্রমিক এই মৃৎশিল্পধারায় পুত্র শৈশবকাল থেকে পিতার কাছে শিল্পকর্মে শিক্ষা পান ও কলাকৌশল-শৈলী সহজেই আয়ত্ত করে নৈপুণ্যের অধিকারী হন এবং দক্ষ থেকে সুদক্ষ মৃৎশিল্পী হয়ে ওঠেন। শিল্পীরা সাধারণত তিন ইঞ্চি থেকে দুই ফুট পর্যন্ত উচ্চতার পুতুল ও মূর্তি তৈরি করেন। নানা রকম ফলমূল, বিস্কুট, পশু-পাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ, দেবদেবীর মূর্তি, সাধুসন্ন্যাসী, জ্ঞানীগুণী, জননেতা, কীর্তনীয়া ও বিভিন্ন জীবিকার কর্মরত মানুষের মূর্তি (কামার, কাঠুরিয়া, সাপুড়ে, মুচি, ফলবিক্রেতা প্রভৃতি) সুনিপুণ দক্ষতায় সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণনগরে এখন বছরে গড়ে ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের মৃৎশিল্প ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সূক্ষ্ম বাস্তব অনুকৃতির শিল্পগুলি ছাঁচে ঢালা নয়। সেগুলি প্রত্যেকটি হাতেই তৈরি করা হয়। এই সৃষ্টির পিছনে থাকে শিল্পীর অসামান্য দক্ষতা। মূল্যও ছাঁচে ঢালা পুতুলের চেয়ে বেশি। তবে হালকা ছাঁচে ঢালা পুতুল ও অন্যান্য মৃৎশিল্পের মূল্য তুলনামূলক ভাবে স্বল্প হওয়ায় বিক্রয় হয় বেশি। এখন পুতুল ও মূর্তিতে কাঁচামাল ও রঙের দাম মোট মূল্যের শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ, মজুরি ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ। যে সব কারিগর মাস মাইনেতে কাজ করেন, তাঁরা পান ১০০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে।

ঘূর্ণি থেকেই সরাসরি পুতুল ও মূর্তি বিক্রয় হয়। এখন বিদেশী পর্যটকেরা প্রায়ই আসেন এবং কিনে নিয়ে যান। এছাড়া, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প বা এই ধরনের হস্তশিল্পকর্ম বিক্রয় করবার জন্য অনেক সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁরা এখান থেকে এক সঙ্গে অনেক পরিমাণ মাল কিনে নিয়ে বিক্রয় করেন দেশের নানা স্থানে ও বিদেশে। বিভিন্ন মেলায় মৃৎশিল্পীরা দোকান দেন, সেখানেও বিক্রয় হয়। এছাড়া, সরকার-আয়োজিত নানা প্রদর্শনীতেও মৃৎশিল্প বিক্রয় হয়। এখানকার শিল্পীদের তৈরি দেবদেবীর প্রতিমা (দুর্গা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি) নানা স্থানে যায়।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প আজ যে সব সমস্যায় জর্জরিত সেগুলি হল :

১. মাটির সমস্যা। রাজমহলের মাটিতেও পুতুল তৈরি হয় কিন্তু সেখান থেকে এখানে নিয়ে আসায় ব্যয় বেশি পড়ে যায়।

২. পুতুল ও মূর্তির ক্ষণভঙ্গুরতা। এখান থেকে বিক্রয়ের জন্য অন্যত্র পাঠাবার সময়, নিয়ে যাওয়ার সময় ভেঙে যায়।

৩. প্যাকিং করার সমস্যা। মৃৎশিল্পীরা আধুনিক রুচিসম্মত প্যাকিং জানেন না প্রশিক্ষণ না থাকায়। মৃৎশিল্প বিদেশে বিক্রয় করতে গেলে প্রয়োজন প্লাসটিকের ভেলভেট আবৃত সুন্দর কাসকেট, যার ভিতরে থাকবে মৃৎশিল্প। তবে তার চাহিদা হবে। আবার, মূর্তির (নানা হিউম্যান ফিগার) জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের কাসকেট।

৪. আন্তরাজ্য ও অন্তঃরাজ্য বিক্রয়কর ও অন্যান্য কর।

৫. মেলায় মৃৎশিল্প বেশি বিক্রয় হয় কিন্তু মেলাগুলি এখন তেমন জমে না, দীর্ঘদিন স্থায়ীও হয় না। গ্রীষ্ম-বর্ষায় মেলায় ঝড়-বৃষ্টিতে দোকানের ক্ষতি হয়।

৬. সমবায় সমিতিতে গোষ্ঠীতন্ত্র থাকার দরিদ্র অসহায় দুর্বল মৃৎশিল্পীদের কোনও সুবিধা নেই।

৭. যেহেতু মৃৎশিল্পী অধিকাংশক্ষেত্রে নিজেরাই মৃৎশিল্পদ্রব্য বিক্রয় করেন, বিক্রয়কর আরোপের ফলে তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে নিজেদেরই দিতে হয়। মজুরি থেকেই এই অর্থ বাদ যায়।

৮. সূক্ষ্মশিল্পদ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না।

৯. জাঁকজমকপূর্ণ শোরুম না করলে বিক্রয় হয় না, ক্রেতা আকৃষ্ট হয় না।

১৯৪৯ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণনগর মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি গঠিত হয়। সদস্য সংখ্যা মাত্র ৪৩ জন। শেয়ার মূলধন একশো টাকা। সরকার তিনহাজার টাকা অনুদান দেন। বর্তমানে এই সমিতি আর কার্যকর অবস্থায় নেই। আর একটি নতুন সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে।

মৃৎশিল্পীরা মৃৎশিল্পের উন্নয়নে ও তাঁদের বহুবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে দাবী করেন: ব্যাপক সরকারী অনুদান (বিশেষ করে গরিব বিত্তহীন শিল্পীদের ক্ষেত্রে), কাঁচামালের সুবন্দোবস্ত, সরকারী ব্যবস্থা, প্যাকেজিং সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, বিদেশে সরাসরি রপ্তানীর ব্যবস্থা, সরকারী উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে মৃৎশিল্পীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ ও মডেলিং প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শশালা স্থাপন, সহজ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিশোধ্য সরকারী ও ব্যাঙ্কের ঋণের ব্যবস্থা, সরকার থেকে নানা স্থানে মৃৎশিল্পসহ অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা, মৃৎশিল্পে ছাড় বা রিবেটের ব্যবস্থা (ক্রেতাদের ক্রয়ে উৎসাহদানের জন্য), মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়ার্ক এডুকেশন বিভাগে মৃৎশিল্পীদের প্রশিক্ষকপদে নিয়োগের ব্যবস্থা, আধুনিক রাসায়নিক ও কৃত্রিম রঙের প্রয়োগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সরকারী বিক্রয়কেন্দ্রে মৃৎশিল্পীদের শিল্পদ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থা, জীবিকা-ঋণ, মৃৎশিল্পদ্রব্যে সরকারী সাবসিডি প্রদান ও একদর নির্ধারণ প্রভৃতি।

কৃষ্ণনগরের ডাকের-শোলার সাজ

কৃষ্ণনগরের ডাকের সাজের নামডাক অনেকদিনের। ডাকের সাজ নামকরণ কি এই কারণেই?

কৃষ্ণনগরের ডাকের সাজ বৈশিষ্ট্যে ও ঐতিহ্যে খ্যাত এক অনুপম হস্তশিল্পকর্ম।

এখানকার আনন্দময়ীতলা-চৌরাস্তা-বাগদীপাড়া অঞ্চলে ডাকের সাজের শিল্পীদের পুরুষানুক্রমিক বসবাস। ডাকের সাজ ও বাজী তৈরিই তাঁদের প্রধান উপজীবিকা।

ডাকের সাজ কৃষ্ণনগরের প্রাচীন লোকায়ত হস্তশিল্প হলেও নদীয়া জেলার বীরনগরে ডাকের সাজের উৎপত্তি। বীরনগরের (উলা) শিল্পীরাই নাকি প্রতিমার অলঙ্করণের ডাকের সাজ প্রথম তৈরি করেন। বীরনগরের ডাকের সাজের আদিশিল্পী হলেন পালিতপাড়ার কানাইলাল আচার্য ও নীলমণি আচার্য। তাঁরা দুজনেই ছিলেন বিগ্রহের অঙ্গরাগের শিল্পী। কৃষ্ণনগরে তাঁদেরই বংশধরদের নিয়ে আসেন নদীয়ারাজেরা এবং রাজবাড়ির কাছাকাছি এলাকায় তাঁদের বসতি করান। নদীয়ারাজদের পূজিত নানা দেবদেবীর অলঙ্করণের জন্য ডাকের সাজের প্রয়োজনেই তাঁদের এখানে আনা হয়।

শুধু প্রতিমার অলঙ্করণে-সাজসজ্জায় নয়, যাত্রাদলের কুশীলবদের পোষাকেও ডাকের সাজের অলঙ্করণ লাগে।

আগে আমাদের দেশে প্রতিমার মাটির সাজই শুধু থাকত। ক্রমে প্রতিমার অলঙ্করণে-পোষাকে ও চালচিত্রে ডাক ও শোলার কাজ প্রবর্তিত হয়। মাটির সাজে খরচ কম। শোলার সাজে খরচ বেশি। সবচেয়ে বেশি খরচ ডাকের সাজে।

ডাকের সাজ হল নানা রঙের জরির, রাংতার ও অন্যান্য জমকালো কাজ। ডাকের সাজে প্রতিমা অলঙ্কৃত হলে প্রতিমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে দুর্গা প্রতিমার ষড়ৈশ্বর্যময়ী রূপ ডাকের সাজেই মূর্ত হয়ে ওঠে। ডাকের সাজের যেমনি জাঁক তেমনি তা জমকালো। যেমনি তার কারিগরি নৈপুণ্য তেমনি তার গঠনচাতুর্য।

ডাকের সাজ সূক্ষ্ম হস্তশিল্প। এতে শুধু পরিশ্রম লাগে না, লাগে দীর্ঘ সময়। দীর্ঘদিনের সুনিপুণ পরিশ্রমে নির্মিত হয় ডাকের সাজের এক একটি অলঙ্কার।

ডাকের সাজের অলঙ্কার মুকুট প্রভৃতি তৈরি করতে লাগে শোলা, কাপড়, রঙিন কাগজ, তার, জরি ও রাংতা প্রভৃতি। জরির সুতোই হচ্ছে এই সাজের প্রধান উপাদান। জরি কিনে বিশেষ এক ধরনের চরকায় সুতো কাটা হয়। প্রথমে শোলা, কাগজের মত পাতলা করে কেটে নিয়ে, তার উপর জরির চুমকি ও জরির সুতো ও রাংতা বসিয়ে তৈরি হয় সাজ। সাজের তলায় কাপড় ও কাগজ থাকে। ডাকের সাজের অলঙ্কারের মধ্যে কলকা, ঝালট, হীরাপটি, ক্রাউন, জিনকোর, শাড়ি, সিঁথি, আঁচলা, হাত-পা-নাক-কানের নানা গহনা ও মাথার মুকুট উল্লেখযোগ্য। সব গহনার মধ্যে দেখতে সুন্দর লাগে আঁচলা ও মুকুট। দামও খুব বেশি। মুকুট তৈরি করতে রাংতা ও ময়ূরের পালক লাগে। এক একটি মুকুটের দাম ১৫০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত। সূক্ষ্ম কারুকার্যময় একটি মুকুট তৈরি করতে দক্ষশিল্পীর সময় লাগে প্রায় একমাস।

সারা বছরেই মালাকরেরা ডাকের সাজের অলঙ্কার তৈরি করেন। দুর্গাপূজার সময় কাজের চাপ বেশি। মালাকর পরিবারের সকলকেই এ কাজে যুক্ত হতে হয়।

মেয়েরাও সাজ তৈরি করেন—বিশেষ করে জরির সুতো কাটার কাজ। কলিকাতার পাইকারী ক্রেতারা শিল্পীদের দাদন দেন, পূজার আগে ডাকের সাজ নিয়ে যান।

নতুন কাল : নতুন হাল। এখন প্রতিমার নতুন মূর্তি—নতুন ঢঙ—নতুন সজ্জা। যেহেতু ডাকের সাজে খরচ বেশি লাগে সে কারণে অনেকেই এখন আর প্রতিমা ডাকের সাজে সাজান না। যাত্রাতেও পৌরাণিক-ঐতিহাসিক কাহিনীর বদলে ধীরে ধীরে আধুনিক জীবনের কাহিনী স্থান করে নিয়েছে। ফলে, ডাকের সাজের প্রয়োজনীয়তা যাত্রা-অভিনয়েও কমে এসেছে।

একসময় জমিদার-বিত্তবানদের বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব হত—প্রতিমা ডাকের সাজে হত সজ্জিতা। অর্থনৈতিক সংকট হেতু এখন অনেক পারিবারিক দুর্গোৎসব বন্ধ হয়ে গেছে, প্রতিমা আকারে ছোট হয়েছে, ডাকের সাজের বদলে এসেছে মাটির সাজ।

ডাকের সাজের চাহিদা কমে যাওয়ায় শিল্পীদের জীবিকা ও জীবনে নেমে এসেছে নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকট। অনেকেই বৃত্তি ত্যাগ করে অন্য জীবিকা ধরেছেন। আজ আর মালাকরদের শুধু ডাকের সাজ তৈরি করে পেট ভরে না।

তুলনামূলকভাবে শোলার সাজের দাম কম। নদীয়ায় কালীগঞ্জ এলাকায় ব্যাপক শোলা হয়—চিল-বাঁওড়ে। শ্বেতশুভ্র শোলার সাজে সজ্জিতা প্রতিমাও দেখতে অপরূপা হয়ে ওঠে। ডাকের সাজের মতই শোলার সাজেও আছে প্রতিমার পোষাক, অলঙ্কার, মুকুট, গহনা, আঁচলা প্রভৃতি।

কৃষ্ণনগরের ডাক ও শোলার শিল্পীরা মনে করেন যে তাঁদের প্রয়োজন—সরকারী অনুদান, ঋণ, বিপনন ব্যবস্থা, সরকারী প্রদর্শনীতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

কৃষ্ণনগরে এখন শতাধিক ব্যক্তি ডাক ও শোলার শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। কৃষ্ণনগরের ডাক-শোলার শিল্পীদের মধ্যে সোমনাথ মান্না ও সুবল মালাকর সরকারী সম্মান অর্জন করেছেন।

মিষ্টান্ন শিল্প

মিষ্টান্ন আমাদের প্রিয় খাদ্য। নদীয়া জেলার নানা স্থানের মিষ্টান্ন বিখ্যাত।

একদা কৃষ্ণনগর ও সন্নিহিত এলাকায় গোপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের কেন্দ্র ছিল। শহরের একাংশের নাম গোয়াড়ী, গোবাড়ির বিবর্তিত রূপ। বাংলার মিষ্টান্ন প্রধানত গো-দুগ্ধজাত দ্রব্য। মিষ্টান্নের উপাদান দুগ্ধ, সর, ক্ষীর, চিনি ও খেজুর গুড়। নদীয়ায় এগুলির সহজলভ্য ছিল। ফলে, নদীয়ায় মিষ্টান্নশিল্প গড়ে ওঠে।

কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, সরভাজা ও সরতক্তি বিখ্যাত। ছানা ও ক্ষীরের বাটা মাখা সন্দেশের (হলুদ রঙের) উপর সরযুক্ত নরম মিষ্টির নাম সরপুরিয়া, এক ধরনের সন্দেশ বলা যেতে পারে। চারকোণা মোটা সর চিনির রসে ডুবিয়ে সরভাজা এবং শুকিয়ে সরতক্তি তৈরি করা হয়। এখন এই তিনটি মিষ্টান্ন তৈরির সবরকমের মশলা ও জাফরান মেলে না। শীতকালে কৃষ্ণনগরের নতুন খেজুর গুড়ের সন্দেশ দেদোমণ্ডা ও অন্যসময় বাদামের বরফি সন্দেশ বিখ্যাত।

শান্তিপুরের নিখুঁতি নিখুঁতভাবে তৈরি মিষ্টান্ন। দেখতে অনেকটা ভাঙা ছানার জিলাপীর অংশ বলে মনে হয়। ছানা ঘিয়ে ভেজে রসে ফেলা হয়। তার উপরে ছোট এলাচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

রাণাঘাটের ঘিয়ে ভাজা পানতুয়া-কালোজাম বিখ্যাত।

মুড়াগাছার ছানার জিলাপী সুস্বাদু মিষ্টান্ন।

মাজদিয়া-কৃষ্ণগঞ্জের নতুন গুড়ের (খেজুর গুড়ের) মাখা সন্দেশ-কাঁচাগোল্লা আজও মেলে।

বেতাইতেও অনুরূপ কাঁচাগোল্লা মেলে। এখানকার চমচমও নামকরা।

দেবগ্রামের (কালীগঞ্জ থানা) রসকদম্ব বিখ্যাত।

নবদ্বীপের রাজভোগ-গোবিন্দভোগ বিরাটাকার রসগোল্লা, ভিতরে ক্ষীরের পুর। নবদ্বীপের দইও বিখ্যাত।

এককালে নদীয়ার এইসব বিখ্যাত মিষ্টান্ন ছিল স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে-আকারে অনুপম। একবার খেলে মুখে স্বাদ লেগে থাকত। এখন মশলা মেলে না, দুধও সেরকম নেই। ফলে সেকালের মিষ্টান্ন একালে ভেজালের যুগে দুঃস্বপ্নমাত্র। মিষ্টান্নশিল্পের সুদক্ষ কারিগর-শিল্পীরাও আজ আর নেই। ক্রমেই মিষ্টান্ন ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, আকারে ছোট হচ্ছে, কৃত্রিমতায় পূর্ণ হচ্ছে। নদীয়ার মিষ্টান্নের সাবেক স্বাদ ও রূপ এখন আর নেই।

সেকালের খ্যাতনামা লেখক পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রসগোল্লা মিষ্টান্নের জন্ম নদীয়া জেলাতেই। তিনি লিখেছেন : 'রসগোল্লার প্রত্নতত্ত্ব বলিয়া রাখি। উহার বয়স ৫৯/৬০ বৎসরের অধিক নহে। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে রসগোল্লার জন্মভূমি। ঐ গ্রামের হারাধন ময়রা রাণাঘাটের পালচৌধুরী মহাশয়দের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। তাঁহার শিশুকন্যা কাঁদিতেছিল। তাহাকে সান্ত্বনার জন্য উনানের উপর তৈয়ারী রসে ছেনা ফেলিয়া দেখিল উৎকৃষ্ট সামগ্রী তৈয়ার হইয়াছে। পালচৌধুরী জমিদারেরা উহার রসগোল্লা নামকরণ করেন।' (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, ১৩৩২)

পূজা, পার্বণ ও মেলা

কোতোয়ালী থানা :

সাধনপাড়া—এখানে রংদোল উৎসবে মেলা বসে।

সোনাডাঙা—এখানকার মানিকপীরতলায় মহররমের সময় মেলা বসে। লাঠিখেলা ও জারিগান হয়।

চুয়াখালি—চড়কে মেলা বসে। বাণফোঁড়া, আগুনঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ হয়। বোলান গান হয়, সঙ বের হয়। এখানে মনসাপূজায় ঝাঁপান, কবিগান ও তরজা হয়।

রূপদহ—জগদ্ধাত্রীপূজা ও মেলা হয়।

সুবর্ণবিহার—গাজন-চড়ক হয়।

হরিশপুর—পঞ্চাননতলায় মাঘ মাসে পূজা ও মেলা হয়।

দেপাড়া—বৈশাখী পূর্ণিমায় নৃসিংহদেবের বার্ষিক পূজা হয়, মেলা বসে।

আনন্দবাস—দশহরা তিথিতে স্নানযাত্রার ও পৌষসংক্রান্তি তিথিতে উত্তরায়ণের মেলা বসে।

ভালুকা—নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত কালাচাঁদ বিগ্রহের রংদোল উৎসব ও পয়লা বৈশাখ ভগবতী যাত্রা উৎসব হয়। এখানে গাজন-চড়কও হয়।

আসাননগর—অম্বুবাচী তিথিতে মেলা বসে। এখানে ঘোড়াপীরতলায় পীরের মাজারে মেলা বসে। এখানে পঞ্চাননতলায় পঞ্চাননপূজা হয়। মনসাতলায় মনসা পূজা হয়।

বেলপুকুর—কার্তিকী অমাবস্যা ও রটন্তী তিথিতে এখানে গভীর রাত্রিতে তন্ত্রাচারে কালীপূজা হয়।

কৃষ্ণনগর পৌরশহর :

কার্তিকী শুক্লা নবমীতে অনুষ্ঠিত একদিনের জগদ্ধাত্রীপূজা বিখ্যাত। পরদিন বিসর্জন উৎসব। চৈত্রের শুক্লা একাদশীতে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির চকে বসে তিনদিনের বারদোলের মেলা। রথেও এখানে দুটি স্থানে মেলা বসে। নানা স্থানে চড়ক হয়।

ঘূর্ণিতে ধর্মরাজতলায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। মালোপাড়া, বাগদীপাড়া ও মানিকপাড়া-সর্দারপাড়ায় ধর্মঠাকুরের থান আছে, পূজাও হয়।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে সারা বছর নানা শাক্ত দেবদেবীর ও রাধাকৃষ্ণের নানা পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে।

নবদ্বীপ থানা :

নবদ্বীপ পৌরশহর—গঙ্গাতীরবর্তী হিন্দু ও বৈষ্ণবতীর্থ। নানা তিথিতে গঙ্গাস্নান ছাড়া শাক্ত ও বৈষ্ণব নানা উৎসব হয়। নবদ্বীপের বৈষ্ণব রাস শাক্ত রাসে পরিণত হয়েছে, রাসে নানা শাক্ত দেবদেবীর বিরাটাকার মূর্তি পূজিতা হন। বৈষ্ণবভক্তদের কাছে নবদ্বীপ হল 'বাংলার বৃন্দাবন'। মহাপ্রভুপাড়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর দারুবিগ্রহের মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গবাড়ি, শ্রীবাস অঙ্গন, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মন্দির, মণিপুররাজ প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণচূড় মন্দির, গোবিন্দবাড়ি, প্রাচীন মায়াপুরে মহাপ্রভু মন্দিরে মহাপ্রভুর বিশেষ পূজাদি হয়ে থাকে। পোড়ামাতলায় লোকায়ত দেবী পোড়ামা, ভবতারণ শিব, ভবতারিণী কালী ও বুড়োশিবমন্দিরে বুড়োশিবপূজা হয়। বৈষ্ণবপাট নবদ্বীপে প্রতিদিনই নানা বৈষ্ণব মহোৎসব ও সংকীর্তনাদি হয়ে থাকে।

এছাড়া নবদ্বীপে আছে ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, যোগনাথ শিব, দণ্ডপাণি শিব ও পদ্মপাণি শিব প্রভৃতি লোকায়ত দেবদেবী। এখানকার অধিকাংশ শিব লিঙ্গমূর্তি-বিশিষ্ট নয়, নোড়াকৃতি প্রস্তরখণ্ড—অবয়বহীন। উল্লেখ্য যে এই সব শিবের প্রধান উৎসব গাজন। চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচদিন আগে থেকে হয় 'সাতগাজন'। পাঁচদিনের অনুষ্ঠানের নাম—সাতগাজন, ফুল, ফল, নীল ও গাজন। নবদ্বীপের সাতটি শিবের স্নানোৎসব। গঙ্গায় শিবস্নান হয়। ফুল হল গভীর রাত্রে অনুষ্ঠিত গাজনের সন্ন্যাসীদের নৃত্যোৎসব। শবনাচ, কাঁটাঝাঁপ, মশালনাচ ও শ্মশাননাচ এই উৎসবের অঙ্গ। আর একটি অনুষ্ঠান শিবের বিবাহ। শিবকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপে নানা-লোক-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

শ্রীমায়াপুর—এখানে নানা মঠ-মন্দিরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নানা অনুষ্ঠান সারা বছর ধরে হয়ে থাকে। অধুনা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্ঘ (ISKCON) সুরম্য মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

চাপড়া থানা :

কল্যাণদহ—এখানকার গাজন বিখ্যাত।

জলকর-মথুরাপুর—এখানে বৈশাখে ব্রহ্মাপূজা ও দশহরা তিথিতে মনসাপূজা হয়।

হাতিশালা—এখানে গাজনে ছাগ বলি হয়।

বাঙালঝি—বড়দিনে বিরাট খৃষ্টীয় মেলা বসে।

শেওড়াতলা-রাণাবন্ধ—পীরের মেলা বসে।

কৃষ্ণগঞ্জ থানা :

দিগম্বরপুর—দোলপূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে।

বিষ্ণুপুর—এখানে অশ্বত্থবৃক্ষতলে হরিঠাকুরের থান আছে। পূজাদি হয়ে থাকে।

কৃষ্ণগঞ্জ—বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরীপূজা হয়। চড়ক ও মনসাপূজায় মেলা বসে।

মালীঘাটা—এখানকার চড়ক সাড়ম্বর, ১৫দিনব্যাপী অনুষ্ঠান। বোলান গান চড়কের সন্ন্যাসীরা করেন।

টুঙ্গী—পঞ্চাননের থান আছে, পূজা হয়। এখানেও চড়ক হয়। ফাল্গুন মাসে এখানে রাধাকৃষ্ণের পঞ্চম দোল উৎসব হয়।

থাটুরা—এখানে তেঁতুলপীরতলায় পীরের মাজারে অম্বুবাচী তিথিতে মেলা বসে।

কুঠিপাড়া—মাজদিয়া সংলগ্ন এই গ্রামে চড়কে বোলান গান শোনা যায়।

নোনাগঞ্জ—বুড়ো সাহেব পীরের মাজারে মেলা বসে।

শিবনিবাস—ভীম একাদশী তিথিতে এখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত মন্দির-চত্বরে বিরাট মেলা বসে।

মাটিয়ারি—মলি-অল-গস পীরের মাজারে মেলা বসে।

নাকাশিপাড়া থানা :

জগদানন্দপুর—বেথুয়াডহরী সংলগ্ন এই গ্রামে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ জগদানন্দ গোঁসাই-এর পাট। শ্রীচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নানা অনুষ্ঠান এখানে হয়।

বিল্বগ্রাম—এই প্রাচীন জনপদে লোকায়ত দেবী বিলেশ্বরী দেবীর পূজা হয়। এখানকার রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব বিখ্যাত। স্নানযাত্রায় মেলা বসে।

ব্রহ্মাণীতলা—এখানকার মনসার নাম ব্রহ্মাণী। শ্রাবণ-সংক্রান্তি তিথিতে সাড়ম্বর ব্রহ্মাণীপূজা হয়, মেলা বসে, ঝাঁপান ও মনসা পুরাণের গান শোনা যায়।

গোটপাড়া—গোপীনাথ বিগ্রহের স্নানযাত্রায় মেলা বসে।

ভেবুয়াডাঙা—গঙ্গাতীরবর্তী এই গ্রামে মকরস্নান উপলক্ষে মেলা বসে।

নাঙ্গলা—কাটাপীরসাহেবতলায় অম্বুবাচী তিথিতে ও মাঘী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত মেলা বিখ্যাত, মেলায় রাতে বসে ফকিরিগানের আসর।

বেকোয়াইল—দশহরা তিথিতে পঞ্চাননের (পঞ্চানন্দ) পূজা অনুষ্ঠান হয়।

ধনঞ্জয়পুর—মহরম উপলক্ষে এখানকার গাজীপীরতলায় মেলা বসে, লাঠিখেলা হয়, জারিগান হয়।

বড়গাছি—এখানকার বৈষ্ণব আখড়ায় মহাপ্রভুর পূজাদি নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

দোগাছিয়া—চড়ক উপলক্ষে মেলা বসে। বৈশাখী ও মাঘী পূর্ণিমায় মুলীচাঁদ পালের স্মরণোৎসব হয়।

মুড়াগাছা—সর্বমঙ্গলা দেবীর পূজা বৈশাখী সংক্রান্তি তিথিতে, তখন মেলা হয়।

ধর্মদহ—রাসপূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয়।

কালীগঞ্জ থানা :

পলাশী—স্নানযাত্রায় ও মনোহর শাহ পীরের মাজারে মেলা বসে। রাধাষ্টমী তিথিতে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয়।

হাটগোবিন্দা—বড়পীরতলায় মাঘ মাসে 'থানা' উৎসব হয়।

হাটগাছা—রথযাত্রায় মেলা বসে। এখানে গাজনও হয়।

হিজুলী—ফাল্গুনমাসে পঞ্চম দোল উপলক্ষে মেলা বসে।

দেবগ্রাম—গ্রামের লোকায়ত দেবী কুলাইচণ্ডীর পূজানুষ্ঠান বিখ্যাত।

জুড়নপুর—মাঘীপূর্ণিমায় মেলা বসে।

বসন্তপুর—মনসাপূজায় ঝাঁপান গান শোনা যায়।

কামদেবপুর—এখানে গাজন উৎসব হয়।

মহুরাপুর—স্নানযাত্রায় ও রথযাত্রায় মেলা বসে।

চাখুন্দী—শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মস্থান, তাঁর আবির্ভাব উৎসব হয়।

বড় চাঁদঘর—লোকায়ত দেবী 'যশদায়িনী'র বৈশাখী বিশেষ পূজায় মেলা বসে। বারুণী তিথিতে হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব হয়।

ঘোড়াইক্ষেত্র—লৌকিকদেবী 'বুড়ো মা' ও 'ধর্মঠাকুরে'র পূজা অনুষ্ঠান উল্লেখ্য।

তেহট্ট থানা :

ধাওয়াপাড়া—গাজন উৎসবে বোলান গান পরিবেশিত হয়।

সাহেবনগর—অগ্রহায়ণ মাসে 'মাস পালনী' উৎসব হয়। লৌকিক দেবী 'রায়দেয়াশিনী'র পূজায় মেলা বসে।

বাওর—পৌষপার্বণে মেলা হয়।

চান্দেরঘাট—রথযাত্রায় মেলা বসে।

ভিতারপাড়া—পৌষসংক্রান্তি তিথিতে মোজদ্দিন শাহ ফকিরের মেলায় রাতে বসে ফকিরিগানের আসর।

তেহট্ট—কৃষ্ণরায় বিগ্রহের পূজায় মেলা বসে ১লা মাঘ উত্তরায়ণ তিথিতে। দোল উৎসবও বিখ্যাত।

ইলশামারী—বিজয়া দশমীতে নৌকাবাইচ খেলা হয়, মেলাও বসে।

নাটনা—ছিন্নমস্তার পূজায় মেলা বসে।

করিমপুর থানা :

ধোড়াদহ—রামনবমী তিথিতে মেলা হয়।

করিমপুর—বাসন্তীপূজায় চৈত্র মাসে চারদিনের মেলা বসে।

কাজিলনগর—গাছপূজা জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়।

থানাপাড়া—জঙ্গলীপীরতলায় মাজারে পৌষ মাসে মেলা বসে।

মুরুটিয়া—স্নানযাত্রায় জগন্নাথবিগ্রহের উৎসব ও মেলা হয়।

শিকারপুর—বাসন্তীপূজায় মেলা বসে।

ফুলখালি—বারুণীতিথিতে মেলা হয়।

সুন্দলপুর—বৃন্দাবনবিহারী বিগ্রহের রংদোল ও অন্যান্য উৎসব হয়

রাণাঘাট থানা :

উলা-বীরনগর—বৈশাখীপূর্ণিমায় উলাইচণ্ডীর যাতের মেলায় শাক্তদেবী মহিষমর্দিনী ও বিন্দুবাসিনী দেবীর পূজা হয়।

আড়ংঘাটা—যুগলকিশোর রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে মেলা বসে।

পাঁচবেড়িয়া—মনসাপূজায় মেলা বসে।

শ্রীরামপুর—গাজন ও মনসাপূজা হয়।

শ্মশমালী—রাসোৎসবে মেলা বসে। এখানে গাজন-উৎসবও হয়।

হবিবপুর—দোলযাত্রায় মেলা হয়। এখানকার শীতলাপূজা প্রাচীন।

গাজীপুর—গাজীপীরতলায় মাজারে মেলা বসে।

মাজদিয়া—গোরা শহীদ পীরের উরস উপলক্ষে মেলা হয়।

কামারগড়িয়া—পীরতলায় শ্রাবণ মাসে মেলা বসে।

আনুলিয়া—গাজন চড়ক উপলক্ষে মেলা হয়।

চাকদহ থানা :

গঙ্গাপ্রসাদপুর—এখানকার বুড়াশিবের গাজন-উৎসব বিখ্যাত।

চাকদহ—মাঘী পূর্ণিমায় গণেশজননীর পূজায় মেলা বসে।

যশোড়া—বৈষ্ণবপাট, নানা বৈষ্ণব-মহোৎসব এখানে অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও জগদীশ পণ্ডিতের তিরোধান উৎসবে মেলা বসে।

কালীগঞ্জ—'রাজরাজেশ্বরী' দেবীর ও গঙ্গা দেবীর পূজায় মেলা বসে।

ঘোষপাড়া—কর্তাভজা লোকধর্ম-সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সতীমার মেলা বিখ্যাত।

কুলিয়া—অপরাধ-ভঞ্জনের মেলা অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়।

চান্দুরী—মাঘীপূর্ণিমায় গাজীপীরের মেলা বসে।

ঘোড়াগাছা—ঘোড়াপীরের উরস উপলক্ষে মেলা হয়।

কুমারপুর—বড়পীরসাহেবের মেলা ফাল্গুন মাসে বসে। এখানে মানিকপীর ও সত্যপীরও প্রতিষ্ঠিত, উৎসব হয়।

মদনপুর—অষ্টমদোল উপলক্ষে ফাল্গুন মাসে মেলা হয়।

বেজপাড়া—দোলযাত্রায় মেলা বসে।

ঘেটুগাছি—ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে অগ্রহায়ণ মাসে মেলা বসে।

শিবপুর—মাদারপীরের উরস উপলক্ষে ফাল্গুন মাসে মেলা হয়।

মথুরাগাছি—শ্রাবণসংক্রান্তি তিথিতে খেদাইতলায় মেলা বসে। 'খেদাই ঠাকুর' সর্পদেবতা হিসাবে লৌকিকভাবে পূজিত।

নেউলিয়া—রথযাত্রায় মেলা বসে।

চাকুডাঙ্গা—ক্ষেত্রপাল ও শীতলাপূজায় মেলা হয়।

শ্রীনগর—মাঘীপূর্ণিমায় গাজীপীরের মেলা বসে।

হরিণঘাটা থানা :

বিরহী—ভাইফোঁটা তিথিতে মদনগোপাল বিগ্রহের মেলা বসে।

রাজাপুর—বৈশাখ মাসের শেষে ফতেমা বিবির মেলা বসে। ভাদ্রসংক্রান্তিতে মনসাপূজা হয়, ভাসান গানের আসর বসে।

কাষ্ঠডাঙা—মানিকপীরের দরগায় মাঘ মাসে মেলা হয়।

বড়জাগুলী—বাবাঠাকুরতলায় ও পঞ্চাননতলায় বিশেষ লোকপূজানুষ্ঠান হয়।

দিঘলগ্রাম—এখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের করম পূজায় মোরগলড়াই দর্শনীয়। বদরপীরতলায় অগ্রহায়ণ মাসে উৎসব হয়।

জাহিরতলা—জাহিরপীরতলায় মেলা বসে।

মোহনপুর—শিবরাত্রি উপলক্ষে মেলা হয়।

হাঁসখালি থানা :

বাদকুল্লা—গাজন-চড়ক উপলক্ষে মেলা বসে।

মামজোয়ান—চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা ও শিবের গাজন উৎসব হয়।

হাজরাতলা—হাজরা ঠাকুরের থানে মেলা বসে গাজনের সময়।

শান্তিপুর থানা :

চরপানপাড়া—উত্তরায়ণ উপলক্ষে ১লা মাঘ গঙ্গায় পুণ্যস্নান-তর্পণাদি অনুষ্ঠান হয়, মেলা বসে।

বাগআঁচড়া—ফাল্গুন মাসে বাগ্‌দেবীপূজায় মেলা হয়।

শান্তিপুর—অদ্বৈতপ্রভুর বংশধরদের গৃহদেবতা নানা নামের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের রাসযাত্রা উৎসব বিখ্যাত, এই উপলক্ষে 'ভাঙারাসের মেলা' বসে। এখানকার ব্রহ্মাপূজা, গণেশপূজা, অন্নপূর্ণা পূজা ও রথযাত্রা অনুষ্ঠানও উল্লেখ্য। মালঞ্চ পল্লীতে বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হয় গাজী মিয়ার বিবাহের লোক-অনুষ্ঠান।

বাবলা-অদ্বৈতপাট—ফাল্গুন মাসে পঞ্চমদোল উপলক্ষে মেলা বসে।

ফুলিয়া—কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে মাঘমাসে মেলা বসে।

আড়বান্দী—ফাল্গুন মাসে ব্রহ্মাপূজায় মেলা হয়।

অবিভক্ত নদীয়া জেলার সাময়িকপত্র

বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে অবিভক্ত নদীয়া জেলা ও নদীয়াবাসীর ভূমিকা উল্লেখ্য।

নদীয়ার কাঞ্চনপল্লীর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি 'সংবাদ প্রভাকর'। কলিকাতা থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্ররূপে ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরে ১৪ জুন ১৮৩৯ থেকে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর'-ই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিকপত্র 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' আগস্ট ১৮৪৭ প্রকাশিত হয়।

নদীয়ার কাঞ্চনপল্লীর বৈদ্যকুলোদ্ভব প্রেমচাঁদ রায়ের সম্পাদনায় কলিকাতা থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ 'সম্বাদ সুধাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

নদীয়ার বিল্বগ্রামের মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রতিষ্ঠিত 'সর্ব্বশুভকরী' মাসিক পত্রিকা আগস্ট ১৮৫০ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার ছোট জাগুলী গ্রামে ১১ এপ্রিল ১৮৪৮ প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছোট জাগুলীয়া হিতৈষিসভা'। এই সভার পক্ষ থেকে এপ্রিল ১৮৫৩ 'ছোট জাগুলীয়া হিতৈষিসভার বক্তৃতা' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। অকটোবর ১৮৫৩ থেকে পত্রিকায় নামকরণ হয় 'ছোট জাগুলীয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা'। কলিকাতায় এই পত্রিকা মুদ্রিত হত।

নদীয়া জেলার কুমারখালির বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) এপ্রিল ১৮৬৩ প্রকাশ করেন মাসিক পত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা।' কলিকাতায় মুদ্রিত এই পত্রিকায় গ্রাম-নদীয়ার সংবাদ প্রায় প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হত। কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁর দিনপঞ্জীতে উল্লেখ করেছেন: 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া··· গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার কার্য্য আরম্ভ করিলাম।' নির্ভীক সাংবাদিকতা ছিল এই পত্রিকার আদর্শ। নদীয়া জেলায় নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারের মর্মস্পর্শী সংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দশ বছর পরে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে হরিনাথ স্বগ্রাম কুমারখালিতে 'মথুরানাথ যন্ত্র' নামে মুদ্রণালয় স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' প্রকাশিত হতে থাকে। পরে পত্রিকা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

শান্তিপুর শহরে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে 'কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র' নামে মুদ্রণালয় স্থাপন করেন হরলাল মৈত্র। ১৫ জুন ১৮৬৩ শান্তিপুর থেকে ঐ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'ভারত পরিদর্শন' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন যদুনাথ তর্কভূষণ। শান্তিপুর থেকে 'রঙ্গভূমি' নামে মাসিক পত্রিকা ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। শান্তিপুর থেকে ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সরোজিনী' মাসিকপত্র, সম্পাদক ছিলেন রামলাল চক্রবর্তী। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে শান্তিপুরে স্থাপিত হয় 'হিতকারী যন্ত্র' নামে মুদ্রণালয়। এখান

থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিকপত্র 'ভারতভূ ও মাসিকপত্র 'মুদ্গর' পত্রিকা দুটি সম্পাদনা করতেন শ্যামাচরণ সান্যাল।

কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ার মীর মশাররফ হোসেন প্রকাশ করেন 'আজিজন নেহার' নামে পত্রিকা ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে। তিনি 'হিতকরী' নামে পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ১৮৯০ খৃস্টাব্দে। 'হিতকরী'র পৃষ্ঠপোষক ও প্রেরণাদাতা ছিলেন কাঙ্গাল হরিনাথ। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে অনন্তপুর থেকে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নদিয়াবাসী' মাসিকপত্র।

কুমারখালি থেকে তন্ত্রসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে 'শৈবী' নামে ধর্মমূলক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কুমারখালিতে কাঙ্গাল হরিনাথ প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণালয় থেকে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে 'কোহিনুর' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়, সম্পাদক ছিলেন রওশন আলী চৌধুরী। পরে এই মুদ্রণালয় থেকে আরও একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার নাম 'বঙ্গীয় তিলিসমাজ পত্রিকা', সম্পাদক ছিলেন রাধাবিনোদ সাহা।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ থেকে যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'যুবক' মাসিকপত্র। তিনি দীর্ঘকাল এর সম্পাদক ছিলেন, পরে তাঁর পুত্রদ্বয় কল্যাণকুমার ব্রহ্মচারী ও নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সম্পাদনা করেন। নবদ্বীপ থেকে নবদ্বীপ ধর্মরক্ষিণী সভার পক্ষ থেকে ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় মাসিক ধর্মমূলক পত্রিকা 'নিত্যধর্ম'। শান্তিপুর থেকে কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় ১৯০০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'লহরী' মাসিকপত্র। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর থেকে মন্মথনাথ দাসের সম্পাদনায় 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় ১৯০৫ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর থেকে ব্রাহ্মসমাজের হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্রের সম্পাদনায় জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বাঙ্গালা' প্রকাশিত হয়।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট থানার মাঝেরগ্রামের জমিদার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় রাণাঘাট থেকে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশ করেন 'সমাজ ও সাহিত্য' নামে মাসিক পত্রিকা। কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বঙ্গরত্ন' ১ জানুয়ারি ১৯০৭। প্রতিষ্ঠাতা কানাইলাল দাস। বিগত ৮০ বছর ধরে অদ্যাবধি 'বঙ্গরত্ন' প্রকাশিত হচ্ছে। রাণাঘাটের যদুনাথের পুত্র সুকবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ১৯০৯ খৃস্টাব্দে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'বার্তাবহ', এই পত্রিকা অদ্যাবধি প্রকাশিত হচ্ছে।

বৈশাখ ১৩২০ থেকে (১৯১৩ খৃস্টাব্দ) মেহেরপুরের নিকটবর্তী দারিয়ারপুর গ্রামের 'নদীয়া সাহিত্য সম্মিলনী'-র মুখপত্ররূপে সতীশচন্দ্র বিশ্বাসের সম্পাদনায় নদীয়া জেলা বিষয়ক সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা 'সাধক' প্রকাশিত হয় এবং দুই বৎসরাধিক কাল নিয়মিতভাবে চলে।

১৯২১ খৃস্টাব্দে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জাগরণ' পত্রিকা। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হলেন জননেতা হেমন্তকুমার সরকার। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই পত্রিকার

সহ-সম্পাদক ছিলেন। চারটি পর্যায়ে 'জাগরণে'র সম্পাদক তথা পরিচালক ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার (১৯২১—১৯২৪), নিশিকান্ত পাত্র (১৯২৫—১৯৪৮), নারায়ণকৃষ্ণ মজুমদার (১৯৪৮—১৯৬৩) এবং আবদুর রশীদ চৌধুরী (১৯৬৩—১৯৬৫)। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক-রাষ্ট্রনায়ক আয়ুব-সরকারের সমালোচনার জন্য সরকার কর্তৃক 'জাগরণ' প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। 'জাগরণে'র প্রকাশকালেই কুষ্টিয়া থেকে জননেতা মৌলানা আফসারউদ্দিন আহমদের পোষকতায় ও কফিলুদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজাদ'।

১৯২২ খৃস্টাব্দে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মুখপত্ররূপে কলিকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'। সম্পাদক ছিলেন অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপদ বিদ্যারত্ন। পরে 'গৌড়ীয়' কৃষ্ণনগর ও শ্রীমায়াপুর থেকে প্রকাশিত হয়। শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠে নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস মুদ্রণালয় স্থাপিত হবার পর ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ থেকে প্রকাশিত হয় পারমার্থ দৈনিক পত্রিকা 'নদীয়াপ্রকাশ'। 'নদীয়াপ্রকাশ'-ই নদীয়া জেলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন প্রমোদভূষণ চক্রবর্তী ও অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতোমধ্যে নবদ্বীপ থেকে ১৯২২ খৃস্টাব্দে ধর্মমূলক মাসিক পত্রিকা 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ' প্রকাশিত হয়। পরে 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' ও 'গৌরাঙ্গ সেবক' নামেও দুইখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা থেকে প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বাঁশরী' ১৯২৭ খৃস্টাব্দ থেকে কৃষ্ণনগরে কবি নীহাররঞ্জন সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২৬—১৯২৮ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে 'লাঙল' পত্রিকা পরিচালনা করেন।

১৯২৮ খৃস্টাব্দে শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত হয় 'সেবা' (প্রথমে পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিক) ও 'শান্তি' (মাসিক) পত্রিকা। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে নবদ্বীপ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নবদ্বীপ পত্রিকা'। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ। ১৯২৯ খৃস্টাব্দ থেকে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'শান্তিপুর'। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক। পরিষদ ও পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রভাস রায়। তাঁর সম্পাদনায় পরিষদ 'সাহিত্য বার্ষিকী' নামে বার্ষিক সংকলনও প্রকাশ করে।

কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট আইনজীবী ও নিবেদন প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুষ্টিয়া কলেজের অধ্যক্ষ গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্মসম্পাদনায় ১৯৩০ খৃস্টাব্দে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বিপ্লবাণী'। স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রতী এই পত্রিকাকে ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করেন। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাক্ষিক পত্রিকা 'দীপিকা' প্রকাশ করেন এবং ২৫ বছর ধরে পত্রিকাটি চলে। নদীয়া জেলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পত্রিকাটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে ধর্মদহ গ্রাম থেকে উপানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধাংশুকুমার বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা

'দীপশিখা'। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনকালে কৃষ্ণনগর থেকে সাইক্লো-মুদ্রিত 'অগ্নিশিখা' প্রকাশিত হয়। অনুরূপ 'মুক্তির ডাক' পত্রিকা ১৯৪২ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হয়।

ভেড়ামারার হারিসউদ্দিনের সম্পাদনায় ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'যুগের আলো'। এই সময় চুয়াডাঙা থেকে 'মিলন', 'নবনলিনী' ও 'উষার আলো' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে রাণাঘাট থেকে নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নদীয়ার বাণী'। কবি মোহম্মদ আবুবকর সম্পাদিত পাক্ষিক সাহিত্যপত্র 'সন্ধানী' কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে। দশকাধিককাল পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে অনিলকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় শিশু ও কিশোরদের জন্য নদীয়ার প্রথম পত্রিকা 'কচিকথা'। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে (ফাল্গুন ১৩৪৭) কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'প্রাতিকা'। সম্পাদক ছিলেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে 'যুগান্তরে'র লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা)। মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কবি হেমচন্দ্র বাগচী ঘূর্ণি থেকে ১৯৪১ খৃস্টাব্দে প্রকাশ করেন মাসিক সাহিত্যপত্র 'বৈশ্বানর'। এর মাত্র চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল (বৈশাখ—শ্রাবণ ১৩৪৮)। তারাগুণিয়ার শিক্ষাব্রতী গোপীবল্লভ বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'শিক্ষকবার্তা' মাসিক পত্রিকা নদীয়া জেলার শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের প্রথম পত্রিকা।

১৯৪২ খৃস্টাব্দে নবদ্বীপ থেকে অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন মাসিক পত্রিকা 'কালের ভেরী'। খানবাহাদুর শামসুজ্জোহার সম্পাদনায় নদীয়া জেলা বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় 'নদীয়া জেলা বোর্ড' নামে পত্রিকা ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে। চারের দশকেই কৃষ্ণনগর থেকে ছাত্র ও তরুণেরা প্রকাশ করেন মাসিক পত্রিকা 'অভিযান' ও 'সংগ্রাম'। 'সংগ্রাম' দুবছর চলে, এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রগতিশীল ছাত্র-যুবকেরা।

১৮৪৬ খৃস্টাব্দে স্থাপিত কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে 'কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকা' হেমন্তকুমার সরকারের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৫-১৯১৬ খৃস্টাব্দে। অদ্যাবধি এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় বাৎসরিক সংকলনরূপে।

১৯৪৭ খৃস্টাব্দে দেশভাগের পর নদীয়া জেলা ও কুষ্টিয়া জেলা থেকে নানা সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, অধিকাংশেরই অকালমৃত্যু ঘটেছে, আবার অনেক পত্রপত্রিকা সুযোগ্য সম্পাদনায়-পরিচালনায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অবিভক্ত নদীয়া

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন-সংগ্রামে অবিভক্ত নদীয়া জেলার বিশেষ ভূমিকা আছে।

ইংরেজ শাসনকালে বারে বারে নদীয়া জেলার প্রশাসনিক পরিবর্তন করা হয়েছে। শাসনকে মজবুত করার জন্য নদীয়ায় নতুন নতুন থানা ও মহকুমা গঠন করা হয়েছে। এই অঞ্চলের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগ্রামী ভূমিকার জন্যই প্রশাসনিক কারণে এই পরিবর্তন করা হয়েছিল।

ওয়াহাবী আন্দোলনে নদীয়ার বীর কৃষকনেতা তিতুমীর এক অবিস্মরণীয় নাম, ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে ১৯ নভেম্বর ১৮৩০ তিনি শহীদ হন। কুমারখালির নিকটবর্তী দুর্গাপুর গ্রামের কাজী মিয়াজানও ছিলেন ওয়াহাবী আন্দোলনের এক নেতা। ধৃত হয়ে আম্বালা জেলে কারানির্যাতন ভোগকালে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফারায়েজী আন্দোলনেও এই অঞ্চলের মানুষের ভূমিকা ছিল।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়ার বিরহামপুরের দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল বলে তৎকালীন বাংলার ছোটলাট স্যার এম. জে. হ্যালিডে প্রেরিত প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনকারী সিপাহীদের খুঁজে বের করে প্রকাশ্যে গুলি করে মারা হয়। বিদ্রোহী সিপাহীদের আশ্রয়দানের জন্যও গ্রামবাসীরা ভোগ করে চরম নির্যাতন।

নদীয়ায় ইংরেজ কুঠিয়ালদের নীলচাষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক সকরুণ রক্তাক্ত ইতিহাস। ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে লুই বন্নো নামে ফরাসী যুবক বাংলায় প্রথম নীলচাষের সূচনা করে। বিগত শতকের সূচনা থেকে অবিভক্ত নদীয়া জেলায় নীলচাষ শুরু হয়, স্থাপিত হয় অসংখ্য নীলকুঠি। নীলচাষে এক বিঘা জমিতে সেকালে ব্যয় হত বারো টাকা, অথচ, চাষীরা ইংরেজ-কুঠিয়ালদের কাছ থেকে পেত মাত্র তিন টাকা। ফলে, নীলচাষ ছিল চাষীদের কাছে আত্মঘাতী ব্যাপার। কুঠিয়াল ও তাদের কর্মচারীরা চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে নীলচাষে বাধ্য করাত। নদীয়ায় নীল ছিল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। তাই, নদীয়া জেলায় বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর চারটি বৃহৎ কারবার (কনসার্ন নামে পরিচিত) ছিল। নদীয়ার সিন্দুরিয়া ও খালবোয়ালিয়ায় সর্ববৃহৎ কারবার ছিল। সমগ্র নদীয়া জেলায় ১৭,৬০০ বিঘা জমিতে বছরে ৭০০ মন নীল উৎপন্ন হত। নীলকর সাহেবরা চাষীদের জমি বলপূর্বক দখল করে দাদন লিখিয়ে নিয়ে সামান্য অর্থ দিয়ে বা কোন অর্থ না দিয়ে চাষীদের নীলচাষ করাত। অবাধ্য হলে তাদের হত্যা পর্যন্ত করা হত। নীলকরদের অত্যাচার-অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চাষীরা জোট বাঁধে ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে নীলচাষীদের

আন্দোলন ব্যাপক বিদ্রোহের রূপ নেয়। নীলবিদ্রোহে নদীয়ার নীলচাষীদের ভূমিকা গৌরবমণ্ডিত। আন্দোলনের ফলে সরকার নীল কমিশন গঠনে বাধ্য হন। ১৮ মে ১৮৬০ তারিখে কৃষ্ণনগরে ডবলিউ. এস. সিটনকারের সভাপতিত্বে নীল কমিশনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন তিনমাস ধরে মোট ১৩৪জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তার মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নদীয়ার মানুষ। নদীয়ার মোল্লাহাটি নীল কনসার্নের নীলকর কেন্ডীর অত্যাচারের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন কালজয়ী উদ্দীপক নাটক —'নীলদর্পণ'। নীলবিদ্রোহে নদীয়ার বীর কৃষকনেতা বিশ্বনাথ, মেঘাই সর্দার, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের নাম উল্লেখ্য।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে গোলাপটির মহিষমর্দিনীপূজায় (১৩. ৭. ১৮৮৬) ছাত্র-পুলিশের সংঘর্ষের পরিণামে অনুষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম ছাত্রমামলা 'Trial of the Krishnanagar Students, 1884.' এই মামলায় সেকালের প্রখ্যাত আইনজীবী মনোমোহন ঘোষ ছাত্রদের পক্ষে ছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র নগেন্দ্রনাথ মজুমদার সহ ২৫ জন ছাত্র ছিলেন আসামী এবং সকলেই বেকসুর মুক্ত হন, ও নির্দোষ সাব্যস্ত হন। বিচারক ছিলেন পি. এইচ. ওব্রায়েন।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে নদীয়ার প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন কৃষ্ণনগরের তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনিই নদীয়ায় কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তোলেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। আন্দোলনের জন্য তিনি কুড়ি হাজার টাকার তহবিল গঠন করে ব্যয় করেছিলেন। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে তিনি এক জনসভার আয়োজন করেন। এই সভায় ভাষণ দেন সেকালের প্রখ্যাত জননেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

নদীয়ায় ব্যাপক স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশীদ্রব্য বর্জন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনধর্মী আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের স্বদেশপ্রাণ মৃত্যুঞ্জয়ী বীর তরুণ যুব-সম্প্রদায় গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির মাধ্যমে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পথে দেশের মুক্তি আন্দোলনে ব্রতী হন। নদীয়ার রায়তা গ্রামে ২৯ নভেম্বর ১৯০৮ তারিখে হয় স্বদেশী ডাকাতি। এই ডাকাতিতে ১৯১৫ টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। অনুরূপ ২৮ অকটোবর ১৯০৯ তারিখে নদীয়ার হলুদবাড়ি গ্রামে ডাকাতিতে ১৪০০ টাকা এবং ৩০ এপ্রিল ১৯১৫ তারিখে নদীয়ার প্রাগপুর গ্রামে ডাকাতিতে ২৭০০ টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ তারিখে নদীয়ার শিবপুর গ্রামে ডাকাতিতে ২০,৭০০ টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। এই ডাকাতিতে একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় নরেন্দ্রনাথ ঘোষচৌধুরী সহ নয়জন বিপ্লবী ধৃত ও দণ্ডিত হন।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতীরবর্তী কয়া গ্রামের 'বাঘাযতীন' যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বাধীনতার জন্য ওড়িষ্যার বুড়ীবালাম নদীর তীরে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ শহীদত্ব বরণ করেন। নদীয়ার খোকসা থানার কমলাপুর গ্রামের জ্যোতিষচন্দ্র

পাল ছিলেন তাঁর সহযোগী, ধৃত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডভোগকালে ১৯২৪ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বাঘাযতীনের অপর সহকর্মী ছিলেন নদীয়ার অতুলকৃষ্ণ বসু।

১৯২০-২১ খৃস্টাব্দে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে কৃষ্ণনগরের হেমন্তকুমার সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ত্যাগ করে কলিকাতায় বেআইনী ঘোষিত বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী হন ও কারাবরণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে নদীয়ার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন। জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে জনসভায় বক্তৃতা করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস পরে স্বরাজ্য দল গঠন করলে নদীয়ায় তার ঢেউ এসে লাগে। ২২-২৩ মে ১৯২৬ কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সভাপতিত্বে। ঐ সঙ্গে ছাত্র সম্মেলন ও যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সরোজিনী নাইডু ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সম্মেলনের আগে ৭-৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন।

কৃষ্ণনগরের অনন্তহরি মিত্র ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ১৬ জুলাই ১৯২৬ কৃষ্ণনগর ডাকঘরের ঘোড়ার গাড়ির ডাক নবদ্বীপের পথে বিপ্লবীরা লুণ্ঠন করেন। অনন্তহরির কৃষ্ণনগরের সহবিপ্লবীরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামী অনন্তহরি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ ফাঁসীতে মৃত্যুবরণ করেন।

১০ মার্চ ১৯৩১ বিপ্লবীরা কৃষ্ণনগরে জেলা পুলিশ সুপারের ভবনে, কোতোয়ালী থানায় ও জেলা গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ-ইন্সপেকটরের বাড়িতে বোমা ফেলে। অনেকেই ধৃত হন পরে এবং কারা ও নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেন। কৃষ্ণনগর বোমার মামলার রায় প্রকাশের দিন কৃষ্ণনগরে সুভাষচন্দ্র বসুসহ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কে. এফ. নরিম্যান ও এম. এস. আনে প্রমুখের উপস্থিতিতে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীকালে তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মীদের নেতৃত্বে নদীয়া জেলায় কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভোগ করেন কারাদণ্ড সহ নানা নির্যাতন।

১৯৪২ সালের ভারত-ছাড় আন্দোলনও নদীয়া জেলার নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনে নদীয়ার ছাত্র-যুবদের ভূমিকাও উল্লেখ্য।

কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া নাম কষ্টা বা পাট থেকে হয়েছে বলে অনুমিত হয়। (Costah—পাটনাম বিশেষ। দ্র. N. Ahmed—Economic Geography of East Pakistan, P. 87.)

সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন : 'কুষ্টিয়া জেলার প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে কুষ্টিয়ার অধিপতি ছিলেন বিদ্রোহী মোগল সেনাপতি মাসুম খান কাবুলী। তিনি ঈশা খান, উসমান ইত্যাদি বারভূঁইয়ার সঙ্গে মিলিত হন। তিনি নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ বলে ফরমানে উল্লেখ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মির্জা মুনীম ফতেহাবাদের (বর্তমানে ফরিদপুর) জমিদার মজলিশ কুতুবের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মোগল সেনাপতি শেখ হবিবুল্লা মির্জা মুনীম ও মজলিশ কুতুবকে পরাজিত করে কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। মোগল আমলে কুষ্টিয়া ছিল সরকার ফতেহাবাদ ও সরকার ভূষণার (যশোহর) অন্তর্গত।'

কুষ্টিয়া জেলা (মেহেরপুরের কিছু অংশ ভিন্ন) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে রাজশাহী জেলাভুক্ত ছিল। পরে ১৮২৮ খৃস্টাব্দে পাবনা জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

দেশ স্বাধীন (১৯৪৭) হবার আগে কুষ্টিয়া আলাদা জেলা ছিল না। অবিভক্ত নদীয়া জেলার সদর ও রাণাঘাট মহকুমা নিয়ে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নবদ্বীপ জেলা গঠিত হয় এবং কুষ্টিয়া অংশের মেহেরপুর মহকুমার করিমপুর ও তেহট্ট থানা নবদ্বীপ জেলার সদর মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয়। অবিভক্ত নদীয়া জেলার আয়তন ছিল ২৮৪১ বর্গমাইল ও ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল সতেরো লক্ষ উনষাট হাজার।

১৯৪৭ খৃস্টাব্দে অবিভক্ত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমা, চুয়াডাঙা মহকুমা ও মেহেরপুর মহকুমা (করিমপুর ও তেহট্ট থানা বাদে) নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত কুষ্টিয়া জেলা গঠিত হয়।

১৯৪৮ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ জেলার নদীয়া জেলা এবং পূর্ব পাকিস্তানের নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া জেলা নামকরণ হয়। কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলার সদর, কুষ্টিয়ায় কুষ্টিয়া জেলার সদর হয়।

১৯৭১ খৃস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হলে কুষ্টিয়া জেলা তার অঙ্গীভূত একটি জেলায় পরিণত হয়। ২৪ মার্চ ১৯৮৪ কুষ্টিয়া তিনটি জেলায় বিভক্ত হয়—পূর্বতন মহকুমা তিনটি পৃথক তিনটি জেলায়

পরিণত হয় : কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা ও মেহেরপুর জেলা। আবার পূর্বতন থানাগুলি উল্লিখিত তিনটি জেলার মধ্যে উপজেলায় পরিণত হয়। জেলা ও উপজেলা বিন্যাস এইরকম : কুষ্টিয়া জেলা (কুষ্টিয়া, দৌলতপুর, ভেড়ামারা, মীরপুর, কুমারখালি ও খোকসা উপজেলা), চুয়াডাঙা জেলা (আলমডাঙা, দামুরহুদা, জীবননগর ও চুয়াডাঙা উপজেলা) ও মেহেরপুর জেলা (মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলা)।

বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার (চুয়াডাঙা ও মেহেরপুর জেলা সহ) আয়তন ১৩৪২ বর্গমাইল (৩৪৭৬ বর্গকিলোমিটার)। মোট ১২টি থানা (উপজেলা), মোট ইউনিয়ন ১০৭, মোট গ্রাম ১৬৭৩। ১৯৮১র জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা—২২,৭২,৯১২ জন। ১৯৭১ খৃস্টাব্দের জনগণনা (বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের জন্য ১৯৭৪ খৃস্টাব্দে পরিসংখ্যান গৃহীত হয়) অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলার জনবিন্যাস :

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
মোট জনসংখ্যা	১, ৮,৮৩, ৬৩৫	৯, ৭১, ০৪১	৯, ১২, ৫৯৪
গ্রাম এলাকায়	১, ৭২৭১৮২	৮৮৮৬২৬	৮৩৮৪৮৬
শহর এলাকায়	১, ৫৬, ৪৫৩	৮২, ৩৫৪	৭৪, ১০৮

সাক্ষরতার হার :

	মোট সাক্ষর	পুরুষ	মহিলা
মোট সাক্ষর জনসংখ্যা	১৮·৭০ %	২৪·৮৭	১২·০৬
গ্রাম এলাকায়	১৬·৩২ %	২২·২১	৯·৯৭
শহর এলাকায়	৪৪·২৬ %	৫২·৪৭	৩৫·০৫

অবস্থান : কুষ্টিয়া জেলা ২৩°২৯' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°১৩° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°৩৪° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯°২২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থান করে।

কুষ্টিয়া জেলার নদী : পদ্মা, গড়াই, কুমার, ভৈরব, মাথাভাঙা, নবগঙ্গা, কালীগঙ্গা, ডাকো, হিসনা, মরা গড়াই, ভাইমারা, ছেটো, মড়কা ও কোল (ডামোশ)।

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প : কুষ্টিয়া (ও যশোহর) জেলার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং আর্থিক সচ্ছলতা আনবার জন্য ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প গৃহীত হয়। বাংলাদেশে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে জলসেচের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রথম প্রয়াস—গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প। জলসেচ, নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এই ত্রিমুখী পরিকল্পনা নিয়ে এই প্রকল্পের রূপায়ণ। প্রথম পর্যায়ে উত্তরে পদ্মা-গড়াই, পূর্বে গড়াই-মধুমতী ও দক্ষিণে নবগঙ্গা-মাথাভাঙা নদী নানা খাল-নালায় সংযুক্ত করা হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্গত খাল-নালা কুমার-কপোতাক্ষ নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। প্রায় দশলক্ষ একর পরিমিত জমি এই প্রকল্পভুক্ত।

কুষ্টিয়া (চুয়াডাঙা ও মেহেরপুর জেলাসহ) জেলার শিক্ষা পরিসংখ্যান :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯৬ (গ্রাম ২৩৬ + শহর ৬০)। প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা গ্রাম ২১০০০০ জন + শহর ২৫০০০ জন; মোট ২৩৫০০০ জন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ২১৬ (গ্রাম ১৭৭ + শহর ৩৯) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা গ্রাম ৫১০০০ জন + সহর ৫০০০ জন; মোট ৫৬০০০ জন।

মহাবিদ্যালয় সংখ্যা ১৩।

১৯৮১র জনগণনা অনুযায়ী সাক্ষরতার হার: পুরুষ ১৮'৮, মহিলা ৯'৪, মোট ১৪'৩ শতাংশ।

দেশবিভাগ: ৩০ জুন ১৯৪৭ ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা কমিশন গঠন করেন। অবিভক্ত বঙ্গ বিভাগের জন্য বেঙ্গল বাউণ্ডারী কমিশন গঠিত হয়, তার সদস্য ছিলেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ (চেয়ারম্যান), ভারতের পক্ষে বিচারপতি বি. কে. মুখার্জী ও সি. সি. বিশ্বাস এবং পাকিস্তানের পক্ষে বিচারপতি আবু সালেহ মহম্মদ আকরাম ও এস. এ. রহমান। দেশভাগ ও স্বাধীনতা ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে হলেও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষিত হয় ১৬ আগস্ট ১৯৪৭। তার ফলে অবিভক্ত নদীয়া জেলা বিভক্ত হয়। একাংশ ভারত ও অপর অংশ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানভুক্ত হয়। সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য যে ট্রাইবুনাল গঠিত হয়, তার সদস্য ছিলেন আলগট ব্যাগী (চেয়ারম্যান), বিচারপতি চন্দ্রশেখর আয়ার (ভারত) ও শাহাবুদ্দিন (পাকিস্তান)। ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ ব্যাগী কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় এবং নদীয়া-কুষ্টিয়া জেলার সীমানা চিহ্নিত হয়।

কুষ্টিয়া জেলার পুরাকীর্তি

চুয়াডাঙা ও মেহেরপুর জেলাসহ বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় ইতিহাস-পূর্বযুগের ও প্রাক্‌হিন্দুবৌদ্ধযুগের কোনও প্রত্ন-নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। হিন্দু-বৌদ্ধযুগের পুরাকীর্তি-সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলও নেই বললেই চলে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে এ অঞ্চলের নানা স্থানে পাল-সেন যুগের প্রস্তর-ধাতব অখণ্ড ও ভগ্ন-ভগ্নাংশ মূর্তি ও অন্যান্য ভাস্কর্য-নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেলার সদর মেহেরপুর পৌরশহর থেকে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে ভারতভুক্ত নদীয়া জেলার সীমান্তের পূর্বদিকে অবস্থিত আমদহ গ্রামের স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ হিন্দু বা বৌদ্ধযুগীয় বলে 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ'-লেখক আবুল কালাম

মোহাম্মদ যাকারিয়া মনে করেন। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ ও প্রায় আধ মাইল প্রস্থবিশিষ্ট আয়তাকার এই প্রত্নস্থলে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। পশ্চিমে প্রাচীন নদীখাত, একদা এই নদী বহতা ছিল। প্রত্নস্থলের চারদিকেই একসময় পরিখা ছিল। পরিখার পর প্রাচীর-বেষ্টনী ছিল না। বর্তমানে এই প্রত্নস্থল চাষের জমিতে পরিণত। চাষের ফলে অসংখ্য পোড়ামাটির টালি ইট ও ইটের ভগ্নাংশ জমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বেশ বোঝা যায় যে এখানে পোড়ামাটির ইটের তৈরি সুবিশাল গঠনস্থাপত্য ছিল। কিন্তু গঠনস্থাপত্যের শৈলী বা চরিত্র আজ আর বোঝবার উপায় নেই। সমগ্র এলাকায় ৯টি ছোটবড় ঢিপি আছে। এই ঢিপিগুলি প্রত্ন-বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উৎখনিত হলে এই প্রত্নস্থলের জন-ইতিহাস-সংস্কৃতিধারার রহস্য উন্মোচিত হতে পারে। এখানে ছোটবড় প্রস্তরখণ্ডও বর্তমান। ঢিপিগুলির উত্তরদিকে, উত্তরদিকের পরিখার বাইরে উঁচু স্থানে কয়েকখণ্ড পাথর আছে। নিঃসন্দেহে এই প্রস্তরখণ্ডগুলি প্রাচীন সৌধের স্তম্ভবিশেষ। এই প্রত্নস্থল থেকে সংগৃহীত অনুরূপ একটি কারুকার্যমণ্ডিত ৬ ফুট দৈর্ঘের ও ১২ ইঞ্চি প্রস্থের চারকোণা প্রস্তরস্তম্ভ এখন মেহেরপুর জেলাপ্রশাসকের আবাসভবনের চত্বরে উদ্যানে প্রোথিত আছে। সমগ্র প্রত্নস্থলে অসংখ্য পোড়ামাটির মৃৎপাত্রের ভগ্ন নিদর্শন আছে। এখানকার পোড়ামাটির টালি ইটের গঠন—৮´´ × ৮´´ × ২´´। এই ইটের প্রাধান্য থাকলেও এই পরিমাপের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারেরও ইট আছে। এখানে কোনও লিপি-লেখ পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতি যে এখান থেকে অনেকে মুদ্রা পেয়েছেন।

প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় না যে এই প্রত্নস্থলে বৌদ্ধস্তূপ সমাহিত ছিল। 'সাধক' মাসিকপত্রের বৈশাখ ১৩২০ (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) সংখ্যায় আমদহের উল্লিখিত ধ্বংসাবশেষকে গোয়ালা-চৌধুরীদের বর্গীর অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসগৃহ বলে লেখা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলার খোকশা থানার খোকশা-জানিপুরের কালীবাড়ি বিগত শতকের শেষার্ধে নির্মিত। কালীবাড়িতে মন্দিরচত্বরে কালো রঙের স্তম্ভবিশেষ প্রস্তরখণ্ড আছে। জনশ্রুতি যে এই প্রস্তরখণ্ড নলডাঙার রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় গড়াই নদীতে প্রাপ্ত হন। কারুকার্যমণ্ডিত এই স্তম্ভটি পাল-আমলের নিদর্শন বলে অনুমিত।

কুষ্টিয়া জেলার অধিকাংশ পুরাকীর্তিই মুসলমান যুগে ও তৎপরবর্তীকালে নির্মিত।

মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর পৌরশহর থেকে ১০ মাইল দক্ষিণে পাকা সড়কপথে কেদারগঞ্জের মোড়, সেখান থেকে কাঁচা সড়কপথে কিছুদূরে বল্লভপুর গ্রাম। আমদহ থেকে দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামে ১৬০৬-১৬০৭ খৃস্টাব্দে নদীয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার সাতটি শিবমন্দির ও তার কাছেই রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। ১৭২৮ খৃস্টাব্দে লিখিত 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতং' পুঁথিতে আছে: '...বল্লভপুরনামনগরে পুরীং নির্মায়...।' এ গ্রামের মাঝপাড়ায় প্রায় এক বিঘা পরিমিত অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে সাতটি মন্দির ছিল। এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং জঙ্গলাকীর্ণ।

পোড়ামাটির টালি ইটের স্তূপে স্থানটি পরিপূর্ণ। একদা প্রাচীর-বেষ্টনী ছিল, এখন নেই। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া লিখিত 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে লেখা হয়েছে: 'মাঝখানে ছিল কেন্দ্রীয় মন্দির। কেন্দ্রীয় মন্দিরের দক্ষিণ দিকে এক সারিতে ছিল ৩টি মন্দির, পশ্চিমদিকে এক সারিতে ছিল ২টি মন্দির এবং উত্তরদিকে ছিল লম্বাটে ধরণের একটি ইমারত। কেন্দ্রীয় মন্দির সহ এখানে মোট সাতটি মন্দির ছিল। কেন্দ্রীয় মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বড়। মন্দিরটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে এর আকার ও আয়তন সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তার উপর এর মধ্যে গজিয়েছে কাঁটালতা ও ঝাড়-জঙ্গল। তবে যতটুকু ধারণা হয়, বর্গাকৃতি এ মন্দিরের আয়তন ছিল প্রায় ১৬×১৬ ফুট। দেওয়ালগুলি ছিল প্রায় ৩½ ফুট প্রশস্ত। বর্গাকারে নির্মিত গর্ভগৃহের ভিতরের আয়তন ছিল প্রায় ৫×৫ ফুট। এর চারদিকে ছিল বারান্দা। গর্ভগৃহের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ ছিল। উত্তর দিক বন্ধ ছিল এবং সেখানেই ছিল খুব সম্ভব কুলঙ্গীর মধ্যে বিগ্রহের অবস্থানস্থল। ...এটি ছিল খুব সম্ভব একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহের উপরে যে চূড়াটি আছে, তা প্রায় ২০ ফুট উঁচু।'

এই বিবরণের সঙ্গে আমি একমত পোষণ করছি না। গত ১০ মে ১৯৮৬ এই প্রত্নস্থলে আমি সরজমিন অনুসন্ধান করি। বাংলা চালারীতির নানা শৈলীর মন্দিরের ছবি নিয়ে গিয়ে স্থানীয় প্রবীণ অধিবাসীদের দেখাই, সকলেই চারচালা মন্দিরের ছবি দেখে নির্দ্বিধভাবে বলেন যে বল্লভপুরের মন্দিরগুলি অনুরূপ ছিল। বর্তমানে মন্দিরগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এমনকি ভিত্তিভূমির ইটও তুলে নেওয়া হয়েছে। মন্দিরগুলির বাইরের দেওয়াল পোড়ামাটির নানা মূর্তি ও অলঙ্করণে মণ্ডিত ছিল—সে তথ্যও স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা গেল। 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস'-প্রণেতা শ. ম. শওকত আলী লিখেছেন: 'বল্লভপুর মন্দির নানা আকারের টেরাকোটা ইট দ্বারা তৈরী। অধিকাংশ ইটে সিংহ, বাঘ, ঘোড়া, হাতি প্রভৃতি জীবজন্তু এবং পদ্ম নৃত্যরতা যুবতী প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত।' সুতরাং এই মন্দিরগুলি 'প্রাক্-মুসলিম যুগে নির্মিত বৌদ্ধমন্দির' নয়, নদীয়ারাজ ভবানন্দ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত ১৬০৬-৭ খৃস্টাব্দে নির্মিত পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত চারচালা শিবমন্দির। এই মন্দিরগুলি 'নাথযোগী সম্প্রদায়ের উপাসনালয়'ও নয়। স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন যে প্রত্যেকটি মন্দিরেই ত্রিশূল ছিল শিখরদেশে, সুতরাং মন্দিরগুলি নিঃসন্দেহে ছিল শিবমন্দির।

বল্লভপুর গ্রামে আছে একটি গির্জা। উনিশ শতকের সূচনায় এই অঞ্চলে খৃস্টীয় মিশনের কর্মধারা শুরু হয়। বল্লভপুর, ভবেরপাড়া ও রতনপুর গ্রামে গির্জা আছে এবং এই অঞ্চলে খৃস্টান অধিবাসীদের বসবাস। বল্লভপুর গির্জার সামনেই আছে মিশনের পাদরি হেনরি উইলিয়ামসের সমাধি। সমাধিতে উৎকীর্ণ ইংরেজি লিপি: 'In the memory/of/Henry Williams/A servant of Jesus Christ/and brother of the Bengali people/Fell asleep 24th May 1890/Where I am there

shall also my servant me/ O Death where is thy sting ?' অন্যদিকে বাংলা লিপি : 'যীশুখ্রীষ্টের দাস / ও বাঙ্গালী দিগের ভ্রাতা / পাদ্রী হেনরি উইলিয়মসের/ স্মরণার্থ / ১৮৯০, ২৪শে মে তিনি / প্রভুতে নিদ্রিত হন / আমি যে স্থানে থাকি / আমার পরিচারকও সেইস্থানে থাকিবে / হে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায় ?'

বল্লভপুর গ্রামের দক্ষিণে কিছুদূরে বাগোয়ান গ্রাম। মোগল আমলে বাগোয়ান প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল। ডক্টর ইরফান হাবিব কৃত 'An Atlas of Mughal Empire —Political and Economic Maps with detailed notes, bibliography and Index' গ্রন্থে বাগোয়ান সম্পর্কিত তথ্য আছে। বাগোয়ানেই ছিল 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি চরিতং'-এ উল্লিখিত হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের জমিদারী ও আবাসভবন। মোগলসেনাদের হাতে নিহত বিদ্রোহী জমিদার কাশীনাথ রায়ের বিধবা ও সন্তানসম্ভবা পত্নী বাগোয়ান গ্রামেই নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। কাশীনাথের পুত্র রামচন্দ্র হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের গৃহে পুত্রবৎ পালিত হন, সে কারণে তিনি হলেন রামচন্দ্র সমাদ্দার। রামচন্দ্রের পুত্র দুর্গাদাস সমাদ্দার, তিনিই পরবর্তীকালে মোগল-অনুগ্রহে নদীয়ারাজ হন এবং নাম হয় ভবানন্দ মজুমদার। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা সকলেই কাশীনাথ রায়ের উপাধি অনুসারে রায় উপাধি গ্রহণ করেন।

আবুল কালাম মোহম্মদ যাকারিয়া বাগোয়ান সম্পর্কে তাঁর 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে লিখেছেন : '...একটি প্রাচীন দিঘি আছে। দিঘির ঘাট বাঁধান ছিল, দিঘির পূর্ব তীরে প্রাচীর বেষ্টিত একটি উঁচু স্থানে এককালে একটি বিরাট আকারের বসত বাড়ি ছিল। এটি কোন সময়ের, তা বলা কঠিন। এই ধ্বংসাবশেষের কিছু দক্ষিণ পূর্বদিকে একটি একক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। খুব সম্ভব পূর্বোক্ত মন্দিরগুলির সমসাময়িক ছিল। খোলা মাঠের উপরে অবস্থিত এ মন্দির। এটি কোন মঠও হতে পারে।'

বিগত ১০ মে ১৯৮৬ এই বাগোয়ান প্রত্নস্থল সরজমিন অনুসন্ধানে আমি মন্দিরটির কাঠামো অক্ষত অবস্থায় দেখেছি। আটচালা ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির। মাথায় ত্রিশূল আছে, তাতেই প্রমাণিত হয় যে মন্দিরটি ছিল শিবের। শিবলিঙ্গ নেই। পরিত্যক্ত মন্দির। মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির ভাস্কর্য এখন আর নেই। তবে বাঁকানো কার্নিশের নিচে পোড়ামাটির অলঙ্করণ এখনও বর্তমান। এই মন্দিরটি নিঃসন্দেহে ১৬০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে বাগোয়ানের জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার নির্মিত। এই মন্দির কোনও মঠ বা বিহার নয়। কাছেই হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বসতবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। তবে ভবানন্দ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত জনপদ ভবানন্দপুরে নদীয়ারাজ-পরিবারের আবাসগৃহাদি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন।

মেহেরপুর শহর থেকে মুজিবনগর পর্যন্ত এখন পাকা সড়ক, বাস যাতায়াত করে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সীমান্তস্থিত বৈদ্যনাথতলায় ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে আম্রবাগানের তলায় এক প্রকাশ্য জনসভায় ও দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে

ঘোষিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের জন্ম এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাকিস্তানে করাচীতে আটক ছিলেন। শেখ মুজিবকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। বৈদ্যনাথতলার নব নামকরণ হয় মুজিবনগর।

২৩ জুন ১৭৫৭ নদীয়া জেলার পলাশীর আমবাগানে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়, আবার ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ নদীয়ার (অবিভক্ত) বৈদ্যনাথতলা-মুজিবনগরের আমবাগানে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুজিবনগরে স্মৃতিস্মারক নির্মীয়মাণ।

মেহেরপুর শহর থেকে মুজিবনগর আসার পথে পাকা সড়ক-সংলগ্ন গ্রাম দারিয়ারপুর। এই গ্রামেই ১ বৈশাখ ১৩১৯ সালে হীরালাল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে গঠিত হয় 'নদীয়া সাহিত্য সম্মিলনী'। সম্মিলনী ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশ করে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সাধক' এবং দুইবছর নিয়মিতভাবে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস এবং 'নদীয়া সাহিত্য সম্মিলনী'র সম্পাদক ছিলেন যতীশচন্দ্র বিশ্বাস।

মেহেরপুর শহরের মালোপাড়ায় ভৈরবনদীর তীরে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত নববৈষ্ণবধর্ম বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের লৌকিক উপশাখা বা গৌণ লোকধর্ম বলরামী সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের গোড়ায় এই লোকধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। বলরাম হাড়ি প্রবর্তিত এই লোকধর্মে সমসময় তথাকথিত নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক মানুষ আকৃষ্ট হয়ে দীক্ষিত হন। 'Hindu Castes and Sects' (1896) গ্রন্থে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রদত্ত তথ্য জানা যায় যে এই লোকধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার। এই লোকধর্ম বংশানুক্রমিক নয়। দীক্ষিত না হলে এই লোকধর্মাবলম্বী হওয়া যায় না। বলা হাড়ির কাল আনুমানিক ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ খৃস্টাব্দ। তাঁর প্রকৃতি (বা স্ত্রী বা শিষ্যা) হলেন ব্রহ্মমালোনী (বা ব্রহ্মময়ী বা হামবড়ি)। 'হাড়ি' শব্দটি বলরামীদের মতে কোনও বর্ণ নয়, বলরাম হাড়ের সৃষ্টি করেছেন—এ কারণে হাড়ি। ভক্তের কাছে তিনি ঈশ্বর। হাড়িরাম বা বলরামী তত্ত্ব তাঁদের গানে প্রকাশিত। বলরামীরা মনে করেন যে বলরাম পূর্ণব্রহ্মসনাতন। রবীন্দ্রনাথের 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে' গানের 'কোন্ বলরামের আমি চেলা' শব্দের উদ্দিষ্ট বলরাম হাড়ির শিষ্য। মেহেরপুরের জমিদার জীবন মুখুজ্যে প্রদত্ত বলরামের নামে উল্লিখিত জমির পরিমাণ ৩৫ শতক (১৯২৩ দাগ, মেহেরপুর মৌজা); এখানে আছে বলরামের সমাধিমন্দির, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। সাধারণ অলংকরণহীন আটচালা সিমেন্টে তৈরি সমাধিমন্দির, মেঝে পাকা নয়। ১৫ ফুট × ১৫ ফুট বর্গাকার; গর্ভগৃহের আয়তন ৮ ফুট × ৮ ফুট। এখানে বারুণী তিথিতে প্রতিবছর মেলা বসে, বলরামের উৎসব হয়। দুই বাংলার বলরামী সম্প্রদায়ের সমাবেশ হয়। সংলগ্ন পাকা দালানমন্দিরের ছাদ ধ্বসে গেছে। চারপাশে চালাঘরে বলরামীদের বসবাস। তাঁদের

জীবিকা ভৈরব নদীতে মাছধরা। বলরামের পাদুকা আজ আর সেখানে নেই। সর্বশেষ পাদুকা-সেবাইত বৃন্দাবন হালদার ১৯৮৫ খৃস্টাব্দে ৮০ বছর বয়সে গত হয়েছেন।

কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া-কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত ও কুষ্টিয়া পৌরশহরের সন্নিকটস্থ বারাদী গ্রামে পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত একটি চারচালা মন্দির জীর্ণ অবস্থায় এখনও বিদ্যমান, তবে পরিত্যক্ত। শীর্ষে ত্রিশূল ছিল। মন্দিরের বিগ্রহ শিবলিঙ্গ বর্তমানে নেই। প্রবেশদ্বারের উপরে এক জোড়া বিশাল নরসিংহ (ঘোড়াদাবা সিংহ) পরস্পর মুখোমুখি উৎকীর্ণ। বাংলার অন্য কোনও মন্দিরে এই ধরনের ভাস্কর্য নেই। প্রবেশদ্বারের উপরে বাঁকানো কার্নিশের নিচে দুই সারিতে ১৫টি করে মোট ৩০টি কুলুঙ্গিতে পোড়ামাটির মূর্তি-ভাস্কর্য। নিচে দুই পাশে ৮টি করে মোট ১৬টি মূর্তি-ভাস্কর্য। রামায়ণীয়, পৌরাণিক, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার প্রভৃতি ধর্মীয় দৃশ্য ছাড়া সামাজিক দৃশ্য ও পশুপাখি উৎকীর্ণ আছে মূর্তিগুলিতে। সাহেব-মেম ও তাদের শিকার দৃশ্যও আছে। কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় স্থাপনকাল ও স্থাপয়িতার নাম জানা যায় না। তবে, ভাস্কর্যশৈলী দেখে অনুমিত হয় যে মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের শেষে বা উনবিংশ শতকের সূচনায় নির্মিত। অবিলম্বে মন্দিরটি সংস্কৃত ও সংরক্ষিত না হলে অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হবে।

এ গ্রামে জগমোহন বিগ্রহের দালানমন্দির আছে। মন্দিরগাত্রে মার্বেল পাথরের দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে মন্দিরটি নির্মিত।

নিকটবর্তী গ্রাম যোগীয়া বা যুগীয়া। তাঁতী কারিগরদের বসবাস। একদা এখানে নাথযোগীদের কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়।

কুষ্টিয়া জেলার সদর-কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত ও কুষ্টিয়া শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে (হালসা রেলস্টেশন থেকে চার মাইল দক্ষিণে) অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম—গোসাঁই (গোস্বামী)-দুর্গাপুর। এখানে ছিল পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত একটি জোড়বাংলা মন্দির। পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠাফলকের পাঠ :

কালাঙ্কবাণেন্দুমিতেশকাব্দকে জ্যৈষ্ঠে শুভেমা / সি স্তনির্ম্মলাশয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণরায়ঃ শুভসৌধ / মন্দিরম্ মুক্ত রাধারমণায়সন্দদৌ ॥ ১৫৯৬ ॥

বাংলা অনুবাদ : ১৫৯৬ শকাব্দে শুভ জ্যৈষ্ঠ মাসে শুভ আশায় শ্রীকৃষ্ণ রায় শুভ সৌধমন্দির রাধারমণকে প্রদান করে উন্মুক্ত করলেন।

[কাল ৬, অঙ্ক ৯, বাণ ৫ ও ইন্দু ১ ধরে অঙ্কের বামাগতি অনুযায়ী ১৫৯৬ শক অর্থাৎ ১৬৭৪ খৃস্টাব্দ।]

এই মন্দিরে আরও একটি পোড়ামাটির লিপি নিবদ্ধ ছিল, তার পাঠ : শক ১৫৯৬ প্রবসতি / শ্রী শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মাণং···তিঃ।

মন্দির প্রতিষ্ঠাফলক অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ রায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও জনবসতির পত্তন করেন। নদীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায়। তিনি

১৬৭৭ খৃস্টাব্দের সমসাময়িককালের। আমাদের অনুমান যে তিনিই এই মন্দির ও জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু জনশ্রুতি অন্যরূপ। জনশ্রুতি অনুযায়ী জয়দিয়ারাজ মুকুট রায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রামপত্তন ও মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তি প্রেমকাহিনীমূলক। 'বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থে আছে: 'কথিত আছে, পূর্বে এই স্থানে গভীর জঙ্গল ছিল এবং সেই জঙ্গলের মধ্যে কমলাকান্ত গোস্বামী নামে একজন সুদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। একদিন একদল দস্যু স্থানান্তরে দস্যুবৃত্তি করিয়া এই বনের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। দ্রুত গতিতে ছুটিয়া আসার জন্য তাহারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়ে এবং সম্মুখে সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট পানীয় জল চাহে। সন্ন্যাসী অদ্ভুত ক্ষমতাবলে স্বীয় ক্ষুদ্র কমণ্ডলু হইতে জল দিয়া সমগ্র দস্যুদলের পিপাসা নিবৃত্ত করেন। দস্যুদলের লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে একটি রাধারমণ (কৃষ্ণ) বিগ্রহ ছিল। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহারা সেই বিগ্রহটি তাঁহাকে দান করে। সন্ন্যাসীও বিগ্রহটিকে যথাবিধি পূজা করিতে থাকেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে জয়দিয়ার রাজা মুকুট রায় স্বীয় তরুণী কন্যা দুর্গাবতীকে সঙ্গে লইয়া শিকারে বহির্গত হন এবং এই অরণ্য মধ্যে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তরুণ সন্ন্যাসীর সুন্দর মূর্তি ও গাম্ভীর্য দর্শনে রাজা বিশেষ মুগ্ধ হন এবং রাজকন্যা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। সন্ন্যাসীও রাজকন্যার রূপ দর্শনে প্রীতিলাভ করেন। রাজা উভয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের বিবাহের আয়োজন করেন এবং অরণ্য মধ্যে একটি সুন্দর নগর নির্মাণ করিয়া উহার নাম দেন গোস্বামী-দুর্গাপুর।'

জয়দিয়া বাংলাদেশের যশোহর জেলায় অবস্থিত এবং গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রাম থেকে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে ও কুষ্টিয়া জেলার জীবননগর থানার নিকট।

গোস্বামী-দুর্গাপুরের প্রেমকাহিনীনির্ভর গ্রন্থ 'রাজবালা'। এতে জানা যায় যে উল্লিখিত সন্ন্যাসী একদা ছিলেন ভূস্বামী-জমিদার। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য কর্তৃক এই পরিবার নাকি সর্বস্বান্ত হন। আবার দেবাজ্ঞায় তিনি নাকি সংসার ত্যাগ করে নির্জন বনমধ্যে ধ্যানের আসন পাতেন।

নানা লোকশ্রুতি প্রচলিত। দুর্গা নামে ব্রাহ্মণকন্যা ও গোসাঁই নামে বৈষ্ণব-যুবকের প্রেমমিলন-বিবাহে কন্যার অভিভাবকদের আপত্তির ফলে নাকি তাঁরা উভয়ে আত্মহত্যা করলে স্থাননাম হয় গোসাঁই (গোস্বামী)-দুর্গাপুর। আবার, উল্লিখিত সন্ন্যাসীর বংশধর বলে বর্ণিত হরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মতে সন্ন্যাসীর প্রকৃত নাম নাকি কৃষ্ণকমল গোস্বামী। প্রচলিত কিংবদন্তি বিচার-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই নিশ্চিত হওয়া যায় যে এই স্থাননামের সঙ্গে এক গোসাঁই যুবক ও দুর্গা নামে এক ব্রাহ্মণকন্যার প্রেমমিলনের স্মৃতিবিজড়িত।

গোস্বামী-দুর্গাপুরের জোড়বাংলা মন্দিরটি বিধ্বস্ত হলে ১৩০২ সালে পাবনা জেলার দোগাছি গ্রামের ভক্তবৈষ্ণব জগবন্ধু প্রামাণিক আর একটি চারচালা মন্দির প্রতিষ্ঠা

করেন। ঢাকা জেলার নাগেরহাট গ্রামনিবাসী ভাস্কর কুঞ্জলাল পাল নতুন মন্দির নির্মাণ করেন ও প্রাচীন মন্দিরের পোড়ামাটির ভাস্কর্যগুলি নতুন মন্দিরগাত্রে সংযুক্ত করেন। বর্তমানে রাধারমণ বিগ্রহ (নিমকাঠের বেণুকৃষ্ণ মূর্তি) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে ১৯৭২ খৃস্টাব্দে হরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রদান করেন। রাধিকামূর্তি বহুকাল পূর্বেই অপহৃত হয়। মন্দিরের অন্যান্য মূর্তি ইত্যাদি (শালগ্রাম শিলা, রৌপ্যখোদিত বিষ্ণু পাদপদ্ম) এখন কালীমন্দিরে আছে এবং নিত্যপূজিত। নতুন মন্দিরটিও বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত।

কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানার অন্তর্গত খোরসেদপুর গ্রাম। খোরসেদ-উল-মুলক নামে এক পীরদরবেশের নাম থেকে এই স্থাননাম। এখানেই আছে এই পীরের আস্তানা ও মাজার। মাজারের পাশে নাটোরের রাণী ভবানী খনিত জলাশয়। এখানকার হাটের কাছে দক্ষিণদিকে প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনে একটি পোড়ামাটির ভাস্কর্য-মণ্ডিত বাংলা চালারীতির চারচালা মন্দির এখন ভগ্ন, বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত। মন্দির-চালা এক বিশাল বটগাছের শাখাপ্রশাখায় ও জঙ্গলে আবৃত। মন্দিরটির আকার দৈর্ঘে-প্রস্থে ২০ ফুট ও উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট। প্রবেশদ্বারের উপরে বাঁকানো কার্ণিশের নিচে দুই সারিতে ও দুই পাশে দুই সারিতে মোট ৬২টি কুলুঙ্গিতে পোড়ামাটির মূর্তি-ভাস্কর্য ছিল, যার অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। এছাড়া, তিনদিকে নানা অলঙ্করণ। মূর্তি-ভাস্কর্য অধিকাংশই বিনষ্ট। অবশিষ্ট ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশার ভাস্কর্যগুলি প্রাচীর-বেষ্টনীর প্রবেশদ্বারের দুই পাশে কিছুদিন আগে নিবদ্ধ করা হয়েছে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন গোপীনাথ বিগ্রহ। এই মন্দিরটি কালের কবলে বিধ্বস্ত হলে পাশেই পাঁচটি ফুলকাটা খিলানের দুইটি সারি সংযুক্ত প্রশস্ত পঙ্খ-অলঙ্কৃত দালানমন্দির নাটোরের রাণী ভবানী কর্তৃক নির্মিত হয়, সেখানেই গোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন। ১৯৭১ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকালে পাক-সেনারা নাকি বিগ্রহটিকে ধ্বংস করে। চালা মন্দিরের পোড়ামাটির কিছু ভাস্কর্য দালানমন্দিরে সংযুক্ত আছে। বাংলা হরফে পোড়ামাটির সংস্কৃত প্রতিষ্ঠালিপিফলক দালানমন্দিরে নিবদ্ধ। ১৯ × ১৩ সেন্টিমিটার আকারের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ :

………যে সাগরশায়ক ঋতু
শীতাংশু চান্তেঃ শকে…গন্তেষু
শ্রীহরে গৃহং শয়ন প্রথাঃ
কীর্ত্তিঃ স্থিতৌ। ত্রিনেত্রপতিঃ রাম
কান্ত নৃপতি না নির্ম্মমে সংস্থপত্যগ্রণী
শ্রী……নাথ জগতঃ পতেঃ স্থপতিভিঃ
……মাদায় নির্ম্মমে……নাথ
… … … … … …

এই প্রতিষ্ঠাফলক অনুযায়ী ১৬৫৭ শকে (সাগর ৭, শায়ক ৫, ঋতু ৬ ও শীতাংশু

১, অঙ্কের বামাগতি অনুযায়ী ১৬৫৭) অর্থাৎ ১৭৩৫ খৃস্টাব্দে রাণী ভবানীর পতি রামকান্ত রায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাফলকের শেষাংশে মন্দিরনির্মাতা স্থপতির নামধাম উল্লেখ আছে। অক্ষরগুলি ভেঙে যাওয়ায় এবং বারবার প্রতিষ্ঠাফলকে রঙ করায় পাঠোদ্ধার এখন অসম্ভব। এই মন্দিরলিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হলে মন্দিরনির্মাতা শিল্পীর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হত।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন: '…ভগিনী নিবেদিতা গেলেন শিলাইদহের বিখ্যাত গোপীনাথ ঠাকুর মন্দির ও দেবদর্শন করতে। …গোপীনাথের প্রাচীন মন্দির দুটি রাজা সীতারাম রায়ের তৈরী, নূতন মন্দিরটি রাণী ভবানীর তৈরী। …সেকালের নানা শিল্পকলার নিদর্শন রয়েছে সেই মন্দিরের পাতলা ইটগুলোতে। কয়েকখানা পুরোনো ভেঙেপড়া ইটও সযত্নে সংগ্রহ করে সঙ্গে নিলেন।' প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে ভগিনী নিবেদিতা ১৯১০ খৃস্টাব্দে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে পক্ষকাল ছিলেন।

দালানমন্দিরে গোপীনাথের স্নানযাত্রা ও দোলের অষ্টকোণাকৃতি কারুকার্যমণ্ডিত মঞ্চ আছে, দারুতক্ষণশিল্পের নিদর্শন। দালানমন্দিরে এখন শালগ্রাম শিলা নিত্যপূজিত। দালানমন্দিরের সামনে অসমাপ্ত নাটমন্দির, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়। প্রাচীরবেষ্টনীর প্রবেশদ্বারও অলঙ্কৃত। বাইরে দুটি দোলমঞ্চ, একটি সংলগ্ন, অপরটি একটু দূরে। দুটিই অষ্টকোণাকৃতি ইটের তৈরি। 'তাঁতী কল্যাণ রায়' ছিলেন ধর্মপ্রাণ জমিদার। তাঁর আরাধ্য গোপীনাথ বিগ্রহ রাজা সীতারাম রায় চারচালা মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির ধ্বংস হলে রাণী ভবানী দালানমন্দির নির্মাণ করেন ১৭৩৫ খৃস্টাব্দে।

কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানার ফুলবাড়ি গ্রামে একটি জোড়বাংলা মন্দির ছিল, বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। খোকসা রেলষ্টেশন থেকে তিন মাইল উত্তরে পাকা সড়কপথে ফুলবাড়ি। তারাপদ দাস তাঁর 'ফুলবাড়ীর মঠ' প্রবন্ধে ('ভারতবর্ষ', শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ. ২৪১—২৪৩) লিখেছেন: 'ফুলবাড়ী মঠের প্রধান মন্দিরগৃহটি পাবনার জোড় বাংলা মন্দিরের ধরণের। এই মন্দিরের দেওয়ালের গাত্রে ও শিরোভাগে বহু দেবদেবীর বিচিত্র মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সনাল পদ্ম ও লতাপাতাও খোদিত হইয়াছে। ··মন্দিরের ভিত্তিভূমি মৃত্তিকা প্রোথিত।···মন্দিরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে নাটমন্দির। প্রধান মন্দিরের কিছু দূরে পশ্চিমের দিকে আর একটি সম্পূর্ণ মৃত্তিকা ভগ্ন ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইলাম।' আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে সরজমিন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে লিখিত বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে এই মন্দিরটি মঠ ছিল না, ছিল পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত জোড়বাংলা মন্দির। মন্দিরের ভিত্তিভূমি দেখে অনুমিত হয় যে মন্দিরটির দৈর্ঘপ্রস্থের আকার ছিল প্রায় ২২ ফুট ও উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট। প্রতিটি দোচালার প্রস্থ প্রায় ১০ ফুট।

জোড়বাংলা মন্দির সংলগ্ন দেবদেবীমূর্তি খোদিত দেওয়াল সমন্বিত নাটমন্দিরও ধ্বংসপ্রাপ্ত, মাটির নিচে বসে গেছে। পশ্চিমদিকে বিরাট ধ্বংসস্তূপের ঢিপি। এই

টিপিতেই নাকি সমাহিত আছে জোড়বাংলা মন্দির ও এই ফুলবাড়ি মঠমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলে বর্ণিত ফরিদপুর জেলার মেঘনা গ্রামের ব্রজবল্লভ ক্রোড়ীর আবাসভবনের ধ্বংসীভূত ইমারত। একদা তিনি নাকি ছিলেন গৃহী ও ধনী বৈষ্ণব। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে পাবনা শহরে অবস্থিত জোড়বাংলা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন মুর্শিদাবাদের নবাবের তহশীলদার ব্রজমোহন ক্রোরী, তাঁরা দুজন অভিন্ন হতে পারেন। মন্দিরে বিগ্রহের (রাধাকৃষ্ণ) নাম ছিল রাধারমণ। কিন্তু জোড়বাংলা মন্দিরের কোনও প্রতিষ্ঠালিপির সন্ধান না পাওয়ায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। সতেরো শতকের শেষে বা আঠারো শতকের সূচনায় এই জোড়বাংলা মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে একদা একটি নদী বহতা ছিল, এখন শুকনো খাত দেখা যায়। পদ্মা থেকে নির্গত হয়ে এই নদী গড়াইতে পতিত হয়েছিল। জনশ্রুতি যে মোগল সম্রাট শাহজাহানের আমলে (১৬২৯—১৬৫৮ খৃস্টাব্দ) এখানে নৌশুল্ক আদায়ের কেন্দ্র ছিল।

কুষ্টিয়া পৌরশহরে গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে পিতলের রথ ছিল। অসামান্য কারুকার্যমণ্ডিত দেবদেবীর মূর্তি শোভিত বিরাট আকারের এই রথটি ছিল বাংলার উল্লেখ্য কারুশিল্প-নিদর্শন। বর্তমান শতকের সূচনায় শহরের ধনী ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী মাখন রায়ের অর্থানুকুল্যে রথটি নির্মিত হয়। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে পাক-সেনারা রথটির পিতল খুলে নিয়ে যায়, ১৯৭৭ খৃস্টাব্দে সরকারী অর্থে রথটি পুনর্নির্মিত হয়েছে। এই রথের উপর গোপীনাথ বিগ্রহ রথযাত্রাতিথিতে আসীন হন এবং প্রতি বছর রথযাত্রায় বিরাট মেলা বসে।

মেহেরপুরের বল্লভপুরের কাছে মহমপুরেও একটি ছোট আকারের পিতলের রথ ছিল, এখন নেই।

কুষ্টিয়া শহরের রক্সি লেনে অবস্থিত জৈনমন্দিরের প্রবেশদ্বার-সংলগ্ন গাত্রে মার্বেল প্রস্তরে খোদিত জৈন দেবদেবীর মূর্তি ও ফুলকারি নকশা আছে।

চুয়াডাঙার নিকটবর্তী কড়চাডাঙা গ্রামে জমিদার রামব্রহ্ম রায় প্রতিষ্ঠিত পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত চারচালা শিবমন্দির এখন পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। গত শতকের সূচনায় নির্মিত এই মন্দিরের ভাস্কর্যশৈলী অনুল্লেখ্য।

মেহেরপুর শহরে জমিদার গোয়ালা চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির আঠারো শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত। মেহেরপুরের কালীবাড়িতে কালীমূর্তি এখন নিত্যপূজিতা। পোড়াদহে অবস্থিত শিবমন্দির এখন বিধ্বস্ত।

খোকসা-জানিপুর গ্রামে গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত কালীমন্দিরে প্রস্তরময়ী কালীমূর্তি আসীনা। প্রতি বছর রটন্তীতিথিতে সাড়ম্বরে কালীপূজা হয়। প্রচুর বলি হয়। আগে মোষ বলি হত। কুমারখালি কালীবাড়িও প্রাচীন।

কুষ্টিয়া জেলায় অনেকগুলি প্রাচীন মসজিদ আছে।

কুষ্টিয়া জেলার আলমডাঙা থানার নাগদহ ইউনিয়ানের ঘোলদাড়ি গ্রামে একটি

প্রাচীন মসজিদ আছে। দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার (ঢাকা থেকে প্রকাশিত) ৩ মার্চ ১৯৭৪ সংখ্যায় লেখা হয়েছে যে ৪১৩ সালে অর্থাৎ ১০০৬ খৃস্টাব্দে নাকি এই মসজিদটি হজরত খায়রুল বাশার ওমজ (রঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই তথ্য শুধু কল্পনাপ্রসূতই নয়, অবাস্তব ও অসম্ভব। মসজিদের পাশে নির্মাতার বলে বর্ণিত মাজার আছে। তিনগম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদের গঠনশৈলী অনুযায়ী মসজিদটি মোগল আমলে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। প্রতিষ্ঠাফলক নেই। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে সরকার কর্তৃক সংস্কারের ফ.ল অলঙ্করণ আর নেই।

কুষ্টিয়া শহর থেকে প্রায় ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ পাকা সড়ক থেকে কিছু দূরে পশ্চিমে সদর (কোতোয়ালী) থানার অন্তর্গত ঝাউদিয়া গ্রামে অবস্থিত মসজিদটি উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। মসজিদের আকার দৈর্ঘ ৫৮ ফুট, প্রস্থ ২৪ ফুট। দেওয়াল ৪ ফুট। পূর্ব দেওয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণে ১টি করে প্রবেশদ্বার। মসজিদগর্ভাংশে পশ্চিম দেওয়ালে ৩টি মেহরাব। শীর্ষে তিনগম্বুজ, চারকোণে চার মিনার। মসজিদের ভিতরে ও বাইরে পোড়ামাটির জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকাশি অলঙ্করণ ছিল। সংস্কারের ফলে অলঙ্করণ বিলুপ্ত হয়েছে। গর্ভাংশ অলঙ্কৃত। তিন সারিতে নামাজ আদায় করা হয়। প্রতিষ্ঠাফলক নেই। গ্রামের জমিদার চৌধুরী বাড়ির এলাকার মধ্যে অবস্থিত। এই পরিবার সূত্রে জানা যায় যে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা শাহ অহম্মদ আলী বা সুফী আদারী মিঞা চৌধুরী। তিনি মোগলসম্রাট আওরঙ্গজেবের দানভাজন ছিলেন। মসজিদের পাশেই তাঁর মাজার। তিনি কামেল ফকির রূপে খ্যাত হন। মসজিদটি ও চৌধুরীবাড়ি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত বলে অনুমিত। চৌধুরীবাড়িতে বংশধরদের পারিবারিক সংগ্রহে ফারসী পাণ্ডুলিপি আছে। ঝাউদিয়া শাহী মসজিদ বাংলার মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর উল্লেখ্য নিদর্শন।

কুষ্টিয়া জেলার সদর (কোতোয়ালী) থানার স্বস্তিপুর গ্রাম (কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ পাকা সড়কপথে) নাকি পত্তন করেন নবাব-সুবাদার শায়েস্তা খাঁ। তিনি ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে সুবাদার হন। তাঁর নামেই নাকি স্থাননাম ছিল শায়েস্তাপুর, পরে বিবর্তিত হয়ে স্বস্তিপুর নাম হয়েছে। এখানে শায়েস্তা খাঁ নাকি 'একরাতের মধ্যে' মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি আকারে ছোট ছিল। সেটি ধ্বংস হয়ে গেলে সেই উঁচু ভিত্তিবেদীর সম্প্রসারণ করে নতুন করে বিশাল মসজিদ নির্মিত হয়। পোড়ামাটির টালি ইঁটে ও মাটির গাঁথনিতে তৈরি এই মসজিদের পরবর্তীকালের সংস্কারে সাবেক রূপ আর নেই। শীর্ষদেশে একটি বিশাল গম্বুজকে কেন্দ্র করে চারকোণে পৃথক স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছোট গম্বুজ। পোড়ামাটির অলঙ্করণও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস'-প্রণেতা শ. ম. শওকত আলীর মতে মুর্শিদাবাদ ঢাকা প্রাচীন পাকা সড়কপথে অবস্থিত এই জনপদে স্থানীয় ভাদালিয়া গ্রামস্থ নবাবী সেনাচৌকির সেনাদের জন্যই নাকি এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকায় সঠিক তথ্য আজ আর জানবার উপায় নেই।

কুষ্টিয়া জেলার সদর (কোতোয়ালী) থানার অন্তর্গত ও কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সড়কপথ থেকে নির্গত সড়কপথে অবস্থিত হরিনারায়ণপুর গ্রামের মসজিদ মোগল-সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহসুজার নামাঙ্কিত। আকারে ছোট হলেও মসজিদের গঠনশৈলী অপরূপ। আয়তাকার মসজিদের শীর্ষে তিনগম্বুজ। সংস্কারের ফলে প্রাচীন রূপ বিলুপ্ত। জনশ্রুতি যে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধকালে শাহ সুজা হরিনারায়ণপুর গ্রামে অবস্থান করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ শাহ পাবনা জেলার দোগাছি দুর্গে অবস্থানকালে পদ্মানদী অতিক্রম করে এসে শাহ সুজার কন্যাকে বিবাহ করেন ও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই মসজিদেও কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকায় শাহ সুজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠার প্রমাণ নেই।

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার ধরমপুর ইউনিয়ানের অন্তর্গত সাতবাড়িয়া গ্রামে একটি প্রাচীন ও অপরূপ স্থাপত্যের মসজিদ বিদ্যমান। আয়তাকার মসজিদটির পূর্বদিকে ৩টি এবং উত্তর-দক্ষিণে একটি করে মোট চারটি প্রবেশদ্বার। অর্ধবৃত্তাকার খিলানের নিচে প্রবেশদ্বার। বাইরে থেকে দ্বারের খাঁজকাটা। মসজিদগর্ভাংশে পশ্চিমদিকে তিনটি মেহরাব। ছাদের কার্ণিশ ও প্যারাপেট সরলরেখায় মিলে গেছে। শীর্ষে তিনগম্বুজ—গম্বুজ কলসাকার ও অলঙ্কৃত। চারটি অষ্টকোণাকৃতি মিনার। মসজিদগাত্র অলঙ্কৃত ছিল। প্রতিষ্ঠাফলক নেই। জনশ্রুতি যে মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খানের আমলে (দেওয়ান ও উপসুবাদার—১৭০০—১৭১৭ এবং সুবাদার-নবাব—১৭১৭—১৭২৭) মসজিদটি নির্মিত হয়।

কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙা থানার কড়চাডাঙা গ্রামের মসজিদ প্রাচীন ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত। বর্তমানে জীর্ণদশায় পরিণত প্রতিষ্ঠাফলকহীন এই মসজিদ নাকি নবাব আলীবর্দীর আমলে (১৭৪০—১৭৫৬) নির্মিত। মেহেরপুর থানার পিরোজপুরে পোড়ামাটির অলঙ্করণযুক্ত প্রাচীন মসজিদ ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে হীরুমোল্লা প্রতিষ্ঠিত।

কুষ্টিয়া জেলার বানিয়াকান্দি, পান্টি, চকহরিপুর, আলমপুর, জুনিয়াদহ, আন্দুলবাড়িয়া, খালিশপুর, তিওরবিলা, মীরপুর ও কুষ্টিয়া শহরে প্রাচীন মসজিদ আছে।

কুষ্টিয়া শহরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করেছেন।

কুষ্টিয়া জেলায় বিভিন্নভাবে নানা স্থানে সুলতানী ও মোগল আমলের মুদ্রা পাওয়া গেছে। মাধপুর গ্রামে পুকুর কাটবার সময় পাওয়া গিয়েছিল বাংলার সুলতান জলালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের (১৪১৭—১৪১৮) মুদ্রা।

নীলকর সাহেবদের আঠারো শতকে নির্মিত আমঝুপি নীলকুঠিতে লর্ড ক্লাইভ অবস্থান করেছিলেন, এখন ডাকবাংলোয় পরিণত হয়েছে।

ভেড়ামারার উত্তরে পাকসীতে পদ্মার উপর রেলসেতুর নির্মাণকার্য শুরু হয় ১৯০৯ খৃস্টাব্দে, শেষ হয় ১৯১৫ খৃস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে, সে কারণে এই সেতুর নাম

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, দৈর্ঘ ৫৯০০ ফিট (এক মাইলেরও বেশি), ১৫টি স্প্যান আছে, প্রত্যেকটির দৈর্ঘ ৩৫০ ফিট। এই সেতু পৃথিবীর বৃহত্তম-দীর্ঘতম রেলসেতু। ১৯৭১ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাক হানাদার বাহিনী পূর্বপ্রান্তের দুটি স্প্যানকে বোমায় বিনষ্ট করে, ১৯৭৪ খৃস্টাব্দে পুনর্নির্মিত হয়। এই রেলসেতু দর্শনীয়। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের মধ্যে কুষ্টিয়া জেলাতেই সর্বপ্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় (১৫ নভেম্বর ১৮৬২ : শিয়ালদহ-জগতি রেলপথ)।

কৃষক আন্দোলনে কুষ্টিয়ার ভূমিকা

বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে কুষ্টিয়া জেলার ভূমিকা গৌরবমণ্ডিত। শুধু যে বাংলার সর্বপ্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙা মহকুমার দামুরহুদা থানার কাপাসডাঙা গ্রামে ১৯২০ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাই নয়, বাংলার কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনে কুষ্টিয়া এলাকার দীর্ঘকালের জনচৈতন্যশীলতা ও সংগ্রামী ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত শতকে নীল চাষীদের রক্তে অবিভক্ত নদীয়া জেলার মাটি হয়েছে লাল: নীলবিদ্রোহে এখানকার অগণিত কৃষকের আন্দোলন ও সংগ্রাম অবিস্মরণীয়। ইংরেজ নীলকর ও তাদের এদেশীয় অনুগ্রহভাজন তাঁবেদারদের নৃশংস অমানুষিক অত্যাচার-শোষণে জর্জরিত অবিভক্ত নদীয়ার কৃষক ও দরিদ্র জনসাধারণের বিক্ষোভ তীব্রতর হয়ে ওঠে। সেকালের নদীয়ার জেলা জজ স্কোনস্ ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে ইংরেজ সরকারকে তদন্ত করার জন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা সত্ত্বেও সরকার ভ্রূক্ষেপ করেনি, গুরুত্ব দেয়নি। বিত্তবান-স্বেচ্ছাচারী জমিদার-জোতদারদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও এখানকার কৃষকেরা মাঝে মাঝেই জোট বেঁধেছে গত শতকে। ওয়াহাবী ও ফারায়েজী বিদ্রোহেও কুষ্টিয়ার কৃষকেরা অংশ নিয়েছে। জমিদারী অত্যাচার-প্রতিরোধে ১৮৬৯—১৮৭৩ খৃস্টাব্দের খাজনা-বন্ধ আন্দোলনেও কুষ্টিয়ার কৃষকেরা পিছিয়ে থাকেনি। ১৮৭০ খৃস্টাব্দে পাবনা জেলার কৃষক বিদ্রোহের ঢেউ এসে পৌঁছায় কুষ্টিয়ায়। এই বছরেই প্রকাশিত হয় কুষ্টিয়ার মীর মশাররফ হোসেনের সুবিখ্যাত নাটক—'জমিদার দর্পণ'। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়াতে। এই নাটক জনজীবনকে প্রভাবিত করে। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পটভূমিকাতেই কুষ্টিয়াতে বর্তমান শতকের সূচনা হয়। ইতোমধ্যে ইংরেজ সরকার ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ ও কার্যকর করেছে। ফলে একদিকে ভূমিহীন কৃষক-শ্রমিকের সংখ্যা

ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপর দিকে চাষের জমিতে চাষীর অধিকার ও স্বত্ব হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হবার পর থেকেই প্রজারা জমির উপর চিরকালের স্বত্ব-স্বামিত্ব হারাতে থাকে।

কুষ্টিয়ার কাপাসডাঙা গ্রামে বিগত শতকেই খৃষ্টীয় মিশনের কাজ শুরু হয়। এখানে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় পাদরী হয়ে আসেন সুদূর ইতালী থেকে ফাদার বারেতো। তিনি ধর্মযাজক পদে বৃত হবার আগে স্বদেশে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেখানকার কৃষক আন্দোলন। কাপাসডাঙা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকেরা এইসময় ক্রমেই সংগঠিত হচ্ছে, গঠিত হয়েছে কৃষক সমিতি। ১৯২০ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাপাসডাঙা গ্রামেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল নদীয়া জেলা কৃষক সম্মেলন। এই সম্মেলনই অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন। বর্তমান নদীয়া জেলার নানা স্থান থেকে যে সংখ্যক কৃষকেরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক কৃষকেরা বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার নানা স্থান থেকে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। পাদরী বারেতো শুধুমাত্র এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাই ছিলেন না, তিনিই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে কৃষকদের জোট বাঁধার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাই, কুষ্টিয়ার কাপাসডাঙা বাংলার কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এক ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রাম।

কাপাসডাঙার কৃষক সম্মেলন অবিভক্ত নদীয়া জেলাকে আন্দোলিত-আলোড়িত করেছিল। ফলে, নানা স্থানে দেখা দিল বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে কৃষক সমাবেশ ও আন্দোলন। কুষ্টিয়ার পোড়াদহ ও ভেড়ামারা অঞ্চলের কৃষকেরা সংগঠিত হয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত নদীয়া জেলার নানা স্থানে ছিল মেদিনীপুর জমিদারী। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা ও মেহেরপুরে এই জমিদারীর বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। এই প্রবল কৃষক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল বঙ্গীয় প্রজা সমিতির নেতৃত্বে। কুষ্টিয়া অঞ্চলে তখন এই সমিতির সক্রিয় কার্যধারা ছিল। এই সমিতির সভাপতিরূপে জননেতা ফজলুল হক ঘোষণা করলেন: 'জমি কার? যে চাষ করে তার।' কুষ্টিয়ার কৃষক আন্দোলনে সুবক্তা কৃষকদরদী সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী গ্রামে গ্রামে সভা-বৈঠক ইত্যাদিতে মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় কৃষকদের উদ্দীপিত করতে লাগলেন।

ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ খৃস্টাব্দে বগুড়া শহরে নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে গঠিত হয়েছিল নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি। এই সমিতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কুষ্টিয়ার মৌলভী আফছারউদ্দিন আহমদ ও তাঁর ভাই শামসউদ্দিন আহমদ। ৬-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনের ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন। এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীতে রায়ত, কৃষক বা প্রজার মতামত প্রকাশের

অধিকার। তদুপরি, এই অধিবেশনেই গঠিত হয় কৃষক ও শ্রমিক দল। বিপ্লব-উত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী ভাবধারা ক্রমেই এদেশে তখন বিস্তারিত হচ্ছে, প্রভাবিত করছে। কৃষ্ণনগর সম্মেলনে কুষ্টিয়ার বহু প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন।

১৯২৯ খৃস্টাব্দে ভারতে আসেন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ফিলিপ স্প্রাট। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় কৃষক সম্মেলন। ফিলিপ স্প্রাট এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন জননেতা হেমন্তকুমার সরকার। তাঁর কৃষ্ণনগরে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও (অবশ্য তাঁর আদিবাড়ি—বাগআঁচড়া গ্রাম, শান্তিপুর থানা, নদীয়া) কুষ্টিয়া শহরে সস্ত্রীক থাকতেন। এই কৃষক সম্মেলনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, ত্রিপুরার ওয়াসীমুদ্দিন প্রমুখ যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই 'বঙ্গীয় কৃষক লীগ' নামে কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ২০ মার্চ ১৯২৯ মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় মুজফ্ফর আহমেদ প্রমুখ ধৃত হওয়ায় কৃষক লীগ আর গঠিত হয়নি। কৃষক সম্মেলনের সময় নজরুল কুষ্টিয়ায় সপরিবারে কয়েকদিন ছিলেন।

১৯৩৬ খৃস্টাব্দে সারা ভারত কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে বঙ্গীয় কৃষক সভা সংগঠিত হয়েছিল। মার্চ ১৯৩৩ মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরে কৃষকনেতা বঙ্কিম মুখার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় কৃষক সম্মেলনে কুষ্টিয়া থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন জননেতা হেমন্ত সরকারের নেতৃত্বে।

২৭-২৮ মার্চ ১৯৩৭ বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় কৃষক সম্মেলনেও কুষ্টিয়া থেকে কৃষককর্মী প্রতিনিধিরা যোগদান করেন এবং এই সম্মেলনেই বঙ্গীয় কৃষকসভা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য, যে, এইসময় কিন্তু নদীয়া তথা কুষ্টিয়ায় কৃষকসভার স্বীকৃত সংগঠনও ছিল না। কৃষককর্মীরা নিজেরাই সংগঠিত হয়ে সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। ২-৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮ হুগলী জেলার বড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় কৃষক সভার দ্বিতীয় সম্মেলনের পর নদীয়া জেলা কৃষক সভা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি অর্জন করে। তার কিছুদিন পরেই ডিসেম্বর ১৯৩৮ কুষ্টিয়ার হরিনারায়ণপুর গ্রামে বঙ্গীয় কৃষকসভার নদীয়া জেলা শাখার প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আবদুল মোমিন। এই সম্মেলন নদীয়া জেলার জনইতিহাসে এক উল্লেখ্য ঘটনা। কারণ, এই প্রথম কয়েক হাজার কৃষকের সমাবেশে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই নিভৃত গ্রামে।

এইসময় কুষ্টিয়ার দর্শনার চিনিকলের মালিক কেরু কোম্পানী স্থানীয় জমিদার-জোতদারদের চক্রান্তে তাদের সঙ্গে কৃষকবিরোধী এক ঘৃণ্য চুক্তি করে কুষ্টিয়া অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার ছোট ছোট জমির কৃষকদের আবাদী চাষের জমি বেআইনীভাবে বলপূর্বক বিনা খেসারতে দখল করে নেয় এবং এই সব জমি কেরু কোম্পানী চিনিকলের

জন্য খামারে পরিণত করে আখ চাষ শুরু করে। ফলে, কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙা অঞ্চলের অগণিত কৃষক নিদারুণভাবে বিপন্ন হয়। বঙ্গীয় কৃষক সভার নেতৃত্বে কৃষকেরা নাষ্য খেসারত ও বিকল্প চাষের জমির দাবীতে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে। কুষ্টিয়ার দর্শনাই ছিল এই আন্দোলনের অভিকেন্দ্র। এই কৃষক অভ্যুত্থানে ভীতসন্ত্রস্ত ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে জমিদারশ্রেণী। এই আন্দোলনের কৃষকদের দাবীর সমর্থনে মুজফফর আহমেদ দর্শনায় এক বিশাল কৃষকসমাবেশে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সংগ্রামী কৃষকদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করেন।

কুষ্টিয়ার তিলকপুর গ্রামে বঙ্গীয় কৃষক সভার নদীয়া জেলা শাখার দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪০ খৃস্টাব্দে। এই সম্মেলনে প্রকাশ্য কৃষকসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সারা ভারত কৃষক সভার সদস্য মৌলভী আবুল হায়াত।

৮-৯ জুন ১৯৪০ খৃস্টাব্দে যশোহর জেলার পাঁজিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় কৃষক সম্মেলনে কুষ্টিয়া থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দের মন্বন্তর-দুর্ভিক্ষের সময় কুষ্টিয়া মহকুমায় ব্যাপক দুরবস্থা দেখা দেয়, কৃষককর্মীরা ভুখা মিছিল সংগঠিত করে এবং খয়রাতী সাহায্যের দাবী জানায়।

১৩-১৪ মার্চ ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় হাটগোবিন্দপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় কৃষক সম্মেলনে কুষ্টিয়া থেকে বহু কৃষককর্মী হাঁটাপথে মিছিল করে (ও নৌকাযোগে নদী পার হয়ে) কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ হয়ে জনসভায় যোগদান করেছিলেন। এত দীর্ঘপথ তাঁরা কত কষ্টে অতিক্রম করেছিলেন—আজকের দিনে ভাবলে অপার বিস্ময় জাগে মনে।

তেভাগা আন্দোলন কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়। কুষ্টিয়ার কৃষকেরাও তেভাগা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রতীর্থ শিলাইদহ

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ গ্রাম আজ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত এক সুপরিচিত তীর্থভূমি। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে শিলাইদহের প্রভাব সুগভীর-সুনিবিড়। জমিদারীসূত্রে এই অঞ্চলের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটলেও সেই পরিচয় ফলপ্রসূ হয়েছে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে। রবীন্দ্র সাহিত্যের এক বৃহৎ ও সমৃদ্ধ অংশ শিলাইদহে রচিত। এখানে কবি শুধু সাহিত্য সৃষ্টিই করেন নি, গ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়নকর্মের নিরীক্ষাও করেছেন। কবি নিজেই লিখেছেন যে শিলাইদহ হল তাঁর

'যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান।' 'পদ্মাপ্রবাহ-চুম্বিত' শিলাইদহ তাই আজ কবিতীর্থ।

শিলাইদহের অবস্থান ২৫°৫৫´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৬৮°২৪´ পূর্বদ্রাঘিমাংশের মধ্যে। সুপ্রাচীনকালে এখানে নাকি ছিল শীলা দেবীর মন্দির, শিলাকুণ্ড বা দহ। শিলা (ই) [দেবী] দহ থেকে শিলাইদহ স্থাননাম হয়েছে বলেও জনশ্রুতি। পদ্মা-গড়াই নদীর প্রায় সঙ্গমস্থলে শিলাইদহ, উত্তরে পদ্মা, পশ্চিমে গড়াই। ডঃ সুকুমার সেনের মতে: শিলাইদহ > শৈবালিকদহ ('বাংলা স্থাননাম' দ্রষ্টব্য)।

১৬০৫—১৬১৭ খৃস্টাব্দে বি (ইব) রাহিমপুর পরগণা শিলা (ই) দহ মৌজার ইজারা পান নাটোররাজ রঘুনন্দন রায়।

১৭১১—১৭১৫ খৃস্টাব্দে সীতারাম রায়ের জমিদারীভুক্ত হয় এই অঞ্চল।

অবিভক্ত নদীয়া জেলায় নীলচাষের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখানে নীলকুঠি ছিল। এই কুঠিতে শেলী নামে এক ইংরেজ নীলকর ছিলেন। পদ্মা-গড়াই নদীর সঙ্গমস্থলে একটি দহ সৃষ্টি হলে নাকি শেলীর নামে হয় শেলীদহ, কালে নাকি হয় শিলাইদহ। এখানে একসময় ছিল শেলী ও তাঁর মেমসাহেবের সমাধি।

১৭৯১—১৮০৭ খৃস্টাব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ রামলোচন ঠাকুর নাটোররাজ রামকৃষ্ণ রায়ের জমিদারী অঞ্চল বিরাহিমপুর পরগণা নিলামে ক্রয় করেন। ঠাকুরবাড়ির শিলাইদহ জমিদারী ছিল অবিভক্ত নদীয়া জেলার ৩৪৩০ সংখ্যক তৌজিভুক্ত।

১৮৩৩ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর নীলকর সাহেব শেলীর নীলচাষের জমিজমা ও কুঠিবাড়ি ক্রয় করেন এবং ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে তিনি শিলাইদহে চিনি কারখানা স্থাপন করেন।

শিলাইদহে নীলকর সাহেবদের কুঠি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হলে ১৮৯২ খৃস্টাব্দে বর্তমান কুঠিবাড়ি নির্মিত হয়। চারদিকে ঝাউ, শাল ও শিশু প্রভৃতি গাছ-গাছালিতে ঘেরা সুরম্য পল্লীভবন হল কুঠিবাড়ি। প্রায় ১৩ বিঘা জমির উপরে অবস্থিত। কুঠিবাড়ি আড়াইতলা ভবন। পাশেই বিশাল ফলবাগান, দীঘি। নামে শিলাইদহ হলেও কুঠিবাড়ি খোরসেদপুর মৌজায় অবস্থিত। এখানে রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথবিগ্রহের পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির অবস্থিত। পীর খোরশেদের মাজার রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮ খৃস্টাব্দে নির্মাণ করেন।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে প্রথম আসেন। এখানকার জঙ্গলে বিশ্বনাথ শিকারীর সঙ্গে বাঘশিকারের কথা কবি তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে লিখেছেন।

২৭ বছর বয়সে ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে পত্নী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে কবি শিলাইদহে এসে নৌকাবাস করেন।

২৯ বছর বয়সে ১৮৯০ খৃস্টাব্দে কবি জমিদারী দেখাশোনার ভার পান এবং

শিলাইদহে এসে কাছারির পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দেন, প্রজাদের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। কিছুদিন পর আবার এখানে এসে পদ্মায় ভ্রমণ করেন। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে এসে জমিদারী পরিদর্শন করেন। ১৯১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর এখানে আসতেন, জমিদারী দেখতেন, পদ্মায় ভ্রমণ করেন এবং অজস্র সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এই সময় বাংলার বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুনীরা শিলাইদহে কবির কাছে এসেছেন। তার মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা, এণ্ড্রুজ সাহেব, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ।

শিলাইদহে যাবার পথে ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ কবি রাণাঘাটে নেমে তৎকালীন রানাঘাটের মহকুমা শাসক কবি নবীনচন্দ্র সেনের সরকারী বাসভবনে আতিথ্যগ্রহণ করেন।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে কবি কুষ্টিয়ায় পাট ব্যবসায়ে যোগদান করেন, আখমাড়াই কল সংগ্রহ করেন ও শিলাইদহেও ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করেন। শিলাইদহে তাঁতের কারখানা ও পান্টিতে সুতো-কাপড়ের হাট স্থাপন করেন। কবির উদ্যোগেই শিলাইদহে 'বঙ্গলক্ষ্মী নাট্যসমাজ' গঠিত হয়। কবি আদর্শ গ্রাম রূপায়ণে ব্রতীবালকদল সংগঠন করেছিলেন।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে কবির সান্নিধ্যে আসেন পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদানন্দ রায়, তাঁরা দুজনেই প্রথমে কাছারীতে কাজ পান। কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নামে শিলাইদহে 'মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপন করেন।

১৮৯৯ খৃস্টাব্দে কবি শিলাইদহে পল্লী সংগঠনের পরিকল্পনা রূপায়ণ করেন, কুঠিবাড়িতে পুত্রকন্যাদের শিক্ষাদানের জন্য গৃহ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পল্লীপ্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষাদানের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের আদলেই পরবর্তীকালে (২২ ডিসেম্বর ১৯০১) কবি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে এই বিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে শিলাইদহেও চলে। সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদের রক্ষার জন্য ১৯০৫ খৃস্টাব্দে কবি শিলাইদহে কৃষিব্যাঙ্ক ও তাঁতশিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করে বহুমুখী গ্রামোন্নয়ন শুরু করেন। কৃষিবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ১৯০৬ খৃস্টাব্দে আমেরিকায় পাঠান এবং ১৯০৯ খৃস্টাব্দে রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে শিলাইদহে ফিরে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ প্রবর্তন করেন। ১৯১২-১৯১৬ খৃস্টাব্দে কবি শিলাইদহে পল্লীউন্নয়নে চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষা, পূর্তকাজ, ঋণদান ব্যবস্থা ও সালিশী বিচার—এই পঞ্চবিধ কর্মসূচী রূপায়ণ করেন এবং জমিদারীতে মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তন করেন। ঠাকুরপরিবারের জমিদারীবিভাগের পরে আর রবীন্দ্রনাথের অংশে শিলাইদহ এলাকার জমিদারী ছিল না। ৬০ বছর বয়সে ১৯২১ খৃস্টাব্দে কবি আবার শিলাইদহে আসেন এবং পরের বছরও এখানে আসেন। পদ্মা তখন বহুদূরে সরে গেছে। কবি তাই লিখেছেন: 'শিলাইদা ঘুরে এলুম—পদ্মা তাকে পরিত্যাগ করেচে—তাই মনে হল বীণা আছে, তা'র তার নেই। তার না থাকুক, তবু অনেককালের অনেক

গানের স্মৃতি আছে।' ১৯২২ খৃস্টাব্দে ৬১ বছর বয়সে কবি শেষবারের মত শিলাইদহে এসেছিলেন, তারপর আর আসতে পারেননি, যদিও আবার শিলাইদহে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ১৮৯০ খৃস্টাব্দে 'অনঙ্গ আশ্রম' ('চিত্রাঙ্গদা'), ১৮৯১ খৃস্টাব্দে 'পঞ্চভূতের ডায়ারি', ১৮৯২ খৃস্টাব্দে 'সোনার তরী' ও অন্যান্য রচনা, ১৮৯৩ থেকে ১৯২২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অজস্র কবিতা, গান, ছোটগল্প ও প্রবন্ধাদি রচনা করেন। এখান থেকে লিখেছেন অজস্র চিঠিপত্র। প্রমথনাথ বিশীর মতে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী হল পদ্মার মহাকাব্য, তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতা পদ্মাশ্রয়ী ছিন্নপত্রাবলী।

১৯০৯ খৃস্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা-গান কবি শিলাইদহে সৃষ্টি করেন এবং ১৯১২ খৃস্টাব্দে শিলাইদহেই 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ (Song Offierings) করেন।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে অবস্থানকালে অংশত ও পূর্ণত রচনা করেন 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'গীতবিতান', 'কল্পনা', 'কণিকা', 'কথা ও কাহিনী', 'চোখের বালি', 'ক্ষণিকা', 'খেয়া', 'নৈবেদ্য', 'চিরকুমার সভা', 'গোরা', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'জীবনস্মৃতি', গীতিমালা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', 'বলাকা', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'গল্পগুচ্ছ'। রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন: 'গদ্য ও পদ্য দুরকম লেখারই উৎস যেন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে, এমন আর কোথাও হয়নি।' শিলাইদহে অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা', নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর আলোচনার ফলে জন্ম হয় 'সবুজপত্র' পত্রিকার।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'চিত্রা' বজরায় নদীভ্রমণ করতেন। পরে তিনি জাপানী কারিগর দিয়ে বহু অর্থব্যয়ে পুনর্নির্মাণ করেন তাঁর সুবিখ্যাত বজরা—'পদ্মা'। দ্বারকানাথ ঢাকার কারিগর দিয়ে এই বজরা তৈরি করান, পরে রবীন্দ্রনাথ আমূল সংস্কার করেন। এছাড়া, 'চপলা' 'চঞ্চলা' নামেও রবীন্দ্রনাথের দুটি বজরা ছিল।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'রায়তের কথা' গ্রন্থে লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন, তা আমি সম্পূর্ণ জানি·········রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবেও যেমন জমিদার হিসাবেও তেমন Unique.' এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন: 'আমার জন্মগত পেশা জমিদারি। কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতের মানুষ নই।

প্রজারা অন্ন জোগায়, আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।'

শিলাইদহ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকেই বাংলার কৃষিজীবনের চিত্র তুলে ধরতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহ-জীবনে তিনি শুধুমাত্র পল্লীবাসী ছিলেন না, ছিলেন জমিদার। শেষবার যখন শিলাইদহে আসেন তখন তিনি কিন্তু শিলাইদহের জমিদার ছিলেন না। তিনি এসেছিলেন শিলাইদহের চরঅঞ্চলের প্রজাবিদ্রোহের অবসান করতে, সমাধান করতে। কবি সুমীমাংসা করেছিলেন, অবসান হয়েছিল প্রজাবিদ্রোহের। তাই অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন: 'জমিদার ও প্রজার পারস্পরিক সহযোগিতাই ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ।'

ঠাকুরপরিবারের শিলাইদহ কাছারীতে প্রাক-রবীন্দ্রকালে চাষীদের উপর অত্যাচার হত বলে 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা' ও 'হিতকরী' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

শিলাইদহের ঠাকুর পরিবারের জমিদারী খাজনার দায়ে হাইকোর্টের রিসিভারের হাতে চলে যাওয়ার পর ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে ভাগ্যকুলের জমিদারেরা নিলামে ক্রয় করেন। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ কুষ্টিয়ায় পাটের কারবারেও লক্ষাধিক টাকা ঋণগ্রস্ত হন।

১৯৫১-১৯৫৩ খৃস্টাব্দে পূর্ববঙ্গ সরকার এই জমিদারী অধিগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ হবার পর সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কুঠিবাড়িকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

শিলাইদহের অদূরেই ছেঁউড়িয়ায় মরমী বাউলসাধক লালন শাহের সমাধি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের সাক্ষাৎ হয়েছিল কী না—তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও রবীন্দ্রনাথই প্রথম লালনের গান সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার করেন। এই অঞ্চলের বাউল সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করেছিল। শিলাইদহ অঞ্চলের বাউল পরিবেশই রবীন্দ্রনাথকে 'রবীন্দ্র-বাউল'-এ পরিণত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র ছিল শিলাইদহ।

শিলাইদহ ছিল রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় স্থান। শিলাইদহে বাসকালে কবি স্ত্রীকে এক পত্রে লেখেন: 'আমি কলিকাতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।' পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহের রম্য পল্লীপ্রকৃতি ও সহজ সরল পল্লীজীবন রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যের অধিকাংশেরই পটভূমি পল্লীপ্রকৃতি। 'রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্পের পট বা পাত্র পদ্মা তথা নদীময় বঙ্গ।' 'রবীন্দ্রজীবনে শিলাইদহ অপরূপ-অবিস্মরণীয়।'

রবীন্দ্রনাথ আজ নেই কিন্তু রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কুঠিবাড়ি আজ বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধ। কবির অজস্র স্মৃতির উপকরণ ছড়িয়ে আছে এখানে। ছিন্নমূল উপেনের 'দুই বিঘা জমি', শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াঘেরা বকুলতলা এখনও বর্তমান।

কুঠিবাড়িতে আছে জলযান পদ্মা-চপলা-চঞ্চলার কিছু অংশ, ১৬ ও ৮ বেহারার পালকি ডুলি, সুখাসন, নানা আরাম-কেদারা, লেখার টেবিল, দারোয়ানের তরোয়াল, ১৮৭০ খৃস্টাব্দে নির্মিত ঘাসকাটার যন্ত্র, জলশোধনযন্ত্র ও আলমারী ইত্যাদি ঘর-গেরস্থালির নানা জিনিষপত্র। এখানে কবির আঁকা শতাধিক ছবি আছে। কুঠিবাড়িতে সরকারী উদ্যোগে রবীন্দ্রগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে, সেখানে আছে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ। সরকার রবীন্দ্রস্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা করেছেন। কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন গড়াইনদীতীর থেকে কুঠিবাড়ি পর্যন্ত পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছে। পর্যটকদের জন্য সুরম্য বিশ্রামাগার নির্মিত হয়েছে ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে। সরকার কুঠিবাড়ির প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন, নির্মিত হয়েছে মুক্তমঞ্চ। কুঠিবাড়িতে আছে সার্বক্ষণিক কর্মী। প্রতিবছর এখানে সাড়ম্বরে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়—দেশবিদেশের বিশিষ্ট অতিথি ছাড়াও অগণিত রবীন্দ্র-অনুরাগীর সমাবেশ হয়। এখানে রবীন্দ্র সংসদ (একাডেমি) স্থাপিত হয়েছে, গঠিত হয়েছে রবীন্দ্রচর্চার জন্য ফাউণ্ডেশন।

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিল শিলাইদহেই তিনি গড়ে তুলবেন শান্তিনিকেতন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সরকারী পর্যায়ে ঘোষিত হয়েছিল কবিতীর্থ শিলাইদহে গড়ে তোলা হবে দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন। কবিতীর্থ শিলাইদহের এই গৌরবমণ্ডিত মর্যাদালাভের প্রত্যাশী দুই বাংলার মানুষ।

কুষ্টিয়া স্থাননাম

কুষ্টিয়া জেলার ১২টি থানা ও ১০৭টি ইউনিয়ন আছে। থানার সংখ্যা-সংকেত : ১ কুষ্টিয়া, ২ দৌলতপুর, ৩ ভেড়ামারা, ৪ মীরপুর, ৫ কুমারখালি, ৬ খোকসা, ৭ মেহেরপুর, ৮ গাংনী, ৯ চুয়াডাঙা, ১০ আলমডাঙা, ১১ দামুরহুদা ও ১২ জীবননগর। ইউনিয়ানের সংখ্যা-সংকেত : ১/১ হাটাশহরিপুর (অর্থাৎ কুষ্টিয়া থানার হাটাশহরিপুর ইউনিয়ান, প্রথম সংখ্যা থানা/দ্বিতীয় সংখ্যা ইউনিয়ান), ১/২ বারখাদা, ১/৩ মজমপুর, ১/৪ জগতি, ১/৫ জিয়ারাখী, ১/৬ আইলচারা, ১/৭ পাটিকাবাড়ি, ১/৮ ঝাউদিয়া, ১/৯ মনোহরদিয়া, ১/১০ উজান গ্রাম, ১/১১ আবদালপুর, ১/১২ হরিনারায়ণপুর, ১/১৩ গোঁসাই দুর্গাপুর, ২/১ দৌলতপুর, ২/২ প্রাগপুর, ২/৩ চিলমারী, ২/৪ রামকৃষ্ণপুর, ২/৫ ফিলিপনগর, ২/৬ মথুরাপুর, ২/৭ হোগলবাড়িয়া, ২/৮ পিয়ারপুর, ২/৯ রেফাইতপুর, ২/১০ আদাবাড়িয়া, ২/১১ বোয়ালিয়া, ২/১২ খালিশাকুণ্ডি, ২/১৩ আড়িয়া, ২/১৪ মরিচা, ৩/১ ভেড়ামারা, ৩/২ ধরমপুর, ৩/৩ বাহাদুরপুর, ৩/৪ জুনিয়াদহ, ৩/৫ মোকারিমপুর, ৪/১ মীরপুর, ৪/২ চিথলিয়া, ৪/৩ বাহালবাড়িয়া, ৪/৪ তালবাড়িয়া, ৪/৫ বারুইপাড়া,

৪/৬ আমলা, ৪/৭ সদরপুর, ৪/৮ ছাতিয়ান, ৪/৯ পোড়াদহ, ৪/১০ কুরসা, ৪/১১ মালিহাদ, ৪/১২ আমবাড়িয়া, ৪/১৩ কালিদাসপুর, ৫/১ কয়া, ৫/২ কুমারখালি পৌরএলাকা, ৫/৩ শিলাইদহ, ৫/৪ জগন্নাথপুর, ৫/৫ সাদকি, ৫/৬ নন্দলালপুর, ৫/৭ চাপড়া, ৫/৮ যদুবয়রা, ৫/৯ বাগুলহাটি, ৫/১০ চাঁদপুর, ৫/১১ পান্টী, ৬/১ খোকসা, ৬/২ সোমেশপুর, ৬/৩ জানিপুর, ৭/১ কুতুবপুর, ৭/২ আমঝুপি, ৭/৩ বুড়িপোতা, ৭/৪ দরিয়াপুর, ৭/৫ মোনাখালি, ৭/৬ বাগোয়ান, ৭/৭ মহজ্জমপুর, ৭/৮ আমদা, ৭/৯ পিরোজপুর, ৮/১ গাংনী, ৮/২ কাজীপুর, ৮/৩ তেঁতুলবাড়িয়া, ৮/৪ কাথুলি, ৮/৫ সাহারবাড়ি, ৮/৬ বামণ্ডী, ৮/৭ মটমুরা, ৮/৮ কামারখালি, ৮/৯ ষোলটাকা, ৮/১০ ধানখোলা, ৯/১ চুয়াডাঙা, ৯/২ আলোকদিয়া, ৯/৩ শঙ্করচন্দ্র, ৯/৪ মোমিনপুর, ৯/৫ কুতুবপুর, ৯/৬ তিতুদহ, ৯/৭ বেগমপুর, ১০/১ আলমডাঙা, ১০/২ ভাঙাবাড়িয়া, ১০/৩ হারদি, ১০/৪ কুমরী, ১০/৫ বরাদি, ১০/৬ গাঙ্গনী, ১০/৭ খাদিমপুর, ১০/৮ জেহালা, ১০/৯ ডাউকি, ১০/১০ জমজমি, ১০/১১ নাগদহ, ১০/১২ খাসকরা, ১১/১ দামুরহুদা, ১১/২ দর্শনা, ১১/৩ জুড়ানপুর, ১১/৪ নাতিপোতা, ১১/৫ কাপাসডাঙা, ১১/৬ কুড়ালগাছি, ১১/৭ হাউলী, ১২/১ জীবননগর, ১২/২ উথালি, ১২/৩ আন্দুলবাড়িয়া, ১২/৪ বাঁকা।

সংখ্যাবাচক স্থাননাম: এক—একতিয়ারপুর (৪/৫), একতারপুর (৬/৩, ১২/২)। দুই—দোহাটি (১২/২)। তিন—তেমাদিয়া (২/৩), তেকালা (২/১০), তেভাগা (২/১২), তেঘরিয়া (১/৩, ৪/৯), তেবাড়িয়া (৫/২), তেরাইল (৮/৬)। চার—চৌগাছা (৮/৫), চৌতুয়ার (৪/৬), চোরহাস (১/৩)। পাঁচ—পাঁচমাদিয়া (২/১), বিলপাঁচবিলা (২/৮), পাঁচবাড়িয়া (৪/১২), পাঁচলিয়া (১০/১০)। ছয়—ছঘরিয়া (১০/১১, ১১/২), ছয়ঘরি (১/৯), ছয়ঘরিয়া (৯/৩)। সাত—সাতগাছি (৪/৫), সাতবাড়িয়া (৩/২, ৪/৩), সাতপাখিয়া (৫/৪, ৬/২)। নয়—নওদাপাড়া (১/৪, ৩/১, ৪/১), নওদাআজমপুর (৪/৭), নওদা কুরশা (৪/৮), চরনওদা (৪/১১), নবদিয়া (৫/১০), নওদা দুর্গাপুর (১০/৪), নবগানা (৬/২), নওদা খামিরদিয়া (৩/৫), নওদাখড়রা (৪/৩)। দশ—দশমী (৯/৫, ১১/১), দশকাহানীয়া (৬/১)। বার—বারখাদা (১/২), বারাদী (১/২, ৫/১, ১১/২, ১২/৪), বারইটুপী (১/১০), বারভাঙা (১/৬), বারঘরিয়া (১০/১১)। তের—তেরঘরিয়া (৭/১)। চোদ্দ—চোদ্দ হাজার (২/১৪), ষোল—ষোলটাকা (৮/৯), কুড়ি—কুড়িপোল (৪/১)।

মাছের নামে স্থান: কাতলামারী (২/১৪, ৪/৭), রুইতনপুর (১০/৭), খলিশাদহ (৫/১), খলিশাকুণ্ডি (২/১২, ৮/৭), খলিশাগাদী (১১/৪), চিংথলিয়া (৪/৯), চিতলা (৮/১০), টেংরামারী (৯/৪), টাকীপাড়া (১/৪), পুটিমারী (৪/১০, ১০/৮), পুটিয়া (৫/৬), ভেদামারী (৪/১০, ৪/১২, ১০/১১), মগ্নামারী (৭/২), মাগুরা (১/১৩, ৪/১১), খালমাগুরা (৪/১০), বালিয়াডোবা (২/১৪),

বালিয়াপাড়া (১/৫), বোয়ালমারী (৯/৪), বোয়ালিয়া (২/১১, ৯/৫, ৯/৭), বোয়ালদহ (১/১), শিলিন্দা (১২/২), শোলমারী (৭/১)। মাছের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত : বর্শিবাড়ি (৭/৯), জালশুকা (৮/১০, ৯/৩)।

ফুলের নামে স্থান : ফুলবাড়ি (১/২, ১১/৬), ফুলবাড়িয়া (৪/১), ফুলবাগাদী (১০/৬), আকুন্দবাড়িয়া (৯/২, ৯/৭), কাঞ্চনপুর (১/৫, ৫/৭), কাঞ্চনতলা (১১/৫), চাপাইগাছি (৫/৪), ধুতুরহাট (৯/৪), পদ্মবিলা (৬/২), পদ্মযোনি (৬/২), পদ্মনগর (১/১২), শিমুলিয়া (১/৪, ৬/৩), সুগন্ধি (৪/৯)। ফুলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত : মালাহাবাশপুর (৩/৪), মালিয়াট (৫/১১), মালীপাড়া (৬/৩), মালীগ্রাম (৬/৩)।

ফল-ফসলাদির নামে স্থান : আমবাড়িয়া (৫/৪), আমঝুপি (৭/২), আমদহ (৭/৮), আমলা (৪/৬), আমকাঠালিয়া (৪/৫)। তালবাড়িয়া (১/১, ৪/৪), তালতলা (৯/১)। কাঠালপোতা (৭/৯। বেলঘরিয়া (১/৫), বেলগাছি (৪/৯, ৫/৩, ৯/১, ১০/১)। তেঁতুলবাড়িয়া (৮/৩, ৮/১০), তেঁতুলিয়া (১২/৪)। খেজুরতলা (১/৭, ৯/৪, ৯/৬, ১০/১১)। দুধকুমড়া (৫/৯)। আদাবাড়িয়া (৫/৯)। কমলাপুর (১/৩, ১/৫)। গাবতলা (২/৮)। কুলবাড়িয়া (৭/১, ৮/৫), কুলতলা (১২/৩), কুলচারা (৯/১, ১১/৭), কুলপালা (১০/৭)। কচুয়াদহ (৪/১), কচুইখালি (৮/১০), কচুবাড়িয়া (৪/৬)। হোগলবাড়িয়া (৯/৪)। হিজলাকর (৫/৫), হিজলাবট (৬/১), হিজলী (৭/২), হিজলবাড়িয়া (৮/৫), হিজলগাড়ি (৯/৭)। কলাইভাঙা (৭/৯)। বেগুনবাড়িয়া (২/৭)। কড়ইগাছি (৮/১)। ডুমুরিয়া (১২/৩)। কাপাসডাঙা (১১/৫)। সেওড়াতলা (৮/৩)। বৈচিতলা (১১/৬)। মাদারহুদা (১০/৮)। পিপুলবাড়িয়া (২/১২)। নিমতলা (১০/৬)। নলুয়া (৬/৪)। হোগলা (৫/৪), হোগলডাঙা (১১/৪)। বেতবাড়িয়া (৬/১, ১০/৮)। হলুদবাড়িয়া (২/৮)। ঢোলমারী (৭/৬)। মরিচা (২/১৪)। সরিষাডাঙা (৯/৪), সরিষাধূলি (২/১১)। দুর্বাচারা (১/১০)। বাঁশবেড়িয়া (৪/১০, ৮/১০, ১০/২), বংশীতলা (১/৫)। খয়েরতলা (২/১৪), খয়েরচরা (৪/৯, ৫/৫), খয়েরহুদা (১২/২), খয়েরপুর (১/৪)। ঝাউদিয়া (১/৮), ঝাউবাড়িয়া (৭/২)। ধানতলা (১/৭, ৭/২), ধান্যখোলা (১২/১), ধানখোলা (৮/১০), ধানাইগঞ্জ (১০/৮)। পাকুরিয়া (২/২)। শালদহ (১/১), শালঘর (৫/৯)।

ফল-ফসলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত : মাটিয়াপাড়া (৪/৪), মৃত্তিকাপাড়া (১/১০), জমজমি (১০/১০), বীজনগর (৪/১), আইলচরা (১/৬)।

পশু-পাখির নামে স্থান : হাতিয়া (১/৮), হাতিভাঙা (১/৯, ১১/১), হাতিকাটা (৯/২), হাসানহাতি (৯/৫)। কায়ামারী (২/৭), কাগহাটি (২/৯)। ভেড়ামারা (২/৯, ৩/১, ৩/৫), হরিণগাছি (২/৯), হরিণদিয়া (৩/১), মৃগমারী

(১২/২)। গরুড়া (২/১০)। ঘোড়ামারা (২/১৩), ঘোড়াই (৫/১)। শিয়ালমারী (১০/৭)। নাগদহ (১০/১১)। মহিষবাথান (৬/২), মহিষাডাঙা (১/১০), মহিষকুণ্ডি (২/২), মহিষাদারা (৩/২), মহিষাখোলা (৪/২, ৮/১০)। চিলমারী (২/৩)। মশাউরা (২/৬)। শালিকা (৭/১, ৭/৩), সিংহাটি (৭/৯)। ভোমরাদহ (৮/৫)। ভিংরুলা (৯/১)। ভালুকা (৫/১১, ১০/১১)। হাসাদহ (১২/৪)। বাঘাডাঙা (১১/৫)।

'শ্রী'যুক্ত স্থান: শ্রীকোল (৫/১), শ্রীনগর (১০/১০), শ্রীনাথপুর (৪/২), শ্রীরামপুর (৪/৭, ৪/১০, ৪/১৩, ১২/৪), শ্রীপুর (৫/১০, ৬/১, ৯/৩)।

নদীয়ারাজদের নামে স্থান: নদীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের নামে—ভবানন্দপুর (৭/৮), চরভবানন্দ দিয়ার (২/৩)। ভবানন্দের ভ্রাতা হরিবল্লভের নামে—হরিবল্লভপুর (২/৮)। ভবানন্দের পিতামহ কাশীনাথ রায়ের নামে—কাশীনাথপুর (১/৮)। বাগোয়ানের জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের নামে—হরেকৃষ্ণপুর (১/২)। নদীয়ারাজ ভ্রাতৃদ্বয় রামচন্দ্র রায় ও রামকৃষ্ণ রায়ের নামে রামচন্দ্রপুর (৫/১০, ১০/৭) ও রামকৃষ্ণপুর (২/৩, ২/৪, ৫/৫)। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ভৈরবচন্দ্রের নামে ভৈরবনগর (১১/৪)। নদীয়ারাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের নামে ঈশ্বরচন্দ্রপুর (১১/২)। ভবানন্দের ভ্রাতা জগদীশের বংশধর রায় জমিদারদের নামে কালীশঙ্করপুর ও হরিশঙ্করপুর (১/৩), কালীনাথপুর (৪/৮) ও হরগোবিন্দপুর (৪/৯)। কৃষ্ণনগর গোলাপটির 'সিংহ রায়' জমিদারদের পূর্বপুরুষের নামে কেদারগঞ্জ (৯/১)। সুবিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক বলে অনুমিত জমিদার পরমবৈষ্ণব কল্যাণ রায়ের নামে কল্যাণপুর (২/৭, ৪/৭, ৫/৩) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহের নামে গোপীনাথপুর (১/১, ৩/৭, ৭/৭, ৯/৪, ১১/৩) গ্রামগুলির নামকরণ হওয়া সম্ভব। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের নামানুসারে হয়েছে রঘুনন্দনপুর (১২/৪)। কুষ্টিয়া জেলায় রানী ভবানীর বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল, তাঁর নাম অনুসারে রানীনগর (২/১০), ভবানীপুর (১/১, ৩/২, ৫/২, ৫/৮, ৬/১, ৭/৫) স্থাননাম হওয়া সম্ভব।

ধর্মঠাকুরের নামে স্থান: ধর্মদহ (২/১০), ধর্মপাড়া (৫/৭), ধর্মচাকী (৮/৫)।

অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর নামে স্থান: দুর্গাপুর (৭/৮, ৫/২, ৫/৬, ১০/৪, ১১/৬), দেবীপুর (৮/৬), কালিকাপুর (৪/২), তারাপুর (৫/৫), মহাদেবপুর (২/৬), শিবপুর (১/৫, ৭/১, ৭/৫, ৯/৫, ১০/৭), লক্ষ্মীপুর (১/৫, ১/১০, ২/৮, ৫/৮, ১০/৩, ১০/৭, ১০/১২, ১২/৪), লক্ষ্মীকোল (৫/১), লক্ষ্মীখোলা (২/৯), হরিপুর (১/১, ৩/৪, ১২/১), জগন্নাথপুর (১/৩, ২/৮, ৪/১৩, ৫/৪, ৭/৬, ১১/৪), গোপালপুর (১/৫, ১/৭, ২/১, ৪/২, ৪/৪, ৫/৫, ৭/২, ৭/৭, ১১/৩), গোপালনগর (৮/১, ১০/৫, ১০/৬), গোবিন্দপুর (৩/৪, ৩/৫, ৪/৪, ৫/৩, ৫/৭, ৫/৮; ১০/৮, ১১/৭), গোবিন্দগোনিয়া (৪/২), গোবিন্দহুদা (১১/১), হরগোবিন্দপুর (৪/৯),

দেবনগর (১২/১), শ্যামপুর (১/১০, ২/১২, ৫/৭, ৬/১, ৬/২, ৭/২), শ্যামনগর (২/১২), বিষ্ণুদিয়া (১/১১), হরিনারায়ণপুর (১/১৩), কৃষ্ণপুর (২/১, ৪/১, ৫/১১, ৯/৭, ১০/৭, ১১/৮, ১২/৪), নারায়ণপুর (২/৭, ২/৯, ৬/৩, ১০/১০), বাসুদেবপুর (৩/৩), কন্দর্পদিয়া (১/৯), রাধানগর (১/৯, ১০/১), নৃসিংহপুর (১/৯), বলরামপুর (১/৯), হরিহরনগর (১২/১)।

পীর-ফকিরের নামে স্থান: পীরপুর (৯/২), ফকিরাবাদ (১/৭, ৩/৬), ফকিরপাড়া (১/৯) দরবেশপুর (১/৪, ৫/৫), গাজিপুর (২/৯), মানিকদিয়ার (২/১), খোরসেদপুর (৫/৩), 'মুস্কিল আসান' পীরের নামে—আসাননগর (১/১৩, ৬/১৩), মাদারপুর (১/২)।

মুসলমান-সম্পর্কিত স্থান: কাজিপাড়া (৬/৩), কাজিহাটা (৩/২), কাজিপুর (২/১০, ২/৮, ২/১০, ৪/১), দরগাতলাপাড়া (৭/২), খাদিমপর (১০/৭), আজান (৮/১০), মোমিনপুর (৯/৪), মোহম্মদপুর (১/৩, ২/৪, ৪/১২, ৫/৫, ১০/০), হজরতপাড়া (১/৭), আলিনগর (১/৮), মুসলিমনগর (২/২), ইসলামনগর (১/২, ১/৪), ইসলামপুর (২/৪, ২/৫, ৫/৪, ৬/৩), মোসলেমপুর (৩/৩), হায়দারপুর (৯/৪), আশরাফপুর (৭/৮), নূরপুর (১/৩), আলমপুর (১/৪), আলমডাঙা (১০/১), ইনসাফনগর (২/৪), ইব্রাহিমপুর (৫/৩, ১১/৩), জামালপুর (২/২), এনায়েতপুর (১০/৫), সলিমপুর (২/৬), সেলিমপুর (২/১২), ওসমানপুর (৬/১, ১০/৩), হাসিমপুর (৫/৪), শেখপাড়া (৫/৯, ১০/৩), আবদুলপুর (২/১২), সুলতানপুর (৪/১, ৫/১, ১১/২), জাহেদপুর (৫/৩), ওমরপুর (২/১৩), করিমপুর (১/১২, ২/১০), রৌশানপুর (২/১৩), ইউসুফপুর (২/১৩), রেফাইতপুর (২/৯), হোসেনপুর (৩/৪), মোকারিমপুর (৩/১), মজলিশপুর (৪/২), আজমপুর (৪/৭), আহাম্মদপুর (৪/৯), মসরবকপুর (৪/১, ৪/৯), মেহেরনগর (৪/১০), মেহেরপুর (৭ পৌরএলাকা), রমজানপুর (৪/১২), শরীফপুর (১/৯), গজনাভিপুর (১/১০), হাসানপুর (২/৯), আমিরপুর (৯/৪)

কুষ্টিয়া জেলা নীলচাষ ও নীলবিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। নীল ও নীলকর সাহেবদের নামে স্থান: নীলগ্রাম (৪/২), ক্রাফোরডাঙা (২/৪), ফিলিপনগর (২/৫), সাহেবপুর (১০/৬), সাহেবনগর (৪/৩, ৮/২, ৯/৫)। তীতুদহ (৯/৬) কী তিতুমীরের স্মৃতিবিজড়িত ?

কুষ্টিয়ায় রাজাপুর আছে ৫টি (১/৪, ১/১১, ২/৩, ৯/২, ১২/২) ও রাজানগর আছে ১টি (১২/১), রানীনগর আছে ১টি (২/১০), বেগমপুর আছে ১টি (৯/৭)। কোন্ রাজা, রানী ও বেগমের নামে নামকরণ হয়েছে, আজ আর জানা যায় না। তেমনি আছে হাকিমপুর (২/১০, ৪/১২), মোকতারপুর (১১/১, ১২/৪), মুন্সীগঞ্জ (১০/৮)।

কুষ্টিয়া জেলায় বিচিত্র স্থাননাম: মহানগর (১/১), আনন্দবাস (৭/৬),

আনন্দধাম (১০/১), হররা (১/৩), স্বর্গপুর (১/৪), স্বস্তিপুর (১/৪), দুঃখীপুর (২/১); কীর্তিনগর (১/১২), চুলকানি (৪/২), কাপড়পোড়া (২/১), চেংরা (৮/৯), ফাজিলের ভিটা (২/২), নদীভর্তি (২/১৪), স্বরূপের ঘোপ (৩/২), যোগীর খোপ (৮/৯), কুচিয়ামারা (৩/৩), জগশ্বর (৩/৪), নফরকাঁদি (৪/৮), চক্রঘূর্ণা (৫/৬), শঙ্করচন্দ্র (৯/৩), লালদাড়ি (৫/৩), দোস্তো (৯/৭), হাড়িগাড়ি (১০/৪), কবিখালি (৯/৪), মায়ামারী (৭/২), মাইলমারী (৮/৪), গোষ্ঠবিহার (৯/৬), ষোলটাকা (৮/৯), আমতৈল (৮/৯), সুতৈল (৪/১২), বাটতৈল (১/৪), দুধকুমড়া (৫/৯), দুধপাতিলা (১১/৭), ভাগজোত (২/৪), বিভাগ (৪/৫), ঝাঝরি (৯/৭), কালা (১২/২), পাকা (১২/৩), বাঁকা (১২/৪)। এছাড়া, বুড়া-বুড়ির নামেও স্থাননাম আছে।

রামায়ণ-মহাভারতীয় নামে স্থান : সুগ্রীবপুর (১/১১), ভীমের দিয়ার (২/৫)।

ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আদ্য ও অন্ত্যপদযুক্ত স্থাননাম : খোর্দ (১/৬, ১/৮, ৫/৩, ৫/৫, ৫/১১, ৬/২, ১০/১, ১১/৬), বুজরক (১/৮, ৫/৬, ৬/২, ৯/১), আরাজী (১/১, ৬/১, ৬/৩), জোত (১/৫, ২/১৪, ৬/৩, ৮/৫), খারি (২/৩, ২/৪), হাটাশ (১/১, ৫/৬), ডিগ্রী (১/১, ২/৩, ৯/১), ভিটা (১/৭, ২/২, ২/৮), লপ্তপয়স্তি (২/৩), খাস (২/১৪, ১০/১২)। দিয়া, দিয়ার, বিল, বাওর, চক, চর, দহ, হাট, পার, ঘাট, কিসমত, দিহি, বাড়িয়া প্রভৃতি পদযুক্ত স্থাননাম বাংলার অন্যান্য জেলার মত কুষ্টিয়া জেলাতেও অনেক আছে।

কুষ্টিয়া জেলার স্থাননামেও অস্ট্রিক প্রভাব আছে। 'ডা' 'গড়ি' প্রভৃতি অন্ত্যপদ যুক্ত স্থাননামে অস্ট্রিকপ্রভাব বর্তমান। কুষ্টিয়া জেলার নানা স্থানে কোল, সাঁওতাল, বিন্দী, কোল (বাঁশফোড়), বাগদী, ওঁরাও প্রভৃতি জনগোষ্ঠী নীলচাষের সময় এখানে আসে জীবিকার প্রয়োজনে এবং পরে তাদের বসতি পড়ে ওঠে। 'গড়ি' অন্ত্যপদযুক্ত স্থান আছে ৪টি (১/৫, ১/৯, ২/৪, ৯/৪), এছাড়া, গোহাল, দহ, কুড়ালি, বিহা প্রভৃতি পদযুক্ত স্থাননামেও আদিবাসী প্রভাব আছে।

ধ্বন্যাত্মক ও শব্দদ্বৈতমূলক স্থাননাম : দমদমা (৫/৯), জমজমি (১০/১০), গড়গড়ি (১০/৮), ডুগডুগী (১১/৭), বড়বাড়িয়া (৪/৭)।

গৃহসামগ্রীর নামে স্থান : কুরসা (৪/১০), আরবী শব্দ, চেয়ার, দুধপাতিলা (১১/৭), মাটির হাঁড়ি বিশেষ, কুড়ালগাছি (১১/৬), ছত্রগাছা (৪/৫), ছত্রপাড়া (১০/৯), ঝাঝরি (৯/৭), সোনাপাতিল (৬/১), ঢেঁকিপাড়া (৫/৭), কল্লাতকান্দি (৫/৫)।

বসতিগত স্থান : চাঁই অনুন্নত হিন্দুসম্প্রদায়বিশেষ, চাঁইডোবা (২/৪), চাইপাড়া (২/১৪)। ঢাকিপাড়া (২/৪), কুমোরগাড়া (৩/৪), কামারপাড়া (১১/২), কামারডাঙা (৪/৯), পাইকপাড়া (৫/৭), ধোবাখালি (১২/২), কাঙালীপাড়া (৩/৩), কাইগারী (কারিগর শব্দের বিবর্তিতরূপ) পাড়া (৩/৩),

বৈরাগীচর (২/১০), বারুই পানচাষী পাড়া (১/১০), কোদালীপাড়া (৩/১), কাটালীপাড়া (১/৪) [কোদালী ও কাটালী কাঠুরিয়া বিশেষ], মিনা (স্বর্ণশিল্পী) পাড়া (১/২), যুগীয়া (১/২) [যুগী, তাঁতী], যোগীনীদহ (৮/১০) ।

কুষ্টিয়া জেলায় দাড়ি আদ্য-অন্ত্যপদযুক্ত স্থাননাম আছে সাতটি : দাড়ি (৫/৬), দাড়িগ্রাম (৫/৩), দাড়িপাড়া (২/১), লালদাড়ি (৫/৩), ঘোলদাড়ি (১০/১১), ভোলার দাড়ি (১০/১১) ও দাড়িবাটিকামারা (৫/৫) ।

শব্দ-ব্যুৎপত্তি : কয়া (৫/১)—খেজুরগাছ, বাগুণ্ডা (৫/১)—বুনো ধানের ভাঁড়ার, গোবরা (৫/১০)—গুল্মবিশেষ, পোলতা (১০/৫)—কচি পাতা বিশেষ, ভারুইপাড়া (৫/৯)—ভন্টাকী গাছ-এলাকা, ভালুকা (৫/১১)—আগাছা বিশেষ, তিয়ারবিলা (১০/১২)—যে বিলে আগাছা জন্মায়, বাটতৈল—বটতলা জিরাট (১১/২) —হাটে যাবার পথে বিশ্রামস্থান, গৌরীহ্রদ (১০/২)—গড়াইনদীর হ্রদ, শালিকা (১০/৬)—যেখানে শালি ধান হয়, গাংনী (১০/৬) ও গাংদী (১/১৩)—নদীবিশেষ এলাকা, বেঁয়ারা-চর-বেহারী (৫/১)—বেহারা অদলবদল অথবা ব্যবস্থা করে পাওয়া গ্রাম + চর নদীর চর + বেহারী বেহালী ? = যে স্থানের অবস্থা ভাল নয়, নাট (৫/৯)—যেখানে নটে শাক জন্মায় । বাহারা অর্থে জলাভূমিও বোঝায় । জানিপুর (৬/৩)—ফারসী জহান অর্থে জগৎ বোঝায় । জহান > জান-জানি হতে পারে ।

আদ্য ও অন্ত্যপদ-ব্যুৎপত্তি : খোর্দ—ফারসী শব্দ, ক্ষুদ্র, আদ্যপদরূপে যুক্ত হয় । খোলা—খোলা জায়গা, অন্ত্যপদরূপে যুক্ত হয় । আইমা—মুসলমান পীর ফকির দরবেশদের ভরণপোষণ, তাঁদের ধর্মপ্রচারকার্য ও দানদাতব্যের জন্য প্রদত্ত নিষ্কর জমি । আরাজী—নদীপথ সরে গেলে যে নতুন জমির উদ্ভব হয়, সেই জমি, আদ্যপদরূপে যুক্ত । কিসমৎ—পৃথকীকৃত জমিজমা এলাকা, আদ্যপদরূপে যুক্ত । খাস—সরকার বা জমিদারের সরাসরি কর্তৃত্বাধীন জমি । চক—মৌজার বাইরের জমি—যে জমি একসময় উল্লিখিত মৌজাভুক্ত ছিল । চর—নদীর মধ্যে বা পাড়ে জেগে ওঠা জমি । দিয়ার, দিয়ারা—নদীর গতি পরিবর্তনের পর পাড়সংলগ্ন জমি । আড়া, আড়ি—উঁচু জমি । আবাদ—নতুন স্থাপিত বসতি । কাঁদি, কান্দি—প্রধান ভূমিখণ্ড বা বসতির অংশ । কুমারী—অকর্ষিত উঁচু জমি । কোল, কোলা—নিরাপদ বসতি ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলা

'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ও মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়াবাসীর অবদান গৌরবময় ও অসামান্য । ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের দেশভাগ ও স্বাধীনতার পরবর্তী ২৫ বছরে পূর্ব-পাকিস্তানের গণআন্দোলনে কুষ্টিয়াবাসী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে ।

১৯৫২ খৃস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে কুষ্টিয়া জেলায় তিনদিন সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দের নির্বাচনে কুষ্টিয়া জেলার সব আসনেই পাকিস্তানপন্থী মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা জয়ী হন এবং এই নির্বাচনী ফলাফল কুষ্টিয়াবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক। ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের গণআন্দোলনে কুষ্টিয়ায় পুলিসের গুলিতে শহীদ হন যুবনেতা আবদুর রাজ্জাক। ১৯৭০ খৃস্টাব্দের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা সকলেই ৯০ শতাংশ ভোটে জয়লাভ করেন এবং শেখ মুজিবের ছয়দফা দাবির প্রতি কুষ্টিয়ার নির্বাচকমণ্ডলী বিপুলভাবে সমর্থন জানায়। ১৯৭১ খৃস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকেই কুষ্টিয়াবাসী সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ গভীর রাত্রে যশোহর সেনানিবাস থেকে কুষ্টিয়ায় আগত বালুচ রেজিমেন্টের ১৪৭ জন সৈন্য নিহত হন কুষ্টিয়াবাসীর সশস্ত্র প্রতিরোধে। এপ্রিল ১৯৭১-এর প্রথমার্ধে কুষ্টিয়া জেলায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রশাসন প্রচলিত ছিল। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আমবাগানে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে। এখানেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী মুজিবনগর প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর ১৯৭১-এর প্রথমার্ধে কুষ্টিয়া জেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন চালু হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকবাহিনীর সঙ্গে কুষ্টিয়া জেলার নানা স্থানে তুমুল লড়াই হয়। কুষ্টিয়া জেলাতেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ক্ষয়ক্ষতি হয় সর্বাধিক পরিমাণে। মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়ার বহু তরুণ ছাত্রযুব শহীদত্ব বরণ করেন। ২৭ মার্চ ১৯৭১ কুষ্টিয়ায় পাকবাহিনীর উপর বোমা নিক্ষেপকালে গুলিতে শহীদ হন ছাত্র রণি রহমান। কুষ্টিয়ায় মার্চ ১৯৭১ খৃস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে ৬০ জন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন এবং শতাধিক আহত হন। আবার শুধু ১৪৭ জন পাকসেনাই নয়, কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাসিম ওয়াকার সহ আরও অনেক পাকপন্থী দালাল-রাজাকার গণরোষের বলি হয়। পাকবাহিনী এপ্রিল মাস থেকে ব্যাপক গণহত্যা ও নির্মম অত্যাচার শুরু করে। তাদের হাতে প্রায় দুই হাজার কুষ্টিয়াবাসী নিহত হয়। পরবর্তী সাত মাসে কুষ্টিয়ায় পাকবাহিনী ও তাদের অনুগত দালালদের হাতে প্রায় চল্লিশ হাজার কুষ্টিয়াবাসী নিহত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ সীমান্তবর্তী নদীয়া জেলায় শরণার্থী হিসাবে চলে আসে এবং অশেষ কষ্টভোগ করে।

পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর তীব্র সংঘর্ষ হয় কুষ্টিয়ার বংশীতলা, খাটুদহ, জীবননগর, আলমডাঙা, পান্টি ও আমবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে এবং পাকবাহিনী পরাভূত হয়। এই সব সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই শহীদ হন। ৮-৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ পশ্চাদপসরণরত পাকবাহিনীর সঙ্গে কুষ্টিয়ার ভাদালিয়ায় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিফৌজের যুদ্ধে ট্যাঙ্ক, দূরপাল্লার কামান ও বিমান ব্যবহৃত হয়। উভয়পক্ষেই প্রচুর হতাহত হয়। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ কুষ্টিয়া শহরের জেলা কালেকটারেট ভবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় এবং সমগ্র কুষ্টিয়া জেলা পাকবাহিনী মুক্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়; বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৭৬।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম, কলিকাতা, ১৩৮৭।

অশোক মিত্র সম্পাদিত—পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য় খণ্ড, দিল্লী, ১৯৬৮।

আবুল আহসান চৌধুরী—কুষ্টিয়ার বাউল সাধক, কুষ্টিয়া, ১৯৭৪।

—সংক্ষিপ্ত কুষ্টিয়া পরিচিতি, কুষ্টিয়া, ১৯৭৪।

আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, কুষ্টিয়া ইতিহাস ঐতিহ্য, কুষ্টিয়া, কুষ্টিয়া সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৮।

—কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী ৭৫ বৎসর পূর্তি স্মারকগ্রন্থ, কুষ্টিয়া, ১৯৮৫।

—লালন স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৭৪।

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া—বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, ঢাকা, ১৯৮৫।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা, ১৩৬৪।

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী—নবদ্বীপ মহিমা, নবদ্বীপ, ১৩৪৪।

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়—ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত; মোহিত রায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৬।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—শান্তিপুর পরিচয়, ১ম-২য় ভাগ, কলিকাতা, ১৩৪৪-১৩৪৯।

কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও সমস্যা, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৯।

ক্ষুদিরাম দাস—বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ, ২য় সংস্করণ; কলিকাতা, ১৯৮৫।

গিরিশচন্দ্র বসু—সেকালের দারোগার কাহিনী, ২য় সংস্করণ; অলোক রায় অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৩।

গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ—নবদ্বীপে সংস্কৃতচর্চার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, নবদ্বীপ, ১৩৭১।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালীর রাগ-সঙ্গীতচর্চা, কলিকাতা, ১৯৭৬।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, ১ম ভাগ, বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, কলিকাতা ১৩৫৮।

দীনেশচন্দ্র সরকার—পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত, কলিকাতা, ১৯৮২।

দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ, ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪১-১৩৪২।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজসভার কবি ও কাব্য, কলিকাতা, ১৯৮৬।

দুর্গাচন্দ্র সান্যাল—বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩১৫।

নদীয়া: স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, কৃষ্ণনগর, ১৯৭৩।

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত—নীলবিদ্রোহ ও বাঙালীসমাজ, কলিকাতা, ১৯৭৮।

বাংলায় ভ্রমণ, ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, প্রচার বিভাগ, পূর্ববঙ্গ রেলপথ, ১৯৪০।

বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০।

বরুণকুমার চক্রবর্তী—লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮৪

বিহারিলাল সরকার—তিতুমীর, ২য় সংস্করণ; স্বপন বসু সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮১।

ভারতকোষ, ১ম-৫ম খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬৪, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০, ১৯৭৩।

ভোলানাথ দত্ত সম্পাদিত—কৃষ্ণনগর পৌরসভা শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ: ১৮৫৪—১৯৬৪, কৃষ্ণনগর, ১৯৬৫।

মনোজ ঘোষ সম্পাদিত—রাণাঘাট পাবলিক লাইব্রেরী: শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ, রাণাঘাট, ১৯৮৪।

মুজফ্ফর আহ্মদ—কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা, কলিকাতা, ১৯৭৫।

মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল—কৃষকসভার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭৬।

মুহম্মদ এনামুল হক—বঙ্গে সুফীপ্রভাব, কলিকাতা, ১৯৩৫।

মোহিত রায়—নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি, কলিকাতা, ১৯৭৫।

—নদীয়া স্থাননাম, কলিকাতা, ১৯৮৫।

—বারোদোলের মেলা, কৃষ্ণনগর, ১৯৭৯।

—রূপে রূপে দুর্গা, কলিকাতা, ১৯৮৫।

—শিবনিবাস, মাজদিয়া, ১৯৮৪।

রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল—শান্তিপুর-স্মৃতি: অদ্বৈত খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৬।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী—শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৯৭৪।

শ. ম. শওকত আলী—কুষ্টিয়ার ইতিহাস, কুষ্টিয়া, ১৯৭৮।

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ১৯০৯।

সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় সংস্করণ: ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩-১৯৬৫।

সনৎকুমার মিত্র—পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা, কলিকাতা, ১৩৮২।

সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত—কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস, ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮২-১৩৮৩।

সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়—আমাদের গ্রাম, কৃষ্ণনগর, ১৯৬৩-১৯৭০।

সুকুমার সেন—বাংলা স্থান নাম, কলিকাতা, ১৩৮৮।

সুখময় মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল, ৩য় সংস্করণ; কলিকাতা, ১৯৮০।

সুধীর চক্রবর্তী—সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান, কলিকাতা, ১৯৮৫।

—কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ, কলিকাতা, ১৯৮৫।

সুপ্রকাশ রায়—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা, ১৯৮০।

সুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী—উলা বা বীরনগর, কলিকাতা, ১৩৩৩।

—উলার মুস্তৌফী বংশ, উলা, ১৩৩৭।

স্বপন নন্দী সম্পাদিত—প্রতিচ্ছবি কুষ্টিয়া, কুষ্টিয়া, ১৯৮০।

স্বপন বসু—গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালীসমাজ, কলিকাতা, ১৯৮৪।

—সতী, ২য় সংস্করণ: কলিকাতা, ১৯৮২।

স্মরণিকা: রাজ্য কো-অর্ডিনেশান কমিটির সপ্তম রাজ্য সম্মেলন, কৃষ্ণনগর. ১৯৮২।

হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ১ম-৪র্থ খণ্ড, নবদ্বীপ, ৪৭০-৪৭১ চৈতন্যাব্দ।

হরিদাস নন্দী সঙ্কলিত—আদিম নদীয়ার কথা, কলিকাতা, তারিখ নেই।

হারাধন দত্ত—জমাদার সাহেব মামুদ জাফর, কৃষ্ণপুর, ১৩৮৩।

—বঙ্গবাসী কৃষ্ণচন্দ্র দেশ ও কাল, কলিকাতা, ১৯৬৫।

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত—বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১ম-১৬শ খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৮—১৯৭৭।

Banerjee, B. and Bowers, N. M.—Changing Landscape of Nadia, Calcutta, 1965.

Bhattacharya, Jogendranath—Hindu Castes and Sects, Calcutta, 1896.

Calendar of Persian Correspondence, vol. 1 (1759—67), New Delhi, National Archives of India, 1970.

Chakrabarty, Chintaharan and Ghosh, Pareshnath, ed.—Krishnagar College Centenary Commemoration Volume, Krishnagar, 1948.

Garrett, J. H. E.—Bengal District Gazetteers : Nadia, Calcutta, 1910.

Ghosh, B.—Census 1971 : West Bengal District Handbook : Nadia, Calcutta, 1973.

Ghosh, S. N.—Census 1981 : Provisional Populalion Total, Calcutta, 1981.

Habib, Irfan—An Atlas of Mughal Empire—Political and Economic Maps.

Hunter, W. W.—A Statistical Account of Bengal, vol. II, London, 1875.

Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, vol. I, Calcutta, 1909.

Indigo Commission's Report, Calcutta, 1860.

Majumdar, Durgadas—West Bengal District Gazetteers : Nadia, Calcutta, 1978.

Mccutchion, David J.—Late Mediaeval Temples of Calcutta, Calcutta, 1972.

Minhaj-ud-din, Maulana—Tabaqat-i-Nasiri, 2 vols. ; translated by R. G. Raverty, London, 1881.

Mitra, Asok—Census 1951 : West Bengal District Handbook : Nadia, Calcutta, 1953.

Rennell, James—Memoir of a Map of Hindoostan, London, 1788.

Roy, B.—Census 1961 : West Bengal District Handbook : Nadia, Calcutta, 1963.

Sarkar, J. N., ed.—The History of Bengal, Dacca, 1948.

Siddiqui, Ashraf, ed.—Bangladesh District Gazetteers : Kushtia, Dhaka, 1976.

Tofayell, Z. A.—History of Kushtia, Kushtia, 1970.

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—উলা বা বীরনগর, সাহিত্য, ২৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২০, পৃ. ৩০৭—৩১০ ; ২৪ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২০, পৃ. ৪২৪—৪৩০ ।

অজ্ঞাত—নদীয়ার অতীত এবং বর্তমান গ্রন্থকারগণের নাম ও লিখিত গ্রন্থ, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন : কৃষ্ণনগর : কার্যবিবরণী, ১৩৪৪, পৃ. ৩১—৪৭ ।

—শঙ্কর-তরঙ্গ, রহস্য-সন্দর্ভ, ১ পর্ব ১০ খণ্ড, কার্তিক ১৯২০ সংবৎ [অক্টোবর ১৮৬৪], পৃ. ১৪৯—১৫৫ ।

অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ—নীল সঙ্ঘর্ষের নেতৃদ্বয়, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন : কৃষ্ণনগর : কার্যবিবরণী, ১৩৪৪, পৃ. ২৯৫—৩০০।

আশুতোষ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায়—প্রাচীন নবদ্বীপে ছাত্রজীবন, সাহিত্য-সংহিতা, নবপর্যায় ৭ খণ্ড ১০-১২ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩২৫, পৃ. ২৫—৩২ [২৮৯—২৯৬]; ৮ খণ্ড ১-৩ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৬, পৃ. ২৯—৩৪ ; ৮ খণ্ড ৭-৯ সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩২৬, পৃ. ১৩৫—১৪৮।

কণা দেবী—নবদ্বীপের গাজন ও শিবের বিয়ে, হোমশিখা (কৃষ্ণনগর), ৬ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৪।

কালীকিঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়—নবদ্বীপের লেখকপল্লী, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন : কৃষ্ণনগর : কার্যবিবরণী, ১৩৪৪, পৃ. ৩৩৪—৩৩৯।

কালীকিঙ্কর দে—দেওয়ান রঘুনন্দন ও সমসাময়িক বাংলা, হোমশিখা, ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩—৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬৬।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের শান্তিপুর-লীলা, শান্তিপুর (শান্তিপুর), ১ বর্ষ ৮ সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩৩৬, পৃ. ১৮৭—১৯৩ ; ১ বর্ষ ৯ সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৬, পৃ. ২১২—২১৮।

—শান্তিপুরে চৈতন্যদেব, তদেব, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬, পৃ. ৭৫—৭৯।

কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী—কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, হোমশিখা, ১ বর্ষ ৭ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০—২ বর্ষ ৭ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১।

গণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ—ফুলবাড়ী, সাধক (কৃষ্ণনগর), ২ বর্ষ ৬-৭ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১, পৃ. ১৭১—১৭৬।

গুরুদাস সরকার—শ্রীনগর, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৩২৩, পৃ. ২৫৭—২৬২।

গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত—কর্তাভজা, সমকালীন, কার্তিক ১৩৮২, পৃ. ৩০৯—৩১০।

গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ—নদীয়ায় সংস্কৃতচর্চার ইতিহাস, হোমশিখা, ১২ বর্ষ ৭ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১।

—ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সমাধান, তদেব, ১ বর্ষ ৭ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নদীয়া জেলার গ্রামাশব্দ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৯ বর্ষ ৪ সংখ্যা (?), ১৩১৯, পৃ. ১—২৪।

—কুলিয়া, সাধক, ১ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২০, পৃ. ১৩১—১৩৫।

—সুবর্ণবিহার, সাধক, ২ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২১, পৃ. ১৩৪—১৩৯।

চন্দ্রশেখর কর—শিবের সভায় শম্ভু, সাধক, ২ বর্ষ ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ. ৩৬—৩৮।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—কৃষ্ণনগরের পত্র-পত্রিকা, হোমশিখা (কৃষ্ণনগর), ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯।

—নদীয়ার ভাষা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫১ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, ১৩৫১, পৃ. ৪০—৪২।

—নদীয়ার শক্তিপূজা ও শাক্ত উৎসব, হোমশিখা, ১ বর্ষ ১১ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬০।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—নদীয়ার মল্লিকবংশ, বংশ-পরিচয়, ৮ম খণ্ড, কলিকাতা, পৌষ ১৩৩৫, পৃ. ১৪৫—১৫২।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—শম্ভুরাম ন্যায়ালঙ্কার, সাধক, ২ বর্ষ ৩ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২১, পৃ. ১০৮—১১০।

তারাপদ দাশ—ফুলবাড়ীর মঠ, ভারতবর্ষ, ২৩ বর্ষ ১ খণ্ড ২ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪২, পৃ. ২৪১—২৪৩।

দীনেন্দ্রকুমার রায়—নদীয়া জিলার সিদ্ধ যোগী (বলরামচন্দ্র), আর্যাবর্ত, ১বর্ষ ৫ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১৭, পৃ. ৩৫৩—৩৫৯ ; ৬ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১৭, পৃ. ৩৯০—৩৯৫।

দেবেন্দ্রনাথ বসু—নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৬ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৩১৬, পৃ. ২০১—২০২।

ধর্মানন্দ মহাভারতী—কৃষ্ণনগর রাজবংশ, বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ, কলিকাতা, ১৯০৬, পৃ. ১—১৫

নলিনীকান্ত ভট্টশালী—[নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা], বাংলা দেশে ইতিহাসচর্চা, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন : কৃষ্ণনগর : কার্যবিবরণী, ১৩৪৪, পৃ. ২৫১—২৬৩।

নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্তী—বল্লালঢিবি, হোমশিখা, ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৯।

প্রফুল্লকুমার সরকার—স্বর্ণবিহারের স্তূপ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৩২১, পৃ. ২০৫—২০৮।

নদীয়া ও তাহার প্রত্নসম্পৎ : চাঁদ রায়-কাহিনী, যমুনা, ২ বর্ষ, ১৩২৬। [পুনর্মুদ্রিত, প্রফুল্লকুমার সরকারের প্রবন্ধ-সংগ্রহ ; নকুল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৮৭—৯১।]

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়—বলা হাড়ি সম্প্রদায়ের কথা ও গান, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯১ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, ১৩৯২, পৃ. ১১—৩০।

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য—নদীয়ার সাহিত্যচর্চা, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন : কৃষ্ণনগর : কার্যবিবরণী, ১৩৪৪, পৃ. ৩২৬—৩৩৩।

ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গঙ্গাবাস, সাধক, ১ বর্ষ ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৩২০, পৃ. ২৯৬—৩০৫।

মোজাম্মেল হক—নদীয়ার পুরা-কাহিনী : বেৎনা, সাহিত্য, ২৭ বর্ষ ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, পৃ. ১৩৭—১৪০।

মোহিত রায়—কৃষ্ণনগরের কামান নির্মাণশিল্প ধারা, কৌশিকী, শারদীয় ১৩৯১।

—কৃষ্ণনগরের ডাকের সাজ, ধনধান্যে, ৪ অক্টোবর ১৯৭০।

—কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, ধনধান্যে, ২৮ জুন ১৯৭০।

—নদীয়া জেলার গ্রাম্যদেবতা পঞ্চানন, কৌশিকী, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪।

—নদীয়া জেলার রথ, কৌশিকী, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৫।

—নদীয়ার ধর্মপূজা, কৌশিকী, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৫।

—নদীয়ার লোকনৃত্য রাইবেশে ও জটাই সর্দার, কৌশিকী, শারদীয় ১৩৯২।

—নদীয়ার লোকসংস্কৃতি, গণকণ্ঠ, শারদীয় ১৩৯২।

—বল্লালটিপি কি বৌদ্ধস্তূপ, আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয়, ৩১ মার্চ ১৯৮৫।

যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—দেবগ্রাম, সাধক, ১ বর্ষ ৬-৭ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০, পৃ. ১৬৮—১৭৮।

যতীন্দ্রমোহন বাগচি—পল্লী-কথা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১২ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৩১২, পৃ. ১০৬—১১৯।

রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ—শ্রীমহেশ পণ্ডিত ও শ্রীপাট পালপাড়া, সাধক, ২ বর্ষ ৯ সংখ্যা, পৌষ ১৩২১, পৃ. ২৬৯—২৭২।

রাধামাধব সাহা—নদীয়ায় মারাঠা আক্রমণ, ইতিহাস, নবপর্যায় ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৭৩, পৃ. ৯৩—১০১।

—নীলচাষের প্রথম পর্বের নীলচুক্তি, তদেব, নবপর্যায় ৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, ভাদ্র—অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, পৃ. ১৫৫—১৬৩।

রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল—শান্তিপুর কথা, শান্তিপুর, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃ. ১৪—১৫ ; ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৪১—৪৫ ; ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, আষাঢ় পৃ. ৭১—৭২ ; ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ, পৃ. ৮৪—৮৬ ; ১ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ভাদ্র, পৃ. ১০১—১০৪ ; ১ বর্ষ ৮ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৯৯—২০১ ; ১ বর্ষ ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ৩১১—৩১৩।

শ. ম. শওকত আলী—প্যারীসুন্দরী : নীল বিদ্রোহের নেত্রী, ছুটি (ঢাকা), ৯ মে ১৯৮৬।

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—নবদ্বীপের পুরাতন কথা, সাধক, ১ বর্ষ ৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২০, পৃ. ১০১—১০৬ ; ৬-৭ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০, পৃ. ১৮৬—১৯১ ; ৯ সংখ্যা পৌষ ১৩২০, পৃ. ২৫৮—২৬৪।

শ্যামলী সুর—বাঙালির ইতিহাসচর্চার কয়েকটি দিক : ১৮৩৫—৭৪, ঐতিহাসিক, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৩, পৃ. ১৭—৩৫।

সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন—হরিপুর, শান্তিপুর, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, পৃ. ২৯—৩০।

সত্যশরণ চট্টোপাধ্যায়—কাঁচকুলি, সাধক, ২ বর্ষ ৬-৭ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১, পৃ. ১৯৫—২০৪।

—ধর্মদ, তদেব, ২ বর্ষ ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ. ৩৮—৪৫।

—বহিরগাছি, তদেব, ১ বর্ষ ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২০, পৃ. ৩৭০—৩৭৪।

—মুড়াগাছা, তদেব, ১ বর্ষ ৯ সংখ্যা, পৌষ ১৩২০, পৃ. ২৬৫—২৭৩।

সমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়—নদীয়ার লোকসংস্কৃতি, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭২, পৃ. ১৫৭—১৬২।

সলীল বিশ্বাস—লোকায়ত নদীয়া, সমকালীন, আশ্বিন ১৩৭৮, পৃ. ২৯৮—৩১২।

সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—দেপাড়া, তদেব, ২ বর্ষ ৩ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২০, পৃ. ১১০—১১৩।

সুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক—নদীয়ার ইতিহাস, হোমশিখা, ১ বর্ষ ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯—১ বর্ষ ১২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৬০।

সুরেন্দ্রমোহন বসু—কৃষ্ণনগর রাজবংশ, রাণাঘাট জমীদারবংশ, ভারত-গৌরব, কলিকাতা, ১৯১৬, পৃ. ২৪০—২৫৪ ; ২৫৫—২৬৩।

সৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী—শান্তিপুরে সতীদাহ, শান্তিপুর আশ্বিন ১৩৩৭ পৃ. ১৪৫—১৪৬।

—শিবনিবাস, ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৩৩, পৃ. ৫২৯—৫৩৩।

স্বপন বসু—অত্যাচারী এক নীলকর : ইতিহাসে সাহিত্যে, প্রতিক্ষণ, ৭ বর্ষ ১ সংখ্যা, ২ জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ৪৯—৫৪।

—নীলকরের অত্যাচার : দুই দারোগার চোখে, শিলাদিত্য, নবপর্যায় ৩ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৬—৩১ জুলাই ১৯৮৩, পৃ. ২১—২৪।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ—ফকির আদাড়ি মিঞা চৌধুরী, সাধক, ১ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২০, পৃ. ৩৪৯—৩৫১।

হাতেম আলি মোল্লাহ—জারি গান, হোমশিখা, ১৮ বর্ষ ৮ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৭—১৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭৭ ; ১৯ বর্ষ ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭—১৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭৮।

—বাউল সঙ্গীত : দুই দিকপাল, তদেব, ১৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৭৩—১৫ বর্ষ ৮ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৪ ; ১৬ বর্ষ ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪—১৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৪।

—বাংলার গুপ্ত ফসল, তদেব, ১২ বর্ষ ৫ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৭০—১৩ বর্ষ ১২ সংখ্যা কার্তিক ১৩৭২।

[আলোচ্য বিষয় : নদীয়ার লোকধর্ম ও লৌকিক সংস্কৃতি।]

—সেকালের গাথা একালের কলমে, তদেব, ১৪ বর্ষ ১ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭২—১৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৩।

—সেকালের বিয়ের গান, তদেব, ১৭ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৌষ ১৩৭৫—১৭ বর্ষ ৮ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৬।

হারাধন দত্ত—ইতিহাসের স্মৃতি : শিবনিবাস মেলা ও উৎসব, জনসেবক সাপ্তাহিকী, ২ বৈশাখ ১৩৭৩।

—একটি প্রাচীন শীতলা মন্দির : শিবনিবাস, সমকালীন, ফাল্গুন ১৩৭৯, পৃ. ৫৩৯—৫৪৬।

একটি সমাধির স্মৃতি : রানীনগর, আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় আলোচনী, ২২ শ্রাবণ ১৩৬৮।

—চূর্ণীতীরের লোকসংস্কৃতি, নয়া বাঙলা, ৯ ফাল্গুন ১৩৭৮।

—দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র, ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৬৪।

—নদীয়ার গাজন উৎসবে লোকগীতি, সমাবেশ, ২য় সংখ্যা, ১৯৬২।

—নদীয়ার পল্লীগীতি বোলান, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৬২ ; সারস্বত বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৮৩।

—নদীয়ার লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক দেবতা, কল্লোল (নবপর্যায়), বৈশাখ ১৩৭৩।

—নীলবিদ্রোহের এক বিস্মৃত পল্লী চৌগাছা আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় আলোচনী, ১০ বৈশাখ ১৩৬৮।

—পুণ্যতোয়া চূর্ণী, বসুধারা, ভাদ্র ১৩৬৬।

—বিদ্রোহী বিশ্বনাথ, মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৬৯।

—বৃন্দাবন সরকার চৌধুরী : নীল আন্দোলনের বিস্মৃত নায়ক, স্বাধীনতা, ২ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯।

—মগরহাট : বড়পীরের মেলা, সমকালীন, বৈশাখ ১৩৮৬।

Ghose, Lokenath—The Nadiya Raj Family, The Modern History of the Indian Chiefs, pt. II Calcutta, 1881, pp. 358--364.

নির্দেশিকা

Opinions of Weight.

The Indian Mirror,

March 7, 1911.

The *Nuddea Kahini*, strings together in a big volume the many interesting chronicles of the interesting District of Nuddea and illumines by the white light of authentic information an interesting chapter in the history of Bengal. The book is the outcome of the laborious researches of its author, Babu Kumud Nath Mullick of Ranaghat, who has left nothing undone to embody in it a complete account of Nuddea in all its various aspects. * * The author of the book before us has turned the abundant materials which he has accumulated by ungrudging labours, to judicious use. With a true historical insight, he has weighed in the balance every new fact likely to throw interesting light, and grouped his materials according as they in giving us a true picture of Nuddea of the past and the present. * * The author has ransacked his materials from Persian chronicles. Vaishnav literature, copper-plates and inscriptions, family histories, village lore and tradition, and important old records and legal documents, and it is no wonder, therefore, that he has produced a book which is a veritable mine of instructive information. The book has all the charms of an old chronicle and a modern gazetteer. * * We are greatly delighted to welcome the appearance of this book, which forms really an acquisition to the growing literature, bearing on the histories of the different

---

* বঙ্গের প্রায় সমগ্র সাময়িক পত্রে "নদীয়া-কাহিনী" সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় যথাযথ প্রকাশ করিবার স্থান এখানে নাই ; তাই অতি সংক্ষেপে কতিপয় সুবিখ্যাত পত্রের অভিমত হইতে কোন কোন অংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এ সম্বন্ধে আমরা শত শত অযাচিত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, সে সমুদয় শীঘ্রই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, এখানে কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইল।

districts in the two Provinces of Bengal. * * We hope the author will continue his labours in this direction to feed a much needed department of Bengali literature.

The Bengali

7th March, 1911.

* * In justice to the author, we are bound to say that his treatment is exhaustive and that he has spared no pains to make the work interesting. It is in a sense a gazetteer. * * The great movement of Vaishnavism, centring round the divinely inspired personality of Chaitanya, is traced with a master's hand : and equally interesting is the record of the growth of Bengalee writing and literature. Altogether we have great pleasure in recommending the book to the favourable consideration of the public. We ourselvés derived much pleasure from its perusal.

The Amrita Bazar Patrika

March 8, 1911.

The book a very big volume, has been really a nice compilation. * * The author has left no stone unturned to collect every particular worth knowing regarding the district, and we dare say his attempts have been a success all through. * * Suffice it to say that it will be found very useful and interesting to those who will care to read it and we doubt not that it will amply repay perusal. We hope the Government will patronize the author by keeping a copy of this valuable book in all its statistical departments. The book has been very nicely got up and beautifuly bound.
We wish the young author all success.

The Reis and Rayyet

March 18, 1911

UNLIKE the "Murshidabad Kahini." the "Nadia Kahini" is the *kahini* or account of the Nadia district, not the city only. * * The book gives many illustrations, some of which are of great interest, particularly the one representing Chaitanya listening to the reading of the sacred Bhagbat Gita. * * It is written in good, sometimes elegant Bengali, and is throughout interesting. The author seems to have a charming way of telling his story, so much so that the history reads more like a romance than otherwise. * * The book in short is almost complete in itself and is thus valuable for reference. * * The book deserves well of the public as of the Government, the more so because it is cosmopolitan in that it is partial to no particular religion or religious section and treats dispassionately, or judges kindly of every religion or religious movement or sect.

The Hindoo Patriot

April 4. 1911.

Babu Kumud Nath Mullik of Ranaghat has rendered a valuable service to the cause of progress of Bengali literature, as he has done by compiling and publishing an account of the District of Nadia under the title of *Nadia Kahini*. * * As to the subject matter of the book, we can confidently assert that every reader will have to be struck with extent of research that the young author has made to collect all possible information about Nadia. * * This book, we are sure is a most valuable contribution to the History of India and future Historian of this ancient land will most heartily thank the author for his valuable contributions. * * We are not aware if the author has received safficient encouragement from the public of Bengal, but we think every one will agree with

us when we say that at least a hundred thousand copies of this valuable work would have been sold in course of a week from the date of its publication, if such book were published in England and in English language. We wish every educated man of the country to get a copy of *Nadia Kahini* and read it at leisure with pleasure and profit.

The Statesman

April 9, 1911.

Almost simultaneously with Mr. Garrett's Gazetteer of Nadia, comes a Bengali volume of 400 pages by Babu Kumudnath Mullik, covering practically the same ground. Its special interest lies in the fact that, whilst making free use of Sir William Hunter's Gazetteer and of other printed books, the author has also availed himself of the legend and folklore of the District. * * The book is brightened by portraits, some of them very well reproduced, of local celebrities, and is worth perusal by any student of local history who can read Bengali.

The Indian Daily News.

7th June, 1911.

* * The writer has been at immense pains to gather together materials for his book and from the manner of treatment it may be expected that these will be amply rewarded. The book is excellently got up and liberally illustrated. The author has been well-advised in appending the statistical account of the district to his book, as otherwise the book would have been defective. * * *

The Modern Review.

June, 1911.

* * The Book has certainly enriched one department of Bengal literature and is sure to be welcomed by every lover of our National History.

হিতবাদী, ৩রা চৈত্র, ১৩১৭ সাল।

* * চারিশত পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ পুস্তকে গ্রন্থকার নবদ্বীপের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সত্য সত্যই হৃদয়ে বর্ণনাতীত আনন্দের সঞ্চার হয়, আশার সঞ্চার হয়। আনন্দের সঞ্চার হয়—কারণ আমরা যাহা লুপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা লুপ্ত নহে; তাহা আমাদেরই উপেক্ষার ফলে এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল; কুমুদ বাবু অশেষ পরিশ্রম সহকারে সেই রত্নরাজির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। আর আশা হয়—কারণ কুমুদ বাবু ধনবানের সন্তান হইয়া, অল্প বয়সে স্বদেশের অতীত গৌরব রক্ষার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার মত যুবাপুরুষ যদি বিরহ ব্যথার কবিতা লিখিতেন বা গোয়েন্দা কাহিনী লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রকে আগাছাপূর্ণ করিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে হয় ত আমরা বিস্মিত হইতাম না। কারণ বয়োধর্ম্মে যুবকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই একেবারে রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র বা কোনেনডয়াল হইতে চাহেন। কিন্তু কুমুদবাবু সে পথে না গিয়া বহুকষ্টসাধ্য মৌলিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা কি এখনকার কালে বিস্ময়ের বিষয় নহে? এই নদীয়া-কাহিনীর উপাদান সংগ্রহের জন্য গ্রন্থকারকে শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া অনেক দুর্গম স্থানে গমন করিতে হইয়াছে। জানিনা বাঙ্গালী পাঠকের নিকট হইতে তিনি ইহার প্রতিদান পাইবেন কি না। এই পুস্তকে বিষয় সন্নিবেশ ও ঘটনার পরম্পর্য্য রক্ষাও বেশ সুন্দর হইয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, মহারাজ আদিশূরের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপের সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার বর্ণনা বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। চৈতন্যদেব এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপ সমাজ কিরূপ ছিল, তাহা এই পুস্তক পাঠে যেন সুস্পষ্ট চিত্রের ন্যায় চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয়। * * এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া কুমুদবাবু যে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আশা করি, বাঙ্গালী পাঠক কার্য্যতঃ সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বঙ্গবাসী, ১১ই চৈত্র ১৩১৭ সাল।

আমরা "নদীয়া-কাহিনী" নামে একখানি সৎগ্রন্থের উপহার পাইয়াছি। এ গ্রন্থখানি পড়িয়া যে আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহাতে বহু অসৎগ্রন্থ পাঠসঞ্চিত পুঞ্জীকৃত পাপের লাঘব বোধ হয়। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক এই "নদীয়া-কাহিনী"র প্রণেতা। বঙ্গসাহিত্য রচকের শীর্ষস্থানীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। এই মুখবন্ধের মূল্য আছে কি? গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, —নদীয়া-কাহিনীকে নদীয়ার ইতিহাস বলা যায় না। তবে যে সকল উপাদানে ইতিহাস বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" ইউরোপীয় প্রথায় অধুনা যে সব ইতিহাস রচিত হয়, তাহার ভাব-প্রণালীমতে নদীয়া-কাহিনী অবশ্য ইতিহাস নহে, তবে ইউরোপে অধুনা ইতিহাস রচনার যাহাকে নূতন প্রণালী বলা যায়, সেই প্রণালীর অংশ এই নদীয়া-কাহিনীতে প্রকটিত। ইউরোপের নূতন প্রণালীমতে ইতিহাসে ধারাবাহিক ঘটনার সঙ্গে সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতির সৃষ্টিপুষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। নদীয়া-কাহিনীতে ধারিবাহিক ঘটনার বিবরণ নাই; তবে নদীয়ার ধর্ম্ম সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতির যেরূপ আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে যে ইতিহাসের একটি পুষ্টাঙ্গ হইতে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে। এক সব ব্যাপারে বেশ একটা সম্বন্ধ সম্বন্ধভাবে ধারাবাহিক ঘটনা, দৃষ্টান্ত এবং লোকচরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে উপন্যাসপাঠাগ্রহের ভাবাপন্ন হইতে হয়। নদীয়ার ৬ক বর্ত্তমান তথ্যের আলোচনায় আধুনিক সমগ্র বঙ্গের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, পরন্তু সেকালের আর একালের তুলনায় সমালোচনার হর্ষ-বিষাদের ঘাত-প্রতিঘাতে হাসি অশ্রুর কি যে সংমিশ্রণ হয়, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। পুস্তক পড়িয়া রাখিয়া দিলে, আপ শোষের তপ্তশ্বাসে যেন মনের বাণী অধরোষ্ঠে ফুটিয়া উঠে:—"হায় কি ছিল, কি হইল!" বাঙ্গালী পাঠকের এ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। এ গ্রন্থে গ্রন্থকারের প্রগাঢ় গবেষণা-শক্তির পূর্ণ পরিচয় পরিস্ফুট। * * নদীয়া-কাহিনী বঙ্গসাহিত্যের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছে

বসুমতী, ১১ই চৈত্র, ১৩১৭।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, রাণাঘাটের বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের সুনামধন্য বংশধর শ্রীমান কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কুমুদ বাবু সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং বিনয়ী। তিনি বাণী এবং কমলা উভয় দেবীরই বরপুত্র। এই গ্রন্থেই কুমুদ বাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি এরূপ সুলিখিত যে, ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া আর ক্ষান্ত হওয়া যায় না। উপন্যাসের কাল্পনিক

কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী ইহাতে বর্ণিত বাস্তব কাহিনীর নিকট অত্যন্ত ম্লান হইয়া যায়। গ্রন্থকার বহু অনুসন্ধান পরিশ্রম-স্বীকার এবং অর্থব্যয় করিয়া অনেক অজ্ঞাতকাহিনী এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহা কেবল নবদ্বীপ নগরের কাহিনী নহে,—নবদ্বীপ জেলার কাহিনী। নবদ্বীপ জেলার সকল তথ্যই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—প্রধান প্রধান স্থানগুলির বিবরণ এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের জীবন-চরিত এই গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও যথাযোগ্য অলঙ্কারে ভূষিত। লেখকের লিখিবার শক্তি অসাধারণ। * * পুস্তকে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। এত বড় বিরাট গ্রন্থের মূল্য দুই টাকা বারো আনা মাত্র। * * বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ সাগ্রহে পঠিত হইবে; এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

সুলভ সমাচার, ৫ই আশ্বিন, ১৩১৮ সাল।

* * বঙ্গভাষায় এরূপ আয়তনে বৃহৎ ও বিবিধ শিক্ষাপ্রদ তথ্যে পরিপূর্ণ পুস্তক অল্পই দেখা যায়। গ্রন্থকার রাণাঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক বয়সে নবীন হইলেও, অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। তিনি নদীয়ার সমাজ, বিদ্যা, ধর্ম্ম, রাজনীতি সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া একটি সুসম্বদ্ধ ঐতিহাসিক আলেখ্য পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থ কেবল নবদ্বীপের কাহিনীতে পূর্ণ নহে, ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সমগ্র নদীয়া জেলার জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। * * কুমুদবাবু বহু আয়াস স্বীকার করিয়া নানাবিধ অভিনব তত্ত্ব সমাহৃত করিয়াছেন,—তাঁহার উদ্যম, চেষ্টা ও গবেষণার শত মুখেও প্রশংসা করা যায় না। তিনি শুধু নদীয়ার বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা, রাজনীতি ও সমাজনীতির বিবরণ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু প্রাচীন ইতিকথা, বংশ-পরম্পরাগত কাহিনী, বিশিষ্ট জীবনী, প্রাচীন ও আধুনিক স্থানের পরিচয় এবং সাহিত্য, শিল্প ও লোকাচার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া, পাঠকের পক্ষে নদীয়া সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার অপেক্ষা রাখেন নাই। বাস্তবিক এরূপ সুসম্পূর্ণ স্থানিক ইতিহাস বাঙ্গলাভাষায় অতি অল্পই আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। নদীয়ার ভৌগোলিক পরিচয়, নদ, নদী, রাজপথ, কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য, আদমসুমারীর ফল, বিখ্যাত জমিদার ও রাজপুরুষদিগের কাহিনী, কিছুকেই কুমুদবাবু অগ্রাহ্য করেন নাই। তিনি প্রত্যেক বিষয়ই যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া নদীয়াকে নবরাগে রঞ্জিত করিয়া আমাদের মানসনেত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন। অনেকগুলি ঐতিহাসিক চিত্র এই পুস্তকের মূল্য বাড়াইয়াছে। * * এই নাটক নবেল প্লাবিত দিনে এইরূপ গ্রন্থের যথোচিত সমাদর হইলে বুঝিব বাঙ্গালী পাঠক গুণগ্রাহিতা শক্তিশূন্য হয়েন নাই।

ভারতী ; চৈত্র, ১৩১৭।

* * রত্ন সঙ্কলনের জন্য গ্রন্থকার বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ বেশ পরিপাটী হইয়াছে।

প্রবাসী ; বৈশাখ, ১৩১৮।

* * গ্রন্থখানি বহুশ্রমে সংকলিত। ভবিষ্য ঐতিহাসিকের শ্রম বহু পরিমাণে লাঘব করিয়া রাখিল। এইরূপ প্রাদেশিক ঐতিহাসিক চিত্র যাঁহারা বহু শ্রমে সংগ্রহ করিতেছেন তাঁহারা যে বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র এ কথা বলাই বাহুল্য। সকলে এক এক খণ্ড ক্রয় করিবে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করা হইবে। * *

অভিনন্দন পত্র

নবদ্বীপোদ্দীপী কবিকুলভুবাং গৌরবরবিঃ।
ক্রমাদস্তঃ যাতঃ প্রচুর তিমিরৈবাবৃতা মহী।
নিরালোকা লোকস্তরগত পুরাতত্ত্ব নিধয়ঃ।
তদুদ্ধারে ধীরপ্রিয় কুমুদনাথঃ প্রযততে॥

পুরাবৃত্তবিরহিতস্যাস্মদ্দেশস্য প্রত্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসবঃ কেবলং লোকপরম্পরাগত পরস্পর বিরুদ্ধমত সঙ্কুলং জনপ্রবাদ মাকর্ণ্যাবিতৃপ্তমানসাস্তৃপ্তিং নাধিগচ্ছন্তি, পরং সন্দেহ দোলামারোহন্তি। সাম্প্রতং মল্লিকান্বয় তিলকেন রাণাঘাটনিবাসিনা শ্রীমতা কুমুদনাথেন বহুযত্ন পরিশ্রমেন নানাস্থানস্থ প্রাচীন লিপিং সঙ্গতাঞ্চ কিম্বদন্তীং তত্তৎসময়জাত ঘটনাবলীঞ্চ সংগৃহ্য নদীয়াকাহিনীনামপুস্তকং নিরমায়ি। অধুনা তৎপুস্তকমনিগত্য সমালোচ্যচ পরিতৃপ্ত মানসা নবদ্বীপস্থাবয়ং গ্রন্থরচয়িত্রে তস্মৈ "পণ্ডিতরত্নেত্যুপাধিং" যচ্ছামঃ।

আশাস্মহে চ ভগবন্তং শ্রীমান কুমুদনাথাত্ম, চিরং জীব সমৃদ্ধয়ে।
আকল্পং কৌমুদীং কীর্ত্তিং কৃতিনঃ কীর্ত্তয়ন্তুতে॥ ইতি

দ্বাত্রিংশদধিকাষ্টাদশ শত শকাব্দীয় সৌর চৈত্রস্যাষ্টাবিংশতি দিবসীয়া লিপিরেখা।

মহামহোপাধ্যায় তর্কপঞ্চাননোপাধিক শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মাণঃ। মহামহোপাধ্যায় সার্ব্বভৌমপাধিক শ্রীযদুনাথ শর্ম্মাণঃ। তর্করত্নোপাধিক শ্রীহরিশ্চন্দ্র দেবশর্ম্মাণঃ। কবিভূষণ শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন শর্ম্মাণঃ। কাব্যতীর্থোপাধিক শ্রীঅহিভূষণ শর্ম্মাণঃ। চূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীতারাপ্রসন্ন শর্ম্মাণঃ। স্মৃতিভূষণোপাধিক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ শর্ম্মাণঃ।

তর্কভূষণন্যায়তীর্থোপাধিক শ্রীআশুতোষ শর্ম্মাণঃ। কাব্যস্মৃতিতীর্থোপাধিক শ্রীহরিপদ শর্ম্মাণঃ।

SIR GOOROO DASS BANERJI KT. M. A. D. L. PH. D.,

Late Vice-Chancellor Calcutta University Ec., Ec., says :—

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা,
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

কল্যাণবরেষু,

আপনার প্রদত্ত "নদীয়াকাহিনী" নামক পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। নদীয়া বঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ প্রদেশ, এবং "নদীয়াকহিনী"তে সেই প্রদেশের বিস্তৃত বৃত্তান্ত সরলভাষায় সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি অল্পই আছে। আপনার এই গ্রন্থ সাহিত্য জগতে অবশ্যই সমাদৃত হইবে।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

MAHAMAHOPADHAYA HARAPROSAD SASTRI

M. A., F. R. A. S., C. I. E.

Late Principal of Sanskrit College Calcutta writes :—

I have read the work entitled Nadia Kahini with great interest. It is a useful work and gives an exhaustive account of the District of Nadia and the city of Navadip from which the District derives the name. Though the work is of the nature of a District Gazetteer it is very interesting to Bengali readers as it is written from a Bengali point of view.

JULY 29th 1912.
26, Pataldanga Street,
Calcutta.

HARA PROSAD SASTRI.

SIR PRATUL CHANDRA CHATTERJI KT., M. A., D. L.
Late Vice-Chancellor, Allahabad University &c. &c., observes :—

I have read Mr. kumud Nath Mullick's "Nadia-Kahini" with great pleasure. It is a mine of informntion about the history, topography and folklore of the district and has been compiled and written with great ease and industry, Such books are greatly needed in these days to throw light on the past of our country, and it is the duty of our educated young men to supply the want. I am very glad Mr. Mullick has devoted himself to this task and has done it with great credit to himself. The book is entertaining and pleasant reading and fully deserves the approbation and patronage of the public.

LAHORE P. C. CHATTERJI
17th March, 1911

THE HON'BL MR. S. P. SINHA, BAR-AT-LAW.
The First Indian Law Member. Viceregal Council &c., &c. writes :—
17, Elysium Road, Calcutta.

I have read with much pleasure নদীয়া-কাহিনী by Babu Kumud Nath Mullick and particularly the portion dealing with the lives of modern leading men born in the District. To me it was most interesting and I should very much like similar works to be undertaken with regard to other Districts of Bengal. The language is chaste and the information given most interesting.

S. P. SINHA.

THE HON'BL BABU SARADA CHARAN MITRA M. A., B. L.

Late Judge, Calcutta High Court, President, Bangiya Sahitya Parishad writes :—

পাণি সেহালা, জেলা হুগলী.
১৯ চৈত্র ১৩১৭ সাল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"নদীয়া-কাহিনী" পড়িয়া দেখিলাম, সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের একটি অলঙ্কার হইয়াছে। অপর সকল কথা সাক্ষাতে বলিব।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

RAI RAJENDRA CHANDRA SASTRI BAHADUR M. A.

Translator to the Govt. of Bengal says :—

৩০ নং তারক চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা।
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১২।

প্রিয় কুমুদ বাবু,

আমি আপনার নদীয়া-কাহিনী পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আজকাল যে শ্রেণীর অসার পুস্তকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজ প্লাবিত হইতেছে, ইহা সে শ্রেণীর পুস্তক নহে। আপনার ইতিহাস রচনার শক্তি আছে; প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া আপনি নদীয়ার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন ও তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। আপনার গ্রন্থ নানা তথ্যপূর্ণ, অথচ সেগুলি আপনি এরূপ সুকৌশলে সাজাইয়াছেন ও এরূপ মনোজ্ঞ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, যে গ্রন্থখানি উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এত শীঘ্র যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, ইহা হইতেই ইহার গুণবত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে। নদীয়ার অধ্যাপকমণ্ডলীর সচিত্র জীবনী বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাসে নদীয়ার রাজপরিবার বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, আপনার গ্রন্থে সেই প্রাচীন রাজবংশেরও সুন্দর কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। আমি আপনাকে আপনার এই উপাদেয় গ্রন্থের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি; আশা করি আপনি এইরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া সুধীসমাজের প্রশংসার্হ হইবেন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।